আলোচনা

ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

প্রথমখণ্ড।

১৮০৬-৭ শক।

কলিকাতা,

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৪-৮৫।

মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা—ডাক মাশুল ।০ আনা।

সূচী।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

আলোচনা

ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] ভাদ্র, ১৮০৬ শক। [প্রথম সংখ্যা।

আবাহন।

যেথা নাহি অন্ধকার, দিবালোক নাই,

ভূত ভবিষ্যৎ নাই, অধ ঊর্দ্ধ ঠাঁই,

মঙ্গল জ্যোৎস্না এক ফুটে অনিবার,

রয়েছে মহিমা ধ্রুব করিয়া বিস্তার,

বাজি' যেথা আনন্দের অনাহত-নাদ

দিতেছে অনন্ত হ'তে অভয় সংবাদ,—

অকাল সেখানে সব, সবি অনাকাশ,

কেবল অনাদি-জ্ঞান আছয়ে প্রকাশ।

সেই বিন্দু—সেই লক্ষ্য—সেই দিকে গতি,

নিত্যানিত্য ছুটে নিত্য সেই লক্ষ্য প্রতি।

তোমরাও হে মানব, হও জাগরিত,

অন্তরে আত্মার জ্যোতি কর প্রজ্জ্বলিত,

সংশয়-তিমির সব যাইবে মিটিয়া,

ধ্রুব-বিশ্বাসের অগ্নি উঠিবে জ্বলিয়া,

দেখিবে অতুল্য জ্যোতি অন্তর-শোভন,

সব আলোচনা তব হইবে পূরণ।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

সিদ্ধিদাতা ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র পত্রিকা খানি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার আকার ছোট, ক্ষমতা অল্প, উদ্দেশ্য সামান্য। এই উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য আলোচনার জন্ম হইল। ধর্ম্মালোচনার পক্ষে এখন অতি সুসময় উপস্থিত। নানা কারণে আজি কালি এদেশের লোকেরা ধর্ম্ম-চর্চ্চায় মন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এত দিন পরে শিক্ষিত বাঙ্গালি বুঝিতেছেন,—ধর্ম্ম ছাড়িয়া মানুষ মানুষ হইতে পারে না, সমাজ চলিতে পারে না; জাতীয় উন্নতি ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা জাতীয় অবনতিতে পরিণত হয়। যৌবনের তেজে প্রমত্ত হইয়া, কুশিক্ষায় অন্ধ হইয়া, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, যাঁহারা এক সময়ে ধর্ম্মের নামে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতেন, ধর্ম্মের কথায় বিদ্রূপ করিতেন, আর ভগবানের প্রসঙ্গ উঠিলে ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া হাই তুলিতেন; এক সময়ে যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ধর্ম্ম, বালক ও অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক এবং ইঁহাদিগের মত অল্পবুদ্ধি ও ভাব-প্রবণ লোকদিগেরই উপযোগী; এক সময়ে যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম-শূন্য শুষ্ক জ্ঞানের আলোচনাই সুখলাভের উপায়;—ভগবানের আশীর্ব্বাদে এত দিনে তাঁহারা বুঝিতেছেন, ধর্ম্মই সত্য, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রাণের নিগূঢ় হাহাকার নিবৃত্ত হয় না,—"ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" আমাদিগের—শিক্ষিত বঙ্গ-সমাজের—মানসিক ইতিহাসে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালি যে আবার এত শীঘ্র এরূপ ভাবে দলে দলে ধর্ম্মের কথা শুনি-বার জন্য ধাবিত হইবেন; এ কথা সহজে কল্পনাতেও আসে নাই। আর তাহাই আজ বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইতেছে! একি অল্প আহ্লাদের কথা! কিন্তু ধর্ম্মের নামে নাকি এজগতে অনেক অসত্য,—অধর্ম্ম বিকাইয়া গিয়াছে এবং আজও দেশ-বিদেশে বিকাইতেছে; তাই আমাদের বড় ভয় হয়, এত দিন পরে ধর্ম্মের মূল্য বুঝিয়া, কি জানি অনবধানতা বা অজ্ঞানতা বশতঃ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া আলিঙ্গন করি।

এজগতে সত্য লাভ করা অতি সুকঠিন। মানুষ বড় দুরন্ত জীব; সে ভগবানের রাজ্যের সত্য গুলির উপর রাশি রাশি অসত্য ঢালিয়া,—পরমে-

শ্বরের কার্য্য প্রণালী সকলের উপর আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া—তাহাদিগকে চাপিয়া মারিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে। এই রাশীকৃত অসত্য হইতে ছোট ছোট সত্যকে টানিয়া বাহির করা অতি দুরূহ। বস্তুতঃ প্রকৃত আলোচনার তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ইহাদিগকে ব্যবচ্ছেদ না করিলে গভীর সত্য-কণা বাহির করা অসাধ্য। আলোচনা,—একটি বিষয়কে চারিদিক হইতে দেখা—ইহাই সত্য লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়; এবং এই উপায়ে ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করিবার জন্যই আলোচনা জন্ম গ্রহণ করিল।

ধর্ম্মের সঙ্গে নীতি ও সমাজের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বিশেষতঃ হিন্দু প্রধান এবং ধর্ম্ম-প্রধান ভারতবর্ষে এই সম্বন্ধ অতি স্ফুটতর। আলোচনা নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নেরও আলোচনা করিবে।

আলোচনার অর্থই একটা বিষয়কে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখা। আলোচনা কেবল এক মতাবলম্বী লোকদিগের মুখপাত্র হইলে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইবে। সর্ব্ব শ্রেণীর ও সর্ব্ব প্রকারের ধর্ম্ম-মতাবলম্বী চিন্তাশীল সুলেখকদিগের জন্য আলোচনার পত্র উন্মুক্ত থাকিবে।

আলোচনা চর্চ্চা করিতে চাহে,—শিক্ষা করিতে চাহে;—উপদেষ্টা হইতে চাহে না। বঙ্গবাসী তাহার সহপাঠী হউন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একাগ্র মনে ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সত্য লাভ করুন, এই ইহার সাধ। দেশের ভাই ভগিনীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে সত্যান্বেষণে যাইতে চাহে; দেশের ভাই ভগিনীগণ কি তাহাকে সাহায্য করিবেন না? তাহার সাথী হইবেন না?

সত্যালোচনা।

"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।"

"সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না"—এই মহা বাক্যের সাধন অতীব সুকঠিন। "অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধতি"। জলের দ্বারা যেমন শরীর নির্ম্মল হয়, সত্যের দ্বারা সেইরূপ মন নির্ম্মল হয়। সত্য শুধু মুখে

মুখে বিচরণ করিলে তাহাতে কিছু হয় না—কেবল যখন সত্য হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তখন তাহাতে মনের সমস্ত মালিন্য প্রক্ষালিত হইয়া যায়। (১) সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মিথ্যার প্রতি বিরাগ সত্য-সাধনের মূল—(২) তাহার পরে সত্য-জিজ্ঞাসা—(৩) তাহার পরে সত্য উপার্জ্জন এবং মিথ্যা-পরিবর্জ্জন—(৪) তাহার পরে সত্য-অনুশীলন—(৫) তাহার পরে সত্য-প্রচার;—সত্যের আলোচনা এইরূপ পাঁচটি অঙ্গে বিভক্ত। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। শরীরের পুষ্টির জন্য অন্ন যেমন প্রয়োজনীয়, হৃদয়ের পুষ্টির জন্য প্রেম যেমন প্রয়োজনীয়, জ্ঞানের পুষ্টির জন্য সত্যও সেইরূপ প্রয়োজনীয়; অন্ন যেমন সাধারণতঃ সকল মনুষ্যেরই সেবনীয়, সত্যও সেইরূপ সর্ব্বজনসেব্য। অন্নে অরুচি যেমন শারীরিক রোগের অবিচ্ছেদ্য সহচর, সেইরূপ সত্যে অশ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক রোগের অবিচ্ছেদ্য সহচর। সত্যে যাঁহার শ্রদ্ধা নাই—সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মকে তিনি প্রমাণ-দ্বারা আয়ত্ত করিতে গিয়া অকূল পাথারে নিপতিত হ'ন। চক্ষুর দোষবশতঃ যিনি সূর্য্যকে দেখিতে পা'ন না—তিনি প্রদীপ ধরিয়া সূর্য্যকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলে, তাঁহার সে চেষ্টা কেমন করিয়া সফল হইবে? আত্মার অপবিত্রতা-দোষে যিনি পরমাত্মাকে—সকল সত্তার মূল সত্তাকে—জ্ঞানের জ্ঞানকে—প্রাণের প্রাণকে—অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি না করেন—তিনি যুক্তির প্রভাবে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার সে চেষ্টা তো ব্যর্থ হইবারই কথা। যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত এবং যিনি শমান্বিত, যিনি শ্রদ্ধাবান্, তিনিই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের অধিকারী;—তাঁহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই তাঁহার হৃদয়ের পিপাসা—মুখের ভাষা-মাত্র নহে। অতএব, প্রথম সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা।

দ্বিতীয়, সত্য জিজ্ঞাসা। শারীরিক পুষ্টি উপার্জ্জন করিতে হইলে অগ্রে যেমন ক্ষুধা আবশ্যক হয় এবং পরে যেমন অন্ন ভোজন আবশ্যক হয়, সত্য উপার্জ্জন করিতে হইলে অগ্রে সেইরূপ জিজ্ঞাসা আবশ্যক হয়, পরে গুরূপদেশ আবশ্যক হয়। চিকিৎসক যেমন অগ্রে রোগীর ক্ষুধা জন্মাইয়া দিয়া পরে পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দেন; গুরুরও সেইরূপ কর্ত্তব্য যে, অগ্রে শিষ্যের জিজ্ঞাসা উদ্বোধিত করিয়া পরে তদুপযোগী সত্যের উপদেশ করেন। অনেকে শিক্ষার দোষে নানা গ্রন্থের নানা সত্যে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, অজীর্ণ অন্নের ন্যায় ইষ্টসাধন করিতে গিয়া তাহা তাঁহাদের প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

তৃতীয়, সত্য-উপার্জ্জন; চতুর্থ, সত্য-অনুশীলন। শিষ্যের কর্ত্তব্য যে, তিনি যতটুকু সত্য উপার্জ্জন করেন—তাহা তিনি বুদ্ধিতে সুন্দর রূপে আয়ত্ত করেন; গুরুর নিকট হইতে যে সত্য উপার্জ্জন করিয়াছেন—তাহা তিনি রীতিমত অনুশীলন করেন। দেখা যায় অনেকে অন্যের নিকট সত্য প্রচার করিতে বড় অভিলাষী—তাঁহারা নিজে যাহা ভাল করিয়া বোঝেন না, তাহা অন্যকে বুঝাইতে যা'ন;—তাঁহারা অন্যকে সত্য বুঝাইতে গিয়া আপনাদের বুদ্ধিমত্তা বুঝাইতেই ব্যস্ত হ'ন,—অন্যেরাও তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করেন,—ক্রমে তাঁহাদের নিজেরও এইরূপ এক কুসংস্কার জন্মে যে, আমি যাহা বুঝি তাহাই সত্য—আমি যাহা না বুঝি তাহা কিছুই নহে। ইহার ফল এই হয় যে, তাঁহাদের মনোমধ্যে সত্যের দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় ও ঘোরতর মিথ্যা অভিমান আসিয়া সত্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। এইরূপে, অন্যের ইষ্টসাধন করিতে গিয়া আপনার এবং অন্যের উভয়েরই অনিষ্ট সাধন করা হয়—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" অতএব অন্যের নিকট সত্য প্রচার করিবার পূর্ব্বে অগ্রে আপনি ভাল করিয়া সত্যের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য;—সদ্গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য,—সৎসঙ্গ করা কর্ত্তব্য—ঋষিদিগের পবিত্র সরলান্তঃকরণের বাক্য সকল আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ মনন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রণালীতে চলিয়া সাধক যখন সত্যের পথে সমুচিত অগ্রসর হ'ন, তখন সেই সত্য জন-সমাজে প্রচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া উঠে। তখন তিনি গুরুর গুরুতর ভার বহন করিবার উপযুক্ত হন। উপযুক্ত অধিকারীগণকে জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া তখন তাঁহারই কর্ত্তব্য; অতএব, পঞ্চম সত্য প্রচার। সত্য সত্যই যাহাতে শ্রদ্ধাবান্ সত্যজিজ্ঞাসুর সংশয়ান্ধকার দূরীভূত হয়, জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়, মনের মালিন্য প্রক্ষালিত হইয়া যায়—তদুপযুক্ত উপদেশ প্রদান করা প্রকৃত গুরুরই কার্য্য। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্যের জিজ্ঞাসা, সত্যের উপার্জ্জন, সত্যের অনুশীলন, সত্যের প্রচার, এইরূপ সহজ-পদ্ধতি অনুসারে যাঁহারা সত্যের পথে অগ্রসর হ'ন—সত্য তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অধর্ম্মে যার ভিত্তি দুর্গতি তার পরিণাম।

এরূপ সংবাদ পাঠকগণ মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকিবেন। একজন এদেশীয় বড় লোক রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীতে যাইতেছিলেন। ঐ বড় লোকটী আমাদের দেশের এক জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি মহদ্বংশে জাত; তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সদ্‌গুণের সৌরভ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। কিন্তু অপরাধের মধ্যে দেশীয় বস্ত্র তাঁহার পরিধানে, দেশীয় জুতা তাঁহার পদে, ও দেশীয় বর্ণ তাঁহার গাত্রে। ভদ্র লোকটী বসিয়া আছেন; তাঁহার প্রকৃতি ও মহত্বের পরিচয় তাঁহার মুখেই পাওয়া যাইতেছে। গাড়ী ছাড়িতে অল্প বিলম্ব আছে, এমন সময়ে একজন ইউরোপীয় সিবিলিয়ান ব্যস্ত সমস্তভাবে উপস্থিত হইলেন। ইনি একটী জেলার মাজিষ্ট্রেট। কুলের পরিচয়ে প্রয়োজন কি? সিবিল-সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিয়াছেন, এবং পদবৃদ্ধি হইয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট। ইংরাজ বাহাদুর গাড়ীতে মুখ দিয়াই দেখিলেন, দেশী কাপড় পরিয়া একজন বাঙ্গালি বসিয়া আছে। কিঞ্চিৎ বিরক্তি বোধ হইল। ভাবিলেন, কি জ্বালা, এই তাড়াতাড়ির সময়ে এ কি বিপদ? দুই একবার অগ্র পশ্চাৎ ছুটাছুটি করিয়া দেখিলেন, আর প্রথম শ্রেণীর গাড়ী নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর যে গাড়ী ছিল, তাহাতে দেশীয় লোক তখনও আসে নাই বটে; কিন্তু আসার সম্ভাবনা ছিল। কি করেন, ষ্টেসন-মাষ্টারের নিকট গিয়া বলিলেন:—

"প্রথম শ্রেণীতে একজন "নেটিব" যাইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া উহাকে কি তুলিয়া দিবে? আমি—জেলার মাজিষ্ট্রেট"।

ষ্টে-মা। আমি কি করিব, ওব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর টিকিট লইয়াছে। অনুমান করি বড়লোক হইবে, নতুবা ১ম শ্রেণীতে যাইবে কেন? আমি কি করিয়া উহাকে তুলিয়া দি?

মাজি। (বিরক্তির সহিত) নেটিবেরা কেন ইউরোপীয়দের গাড়ীতে আসে? যাহা হউক উহাকে তুলিয়া দিতেই হইতেছে। নতুবা আমার যাওয়া হয় না।

ষ্টে-মা। আমিত জোর করিতে পারিনা।

মাজি। তুমি একবার ভদ্রভাবে অনুরোধ করিয়া দেখ।

ষ্টে-মা। তা পারি।

এই বলিয়া ভদ্রলোকটীকে গিয়া সমুচিত সৌজন্যের সহিত বলিলেন:— "বাবু, তুমি এ শ্রেণীতে থাকিলে ইংরাজদের অসুবিধা হয়; তুমি যদি অনুগ্রহ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাও আমি তোমার টিকিট বদলাইয়া দিতে পারি। আর তুমিও বোধ হয় একা ইংরাজদের সঙ্গে যাইতে সুখী হইবে না।"

ভদ্রলোকটী ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া গেলেন। তিনি অতিশয় ভালমানুষ, এই জন্য বিশেষ গোলযোগ করিলেন না।

আর একবার হিন্দু-পেট্রিয়ট লিখিয়াছিলেন:—"কি দুঃখের বিষয়, যে শ্যামাচরণ বিশ্বাসের নিকট ভারতবর্ষীয় রাজস্বের আয় ব্যয়ের হিসাব শিখিয়া অনেক ইংরাজ মানুষ হইয়া গেল, যিনি দক্ষতার সহিত বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের অডিটরের কাজ করিলেন, যাঁর বুদ্ধি বিদ্যা ও কর্ম্মদক্ষতার প্রশংসা কর্ত্তৃপক্ষীয় সকলেই চিরদিন করিয়া আসিলেন, ইংলণ্ডের রাজস্বকমিটীতে যাঁহার সাক্ষ্যগ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইল; সেই শ্যামাচরণ চিরদিন কেরাণীগিরিই করিলেন, কর্ত্তাদলে উঠিতে পারিলেন না!" দুই জন বড় ইংরাজ-কর্ম্মচারী পেট্রিয়টের ঐ উক্তি লইয়া কথোপকথন করিতেছেন:—

প্রথম। কথাটা মন্দ বলে নাই, ঐ লোকটা বড় কাজের লোক; ও ব্যক্তির সাহায্য না হইলে একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনেরালের কাজ চলিত না।

দ্বিতীয়। যতই কাজের লোক হউকনা কেন, "নেটিব"! উহাদিগকে কি কর্ত্তৃত্বের কাজ দেওয়া যায়? ওদের কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই; ন্যায়পরতা নাই; সত্যবাদিতা নাই। আজ এই শ্যামাচরণকে একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনেরাল করিয়া দেখ, কাল একটা গলদ বাহির হইবে। নেটিব বুদ্ধি বিদ্যাতে হাজার বড় হইলেও একজন চতুর্থ শ্রেণীর ইউরোপীয়ের সমান নয়।

পাঠক, এ কথাগুলি কেমন লাগিতেছে?

তৎপরে বিখ্যাত ইলবার্ট-বিলের আন্দোলন যখন উপস্থিত হইল, তখন এ দেশের ইংরাজেরা কি বলিলেন? তাঁহারা বলিলেন, নেটিব যত বড়ই হউক না কেন, বিচার কার্য্যে ইংরাজের সমকক্ষ হইতে পারে না। নেটিব ইংরাজের উপর বিচার করিবে, ইহা কি সহ্য হয়? তবে আমরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিলাম কেন?

এ সকল ত অতীতের কথা। ইহাতে বাঙ্গালি পাঠকের মনে কিরূপ ভাবের

উদয় হইতেছে? বোধ হয় ইংরাজগণের উপর আক্রোশ বাড়িতেছে। পাঠক অপেক্ষা করুন, ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্তের এক পৃষ্ঠা একবার দেখাই। মনে করুন, আগামী ইলেক্‌শনে লিবারেল-মন্ত্রিদল পরাজিত হইয়া পদচ্যুত হইয়াছেন। লর্ড লিটন ভারতবর্ষের ষ্টেট-সেক্রেটারি হইয়াছেন, তাঁহার ন্যায় একজন ভারতহিতৈষী গবর্ণরজেনেরাল হইয়া আসিয়াছেন; লর্ড রিপণ এদেশীয়দিগকে উচ্চপদ দিবার জন্য যে কিছু উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সমুদায় বিপর্য্যস্ত করা হইয়াছে। লর্ড লিটনের চেষ্টাতে কনসারভেটিব-প্রধান পার্লেমেণ্টে এই দারুণ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়েরা আর সিবিল-সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগকে কৃপা করিবেন, তাহারা নেটিব-সিবিল-সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে; ভারতবর্ষীয়গণ আর জেলার মাজিষ্ট্রেট হইতে পারিবে না; ৭০০৲ টাকার উপরের কর্ম্মগুলি সমুদায় ইংরাজদের জন্য থাকিবে; নেটিবের নিকট ইংরাজের বিচার হইতে পারিবে না। একদিকে এইরূপ পক্ষপাত-দূষিত আইন সকল বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অপরদিকে ডিফেন্স-এসোসিএসনের সভ্যদিগের প্রতাপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ এদেশীয়ের প্রতি যতই অত্যাচার করুক না কেন, তাহার শাসন হইতেছে না; এদেশীয়েরা আপনাদের অধিকার ও মান সম্ভ্রমের কথা বলিলে, ইংরাজী সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন, "তোদের আবার অধিকার কি? ভারতবর্ষ আমরা বাহুবলে জয় করিয়াছি; রক্ত দিয়া কিনিয়াছি। অগ্রে আমাদের সুখ সৌভাগ্য, তৎপরে তোদের। আমরা যাহা দয়া করিয়া দিব, তাহা তোরা কৃতজ্ঞ হইয়া গ্রহণ করিবি। যদি একটা উদ্ধত নেটিবকে এক জন ইংরাজ ভদ্র লোক তাহার সমুচিত শাস্তি দেয়,——তাহাকে পদাঘাত করে, আর তাহাতে যদি ঐ হতভাগ্য কৃপাপাত্র জীবের প্রাণ বাহির হইয়া যায়, তাহার আবার সাজা কি? বিংশতি মুদ্রা দণ্ডই যথেষ্ট।" রাজনীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দিকে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মনে কর, আর এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের রেলওয়ের প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবার অধিকার নাই, কারণ ইংরাজগণ তাহাতে যায়; যে সকল প্রকাশ্য বাগানে ইংরাজেরা যাতায়াত করে, সেখানে নেটিবের যাইবার হুকুম রহিত হইয়াছে; এদেশীয় লোক ইংরাজ দেখিয়া সেলাম না করিলে প্রহার আরম্ভ হইয়াছে; ইংরাজেরা পরামর্শ করিয়া এদেশীয় বড়লোকদিগকে পাইলে ছলে বলে লাথি

জুতা মারিতেছে; এ কেমন অবস্থা? যদি এই দশা দেশের ঘটে, দেশের লোক কেমন সুখে থাকিবেন?

কোন কোন পাঠকের শরীরের শোণিত হয়ত উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। মনের আবেগে অধর দংশন করিয়া এবং সম্মুখস্থিত ভূমিতে বজ্র-মুষ্টির আঘাত করিয়া হয়ত বলিতেছেন, "এমন দশাই যদি ঘটে, তবে যেন এদেশের লোক সাগরের পারে উঠিয়া যায়, না হয় গলায় দড়ি দিয়া গঙ্গাতে ঝাঁপ দেয়।"

স্থির হউন, এত ক্রোধ কেন? প্রাণের ভিতর হয় ত কোন পাঠক উত্তর করিবেন, এ কি অবিচার, এ কি পক্ষপাত? এ দেশের মানুষ কি মানুষ নয়? এইটীই ভিতরকার কথা। তুমি আমি বলিতেছি "এদেশের মানুষ কি মানুষ নয়?" ইংরাজগণ মনে করিতে পারিতেছে না যে, এ দেশের মানুষ মানুষ। অর্থাৎ আমাদেরও যে তাহাদের ন্যায় আত্মা আছে, সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে; মান অপমান বোধ আছে; আশা ভরসা আছে; শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা আছে; ঈশ্বর-দত্ত প্রবৃত্তি ও অধিকার আছে, ইহা তাহারা অনুভব করিতে পারিতেছে না। ইংরাজ ইংরাজের প্রতি অত্যাচার করে না কেন? কারণ, সে জানে আমিও মানুষ, এ ব্যক্তিও মানুষ; আমার যে অধিকার, ইঁহারও সেই অধিকার।

চিন্তা করিয়া দেখ, মানুষ মানুষের প্রতি বা দল দলের প্রতি যেখানে যত অত্যাচার করে, তাহা কেবল মানবাত্মার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ মাত্র। প্রাচীন রোমদেশের ভদ্র মহিলাগণ যখন তাঁহাদের ক্রীতদাস-দাসীদিগকে অসহ্য যাতনা দিয়া হত্যা করিতেন, তখন যদি কোন বন্ধু তাহাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বলিতেন, "তবে কি একটা দাসকে মানুষ ভাবিতে হইবে?" মানুষকে মানুষ ভাবিলে অত্যাচার করিতে পারা যায় না।

আমাদের ন্যায় ইহারা ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের ন্যায় ইহাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, আমাদের ন্যায় ইহারা নিজ ক্ষমতা ও গুণানুসারে পুরস্কার পাইবে; ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে ঈশ্বরদত্ত শক্তি সকল নিয়োগ করিবে, এরূপ জ্ঞান থাকিলে এক জাতি অপর জাতির উপর অত্যাচার করিতে পারে না। ঈশ্বর মানবকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন:—"সন্তান, তোমাকে শরীর মনের যে শক্তি দিয়াছি, তুমি তাহার চালনা কর, নিজের উন্নতি সাধন কর ও আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর।" মানবের অহঙ্কার মস্তক তুলিয়া বলিল:—"স্থির

হও, আমি অগ্রে তুমি পরে! আমার অধিকার ঈশ্বরদত্ত অধিকার, তোমার অধিকার আমার কৃপার উপর নির্ভর করে; আমি যে সুখ ও সুবিধা ভোগ করি, তুমি তার আশা করিতে পার না। কারণ আমি উৎকৃষ্ট, তুমি নিকৃষ্ট।” ইহারই নাম জাতি-ভেদ। জাতি-ভেদ ঈশ্বরের বিধি-বিরুদ্ধ; সুতরাং ইহা পাতকের মধ্যে। ইহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমুদায় অধর্ম্মের ব্যাপার। ঈশ্বর মানবাত্মাকে মহৎ করিয়া সৃষ্টি করিলেন এবং এই নিয়ম করিলেন যে, সে গুণানুসারে উঠিবে। তুমি কে হে বাপু, যে তুমি এই বিধি করিলে যে এক দলের সহস্র গুণ সত্ত্বেও আর এক দল নিকৃষ্ট-চরিত্র-লোক তাহাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। নেটিব সহস্র গুণসম্পন্ন হইলেও ইংরাজের সহিত একাসনে বসিতে পারিবে না; এ বিধি পাপের বিধি, অধর্ম্মে ইহার জন্ম। যে সমাজে এমন বিধি প্রচলিত থাকে, সে সমাজে অধর্ম্ম ও অন্যায়াচরণই অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া যায়।

এখন একবার ভারতবর্ষের জাতিভেদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি যে উৎসাহী যুবক ইংরাজের অত্যাচারের ছবি দেখিয়া ক্রোধে স্ফীত ও ক্ষোভে আন্দোলিত হইতেছ, দেখ দেখি তোমার সমাজ মধ্যে কি ঘোর অধর্ম্মের ব্যাপার প্রচলিত? ইংরাজের জাত্যহঙ্কার নিতান্ত প্রবল হইলেও একথা কোন ইংরাজকে অদ্যাপি বলিতে শুনি নাই, যে লালবাজারের একটা ইংরাজ-খালাসী আমাদের শ্যামাচরণ বিশ্বাসের উপরের কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত, অথবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা সামাজিক-সম্ভ্রম লাভের অধিকারী। কিন্তু তোমার জাতি-ভেদ-প্রথাতে কি বলে?

কলিধর্ম্ম প্রযোজক পরাশর বলিয়াছেন :—

“দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীং॥”

“অসচ্চরিত্র দ্বিজজাতিকে সম্মান করিবে, কিন্তু বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্র সম্মানের পাত্র নহে; দুষ্টা বলিয়া ধেনুকে পরিত্যাগ করিয়া কে সৎস্বভাবা গর্দ্দভীকে দোহন করিয়া থাকে?” আমাদের দেশীয় সমাজের সামাজিক ব্যবস্থা চিরদিন কি এইরূপ চলিয়া আসে নাই?

এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার আশীর্ব্বাদে জাতির শাসনের কঠোরতা শিথিল হইতেছে বটে, কিন্তু জাতির ভিতরের কথাটা ত এই? গুণের অনাদর, মানবাত্মার প্রতি ঘৃণা ও অপরকে ঈশ্বরদত্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করা,

এইত জাতি-ভেদের ভিতরকার কথা ? তবে ইহার ন্যায় অধর্ম্মের ব্যাপার আর কি আছে ?

জাতিভেদের উপর যে সমাজের ভিত্তি, তাহার রক্ত মাংস অধর্ম্মে গঠিত; তাহার অস্থি-মজ্জাতে পাপ ; তাহার বায়ুতে অন্যায় ; তাহার ভিতর বাসে মানবাত্মার অধোগতি। কথাগুলি অতি কঠোর বলিতেছি ; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখ, জাতিভেদ-প্রথা নিবন্ধন দেশের কি দুর্গতি হইয়াছে। প্রথম, ইহা কি তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, জাত্যহঙ্কার যাহার বীজ, জাতিবৈর তাহার ফুল এবং বিচ্ছেদ তাহার ফল। যেখানে জাতিভেদ সেখানে প্রকৃত প্রণয় ও আত্মীয়তা কোথায় ? দেখ আমরা ইংরাজদিগের হইতে দিন দিন কত যোজন দূরে গিয়া পড়িতেছি। তাঁহারা আমাদের ধন ধান্য অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়ের ত্রিসীমায় যাইতে পারিতেছেন না। হায়, জাত্যহঙ্কার এমনি জিনিষ যে ইংরাজগণ যে আমাদের এত উপকার করিয়াছেন, জাতিবৈরে সে উপকারসকলও ভুলাইয়া দিতেছে। এরূপ স্থলে কি কখনও মিত্রতা সম্ভব ? এই জন্যই ভারতবর্ষে জাতিতে জাতিতে দলে দলে প্রণয় ও ভ্রাতৃভাব নাই।

দ্বিতীয়: এই প্রথা মানবাত্মার মহত্ব-জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় নাই। অন্যায় ও অবিচার দেখা এবং বহন করা অভ্যস্ত হওয়াতে, বিদেশীয় নেতার দাসত্ব শৃঙ্খল গলে পরিতে লোকের প্রাণে বাধে নাই। যে ঘরে দাস, বাহিরে দাস হওয়া তাহার পক্ষে একটা বড় অধিক কথা নয়।

তৃতীয়: —এই প্রথা বাণিজ্যের পথে কণ্টক দিয়াছে ; কায়িক শ্রমকে ঘৃণিত করিয়াছে ; শ্রমজাত শিল্পের দুর্গতি করিয়াছে ; বিবাহ সম্বন্ধকে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর স্থানে বদ্ধ করিয়া বাল্য-বিবাহ, কন্যা-বিক্রয় ও পুত্র-বিক্রয় প্রভৃতি প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে ; এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা উৎপাদন করিয়াছে।

কিন্তু এ আমাদের কিরূপ বিচার যে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইংরাজের জাত্যহঙ্কারকে ঘৃণা করি, ইংরাজের অত্যাচার বা ঘৃণাসূচক কথা শুনিলে গাত্রদাহে ছট্ ফট্ করি ; কিন্তু সেই জাতিভেদ আপনাদের মধ্যে রাখিতে লজ্জিত হই না। এজগৎ কি কাদার তাল, কেহ কি কর্ত্তা নাই যে, তুমি আমি যেমন ইচ্ছা গড়িব, সেইরূপ দাঁড়াইবে ; অন্যায় হইলে শাস্তি পাইতে হইবে না ? তাতা নয়, এই সংসার এক দুর্ভেদ্য ধর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ। সাধ্য

কি এক চুল অতিক্রম করি। সাধ্য কি নিমগাছ পুতিয়া আম্র ফল আস্বাদন করি? স্থূলদর্শী ইংরাজগণ ভাবিতেছে যে, এ দেশীয়দিগকে ঘৃণা করিলাম, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিলাম, ইহাদিগকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলাম, তাহাতে কি? ইহারা বিরক্ত হইলে আমাদের ভয় কি? আমরা বাহুবলে ইহাদিগকে শাসনে রাখিব। কিন্তু তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, "অধর্ম্মে যার ভিত্তি, দুর্গতি তার পরিণাম।" এই যে ভারতবর্ষীয়দের হৃদয় দিন দিন দূরে গিয়া পড়িতেছে, ইহাতে কি তাঁহাদের ভয়ের কারণ নাই? কে জানে, এই বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধূমিত হইয়া কি আকার ধারণ করিতে পারে? আর যদি ভারতবাসিদিগের মনুষ্যত্বের দিন না আসিয়া অন্ধকারেরই দিন আসে, তাঁহারা যে অত্যাচারে অভ্যাস-প্রাপ্ত হইতেছেন. ইহাতে কি তাঁহাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিবে না? যে অত্যাচার করে, সে অপরের অত্যাচার সহিতেও পারে। কারণ, মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান ম্লান না হইলে মানুষ অপরের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না—আবার সে জ্ঞান ম্লান হইলে নিজ মনুষ্যত্বও রক্ষা করিতে পারে না। বিধির নিয়মই এইরূপ, কণ্টকে পদাঘাত কর, কণ্টক ভাঙ্গিবে; কিন্তু তোমারও চরণে রক্ত ধারা বহিবে।

দেখিয়া দুঃখিত হই, যাঁহারা শিক্ষিত—যাঁহারা সংস্কারোৎসাহী, তাঁহারাও প্রকারান্তরে জাতিভেদ রক্ষণ করিতে চান। কিসে এই সকল অধর্ম্মের খনিস্বরূপ এই সকল কল্পিত সামাজিক-প্রথা ত্বরায় ভগ্ন হইয়া যাইবে, কোথায় আমরা এইরূপ চেষ্টাই করিব, না ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া সামাজিক দুর্গতি-ভোগের দিনের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতেছি!!

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

সারধর্ম্ম।

(প্রথম প্রস্তাব)

জ্ঞান ও সভ্যতার অভ্যুদয়ের কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্য কেবল ধর্ম্ম-বিষয়ক মতামত লইয়া উন্মত্ত রহিয়াছে; প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি লোকের তত মনোযোগ নাই। ইহার জন্য পৃথিবীতে কত বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, এবং কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। সকলেই

অন্যকে আপনার মতে আনয়ন করিতে ব্যস্ত। কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে না যে, যেমন মনুষ্যের মুখশ্রী ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি মনুষ্যের ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন সকল মনুষ্যের মুখশ্রী এক করা একেবারে দুঃসাধ্য, তেমনি সকল মনুষ্যকে এক ধর্ম্মমতে আনাও দুঃসাধ্য। পৃথিবীতে চিরকাল ধর্ম্ম বিষয়ে মত বিভেদ আছে ও চিরকালই থাকিবে। যিনি মনে করেন, সকল মনুষ্যই এক-ধর্ম্ম-মতাক্রান্ত হইবে, তিনি এমন বিষয় ঘটিবে মনে করেন, যাহা কখনও হয় নাই ও হইবে না। অবশ্য আমি যাহা সত্য মনে করি তাহাতে অন্যকে আনিতে স্বভাবতঃ মনে ইচ্ছার উদ্রেক হয়; এই ইচ্ছা পূর্ণ করা বৈধ। কিন্তু সকলেরই ভ্রম আছে। আমি যাহা পূর্ব্ব পুরুষের ভ্রম মনে করি তাহা যেমন গঙ্গা-জলে নিক্ষেপ করিতে চাহি, আমি যাহা একান্ত সত্য মনে করিতেছি, হয়ত পর বংশের লোকেরা তাহা ভ্রম মনে করিয়া গঙ্গা-জলে নিক্ষেপ করিতে চাহিবে; অতএব মতামত লইয়া বিরোধ অপেক্ষা প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা আমাদের অতীব কর্ত্তব্য। দেখা যাইতেছে, রামপ্রসাদ ও টোকারাম প্রভৃতি পৌত্তলিক ধর্ম্মসঙ্গীত রচয়িতাদিগের গান ব্রাহ্মদিগের ভাল লাগে এবং ব্রহ্মসঙ্গীত অনেকানেক পৌত্তলিকদিগেরও ভাল লাগে। ঈশ্বরের উপাসনা এমন করিয়া করা যাইতে পারে, যাহাতে ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান সকলেই অনায়াসে যোগ দিতে পারেন।

ধর্ম্মের এই সাধারণ ভূমি কি? ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। এই বিষয়ে প্রধানতঃ সর্ব্বদা বলিলে ধর্ম্ম-প্রচারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় ইহা কার্য্যে পরিণত করিলে অর্থাৎ নিজে ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে প্রচার-কার্য্য যেমন সিদ্ধ হয়, এমন আর অন্য কিছুতে হয় না। এমন সকল লোক দেখা গিয়াছে, যাঁহারা চিরকালই ধর্ম্মবিষয়ে আন্দোলন করিতেছেন এবং মতামত লইয়া বিবাদ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা রিপু সকল বশীভূত করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদিগের ঈশ্বরে প্রকৃত ভক্তি নাই। নাস্তিক এবং সংশয়বাদীরা বলেন যে, ধর্ম্ম লোকের পাপ-প্রবৃত্তি দমনে অক্ষম। ধর্ম্ম নিবন্ধন লোকসমাজে পাপ কার্য্যের সংখ্যা কমে না। কত দিন ধর্ম্মের শত্রুদিগকে ধর্ম্মের প্রতি এই মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতে ধর্ম্মাবলম্বীরা দিবেন? প্রকৃত ধর্ম্ম অবশ্যই পাপ দমন করিতে সম্যক্‌রূপে সক্ষম। নাস্তিক ও সংশয়বাদীরা যে, ধর্ম্মের প্রতি এই মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতে

সক্ষম হয়েন, তাহার কারণ এই যে, লোকে মতামত লইয়া ব্যস্ত—প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি তত মনোযোগ প্রদান করেন না। কয়টি লোক আমাদিগের দলে পাইলাম এইটি গণনা না করিয়া, কয়টি লোককে আমি ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভক্তি-সম্পন্ন করিতে পারিলাম, পাপ হইতে বিরত করিতে পারিলাম এবং পরোপকারে রত করিতে পারিলাম, এইরূপ দেখা কর্ত্তব্য। আমরা ধর্ম্মের খোলা লইয়া ব্যস্ত, শাঁসের প্রতি তত মনোযোগী নহি।

আমি মনে মনে একটী আদর্শ প্রচারক কল্পনা করিয়াছি। তিনি যেখানে যাইবেন, বিবাদের কথা আদোবে উত্থাপন করিবেন না। তিনি কেবল লোকের নিকট ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের কথা ক্রমাগত বলিবেন। বিবাদের কথা উপস্থিত হইলে নীরব হইয়া থাকিবেন। যাহাতে লোকের মনে ঈশ্বর-প্রেমাগ্নি ও মনুষ্য-প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় কেবল এমন উপাসনা ও গান করিবেন। এমন সকল কথা বলিবেন যাহা কি পৌত্তলিক হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান কি খ্রীষ্টিয়ান সকলেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে পারেন। পাঠক অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে এরূপ করিলে সত্য কিরূপে প্রচার হইবে? এই প্রণালীই ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্য প্রচার করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, উভয় পৌত্তলিক ও ব্রাহ্ম বিশ্বাস করেন। যে পৌত্তলিক ঈশ্বরকে সকল স্থানে সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান দেখিতে অভ্যাস করেন, ঈশ্বরের সাকারতায় তাঁহার বিশ্বাস ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়। যে পৌত্তলিকের মনে পরিশেষে ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তির উদয় হয়, তিনি আপনা হইতে সামান্য পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা অপেক্ষা প্রীতি-পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা শ্রেয়স্কর মনে করেন। যে মুসলমান অথবা খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের সহিত যোগ এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ করিতে অভ্যাস করেন, তাঁহার মধ্যস্থে বিশ্বাস আপনা আপনি দূরীকৃত হয়। প্রেমই সত্যে লইয়া যাইবার প্রকৃত উপায়। অতএব, হে মানব! সাম্প্রদায়িকতা ও মতামত লইয়া বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রকৃত ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হও ও অন্যকে তাহাতে প্রবৃত্ত কর, এবং যাহাতে এই গুরুতর কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার আলোচনায় সর্ব্বদা রত থাক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু

সমাজগতি ও তাহার পরিণাম।

মনুষ্য জাতির অতীত ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, এক সময় ছিল যখন মানবগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বা জাতিতে বিভক্ত হইয়া পরস্পর হইতে দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিত। তাহাদিগের নিজের স্বার্থ-প্রবৃত্তি তখন এত প্রবল ছিল যে, কেবল আপনাদিগের অভাবমোচন ও সুখ সাধনের জন্য সম্পূর্ণ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইত, অপরের অস্তিত্ব হয় স্বীকার করিত না, নয় চিন্তা করিবার অবকাশ পাইত না। যখন অপরের অস্তিত্ব চিন্তা করিত, তখন তাহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবের মধ্যে গণ্য করিত, বা ঘৃণার্হ বলিয়া তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র থাকিত। আপনারা আর্য্য, দেবতা, ভদ্র ; তাহারা ম্লেচ্ছ, অসুর, বর্ব্বর—পরস্পরে পরস্পরকে এই ভাবে দর্শন করিত।

কিন্তু মনুষ্য জাতি সকল বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিবার নয়—মিত্রভাবে না হউক, শত্রুভাবে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। তামসিক ভাবাপন্ন পরস্পর স্বার্থ-সর্ব্বস্ব জাতি সকল অপরের হিংসাপূর্ব্বক আপনাদিগের স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে যে জাতি যাহার যত নিকটবর্ত্তী, সেই তাহার তত পরম শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইল ; দেব অসুর, আর্য্য ম্লেচ্ছ, গ্রীক্ বর্ব্বরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বজাতিপ্রিয়তার অর্থ তখন বিজাতির হিংসন ও নিপীড়ন। তখন পৃথিবী পশুবলের অভিনয় ক্ষেত্র হইল। শারীরিক বলে যে জাতি অধিক বলী, সে অপর জাতিকে পরাস্ত করিতে লাগিল। এই বিবাদের একটী শুভফল এই উৎপন্ন হইল, জেতা ও বিজিত ক্রমে সম্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের পরিবর্ত্তে এক এক বৃহৎ জাতিতে পরিণত হইতে লাগিল—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের পরিবর্ত্তে এক এক বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল। এক রাজ্যের অন্তর্গত অধিবাসী সকলে ভাষা, আইন, শাসন-প্রণালী, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য ও ধর্ম্মযোগে ক্রমে একীভূত বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে লাগিল। বিভিন্ন স্বার্থ-সম্প্রদায় সকল সমস্বার্থ হইয়া এক মহাজাতির পুষ্টি সাধন করিতে লাগিল।

অতঃপর আমরা দেখিতে পাই এক এক মহাবল পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ীর অভ্যুদয় হইল। ইহারা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আপনাদিগের ক্ষমতা ও আধিপত্য আবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সমুদায় জাতিকে

আপনার অধীন করিয়া সসাগরা ধরায় একাধিপত্য লাভের জন্য উন্মত্ত হইলেন, সসৈন্য অস্ত্রধারী হইয়া জ্ঞাত অজ্ঞাত রাজ্য সকলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন এবং নানা দিগ্‌দেশ জয় করিয়া এক এক মহারাজ্যের পত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ীর পথ নরশোণিতে অঙ্কিত এবং তাঁহার অভীষ্ট স্বকীয় বা স্বজাতীয় গৌরব-বর্দ্ধনরূপ স্বার্থমূলক হউক, কিন্তু তাহা হইতে মানব পরিবার সকলের এক মহাযোগের প্রথম সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-প্রণালী প্রভৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও নানাজাতি এক যোগে আবদ্ধ হইল; পরস্পরের শ্রমার্জিত শিল্পজাত প্রভৃতির বিনিময়ে পরস্পরে লাভবান্ হইবার সুবিধা পাইল, দূরবর্ত্তী দেশ সকলের সহিত পরিচিত হইয়া মানবগণ ক্রমে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রলাভে সমর্থ হইল। প্রাচীন ভারত, আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীক্ ও রোমসাম্রাজ্যের ইতিবৃত্তে এই সত্যেরই সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়ী মহাবীর সকল কালগ্রাসে বিলীন হইয়াছেন, প্রাচীন সাম্রাজ্য সকল ছিন্ন ও বিছিন্ন হইয়াছে, জাতীয় গৌরব-পতাকা সমূহ ধূলিসাৎ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা জাতিমধ্যে যে মহাযোগ স্থাপনের সহায়তা করিয়াছেন, পৃথিবীর ভাবী বংশ সকল তাহার সুফল ভোগে সমর্থ হইতেছে।

যুদ্ধযাত্রা ও দিগ্বিজয় যেমন মানবজাতির সম্মিলনের একটী প্রকৃষ্ট উপায় হইয়াছে, সেইরূপ আর কয়েকটী কারণও ইহার সহায়তা করিয়াছে। নৌযাত্রা ও বিদেশ পর্য্যটন, উপনিবেশ স্থাপন, বাণিজ্য, শাস্ত্র ও জ্ঞান চর্চ্চা এবং ধর্ম্মপ্রচার এই সকলের ইতিহাস যথাযথরূপে অধ্যয়ন করিলে জাতীয় সম্মিলনের এবং জগতের সভ্যতার উন্নতি ও বিস্তারের পক্ষে ইহারা যে কতদূর সহকারিতা করিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

১। নৌযাত্রা ও বিদেশ পর্য্যটন—পুরাকাল হইতে মনুষ্য যেন স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞাত দেশ ও জাতি সকলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মনুষ্যের নিজের স্বার্থ ইহার প্রবর্ত্তক, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার জন্য মনুষ্য স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বালুকারণ্য ও উত্তুঙ্গ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, তরঙ্গ তুফান ও মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করিয়া সমূহ কষ্ট বহন পূর্ব্বক মানব-বাসভূমির সীমানির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছে—ইহা হইতেই আদিম ব্রিটন্ ও কাফ্রিদিগের সহিত ফিনিসীয়জাতির সাক্ষাৎ, ইহা হইতেই ভারতে প্রথমে হিন্দু ও পরে পাশ্চাত্য জাতিসকলের সমাগম এবং ইহা হইতেই

অর্দ্ধ জগৎ আমেরিকার আবিষ্কার। অদ্যাপি নাবিক ও পর্য্যটকগণ দুঃসাহস সহকারে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র এবং আফ্রিকার দুর্গমস্থান অনুসন্ধানে প্রাণপণে অগ্রসর, যেন তাহারা পৃথিবীর কোন স্থানই লুকায়িত থাকিতে দিবে না, সকলই মানবের গম্য ও মানব-জ্ঞানের গোচর করিবে।

২। উপনিবেশ স্থাপন—মানবজাতির একতা বন্ধনের একটী অব্যর্থ উপায়। দূরদেশকে নিকট ও বিদেশকে স্বদেশে পরিণত করিবার এমন উপায় আর নাই। আসিয়ার সহিত ইউরোপ ও আফ্রিকার, এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার সহিত আমেরিকার প্রথম স্থায়ী যোগ ইহাদ্বারাই সংস্থাপিত হয়। কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় অষ্ট্রেলিয়া, কেপ্ কলোনী ও কানাডা; কিন্তু ইহাদ্বারাই এক রক্তযোগে ইংরাজ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়াছে। ইহুদী জাতি ছিন্ন ও বিছিন্ন, দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; কিন্তু এক ক্ষুদ্র স্থানের পরিবর্ত্তে সমুদায় পৃথিবীকে আপনাদিগের বাস-ভূমি করিয়া অজ্ঞাতসারে এক ভাবী মহাযোগে যোগ দান করিতেছে। এই উপনিবেশ-প্রণালী দ্বারা এক জাতির ভাষা, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-প্রণালী প্রভৃতি কত স্থানে প্রচারিত ও ব্যাপ্ত হইতেছে, এক জাতিকে কত জাতির সহিত পরিচিত ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতেছে! কেবল তাহা নহে, সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, জাতিবিশেষ স্বদেশে যে উন্নতি বহুযুগে সাধন করিতে পারে নাই, স্থান পরিবর্ত্তনে অল্পদিনে তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছে। মধ্য আসিয়ার আর্য্য ভারতে আসিয়া, ফিনিসীয় কার্থেজনগর প্রতিষ্ঠা করিয়া, সাক্সন ইংলণ্ডে গিয়া এবং ইংরাজ আমেরিকায় বাস স্থাপন করিয়া কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে কে না চমৎকৃত হইবেন? স্থানীয় কোন বৃক্ষের বীজ যেমন সমুদ্র-বক্ষে ভাসিয়া বা পক্ষিমুখে নীত হইয়া নানাদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং সতেজ অরণ্যানী উৎপন্ন করে, উপনিবেশদ্বারা মনুষ্য-জগতে সেই কার্য্য সাধিত হইয়াছে। এক বীজ নানা উদ্যানে পতিত হইয়া সকলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও আন্তর্জাতিক যোগ সাধনের সহায়তা করিয়াছে।

৩। বাণিজ্য—ইহা মনুষ্যের রাজসিক প্রবৃত্তির এক প্রধান উত্তেজক। যে কার্য্যদ্বারা আমারও উপকার, তোমারও উপকার, তাহাতে পরস্পরে সমস্বার্থ হইয়া কেন না বন্ধু-ভাবে মিলিত হইব? বাণিজ্যদ্বারা এক জাতি অন্য জাতিকে স্বার্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিল, স্বার্থের অনুরোধে বন্ধুত্ব সূত্রে

গ্রথিত করিল। যে সকল জাতির মধ্যে পর্ব্বতের ব্যবধান ছিল, অরণ্যের ব্যবধান ছিল, অপার মহাসমুদ্রের ব্যবধান ছিল, তাহারা বাণিজ্যযোগে পরস্পরের সহিত মিলিত হইল, মধ্যবাসী জাতিসকল দুই প্রান্তবাসী জাতির মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের পরস্পরের দ্রব্যজাত পরস্পরের সহিত বিনিময় করিতে লাগিল। ক্রমে পৃথিবীর সীমান্তবাসী জাতি সকল পরস্পরের কৃষিজাত, শিল্পজাত, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমজাত নানাবিধ পদার্থদ্বারা পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে হইতে পরস্পরকে সাক্ষাৎ দর্শনের অভিলাষ করিল; এবং সাক্ষাৎভাবে পরস্পরের সহিত বাণিজ্যযোগে সংযুক্ত হইয়া পরস্পরের স্বার্থোন্নতির পথ প্রসারিত করিল। আজি বাণিজ্যের সাম্রাজ্য বিশ্বব্যাপী, আজি আর দেব দৈত্যে, আর্য্য ম্লেচ্ছে, গ্রীক্ বর্ব্বরে, খৃষ্টান হিদেনে, মুসলমান কাফেরে, এবং পুরাতন ও নূতন পৃথিবীর অধিবাসীতে পরস্পরে বিষম স্বার্থ লইয়া সহসা পরস্পরের অনিষ্ট সাধনে সাহসী নহে, তাহাতে আপনাদিগেরই বিষম অনিষ্ট জানিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত। এক জাতির সহিত অন্য জাতির যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে তাহার শান্তি করিয়া দেওয়াই সকল জাতির স্বার্থ। এইরূপে যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্রমে অল্পতর হইয়া শান্তির রাজ্য ক্রমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আর কোন জাতির দ্রব্য সম্পত্তি তাহার কেবল নিজের ভোগের জন্য নহে, তাহা সর্ব্বজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং এক জাতি পৃথিবীর আর সকল জাতির সেবা ও প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত হইতেছে। বর্ত্তমান কালের সভ্য জাতীয় এক ব্যক্তি এই জন্য গর্ব্ব-সহকারে বলিতে পারেন, চীনেরা আমার জন্য চা-পত্র চয়ন করিতেছে, জাপানীরা বার্ণিস্ প্রস্তুত করিতেছে, ভারতবাসীরা ঢাকাই ও শাল বয়ন করিতেছে, কাবুলীরা মেওয়া ফলাইতেছে, পারস্য আরব ও তুরুস্কেরা গালিচা দুলিচা তৈয়ার করিতেছে, জর্ম্মণেরা দর্শন-শাস্ত্র লিখিতেছে, সুইসেরা ঘড়ী প্রস্তুত করিতেছে, ফরাসীরা বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে; ইংরাজেরা ছুরী, কাঁচি, আলপিন গড়িতেছে; মার্কিনেরা তুলার চাষ করিতেছে, এবং নিগ্রোরা খনি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহে নিযুক্ত আছে। বাণিজ্য এক সুবিস্তৃত সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়া সকল জাতিকে তাহার অন্ত-ভূর্ত করিয়াছে, কোন জাতিকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিতেছে না।

৪। **শাস্ত্র ও জ্ঞান চর্চ্চা**—হইতে মানবীয় আর একটী যোগের সূত্র নিঃসৃত হইয়াছে। মানবীয় জ্ঞানগত-যোগ সূক্ষ্ম বলিয়া কম বলবৎ নহে।

জ্ঞানের জন্য এক জাতির নিকট অন্য জাতি ঋণী বহুদিন হইতে। বর্ত্তমান ইউরোপের শিক্ষাগুরু রোম, রোমের আচার্য্য গ্রীশ, গ্রীশের মিশর, মিশরের সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ। কথিত আছে, যখন রোম বাহুবলে গ্রীশকে পরাজয় করিল, তখন গ্রীশের জ্ঞান গৌরবের নিকটে আত্ম পরাজয় স্বীকার করিল, এবং তাহার চরণ-তলে বসিয়া জ্ঞানের বর্ণমালা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। প্রত্যেক জাতি বহু তপস্যায় যে জ্ঞানরত্ন অর্জন করিয়াছে, অপর জাতি সকলকে নত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে। এখন, যেমন এক জাতির কৃষি-শিল্পজাত, সেইরূপ এক জাতির মানসিক চিন্তার ফলও সর্ব্ব জাতির সাধারণ সম্পত্তি হইতেছে। বিদেশীয় দ্রব্য সকলের আমদানী না হইলে যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, বিজাতীয় চিন্তা-স্রোতের পথ অবরুদ্ধ হইলে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। কবিত্ব, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, নানাবিধ বিজ্ঞানতত্ত্ব ও ধর্ম্মচিন্তা এক দেশে উদ্ভাবিত হইয়া এখন সকল দেশে আদৃত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেছে। দূরদেশবাসী এক জাতির পুরাতত্ত্ব এখন কত কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতেছে। সুসময়ে মুদ্রাযন্ত্র ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া জ্ঞান-রাজ্য কত দ্রুতবেগে বিস্তারিত করিতেছে। জ্ঞান সংগ্রহে আর জাতিবিচার নাই; প্রত্যেক জাতি কৃতজ্ঞতার সহিত অপর জাতিসকলের সঞ্চিত জ্ঞান আহরণ করিয়া আপনাপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। একটী রোগের তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য, একটী জ্যোতিষ্ক পদার্থের গতির নিয়ম বিশদ করিয়া বুঝিবার জন্য, একটী দার্শনিক জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য, একটী বৈজ্ঞানিক কৌশল উদ্ভাবন জন্য সকল দেশের পণ্ডিত এক যোগে চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ের ফল দ্বারা সমুদায় মনুষ্য জাতি লাভবান্ হইতেছে।

৫। **ধর্ম্ম প্রচার**—ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার। মানব সমাজকে এক যোগে বদ্ধ করিবার জন্য ইহার প্রবল সহায়তা কে অস্বীকার করিবে? ধর্ম্মহেতু পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ, হত্যা ও বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সে সকল ক্ষণিক ও বাহ্য ব্যাপার মাত্র; সেই সকলেরই মধ্য দিয়া ধর্ম্ম তাহার অদ্ভুত স্বর্গীয় সংযোজনী ও সঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্ম প্রচারের সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া দুর্ঘট; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইতে একাল পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মপ্রণালীর সৃষ্টি

হইয়াছে, তদ্দারা মানব জাতির একতা বন্ধনের ভাব ক্রমে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে এই ধর্ম্ম মানব জাতির শান্তির সংবাদ লইয়া পৃথিবীর অধিক সংখ্যক নর-নারীকে ভ্রাতৃ বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে। আসিয়ার পশ্চিম সীমান্তে ইহুদা ও খৃষ্ট ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য ও সভ্য জগৎকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। আরবদেশ হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া কত শত শত জাতিকে এক ধর্ম্মাক্রান্ত ও একেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত করিয়াছে। বর্ণগত, ভাষাগত ও স্থানগত সহস্র পার্থক্য সত্ত্বেও শত শত জাতি এক এক ধর্ম্মের পতাকার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে—মানব জাতি একত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর ধর্ম্মজনিত যুদ্ধও মানবজাতির সম্মিলন বন্ধন দৃঢ় করিয়াছে। খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে ক্রুজেড নামক মহাযুদ্ধ উপস্থিত না হইলে, খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের স্ব স্ব দলের মধ্যে ঐক্যবল তত বর্দ্ধিত হইত না—কেবল তাহা নহে, ইউরোপ ও আসিয়ার লোকদিগের এক ক্ষেত্রে সমাগমে পরস্পরের নিকটে পরস্পরে যে প্রভূত শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাতে কখনই সমর্থ হইত না। ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে দেখাইতেছে, এই ক্রুজেড্ পূর্ব্ব পশ্চিম রাজ্যের শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যোন্নতির অভূত-পূর্ব্ব সহায়তা করিয়াছে। ইউরোপের ধর্ম্মসংস্কারে, ভারতে নানক চৈতন্য প্রভৃতির নূতন মত প্রচারে যদিও সাময়িক অনেক বিপ্লব ঘটিয়াছে; কিন্তু তদ্দারা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দূর করিয়া উদারতার ভাব অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। আজি আমরা দেখিতেছি, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক পুরুষ ও রমণী দলে দলে বহু দূরদেশে; বন্য, পার্ব্বত্য, দ্বীপপুঞ্জবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে আপনাদিগের শরীরের শোণিত দান করিয়া ধর্ম্মের সুসংবাদ ঘোষণা করিতেছেন; ধর্ম্মের উত্তেজনা ভিন্ন আর কিসে এরূপ ঘটনা সংঘটন করিতে পারিত? অসাধারণ বাহুবলধারী শত শত ব্যক্তি বহুক্লেশে বহু দিনের আয়াসে মানব জাতিকে যে একচ্ছত্রের অধীন করিতে পারেন নাই, এক একজন অসাধারণ ধর্ম্মবীর যাদু-মন্ত্র-বলে অনায়াসে তাহা সাধন করিয়াছেন। ধর্ম্মযোগের মধ্যেই মানবের সাত্ত্বিক, স্বর্গীয় ও উন্নত ভাবের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। মানবীয় প্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা-হেতু ইহার মধ্যে অনেক সময় অনেক সঙ্কীর্ণতা ও মলিনভাব স্থান পাইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, অদ্যাপি যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা কাল সহকারে

যে বিদূরিত হইয়া যাইবে তাহার আশা হইতেছে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য আছে, সকল ধর্ম্মপ্রণালীরই যে কিছু না কিছু সার্থকতা আছে, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দেববৎ পূজনীয় ধার্ম্মিক মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সাম্প্রদায়িক বাহ্য চিহ্ন ও অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্ম সাধকগণ বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের স্কন্ধ ধারণ পূর্ব্বক অমৃত লোকের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন, ক্রমে মানুষ তাহা স্বীকার করিতেছে। ধর্ম্ম-সকলের সামঞ্জস্য ও ঐক্য ইহা দ্বারা সাধিত হইয়া মানবসমাজের এক গাঢ়-তর যোগ সম্পন্ন করিবে।

অসভ্যতম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সভ্যতম অবস্থা পর্য্যন্ত মানব জাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? এক মহাসম্মিলন ক্ষেত্রে মিলিত হইবার জন্য মানবমণ্ডলী যাত্রা করিয়াছেন। গমনের পথে তাঁহারা পরস্পরের সহিত অনেক বিবাদকলহ করিয়া পরস্পরের গতির বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এক অদৃশ্য-হস্ত তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল করিয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে সকলকে একযোগে বন্ধন করতঃ উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছে। মানব-সমাজ কেবল মানব-ইচ্ছাতে গঠিত হয় নাই, কিন্তু এক উচ্চতর, প্রবলতর ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। মনুষ্য তামসিক ভাবে অর্থাৎ কেবল নিজের স্বার্থ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যখন অপরকে আপনার অধীনস্থ ও সুখ সম্পাদনের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন এই যোগের সূত্রপাত হইয়াছে; মনুষ্য যখন রাজসিকভাবে অর্থাৎ অন্যের স্বার্থের সহিত আপনার স্বার্থের সম্মিলন করিয়া আপনার সুখ সমৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে, তখন ইহা আরও দৃঢ়তর হইয়াছে; কিন্তু মনুষ্য সাত্ত্বিকভাবে,—পরস্পরের সহিত প্রেমের ভাবে যতদিন না সম্মিলিত হইবে, ততদিন এ যোগ স্থায়ী, পবিত্র এবং পূর্ণসুখকর হইবে না। জগতের এই উন্নত অবস্থায়ও মানবমণ্ডলী রাজসিক ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, কিন্তু এতদপেক্ষা উচ্চতর যোগের আভাস কি ইতমধ্যে প্রকাশিত হইতেছে না? সৃষ্টিকর্ত্তা মানব সমাজকে অগ্রে যেন বাহিরের কতগুলি বন্ধনে আবেষ্টন করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের নিকট-বর্ত্তী করিতেছেন; শাসনপ্রণালী, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, এই সকল যোগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সকল যে একীকৃত হইয়া যাইতেছে এই উনবিংশ

শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোকে কে ইহা অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইহার পরিণাম কি হইবে কেহ কি চিন্তা করিয়া থাকেন? কেবল আন্তর্জ্জাতিক শিল্প, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রদর্শনী দেখাইয়া কি মানব জাতির ইতিহাসের পত্র চিরমুদ্রিত হইবে, না ইহার পর আরও কিছু উৎকৃষ্টতরদৃশ্য আছে? যাঁহারা বিজ্ঞান-চক্ষে ইতিহাস পাঠ করিয়া সত্যের আলোক অন্তরে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বিশ্বাস করিবেন, ঈশ্বরের হস্ত হইতে আরও একটী দৃঢ়তর যোগের সূত্র অদৃশ্যভাবে নরনারীর হৃদয় বন্ধনের চেষ্টা করিতেছে। সকল জাতি ইহা দ্বারা ঘনিষ্টতম যোগে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধন ও সৃষ্টিকর্ত্তার মহোদ্দেশ্য সাধন করিবে। মানবজাতির ভবিষ্য ইতিহাসেরপত্রে স্বর্ণাক্ষরে এই পরিণাম লিখিত রহিয়াছে;—অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বর একমাত্র পিতামাতা ও উপাস্য দেবতা বলিয়া যখন সর্ব্বদেশে সকল জাতি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত ও পূজিত হইবেন, তখন সমুদায় মানবজাতি যথার্থ একপরিবারবদ্ধ হইয়া নিঃস্বার্থ প্রেমের ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে শিখিবে এবং সকলে মিলিয়া তাঁহার ইচ্ছা পালনে নিযুক্ত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গধামে পরিণত করিবে। এতকাল ধরিয়া মানবজাতির ইতিহাস যে উন্নতি, সভ্যতা ও সম্মিলনের পরিচয় দিতেছে, তাহা এই মহাযোগের আয়োজন ও পূর্ব্বাভাস মাত্র।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।

যোগিচর্য্যা।

ম্যাডাম্ ব্ল্যাভেট্স্কি ও কর্ণেল অল্কট্ দ্বারা আজ কাল যোগ ও যোগী লইয়া চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় জন সাধারণ সামান্য প্রতারককেও যোগী বলিয়া মান্য করিতে প্রস্তুত! বস্তুতঃ যোগিচরিত্র অতীব দুর্ব্বোধ্য। প্রাচীন যোগশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে যে সকল যোগ ও যোগিচরিত্র দৃষ্ট হয়, তদ্ভাবতের সহিত বর্ত্তমান যোগ ও যোগিচরিত্রের অনেক প্রভেদ। যাঁহারা প্রকৃত যোগী—তাঁহাদের চরিত্র ও বাহ্য লক্ষণ যাহা আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়—তদ্ভাবতের সহিত এক্ষণকার সাহেব যোগী ও তাঁহাদের অনুচরদিগের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। ইহা

দেখাইবার জন্যই এই "যোগিচর্য্যা" শীর্ষক প্রবন্ধটীর এখানে অবতারণা করা গেল।

পূর্ব্বকালের যোগিগণ কিরূপ চরিত্রে কালযাপন করিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"বাক্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডা স ত্রিদণ্ডী নিগদ্যতে॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ॥
যেন কেন চিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ।
যত্রসায়ংগৃহে যাতি তং দেবা যোগিনং বিদুঃ॥
মানাপমানৌ যাবতৌ প্রীত্যুদ্বেগকরৌ নৃণাম্।
তাবেব বিপরীতার্থৌ যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ॥
চক্ষুঃপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপূতং বিচিন্তয়েৎ॥
সর্ব্বসঙ্গবিহীনশ্চ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
জড়বন্মূকবদ্‌যোগী বিচরেত মহীতলম্॥
অসিধারাং বিষং বহ্নিং সমত্বেন প্রপশ্যতি।
সর্ব্বত্রসমবুদ্ধির্যঃ স যোগী কথ্যতে বুধৈঃ॥
আতিথ্যে শ্রাদ্ধযজ্ঞেষু দেবযাত্রোৎসবেষু বা।
মহাজনে চ সিদ্ধার্থো ন গচ্ছেদ্‌যোগবিৎ ক্বচিৎ॥
জাতে বিধূমে চাঙ্গারে সর্ব্বস্মিন্ ভুক্তবজ্জনে।
অটেত যোগবিদ্‌ভৈক্ষ্যং ন তু তেষেব নিত্যশঃ॥
যথৈনং নাবমন্যন্তে জনাঃ পরিভবন্তি চ।
তথাযুক্তশ্চরেদ্‌যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্॥
ভৈক্ষ্যং গৃহ্নন্ গৃহস্থেষু শ্রোত্রিয়েষু চরেদ্‌যদি।
ফলমূলং যবাগ্নন্নং পয়স্তক্রঞ্চ সক্তবঃ॥

ব্রহ্মচর্য্যমলোভশ্চ দয়াঽক্রোধঃ সুচিত্ততা।
আহারলাঘবং শৌচং যোগিনাং নিয়মাঃ স্মৃতাঃ ॥
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধনম্।
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগবিঘ্নকরী হি সা ॥
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥
সমাহিতোব্রহ্মপরোঽপ্রমাদী,
বুধস্তথৈকান্তরমোযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ,
প্রাপ্নোতি যোগী পরমব্যয়ং পদম্ ॥

বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কর্ম্ম,—যে ব্যক্তি এই ত্রিবিধ দণ্ড নিয়মিতরূপে ধারণ করেন, সে ব্যক্তি ত্রিদণ্ডী অথবা ত্রিদণ্ডযোগী বলিয়া উক্ত হন।

যাহা সকল প্রাণীর রাত্রি, সংযমী যোগী তাহাতে জাগ্রৎ, অর্থাৎ তাহাই সংযমীর (যোগীর) দিবা। আর আর প্রাণী যাহাতে জাগ্রৎ থাকে, প্রত্যক্ষদর্শী মুনি তাহাতেই নিদ্রিত থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণ প্রাণীরা আত্মতত্ত্বে নিদ্রিত এবং সংসারের প্রতি জাগ্রৎ; কিন্তু যোগীরা আত্মতত্ত্বেই জাগ্রৎ এবং সংসার বিষয়ে নিদ্রিত থাকেন।

দেবতারাও জানেন যে, যোগীরা যাহা তাহা পরিধান করেন, যাহা তাহা আহার করেন, যেস্থানে সন্ধ্যা হয় সেই স্থানেই তাঁহাদের গৃহ; অর্থাৎ তাঁহাদের আহার, আচ্ছাদন ও গৃহের বা বাসস্থানের কোন নিয়ম নাই। যথোপস্থিত মতে তাঁহারা আহার ব্যবহার প্রভৃতি চালাইয়া থাকেন।

মান ও অপমান, যাহা সাধারণ লোকের প্রীতি ও উদ্বেগ জন্মায়, যোগীর নিকট তাহা বিপরীত; অর্থাৎ তাঁহারা মানেও সন্তুষ্ট হন না, অপমানেও রুষ্ট হন না, সর্ব্বত্রই সমদর্শী।

যোগীরা দৃষ্টিপূত করিয়া পদচালনা করেন, বস্ত্রপূত করিয়া জল পান করেন, সত্যপূত করিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন, বুদ্ধিপূত করিয়া চিন্তা করেন।

তাঁহারা কোন প্রকার আসঙ্গ করেন না, কোন প্রকার পাপকার্য্য করেন না, জড়ের ন্যায় ও বোবার ন্যায় হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

অসির ধার, বিষ ও অগ্নিকে যাঁহারা সমান জ্ঞান করেন, (অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বত্রই নির্ভয়) বুধগণ তাঁহাদিগকেই যোগী বলিয়া উল্লেখ করেন। যোগবেত্তা যোগী, যাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা অতিথিশালায় গিয়া অতিথি হন না, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি স্থানে যান না, দেবযাত্রায়, উৎসবে ও জনতাস্থানেও যান না। গৃহস্থের পাকশালার অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, সকলের ভোজন সমাপ্ত হইলে, তাদৃশ যোগীরা ভিক্ষার্থে গৃহস্থগৃহে গমন করেন, কিন্তু নিত্য নিত্য যান না। যে প্রকার অনুষ্ঠান করিলে বা যে প্রকার আচার ব্যবহার করিলে, তাঁহাকে কেহ অবমাননা করিবে না, পরিভব করিবে না, বা বিরক্ত করিবে না, তাঁহারা সেই প্রকার অনুষ্ঠান ও সেই প্রকার আচার ব্যবহার করতঃ বিচরণ করেন এবং কোন সদ্ধর্ম্মের প্রতি নিন্দাবাদ উচ্চারণ করেন না। যোগীরা যখন কোন গ্রামে আসিয়া গৃহস্থের নিকট ভক্ষ্য ভিক্ষা করেন, তখন তাঁহারা অন্য কিছু ভিক্ষা করেন না; কেবল ফল, মূল, যবান্ন, দুগ্ধ, তক্র, সক্তু,—ইত্যাদি যোগিদিগের যাহা উপযুক্ত খাদ্য তাহাই ভিক্ষা করেন। ব্রহ্মচর্য্য, আলোভ, দয়া, অক্রোধ, সরলচিত্ততা, আহার-লাঘব, শৌচ, —এই কএকটীই যোগিদিগের নিয়মিতরূপে সেব্য। যোগীরা কেবলমাত্র কার্য্যসাধক সার জ্ঞানের উপাসনা করেন, অনেক জানিবার জন্য ব্যগ্র হন না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানের বহুত্ব অর্থাৎ বহু বস্তু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা যোগের বিঘ্নকারী হয়। ইহা জানিব, উহা জানিব, উহা না জানিলে হইবে না, যে ব্যক্তি এরূপ জ্ঞানতৃষ্ণায় ব্যাকুলিত হইয়া ভ্রমণ করে, হাজার হাজার কল্প অতীত হইলেও সে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞাতব্য জানিতে পারে না, প্রকৃত প্রাপ্তব্যও পায় না। সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমত্ত, জ্ঞানবান্, একাগ্রচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, শুদ্ধবুদ্ধি, লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে তুল্যবুদ্ধি,—এরূপ যোগীই অক্ষয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

নবজীবন।

পুরাতনের বিনাশেই কেবল নূতনের উৎপত্তি সম্ভব। পূর্ব্বকার ফসলের ভগ্নাবশেষকে পোড়াইয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়, তবেইসে সে ক্ষেত্রে নূতন ফসল জন্মিতে পারে। নতুবা পুরাতন ফসলের মরা, শুষ্ক,

খট্‌খটে খড় গুলিও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, অথচ তাহারই মাঝে নূতন ফসলের অঙ্কুর হ'বে এ কি কখনও সম্ভব? পুরাতন জীবনটাকেও তালি দিয়া, রিফু করিয়া, যত্নপূর্ব্বক ঢাকিয়া ঢুকিয়া রাখিব, অথচ তাহারই ভিতর আবার একটা নূতন জীবনও পাইব, একি কখনও হয়? নূতন জীবন পাইতে চাহিলেই অগ্রে পুরাতন জীবনটাকে ভস্ম করিতে হইবে। পুরাতন জীবনের মায়া যিনি ছাড়িতে পারেন নাই, তাঁহার নবজীবন লাভের আশা নিরতিশয় বিড়ম্বনা।

অনুতাপ নবজীবনের বীজ। প্রকৃত অনুতাপ ধর্ম্ম জীবনের প্রসব-বেদনা। এই ঘোর যাতনা প্রাণে উপস্থিত হইলেই নবজীবনের জন্ম হইবে, এ আশা হয়। অনুশোচনা অনুতাপ নহে। দুষ্কর্ম্ম করিয়া লোকলজ্জা বা সাংসারিক পদমর্য্যাদা হানি বা অর্থক্ষতি নিবন্ধন যে যাতনা, তাহা অনুতাপ নহে। অনুশোচনার সঙ্গে সংসারের সম্বন্ধ;—মানুষের সম্বন্ধ; অনুতাপের সঙ্গে কেবল ভগবানের সম্বন্ধ। অতি নির্জ্জনে, গভীর অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে, মহারণ্য প্রদেশে যে পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, যাহা কোনও মতে কখনও লোক সমাজে প্রকাশিত হইতে পারে না, তাহার জন্যও মানবাত্মা গভীর অনুতাপ যাতনা ভোগ করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে অনুশোচনা হইবে না। অনুতাপের আর একটী লক্ষণ এই যে, অনুতাপ একবার প্রাণে দেখা দিলে মানুষ আর সে পাপ অনুষ্ঠানে রত হইতে পারে না। এই ঘোর যাতনার স্মৃতি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে সতত রক্ষা করে। অনুশোচনাতে ইহা হয় না।

আপনার হীনতা ও অপবিত্রতা জ্ঞানজনিত যে গভীর আধ্যাত্মিক যাতনা, তাহাকেই অনুতাপ বলে। প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মানবাত্মাতে অনুতাপযাতনার উদয় হয়। মানুষ যখন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া, ধর্ম্মের তুলাদণ্ডে আপনার জীবনের পরিমাপ করিতে আরম্ভ করে, তখনই সে আপনার হীনতা দেখিয়া বড় যাতনা পায়। ধর্ম্মজ্ঞানে তাহার প্রাণের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ সকলে সে ধর্ম্মের পবিত্র আলো হাতে লইয়া গিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেখানকার লুক্কায়িত পাপের ছবি দেখিয়া আপনি শিহরিয়া উঠে। এই আলোকের সমক্ষে প্রাণের সর্ব্বাংশ হইতে আশ্চর্য্য যাদু-প্রভাবে যেন দুষ্কৃতির স্মৃতি ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তখন সে আপনার জীবনের দুর্গতি অতি বিশদরূপে বুঝিতে পারে।

"ভগবান কি অমূল্যরত্নের অধিকারী করিয়া এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; আর সেগুলিকে কেমন করিয়া পাপের বাণিজ্যে উড়াইয়া দিয়াছি।"— এই চিন্তায় তাহার প্রাণে গভীর যাতনার উদ্রেক হয়। গতজীবনের দুষ্কৃতির স্মৃতিকে সে চাপিয়া রাখিতে চাহে; কিন্তু স্মৃতি তাহাতে আরো অধিকতর বেগভরে জাগিয়া উঠে। জীবন তাহাতে বিষময় হইয়া যায়। কোনও দিকে তাহার আর সুখের পথ, শান্তির পথ থাকে না। প্রকৃতির সেবা, বন্ধুবান্ধবগণের আদর যত্ন, আত্মীয় স্বজনবর্গের পরিচর্য্যা, কিছুতেই আর তাহার সুখ হয় না। বরং তাহাতে প্রাণে আরো গভীরতর যাতনার উদয় হয়। সে যে পাপী; সে যে ভগবানের বিরুদ্ধে শতবার অস্ত্রধারণ করিয়াছে; ভগবানের রাজ্যে আর যে তাহার সুখী হইবার অধিকার নাই! ভগবানের আদেশে যখন চারিদিক্ হইতে প্রকৃতি তাহার সেবা সুশ্রূষা করিতে আসে;—যখন প্রাতঃসমীরণ তাহার অনিদ্রায় পরিশ্রান্ত দেহে মৃদুমধুর ব্যজন করিতে আসে; যখন সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি তাহার চক্ষুর উপরে বায়ুভরে নাচে; যখন উষা শত কণ্ঠে তাহার কর্ণে সঙ্গীত বর্ষণ করে; যখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদীর জল, বৃক্ষের ফল, ক্ষেত্রের শস্য সকলে মিলিয়া তাহার সেবা করিতে আসে, যখন বন্ধুবান্ধবগণ তাহাকে আদর যত্ন করেন, স্বজনবর্গ যখন তাহার প্রতি ভালবাসা দেখান;—তখন তাহার প্রাণে গভীরতম যাতনা হয়। অবমানিত পরমেশ্বরের পুত্রকন্যাগণ তাহাকেই আবার এরূপ ভাবে ভালবাসিতে আসেন, ইহা তাহার অসহ্য। সে এখন দণ্ড চায়; ঘৃণা চায়, কষ্ট চায়, কঠোর শাসন চায়; সুখ চাহেনা, ভালবাসা চাহেনা, আদর চাহেনা, সেবা সুশ্রূষা কিছুই চাহেনা।

ধর্ম্মের সুখের আভাস পাইয়াও সে সেই সুখ হইতে বঞ্চিত;—ইহাতে তাহার প্রাণে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী যাতনা হয়। সে জানে যে, ভগবানকে ডাকিলে তিনি আপনি আসিয়া প্রাণের এই ঘোর যাতনার আগুন নিভাইয়া দেন। তথাপি, ভগবানকে সে ডাকিতে পারে না। নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে যাইতে তাহার সাহস হয় না। পরমেশ্বর এখন তাহার নিকট "ভীষণং ভীষণানাং।" স্বচ্ছ-শীতল-সলিলা সরসীতীরে দাঁড়াইয়া তাহার তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু এই পবিত্র জল স্পর্শ করিবার তাহার অধিকার নাই;—একি অল্প যাতনা? ইহা অপেক্ষা গভীরতর যাতনা আর এ পৃথিবীতে নাই। এই ভীষণ যাতনা, এই

পাপ-বৃশ্চিক দংশনই অনুতাপ। এই অনুতাপের আগুনে প্রাণ পুড়িতে আরম্ভ করিলেই আশা হয় যে, নবজীবন লাভ হইবে।

অনুতাপ যেমন নবজীবনের বীজ; ব্যাকুল ঈশ্বর-পিপাসা সেইরূপ নব-জীবনের অঙ্কুর। ক্রমে যখন অনুতাপের এই ভীষণ যাতনা প্রশমিত হইতে আরম্ভ করে; যখন এই আগুনে পুড়িয়া প্রাণের মলা দূর হইয়া প্রাণ বিশুদ্ধ হয়; যখন ক্রমে ভগবানের দয়ার ভাব প্রাণে বিকশিত হইয়া অনুতপ্ত আত্মার নিরাশা অন্ধকারের ভিতর দিয়া একটু একটু আশার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে থাকে; তখন প্রাণ সহজেই ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। ঈশ্বর আর এখন তাহার নিকট "ভীষণং ভীষণানাং নহেন"; কিন্তু "গতিঃ প্রাণীনাং।" তাহাতেই আত্মা সেই পরমগতিকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই অবস্থা বড় বিষম অবস্থা। এই অবস্থায় আসিয়াই ধার্ম্মিকগণ অনেক সময় মহাভ্রমে পড়িয়া থাকেন। ভগবানের জন্য প্রাণ তখন এতদূর ব্যাকুল হইয়া পড়ে যে কোন্ পথে গেলে বস্তুতঃ তাঁহাকে লাভ করা যাইতে পারে, ইহা তলাইয়া দেখিবার ক্ষমতা থাকে না; এবং পীড়িত পুত্রের স্বাস্থ্য বিধানের জন্য ব্যাকুলপ্রাণা জননী যেমন কোনও বিচার না করিয়া যে যে উপায় বলে তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকেন; ব্যাকুল ঈশ্বর জিজ্ঞাসুও তখন যে যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই পথেই যাইতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় উপনীত হইয়াই মহাযোগী শাক্যসিংহ ইতস্ততঃ নানা তপশ্চারণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই অবস্থায় আসিয়াই মহাত্মা চৈতন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অবস্থা; এই অব-স্থাতেই নবজীবনের অঙ্কুরভেদ হয়।

ইহার পর নবজীবন লাভ। ইতস্ততঃ ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রাণ যখন ভগবদ্-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ভগবানকে লাভ করে, তখনই তাহার প্রকৃত নবজীবন প্রাপ্তি হয়। তখন আর সে মানুষ থাকে না। মনুষ্য জীবনের পরিণতি লাভ করিয়া তখন দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার বিশ্বজনীন্ ভালবাসা তখন সমগ্র জগৎকে প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন করে। তখন তাঁহার ধর্ম্ম বস্তুতঃই নিষ্কাম হইয়া যায়। সাধক আর তখন মুক্তির প্রার্থী নহেন;—মুক্তি তাঁহার লাভ হইয়াছে। তখন আর তিনি পুণ্যেরও প্রার্থী নহেন; পুণ্য সাগরের মধ্যে তিনি ডুবিয়া আছেন। তখন তিনি আর সুখ কামনা করেন না, তাঁহার দুঃখ-জ্ঞান রহিত হইয়াছে। ভগবানের

প্রেমে হৃদয় মন নিমগ্ন করিয়া এবং তাঁহারই মঙ্গল কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া তখন সাধক অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

নবজীবনের বীজ সঞ্চার অনুতাপে; অঙ্কুরভেদ ঈশ্বর-জিজ্ঞাসায়; এবং পরিণতি ঈশ্বরলাভে। নবজীবনের জন্য যদি বাস্তবিকই আমাদিগের প্রাণ লালায়িত হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে আত্মচিন্তা ও ভগবদ্ চিন্তা দ্বারা প্রাণে যাহাতে প্রকৃত অনুতাপের সঞ্চার হয় জীবনের মলারাশি যাহাতে ধৌত হইয়া যায়, হৃদয় মন যাহাতে বিশুদ্ধ এবং পাপভাব শূন্য হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। নতুবা যে রত্নাকর আছি সেই রত্নাকরই থাকিব, অথচ মধ্য হইতে নবজীবন পাইয়া বাল্মিকী হইব, এ কল্পনাও যেন না করি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সুখী-প্রাণ।

জান না ত নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে,
কোথায় যে করিছ প্রয়াণ,
মাতিয়া চলেছ তবু আপন আনন্দে পূর্ণ,
আনন্দ করিছ সবে দান।
বিজন অরণ্য-ভূমি দেখিছে তোমার খেলা,
জুড়াইছে তাহার নয়ান,
মেষ-শাবকের মত তরুদের ছায়ে ছায়ে
রচিয়াছ খেলিবার স্থান।
গভীর ভাবনা কিছু আসে না তোমার কাছে,
দিন রাত্রি গাও শুধু গান।
বুঝি নর-নারী মাঝে এমনি বিমল হিয়া
আছে কেহ তোমারি সমান।
চাহে না চাহে না তারা ধরণীর আড়ম্বর,
সন্তোষে কাটাতে চায় প্রাণ,
নিজের আনন্দ হতে আনন্দ বিতরে তারা
গায় তারা বিশ্বের কল্যাণ। —Robert Buchanan.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধর্ম্ম ও দর্শন।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক মলিয়ারের লেখা হইতে এক খানি ইংরেজী পুস্তকে একটী অতি রহস্য-জনক গল্প উদ্ধৃত হইয়াছে। মসোঁ জুর্দ্দাঁ্যা নামক চত্বারিংশ-বর্ষ বয়স্ক এক জন প্রণয়ী একজন অধ্যাপকের নিকট যাইয়া তাঁহার হইয়া এক খানা প্রণয়-লিপি লিখিয়া দিতে বলাতে উভয়ের মধ্যে এই কথোপকথন হইলঃ—

অধ্যা। আচ্ছা, বেশ, আপনি কি পদ্যে লিখিতে চান?

জুর্দ্দাঁ্যা। না, না, পদ্যে নয়।

অধ্যা। তবে কি গদ্যে?

জুর্দ্দাঁ্যা। না, গদ্যে ও নয়, পদ্যেও নয়।

অধ্যা। দুটোর একটা হওয়াই চাই।

জুর্দ্দাঁ্যা। কেন?

অধ্যা। কেননা, মসোঁ, আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার এই দুইটী বই উপায় নাই—হয় গদ্য, না হয় পদ্য।

জুর্দ্দাঁ্যা। হয় গদ্য, না হয় পদ্য?

অধ্যা। হাঁ, মসোঁ, কারণ, যাহা কিছু গদ্য নয়, তাহাই পদ্য; আর যাহা কিছু পদ্য নয়, তাহাই গদ্য।

জুর্দ্দাঁ্যা। আমরা এখন যাহা বল্‌ছি, ইহা কি?

অধ্যা। ইহা গদ্য।

জুর্দ্দাঁ্যা। বটে? যখন আমি বলি, "নিকোল, আমার চটী যোড়াটা নিয়ে আয়, আর টুপিটা দে; এটা কি গদ্য হ'লো?

অধ্যা। হাঁ, মসোঁ।

জুর্দ্দাঁ্যা। কি আশ্চর্য্য, এই চল্লিশ বৎসর গদ্য বলে আস্‌ছি, তবু জান্‌তাম না যে গদ্য বল্‌ছি!

গদ্য সম্বন্ধে না হউক, দর্শন সম্বন্ধে এরূপ অসংখ্য মসোঁ জুর্দ্দাঁ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনের নাম শুনিলেই লোকে ভয় পায়। কেবল মসোঁ জুর্দ্দাঁ্যার ন্যায় অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক নহে, অধ্যাপকের ন্যায় সুশিক্ষিত লোকদিগেরও অনেকের এই দশা। অথচ এই কথা সত্য যে,

শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, চিন্তাশীল বা চিন্তাহীন, সকলের মনেই দর্শনের আলোচ্য বিষয় সমূহ সম্বন্ধে কোন না কোন প্রকার বিশ্বাস বা মত আছে। মসোঁ জুর্দ্যাঁ গদ্য কি তাহা না জানিয়া চল্লিশ বৎসর গদ্য বলিয়াছিলেন, আমারও অনেকেই দর্শন-শাস্ত্র কি তাহা জানি না, অথচ প্রতিনিয়ত দার্শনিক চিন্তা ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছি।

দর্শন কি?—যে শাস্ত্র জড়জগৎ, মানবাত্মা ও পরমাত্মা এই তিনের অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও পরস্পরগত সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করে, এবং সাধ্যানুসারে এই সমুদায় তত্ত্ব নির্ণয় করে, তাহারই নাম দর্শন। এমন ব্যক্তি কে আছেন, যাঁহার এই বিষয়ত্রয় সম্বন্ধে কোন না কোন মত বা বিশ্বাস নাই? যিনি মনে করেন জড়জগৎ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, তিনি যেমন দার্শনিক; যিনি মনে করেন জড়জগৎ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে, তিনিও তেমনি দার্শনিক। যিনি মনে করেন, মানবাত্মা অভৌতিক তিনিও দার্শনিক; যিনি মনে করেন ইহা জড় হইতে উৎপন্ন, তিনিও দার্শনিক। যিনি মনে করেন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন, তিনি যেমন দার্শনিক; যিনি মনে করেন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই, তিনিও তেমনি দার্শনিক। যিনি মনে করেন, দর্শন সংবন্ধীয় প্রকৃত-তত্ত্ব জানা যায় না তিনি ও দার্শনিক; যিনি মনে করেন, দর্শন সম্বন্ধীয় প্রকৃত-তত্ত্ব জানা যায় তিনিও দার্শনিক। এই পরস্পর-বিরোধী মত সমূহের সমুদায়ই দর্শন সম্বন্ধীয় মত। এমন কে আছেন যিনি এই সমুদায় মতের কোন না কোন মতে বিশ্বাস না করেন? সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই অল্লাধিক পরিমাণে এক এক জন দার্শনিক; আমাদিগকে বাধ্য হইয়া দার্শনিক হইতে হয়, দর্শন আমাদের অনতিক্রমনীয়। তবে ইহাতে কি ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে যখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই দার্শনিক হইতে হয়, তখন দর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা কিছু নয়। যখন বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে দর্শন সম্বন্ধীয় কোন না কোন মতে বিশ্বাস করিতে হয়, তখন যাহাতে ভ্রান্ত মতে বিশ্বাস না করি, যাহাতে দর্শন সম্বন্ধীয় প্রকৃত-তত্ত্ব লাভ করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। গদ্য আমাদের স্বাভাবিক ভাষা, তাহা বলিয়াই কিছু স্বাভাবিক গদ্য লইয়া আমরা পরিতৃপ্ত থাকি না; স্বাভাবিক গদ্য অমার্জ্জিত অপরিশুদ্ধ মনের গভীর চিন্তা ও ভাব প্রকাশে অসমর্থ, তজ্জন্যই মার্জ্জিত গদ্যের প্রয়োজন; দর্শনও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু তাহা বলিয়াই আমাদের স্বাভাবিক ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ দর্শনে পরিতৃপ্ত

থাকা উচিত নহে; ভ্রম-মুক্ত, বিশুদ্ধ, আত্মার উন্নতিকারী দর্শনের প্রয়োজন।

অন্য লোকের কথা যাহাই হউক, যাঁহারা ধর্ম্ম বিশ্বাসী এবং ধর্ম্ম-প্রয়াসী তাঁহাদের পক্ষে তো দর্শনালোচনা নিতান্তই আবশ্যক। দর্শন ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি। ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস ঈশ্বর-অস্তিত্বে। "ঈশ্বর" অর্থ কি?—না, জড়-জগৎ ও মানবাত্মার স্রষ্টা ও রক্ষাকর্ত্তা। ইহা বুঝিতে অধিক চিন্তার প্রয়োজন হয় না যে, জড়জগৎ এবং মানবাত্মার প্রকৃতি নির্ণিত না হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণিত হইতে পারে না। এই সমুদায় তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলেই দর্শনের আশ্রয় লইতে হইবে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিতরে দার্শনিক-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে; ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তি দার্শনিক না হইয়া থাকিতে পারে না। যিনি বলেন আমি দর্শন টর্শন কিছু জানি না, জানিতেও চাই না; অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তিনি হয় ত কি বলিতেছেন জানেন না, অথবা তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস অন্ধ-অজ্ঞতা-জাত; জ্ঞান-সম্ভূত বিশুদ্ধ বিশ্বাস নহে। এরূপ বিশ্বাসে সুশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি তৃপ্ত থাকিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার দর্শনালোচনা আবশ্যক।

ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিতরে কি কি দার্শনিক মত নিহিত আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই আমাদের উক্ত কথাটী—অর্থাৎ দর্শন যে ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তি তাহা—আরো স্পষ্টতর হইবে। উক্ত অনুসন্ধানে আরো দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সকল প্রকার দার্শনিক মতই যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুকূল, তাহা নহে; বরং কতকগুলি দার্শনিক মত ধর্ম্ম বিশ্বাসের দারুণ শত্রু। ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তি দার্শনিক মত সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। যদি চিন্তাশীল লোকের মনে ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয়, তবে তাঁহাকে আগ্রহের সহিত কতকগুলি দার্শনিক মত প্রচার করিতে হইবে, আর কতকগুলি দার্শনিক মতের বিপক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইবে।*

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

* স্থানাভাবে সমগ্র প্রবন্ধটী এবার প্রকাশিত হইতে পারিল না, আগামীতে শেষ হইবে।

ধর্ম্ম ও দর্শন।

এখন দেখা যাক্ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলে কি কি দার্শনিক মত নিহিত রহিয়াছে, আর কি কি দার্শনিক মতই বা ধর্ম্ম বিশ্বাসের পক্ষে অনিষ্টকর।

প্রথমতঃ, জড়জগতের একজন স্থষ্টিকর্ত্তা আছেন ইহা মানিলেই এই বুঝায় যে জড়জগৎ স্থষ্ট, এমন এক সময় ছিল যখন জড়জগৎ ছিল না। এই তত্ত্বের প্রমাণ কি? মানুষের স্থষ্টি অবধিই সে দেখিয়া আসিতেছে জড়জগৎ আছে; বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক কল্পনার দূরতম স্থষ্টি যতদূর যায়, তত দূর পর্য্যন্ত ও দেখা যাইতেছে, জড়জগৎ আছে। তবে জড় জগৎ যে এক সময় ছিলনা, ইহা যে অনিত্য, তাহার প্রমাণ কি? ইহা কি সম্ভব নয় যে ইহা কোন না কোন অবস্থায় নিত্যকালই বর্ত্তমান আছে এবং থাকিবে? এক প্রকার দার্শনিক মত আছে—ইহার ইংরাজী নাম Natural Realism বা Dualism—যাহা এই প্রশ্নের কোন সন্তোষকর উত্তর দিতে পারে না। সেই মত বলে—জড় নিরবলম্ব, স্বাধীন, ইহা জ্ঞাতভাবে, অজ্ঞাতভাবে, জ্ঞানের বিষয় রূপে এবং জ্ঞানের অবিষয়রূপে, উভয়তঃই থাকিতে পারে। এই মত স্পষ্টতঃই স্থষ্টিতত্ত্বের বিরোধী; কেন না জড় যদি এমন কিছু হয় যাহা আত্মা হইতে স্বাধীনরূপে থাকিতে পারে, তবে ইহা ঈশ্বরের আশ্রয়-নিরপেক্ষভাবে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু আর একটা দার্শনিক মত আছে যাহা স্থষ্টিতত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দেয়। সে মত বলে, জড় নিরবলম্ব হইয়া, জ্ঞানের অতীত হইয়া থাকিতে পারে না; জড় আত্মার আশ্রয়ীভূত, জ্ঞানের বিষয়ীভূত ভাবরাশি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং জীবাত্মার জ্ঞানের অতীত—জীবাত্মা স্থষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী—যদি কোন জড়ের অস্তিত্ব কল্পনা কর, তবে তাহা একটী লোকাতীত জ্ঞানের ভাবরূপে মাত্র কল্পনা করিতে পার। আর অনিত্য জীবাত্মার প্রত্যক্ষীভূত এই যে জড়জগৎ, তাহা যখন জীবাত্মার ইন্দ্রিয়ব্যাপার মাত্র, ভাবরাশি মাত্র, তখন ইহা স্পষ্টতঃই নিত্য নহে; জীবাত্মা যখন অনিত্য, স্থষ্ট, তখন ইহাও অনিত্য, স্থষ্ট। এই মতের ইংরাজী নাম Idealism বা Phenomenalism. পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন উপরোক্ত দুটী মতের মধ্যে যেটাই সত্য হউক না কেন, প্রথমোক্ত মত স্থষ্টি-তত্ত্বের বিরোধী, আর এই শেষোক্ত মত স্থষ্টি-তত্ত্বের সহায়। সুতরাং দেখা গেল ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি জড়ের মূল প্রকৃতি

নির্ণয় বিষয়ে উদাসীন্ থাকিতে পারেন না, এবং সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে শেষোক্ত মত অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

জড়মূলে সৃষ্ট হউক বা অসৃষ্টই হউক, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, জড় জগতের বর্ত্তমান অবস্থা নিত্য নহে, ইহা সৃষ্ট, নূতন। এক সময় ছিল যখন জড় জগৎ অগ্নিময় বাষ্পরাশি মাত্র ছিল। ক্রমে ক্রমে এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তন এখনও শেষ হয় নাই, জগৎ এখনও পরিবর্ত্তনময়, কার্য্যময়। সেই মহৎপরিবর্ত্তন এবং এখনকার এই সকল অসংখ্য পরিবর্ত্তনের কারণ কি? 'কারণ কি?' এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে স্থির করা আবশ্যক কারণের অর্থ কি? কারণের সাধারণতঃ দুটী অর্থ হয়; একটি অর্থ যাহা কোন কার্য্যের পূর্ব্বে নিয়তই ঘটে, এবং ঘটিবার জন্য অন্য কোন ঘটনার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ সংক্ষেপতঃ কোন কার্য্যের নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা অবস্থা *; যথা—দাহ্য পদার্থের অগ্নি-সংযোগ দহন কার্য্যের কারণ অর্থাৎ নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। যদি কার্য্যের কারণ অর্থ ইহাই হয়, তবে এই কারণবাদ হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণিত হওয়া অসম্ভব। নিরীশ্বরবাদী স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারেন জড়ের আদিমাবস্থায় ইহাতে যে সমুদায় গুণ এবং নিয়ম নিহিত ছিল, সে সমুদায়ই জগতের বর্ত্তমানাবস্থার কারণ। এই কথার কোন সন্তোষকর উত্তর নাই। যদি কারণ অর্থ নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা অবস্থাই হয়, তবে ইহা কিছুই অসম্ভব নয় যে, জগতের আদিমাবস্থাই ইহার বর্ত্তমানাবস্থার কারণ। কিন্তু এই কারণবাদে, কারণের এই অর্থে আমরা এবং সাধারণ মানব মন পরিতৃপ্ত হয় না। কারণের প্রকৃত অর্থ কর্ত্তা—কোন কর্ত্তৃত্বশালী, শক্তিশালী পদার্থ। মানব মন যে জিজ্ঞাসা করে 'এই ঘটনার কারণ কি' এই জিজ্ঞাসার প্রকৃত অর্থ এই 'ঘটনা কাহার কর্ত্তৃক বা কিসের কর্ত্তৃক কৃত হইল।'

মানব মন কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্য কল্পনা করিতে পারে না; প্রত্যেক কার্য্যেরই কর্ত্তা আছে, প্রত্যেক কার্য্যই কোন না কোন কর্ত্তৃত্বশালী, শক্তিশালী পদার্থ কর্ত্তৃক কৃত, ইটী মানব মনের একটী অপরিহার্য্য বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল। সময় থাকিলে আরো বিশেষরূপে দেখান

---

* "নব্য ভারত" বৈশাখের সংখ্যায়, "নাস্তিকতা" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং আবশ্যক হইলে আষাঢ়ের সংখ্যায় 'আস্তিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং শ্রাবণের সংখ্যায় "অজ্ঞেয়তাবাদ ও সন্দেহ বাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

যাইতে পারিত যে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে কোন যুক্তি দেওয়া যাক্ না, এই শেষোক্ত প্রকার কার্য্যকারণ মত না মানিলে সে যুক্তির কোন মূল্য থাকে না। সুতরাং পাঠক দ্বিতীয়বার দেখিলেন, ঈশ্বর বিশ্বাসীকে দার্শনিক সংগ্রামে একটী বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিতে হইতেছে; তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই কারণবাদ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব (efficiency) বাদী হইতে হইতেছে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই, এই যে কর্ত্তৃত্ববাদে আমাদের অপরিহার্য্য বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি? ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অভিজ্ঞান (experience) আমাদিগকে এই বিশ্বাস দিতে পারে না। অভিজ্ঞান সীমাবদ্ধ। কাল বিশেষে, দেশ বিশেষে আবদ্ধ অভিজ্ঞান কিরূপ সার্ব্বভৌমিক অবশ্যম্ভাবী সত্যের প্রমাণ দিবে? আমরা বহির্জ্জগতে দেশ বিশেষে বা কাল বিশেষে কার্য্যের কর্ত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু তাহাতে কখনই প্রমাণ হইতে পারে না যে, সকল দেশে সকল কালে কার্য্য মাত্রেরই কর্ত্তা আছে, কর্ত্তা থাকা চাই, কর্ত্তা শূন্য কার্য্য হইতে পারে না। অথচ আমাদের বিশ্বাস তাহাই; সুতরাং বলিতে হইবে এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, আত্ম-প্রত্যয়-মূলক (Intnitive) পাঠক তৃতীয়বার দেখিতেছেন, ধর্ম্ম-বিশ্বাসীকে দার্শনিক যুদ্ধে একটী বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিতে হইতেছে; তিনি অভিজ্ঞানবাদী (Empiricist) থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আত্মপ্রত্যয় স্বীকার করিতে হইবে।

অতঃপর ধর্ম্মবিশ্বাস নিহিত আর একটী দার্শনিক মত দেখান যাইতেছে। উপরোক্ত কারণবাদ নিহিত "কর্ত্তৃত্ব" "শক্তি" "শক্তিশালী পদার্থ" এই সকল ভাব আমারা কোথায় পাইলাম। ইন্দ্রিয়জ্ঞান, বাহ্য অভিজ্ঞান এই সকল ভাব আমাদিগকে দিতে পারে না; বাহ্য-অভিজ্ঞান দ্বারা আমরা কেবল জড় এবং জড়ীয় পরিবর্ত্তনমাত্র জ্ঞাত হই; জড় স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয়, শক্তিহীন, ইহাকে না চালাইলে চলে না; জড় পরিবর্ত্তিত হয় এবং একটি পরিবর্ত্তনের পর আর একটি অথবা আরো অসংখ্য পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা সত্য; কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের কারণ যে 'শক্তি' তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু নহে; সুতরাং তাহা জড়ীয় গুণ নহে। বাহ্য অভিজ্ঞান আমাদিগকে কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান শক্তির জ্ঞান, দিতে পারে না। অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিয়া দেখি, এখানেও পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে বটে; কিন্তু, এখানকার একটি আশ্চর্য্য পার্থক্য এই যে বাহ্যজগতে যেমন কর্ত্তা অদৃশ্য, শক্তি অদৃশ্য, কেবল

বিশ্বাসগ্রাহ্য, এখানে সেরূপ নহে। এখানকার সমুদায় কার্য্যের না হউক, অন্ততঃ কতক গুলি কার্য্যের কর্ত্তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত। সে কর্ত্তা—মন,—ইচ্ছাশালী মন। মন এখানে বসিয়া মানসিক অবস্থা এবং কিয়ৎ পরিমাণে ভৌতিক পদার্থ সমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। কর্ত্তৃত্বের ভাব, শক্তির ভাব আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এখানেই পাই। মন ব্যতীত, ইচ্ছা ব্যতীত আমরা অন্যবিধ শক্তি, অন্যবিধ কর্ত্তা দেখি নাই, জানি না এবং কল্পনাও করিতে পারি না। এই সকল কথার শেষ মীমাংসা কি তাহা চিন্তাশীল পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন ; যাহা হউক সেই মীমাংসা বিশ্বাসরূপে প্রদর্শন করা আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নহে। আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য আর একটী বিষয় দেখান। তাহা এই। এই যে মনের কর্ত্তৃত্ব, ইহাকেই অন্য কথায় "ইচ্ছার স্বাধীনতা" বলে। মনের কর্ত্তৃত্ব মানিলেই প্রকৃত পক্ষে "ইচ্ছার স্বাধীনতা" নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মত মানা হইল। "ইচ্ছার স্বাধীনতা" এই কথাটী নানা কারণে আপত্তিজনক, এবং নানা গোলযোগের কারণ ; সে সমুদায় এখন দেখাইবার স্থানাভাব। প্রকৃত মতটী এই যে আমাদের মানসিক কার্য্য সমূহ জড়ীয় কার্য্যের ন্যায় অলঙ্ঘনীয় নিয়ম সূত্রে আবদ্ধ সন্দেহ নাই,—কার্য্য সমূহের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ব্ববর্ত্তীত্ব, সমকালত্ব, ও পরবর্ত্তীত্বরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই সমুদায় অলঙ্ঘ্য নিয়ম, এই সমুদায় অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ সত্বেও কার্য্যের উপর মনের কর্ত্তৃত্ব নিঃসন্দিগ্ধ। কার্য্য সমূহ কার্য্য মাত্র—মনের আশ্রয়ীভূত অবস্থা পরম্পরা মাত্র ; কার্য্য সমুদায় কখনও পরস্পরের কর্ত্তা হইতে পারে না ; কর্ত্তা কেবল মন। মন কর্ত্তৃত্বশালী—এবং 'কর্ত্তৃত্বশালী' অর্থ যদি "স্বাধীন" হয়, তবে মন স্বাধীন। এই "স্বাধীন ইচ্ছার" মত ঈশ্বর বিশ্বাসের একটী ভিত্তি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। 'যিনি ইচ্ছার স্বাধীনতা' অর্থাৎ মনের কর্ত্তৃত্ব মানেন না তাঁহার পক্ষে "কর্ত্তৃত্বের" ভাব, সুতরাং কর্ত্তৃত্বশালী আদিকারণের ভাব নিতান্তই কল্পনা সম্ভূত, সন্দেহ নাই। সুতরাং পাঠক চতুর্থবার দেখিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী দার্শনিক সংগ্রামে একটী বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। তিনি "ইচ্ছার স্বাধীনতা" অস্বীকার করিতে পারেন না ; বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ইহা মানিতে হইবে।

পাঠক দেখিলেন ধর্ম্মের সহিত দর্শনের কেমন নিকট সম্পর্ক। ধর্ম্মবিশ্বাসী বা ধর্ম্মপ্রয়াসী ব্যক্তিকে কেবল যে দর্শনালোচনা করিতে হইবে

তাহা নহে, তাঁহাকে দার্শনিক সংগ্রামে বিশেষ বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা দেখিলাম—অন্য ধর্ম্ম মত ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র ঈশ্বর বিশ্বাসী হইতে হইলেই—তিনি আর কিছু হউন না হউন—তাঁহাকে জড় সম্বন্ধে Phenomenalist, কারণ বাদ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব-বাদী, জ্ঞানের আকর সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়বাদী এবং ইচ্ছা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বাধীন-ইচ্ছাবাদী হইতে হইবে। এই সকল মত সত্য কি না তাহা স্পষ্টরূপে দেখান আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যদি পারি পরে দেখাইব। যদি অন্য কোন ঈশ্বর বিশ্বাসী এই কার্য্যের ভার নেন, এবং সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করেন, তবে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব।

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে ?

কেউ বলে তুই ভূত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি", আবার কেউ কেউ বলে " তুই শূন্যে উড়ে যাবি "—কার কথা বিশ্বাস করিব ? আমার মায়ার স্বপ্নও ভাঙে না, আমার মরণ কথাও মনে হয় না ; তার পর মরে কি হবো, এত দূরের কথা আমার ভাবনাতেও আইসে না। যদিও সে কথা মনে পড়িল, তাহাতে আবার এত ভিন্ন মত ! কার কথা বিশ্বাস করিব ?

কেউ বলে—তুই ভূত হবি। ভূত কাহাকে বল ভাই ? লোকে যাহাকে পঞ্চভূত বলে, সেই কি সে ভূত ? যদি বট গাছে থাকিতে হয়, ঝড়ের কাঁধে চাপিতে হয়, আর মানুষের ঘাড় মটকাইতে হয়, তবেত সেই পঞ্চভূত হওয়াই আবশ্যক। রহস্য ছাড়িয়া স্বরূপ কথা বলি ;—মরে কি আবার ভৌতিক শরীর ধরিতে হইবে ?

জড় শরীর পাইলে কি হবো ভাই ? পশু পক্ষী বা কীট পতঙ্গ হইব কি ? যে কাক-বংশ চিরদিন " কা " ভিন্ন করিতে জানিল না, যে বলীবর্দ্দ চিরকাল কেবল ভূকর্ষণই করিতেছে ; আমি মরিয়া সেই কাক বা বলদ হইব কি ? আমার অন্তরাত্মাটা কি চিনির খেলনা যে, টিপিলেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে ? নহিলে জীবান্তরে জন্ম পরিগ্রহ কিরূপে সম্ভবে ? আমার এই অপার কর্ত্তব্য জ্ঞান, আমার এই বিচিত্র কল্পনাশক্তি, আমার এই উদ্বেলিত ভগবদ্ভক্তি, আমার জীবনের এই অনন্ত কিন্তু অতৃপ্ত উন্নতিশীলতা কি গো-জন্মে স্বার্থক হইতে পারে ? এমন অসম্ভব কল্পনা মানুষের মনে আসিতেই পারে না। যদি বিদ্যা বুদ্ধি ভাষা জ্ঞানাদি লইয়াও গোরু হওয়া

যায়, তবে আর গো-জন্মের প্রয়োজন কি? হরি হরি, আমার দিকে চাহিয়া দেখ, আমিই যে তাদৃশ পরম গোরু!

পৌরাণিক বলে, কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার জন্য মানুষ ইতর যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে। উহা অতি অল্প বুদ্ধির কথা। কর্ম্মফল ভোগ অর্থ কি? না সৎকার্য্যের পুরস্কার ও দুষ্কার্য্যের দণ্ড লাভ। সাধুতার পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বিধান যিনি করেন, সেই বিধাতা ন্যায়বান্ ও শিবসংকল্প। বিধাতা শিবসংকল্প না হইলে কর্ম্ম ফল বিধানের উদ্দেশ্য কি? আর ন্যায়-বান্ না হইলেই বা কর্ম্মফলের অর্থ কি? কর্ম্মফলে যদি সাধুতার জন্য দণ্ড বা দুষ্কৃতির জন্য পুরস্কার বিধান হয়, তাহাকে কি আর কর্ম্ম ফল বলা যায়? অতএব কর্ম্ম ফলের অর্থ এই যে, ন্যায়বান্ মঙ্গলময় পরমেশ্বর জীবের মঙ্গলের জন্য তৎকৃত সদসৎ কার্য্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিয়া থাকেন।

ইহাই যদি হইল, তবে মানুষ মরিলে গোরু হইবে কেন? দণ্ডের উদ্দেশ্য যদি অপরাধীর সংশোধন হয়, তবে, মানুষকে গোরু করিলে তাহার কি সংশোধন হয়? যাহাকে দণ্ড দেওয়া যায় সে যদি তাহা বুঝিতে না পারে— সে যদি এরূপ বুঝিতে না পারে, " হায়, আমি এরূপ ছিলাম, আত্মাপরাধে এরূপ হইয়াছি; কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা আবার উন্নত অবস্থা পাইব!"—তবে আর সংশোধন হইবে কিরূপে? হে পৌরাণিকের শিষ্য, তুমি কি ভ্রান্ত, তুমি বল কি? —না দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য জ্ঞান বিশিষ্ট মানুষকে সংশোধন করিবার জন্য ভগবান্ তাহাকে জ্ঞান বুদ্ধি বিহীন গোরু করিয়া থাকেন! তোমার যুক্তিতে শয্যাতে কীট হইলে সমস্ত শয্যা দগ্ধ করা কর্ত্তব্য!!

তবে কি ভাই, মরে মানুষ হবো? সংসারে কেউ কি মরে আবার মানুষ হয়েছে? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও ত বলিতে পারে না সে পূর্ব্ব-জন্মে কি ছিল, কোথায় ছিল। পূর্ব্ব-জন্মে যে মানুষ ছিল, মরে তাহার দেহ গিয়াছে, রক্ত মাংস গিয়াছে; বুদ্ধির পক্কতা বা স্মরণশক্তি ত যায় নাই? তবে পূর্ব্ব-জন্মের কথা মনে নাই কেন?

স্মৃতি কি?—মনুষ্য মনের একটি শক্তি। সে শক্তি বা শক্তির কার্য্য বজায় থাকে কিরূপে?—অভ্যাস ও আলোচনা অবলম্বন করিয়া। বহুকাল যাহা অভ্যস্ত বা আলোচিত নহে, মন তাহাই ভুলিয়া যায়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তুমি যে স্থান দেখিয়াছ, যদি তৎপরে সে স্থান আর না দেখ, অথবা

কোন সময়ে তোমার চিন্তাতেও তাহার কিছু না উঠে, তবে তুমি নিশ্চয়ই তাহা ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু আজ যাহা দেখিতেছ, কাল তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। তবে মানুষ আজ মরিয়া কালই নিজ জীবনের বৃত্তান্ত ভুলিয়া যায় কিরূপে? যদি বল নূতন স্থান বা অভিনব অবস্থায় ভাবযোগ (Association of ideas) বিলুপ্ত হইয়া স্মৃতির কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, মানুষ মরিয়া আবার মানুষ হইলে এমন নূতন অবস্থাপন্ন হয় না অথবা এমন নূতন স্থানে পড়ে না যে, জন্মান্তরের অবস্থা বা অবস্থিতি স্থানের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য নাই। নূতন স্থান বা নূতন অবস্থাতে স্মৃতির ব্যাঘাত ঘটায় বটে, কিন্তু সদৃশ অবস্থায় স্মৃতির উদ্রেক করে না কেন? সেই পৃথিবী, সেই বৃক্ষলতা, সেই পান ভোজন, সেই দৃশ্য, সেই শব্দ, সেই আস্বাদ, তবে কেন ঘুণাক্ষরেও পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে না? তাই বলি ভাই, আর যাই হই, মরে কখনও মানুষ হইব না।

তবে কি উড়ে যাবো? আমার মন বলে না উড়ে যাবো, প্রাণ বলে না উড়ে যাবো; কেবল তোমরা কেউ কেউ এ কথা বলে থাক। তোমাদিগের কথা বিশ্বাস করিব কেন? আমার আত্মার মূলে যে জ্ঞান নিহিত,সেই সহজজ্ঞান যেমন বলিতেছে "আমি আছি," তেমনই বলিতেছে "আমি থাকিব"; এ সংস্কার আমি অন্য কাহারও নিকট পাই নাই। এই জ্ঞান আমার শিক্ষিত নহে। সেই জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া যদি তোমাদিগের কথায় বলিতে হয় যে আমি থাকিব না, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে আমি নাই। বল দেখি ভাই, এই যে তোমার সম্মুখে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত জীবন্ত আমি দণ্ডায়মান আছি, কেহ যদি বলে এই আমি "নাই", তবে কি আমি বিশ্বাস করিব যে, সত্য সত্যই "আমি নাই"?

আমার সহজ-জ্ঞান যাহা বলে,তোমার সহজ জ্ঞানও তোমাকে তাহাই বলে। যদি তুমি সেই প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া তাহা অস্বীকার কর, তোমাকে কতক গুলি অকাট্য যুক্তি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার কথা বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। বল দেখি ভাই, তুমি যে বল,আমি থাকিব না, তুমি কিরূপে জানিলে যে আমি থাকিব না?

তুমি যাহা বলিবে তাহা যেন আমার মনেই উঠিতেছে। "মানুষ মরিলে আর তাহাকে দেখিতে পাই না। রাম শ্যাম মরিল আর তাহাদিগের কিছু রহিল না, তুমি মরিলেও তোমার কিছু থাকিবে না। অভিজ্ঞতা (Experi-

ence) সমস্ত জ্ঞানের কারণ। কোন মানুষ মরিলেই আর কিছু থাকিতে দেখি না, তুমি মরিলেও তোমার কিছু থাকিবে না।"

হে দার্শনিক-শিষ্য, তোমার কথাই যেন মানিলাম। মানিলাম যে অভিজ্ঞতাই সমস্ত জ্ঞানের কারণ। কিন্তু আমার কথার উত্তর দাও। এই যে আমার হস্তে কাষ্ঠখণ্ড দেখিতেছ, উহাকে দগ্ধকর, উহা ভস্ম হইয়া যাইবে। কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে যে উত্তাপ আছে, তাহা উত্তাপে মিশিবে, উহার মধ্যে যে জল আছে তাহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। এই রূপে কাষ্ঠখণ্ড ভূতত্ব প্রাপ্ত হইবে। মানুষও মরিয়া এইরূপে ভূতত্ব পায় কি? মানুষ মরিলে তাহার দেহ ভূতত্ব পায় ইহা তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, বিজ্ঞান দ্বারাও বুঝাইয়া দিতে পার। কিন্তু মানুষ জীবিত থাকিতে যে তাহার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা ছিল, মানুষ মরিয়া তাহা কোথায় গেল? তাহাও ভূতত্ব পাইয়াছে, ইহা তুমি দেখাইতে বা বুঝাইয়া দিতে পার কি? না পারিলেই তোমাকে বলিতে হইবে, "কি হইল, কোথায় গেল, জানি না।" তুমি অভিজ্ঞতাবাদী, ইহার অতিরিক্ত বলা তোমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। অধ্যাত্মতত্ব বা পরমার্থতত্ব বিষয়ে যখন তুমি কিছু উপলব্ধি করিতে বা প্রমাণ করিতে না পার, তখন ভাই অভিজ্ঞতাবাদি, তুমি গোলযোগ না করিয়া পিতার সুপুত্রের মত বলিও—"জানিনা, বুঝিনা।" পণ্ডিতদিগের মতে তোমাকে এ কথাও বলিতে পারি—"When you can not unriddle, learn to believe."

মরিলে যে আমি উড়িয়া যাইব না, তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আমার জীবন অনন্ত উন্নতিশীল। আমার জীবনের উপকরণ—আমার চিন্তা, আমার ভাব, আমার ইচ্ছা অনন্ত উন্নতি-মুখ। শরীরটা যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলই বিলোপ পাইবে এও কি সম্ভব? তাই বলি ভাই, মরিলাম আর সকল ফুরাইল, ইহা কখনও হইবে না।

ঐযে সামান্য অঙ্কুরটী দেখিতেছ, কালে উহা বৃক্ষ হইবে। সেই বৃক্ষে ফল হইবে। বৎসরে বৎসরে সকল বৃক্ষেরই এক রূপে ফল হয়, সকল বৃক্ষই এক রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তারপর বৃক্ষ ক্রমে পুরাতন হইয়া মরিয়া যায়, মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। এক বৎসর, দুই বৎসর, শত বৎসর বা সহস্র বৎসরে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব চরিতার্থ হয়—যাহা হইবার তাহা হইয়া বৃক্ষ আর থাকে না। আমরা বুঝি, বৃক্ষের নিয়তির পরিসমাপ্তি হয়।

মানব জীবনেরও নিয়তির এইরূপ সমাপ্তি হয় কি? কোন্ দিন কোন্ মনুষ্য পূর্ণতা পাইয়াছে? বয়োবৃদ্ধি বা শিক্ষার গুণে ইহ জীবনে কোন্ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হইয়াছে? কোন্ দিন কে অনুভব করিয়াছে বা বলিয়াছে যে আমার জ্ঞান, ভাব বা ইচ্ছার পূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণ চরিতার্থতা হইয়াছে? জীবন পথে মানুষ চিরকাল শিশু, সকলেই এ পথের আরম্ভ দেখিতেছে, অন্ত কোথায় জানে না। বরং মানুষ যতই আত্মজ্ঞান লাভ করে, যতই বাহির ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করে, ততই বর্ত্তমান অপেক্ষা ভাবী জীবনের উপরে দৃষ্টি ও নির্ভর অধিক করিয়া থাকে। ইহ জীবনে মানবাত্মার অনন্ত বল বা অনন্ত আকাঙ্ক্ষার লেশ মাত্রও চরিতার্থ হয় না। প্রেমিক হও, প্রেম-স্পৃহা কেবলই বৃদ্ধি পাইবে। তাহাতেই গৌরাঙ্গ দেব নীলাচলে যাইয়া প্রেমের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সমুদ্র-তরঙ্গে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন। জ্ঞানী হও, জ্ঞানতৃষ্ণা কেবলই বৃদ্ধি পাইবে। পৃথিবীর জ্ঞানীদিগের যিনি পূজ্য, সেই নিউটন বলিয়াছিলেন, "হায়, আমি বালকের মত বেলাভূমে উপলখণ্ডই সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞান-সমুদ্র পুরোভোগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে!" বিশ বৎসর বা পঞ্চাশ বৎসরে মানুষের ইচ্ছার নিবৃত্তি, বালকের কথা। পুরাতন কালে গমন কর; ঐ দেখ দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষ, ক্ষুণ্ণমনে বসিয়া বলিতেছেন, "হায়, পৃথিবী যে ফুরাইয়া গেল, আর কি জয় করিব?" একটী মানবাত্মার মূল্য সমগ্র জড়-সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক। জড় ব্রহ্মাণ্ড যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ভাই, আমি থাকিবই থাকিব।

তৃতীয় প্রমাণ এই—আমার কর্ত্তব্য অনন্ত, আমার দায়ীত্ব অনন্ত। এই জীবনের বিশ বা পঞ্চাশ বৎসরে আমার কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। আমি অনেক সৎকার্য্য করিয়াও ফল পাই না, বা উৎপীড়িত হই। আমি রাশি রাশি কুকার্য্য করিয়াও অনাহত থাকি। এ জীবনেই যদি শেষ, মরিলেই যদি সকল ফুরাইল, তবে সংসারে ন্যায় থাকিল না। দেখ ভাই, পরকাল পরমেশ্বর না মান, ন্যায় নামে একটা পদার্থ আছে, মান তো? ন্যায় ছাড়া, সৃষ্টি কোন্ সুবুদ্ধি কল্পনা করিতে পারে? ভাব দেখি,—পরিশ্রমের পুরস্কার নাই, অনিয়মের ফলভোগ নাই। আঘাতের প্রতিঘাত নাই, অত্যাচারের প্রতিশোধ নাই, অথচ জগৎ আছে, জগৎ-কার্য্য চলিতেছে; এরূপ একটা সংসার, এমন একটা সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টি মানুষের ভাবনার অতীত। অনেক স্থলে জগৎ-কার্য্যের রহস্য ভেদ করিতে পারি না বটে, কিন্তু ভাই,

তুমি আমি বিশ্বাস করি,সকল মানুষই বিশ্বাস করে যে সংসার ন্যায়ে চালিত, জগতে ন্যায়ের রাজত্ব। সত্য সত্যই ভাই, এ সংসারের যিনি বিধাতা, তিনি পূর্ণ ন্যায়বান্। মরিলেই যদি সকল ফুরাইল, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গল বিধান পণ্ড হইয়া গেল। এও কি সম্ভব? তাই বলি ভাই, আমি মরিব আর উড়িয়া যাইব না।

তবে কি আমি মরিয়া স্বর্গে যাইব? কোথায় সেই স্বর্গ? অতিদূরে— মাথার উপরে, ঐ মেঘ, ঐ বায়ু, ঐ যে চন্দ্র সূর্য্য ও অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ দীপ্তি পাইতেছে, তাহার উপরে কি স্বর্গ? ছি ছি! বোকার মত কথা কহিতেছি। এত পড়িলাম, এত শুনিলাম, তথাপি কি শূন্যকে স্বর্গ মনে করিব? না, স্বর্গ মাথার উপরে নহে। ছেলে বেলার সেই স্বর্গ, সেই মন্দাকিনী, সেই পারিজাত-পুষ্প কোন দেশে নাই, উহা কেউ কখনও দেখে নাই, উহা কবির কল্পনাতে জন্মেছিল, কল্পনাতেই মিশে আছে। সে স্বর্গ আকাশ-কুসুম, সেরূপ স্বর্গ কখনও পাইব না।

হায়, তবে কি আমার স্বর্গে যাওয়া হবে না? বৃথা মানুষ হইয়াছিলাম, অনর্থক এই জীবনের ভার বহন করিতেছি। তবে কি আমার স্বর্গে যাওয়া হইবে না? হৃদয়, তুমি আশ্বস্ত হও, আমি স্বর্গে যাইব—স্বর্গ পাইব। কোথায় যাইব? পাঠশালা ছাড়িয়া চতুষ্পাটিতে যাইব, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে যাইব। এই স্থূল দেহ ও স্থূল সংসার ছাড়িয়া সূক্ষ্ম ও উন্নত লোকে যাইব। লোকে বলে সূক্ষ্ম শরীর—জ্যোতির্ম্ময় দেহ পাইব। তা যাই হউক আমি নিশ্চয়ই উন্নত লোকের অধিবাসী হইব।

আমি পাপী, আমার পাপরাশি সঙ্গে যাইবে, আমার কর্ম্ম ফল আমাকে ছাড়িবে না, তাহা জানি। কিন্তু পৃথিবীতে থাকিলে এখানকার নীচতর আশা—নিকৃষ্ট পাপে আমাকে ধরিত। সে লোকে তাহাতে আর আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। তবেইত ভাই,আমার পাপের নৌকা আর নূতন বোঝাই হইবে না। পুরাতন পাপ পাত্র অভাবে, পুরাতন আগুন ইন্ধন অভাবে নিবিয়া যাইবে; আমি ভব-যন্ত্রণা এড়াইব। আহা, আমার কি সৌভাগ্য আমি স্বর্গে যাইব! ধন্য পরমেশ্বর, আমি মহাপাপী হইয়াও স্বর্গে যাইব!!

চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ।

"চতুর্ভ্যঃ খলু ভুতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিম্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যোমদশক্তিবৎ ॥
অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্ম নচাপরঃ ॥
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকীতি।"

—চার্ব্বাক।

(ভূমি, বারি, অনল, অনিল এই) চারি প্রকার ভূতের সংযোগে চৈতন্য উপজাত হয়। যেমন কিম্বাদি দ্রব্য বিশেষের যোগে মদ প্রস্তুত হয়, কিন্তু পৃথগবস্থায় ইহাদের কাহারও মাদকগুণ নাই, সেইরূপ ভূমি বার্য্যাদি যদিও জড়, কিন্তু তাহাদের যোগে এমন দ্রব্যবিশেষ উৎপন্ন হইতে পারে, যাহার চৈতন্য আছে। আবার আমরা বলিয়া থাকি, "আমি স্থূল, "আমি কৃশ" ইহাতে স্থূলত্বের ও আমিত্বের সামানাধিকরণ্য বুঝায়; অর্থাৎ "যেই স্থূল সেই আমি"। স্থৌল্যাদি দেহেরই ধর্ম্ম; অতএব আমিত্বও দেহেরই ধর্ম্ম; দেহই আত্মা; এতদ্ভিন্ন আত্মা কিছু নাই। তবে যে বলি "আমার দেহ" এ কেবল কথা মাত্র।

সর্ব্ব প্রথমে আমাদের বক্তব্য এই যে, চার্ব্বাকের পক্ষে কিম্বাদির কার্য্য হইতে দেহের কার্য্য অনুমান করা শোভা পায় না। কারণ তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বয়ং অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেনঃ—

"তস্মাদবিনা ভাবস্য দুর্ব্বোধতয়া নানুমানস্যাবকাশঃ।"

অতীত অনাগত জানা যায় না, অতএব ব্যাপ্তি-জ্ঞান হয় না, তবে অনুমান কি করিয়া হইবে? অগ্নির দাহিকাশক্তি বর্ত্তমানে আছে, লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ছিল কি না কে জানে? কল্য থাকিবে কি না অথবা পরমুহূর্ত্তে থাকিবে কি না কে বলিতে পারে? আগুনে হাত দিলে পুড়িতে পারে, নাও পুড়িতে পারে; কাল পুড়িয়াছিল তাহাতে কি? এইরূপ অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া স্বয়ং কিম্বাদির অনুমানকে বড় মূল্যবান্ মনে করিতে পারেন না। তবে আমি স্থূল, আমি কৃশ এই বোধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। আমি বলিতে দুই প্রকার পদার্থ বুঝায় (১) দ্রব্য, (২)

তাহার উপাধি অথবা গুণকর্ম্ম। দ্রব্য আজীবন স্থায়ী, উপাধি সদা পরিবর্ত্তনশীল। প্রথমার্থে আমি পদে জ্ঞান ও ভাবের (এবং দেহ ও জ্ঞান ভাবেরই অন্তর্গত) আধার আত্মাকে অথবা জ্ঞাতাকে বুঝায়। এই অর্থে পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমিই আছি। শেষোক্ত অর্থে ভাবজ্ঞানের সমষ্টি অথবা বেদান্ত যাহাকে মনোময়কোষ বলে, তাহাকেই বুঝায়। আমরা যখন বলি আমি আর সে আমি নই, শেষের আমির অর্থ ভাবজ্ঞানের সমষ্টি অথবা মনোময়কোষ। আমার ভাবজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনেই হউক অথবা আংশিক পরিবর্ত্তনেই হউক, পূর্ব্বের সমষ্টি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি পদে কখনও বা নিরুপাধি নিত্য আত্মাকে বুঝায়, কখনও বা অনাত্মা পরিবর্ত্তনশীল উপাধি গুলিকে মাত্র লক্ষ্য করে, আর কখনও কখনও সোপাধিক আত্মাকেও বুঝায়। আমি স্থূল, আমি কৃশ এই সকল বাক্যে আমি পদে নিরুপাধি আমি দ্রব্যকে না বুঝাইয়া, আমি উপাধিকে অথবা সোপাধিক আমি দ্রব্যকেও বুঝাইতে পারে। যথা, আমি স্থূল হইয়াছি; অর্থাৎ আমি-পদবাচ্য উপাধি সমষ্টির মধ্যে অথবা আমি দ্রব্যের উপাধি সমষ্টিতে স্থূলত্বজ্ঞানরূপ নূতন উপাধির যোগ হইয়াছে। আমি কৃশ হইয়াছি, অর্থাৎ আমার মধ্য হইতে স্থূলত্বজ্ঞানরূপ উপাধি চলিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেই আমি দ্রব্য জড় কি না তাহার কিছুই বলা হইল না, এবং একথা দ্বারা দেহাত্মবাদের কোন প্রমাণ হইল না। এতদ্ভিন্ন স্বপ্নের সময়ে শরীর জ্ঞান থাকে না, অথচ আমার কার্য্য থাকে, আমরা এইরূপে আপনাদিগকে স্বপ্নকালে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ করি; অতএব শরীর আত্মা হইতে পারে না। আবার চৈতন্যের সহিত মাদকত্বের অথবা বর্ণ পরিবর্ত্তনের কি সাদৃশ্য আছে যে, ভৌতিক পদার্থের যোগে মাদকত্ব হয় বলিয়া চৈতন্যও ভৌতিক পদার্থের যোগেই হইবে। চৈতন্যে জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব একাধারে এক সময়ে উভয়ই সম্ভবে; কিন্তু মাদকত্বই বল আর যাহাই বল, অন্য কিছুতেই তাহা সম্ভবে না। অতএব তোমার হেতু সংপ্রতিপক্ষ হইল।

তাহা না হইলেও শরীরের যদি আত্মত্ব স্বীকারও করা যায়, তবে স্মৃতি কিরূপে সম্ভবে? শরীরের পরমাণু পরিবর্ত্তিত হয়, যে সকল পরমাণু আজীবন থাকিতে পারে—যথা কেশ, নখ অথবা অস্থি তাহাদের মধ্যে কোন চৈতন্য লক্ষিত হয় না, বৃদ্ধি মাত্র আছে, অথবা সে সকলই আমি আমাদের এরূপ

বোধ নাই। শরীরের যে সকল অংশে চৈতন্য আছে বলিয়া মনে করা যায়, তাহার প্রত্যেক পরমাণু পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে সকল স্থানে সাত বৎসর পূর্ব্বে যে পরমাণু ছিল আজ তাহা নাই। রাসায়নিক ক্রিয়াতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় মানিলেও এই মাত্রই সিদ্ধ হইল যে, যতক্ষণ যে পরমাণু সেই ক্রিয়ার অন্তর্গত থাকে ততক্ষণের ঘটনা সম্বন্ধেই সম্ভব, পূর্ব্বের অথবা পরের ঘটনা সম্বন্ধে তাহার কোনরূপ কার্য্য কি প্রকারে অনুমিত হইবে? অতীত অথবা অনাগত সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে? অনাগত সম্বন্ধে জানে, এমন মানুষ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং স্বপ্নাদিতে এমন কি জাগ্রত অবস্থায়ও অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্বন্ধে অনেক অদৃষ্ট,অশ্রুত অথবা অনাগত কথা জানা যায়,—পাঠক নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন অথবা বিশ্বস্ত আত্মীয়ের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। যাহা হউক অনাগতের কথা পরিত্যাগ করিলাম। সাত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পরমাণুতে আমি বোধ করিতাম, আজ সে সকল নাই। কিন্তু আমি সাত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা কিরূপে স্মরণ করিতে পারি? এই স্মরণ কার্য্য কাহার? তাহারই হইতে পারে, যে আজও আছে, সাত বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। কিন্তু দেহের আজকার চৈতন্য-যুক্ত পরমাণু সাত বৎসর পূর্ব্বে ছিল না। যে পরমাণু দেখে নাই, সে পরমাণু স্মরণ করিবে কিরূপে? যদি বল এক পরমাণু জ্ঞান তাহার স্থানবর্ত্তী অপর পরমাণুতে সংক্রামিত হয়, জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে? যদি জ্ঞান এক পরমাণু হইতে অপর পরমাণুতে যাইতে পারে, তবে জ্ঞান একটী পৃথক পদার্থ হইল, দেহ হইতে আত্মা পৃথক হইল। যদি বল জ্ঞান সেই দেহের স্থান বিশেষের গুণ, যেই সে স্থান অধিকার করে সেই তাহা লাভ করে, যেহেতু জ্ঞান নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না এবং পরমাণু সকল পরিবর্ত্তিত হয়, সেই পরিবর্ত্তনের সময় পূর্ব্ব-স্মৃতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? তাহা দেহ হইতে ভিন্ন, তাহাই আত্মা।

প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে? ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জনিত জ্ঞান। আমি দেখিতেছি আধক্রোশ দূরে একটী বৃক্ষ আছে, এস্থলে প্রত্যক্ষ অথবা ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞাত বস্তু কি? বাহিরের বৃক্ষ চক্ষু হইতে আধক্রোশ দূরে, অতএব বৃক্ষের সহিত চক্ষের সন্নিকর্ষ হয় নাই। বলিতে হইবে বৃক্ষ হইতে আলো আসিয়া আমার চক্ষে পড়িয়া আমার দর্শক স্নায়ুর মধ্যে বৃক্ষের ছবি অঙ্কিত করিয়াছে, সেই ছবিই প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই ছবি সম্বন্ধে কাহারও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। সে ছবি কত-বড় তাহা কেহ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া বলিতে

পারে না। বস্তুর সন্নিকর্ষ হইয়াও যদি সেই সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান না জন্মিল, তবে সেই বস্তু প্রত্যক্ষজ্ঞাত বলা যায় না। আবার প্রত্যক্ষজ্ঞান যদি সন্নি-কর্ষের প্রমাণ না হইল তবে বস্তু-সন্নিকর্ষ প্রমাণ অসম্ভব। আবার বস্তু থাকুক বা না থাকুক কোন photo দ্বারা দর্শক-স্নায়ুতে তাহার ছবি অঙ্কিত করিতে পারিলে বস্তুজ্ঞান জন্মে (Stereoscope). আবার বস্তুর ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ অথবা স্নায়বীয় ছবির ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইয়াও বস্তু-জ্ঞান হয় না, যাহাকে অমনোযোগ বলে। অতএব দর্শক-স্নায়ুর ছবিও প্রত্যক্ষ নয়। বলিতে হইবে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে বৃক্ষ এই জ্ঞানটী মাত্র আমার প্রত্যক্ষ; এবং সেই জ্ঞানের বিষয় অথবা জ্ঞেয় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরের বৃক্ষ আমার মনের বিবর্ত্ত মাত্র; জ্ঞান এবং জ্ঞেয় উভয়ই জ্ঞাতার মনের অবস্থা মাত্র। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে জ্ঞাতার অতিরিক্ত কোন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ শ্রবণাদি অপর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বলা যায় প্রকৃত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হয় না। সুতরাং সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার মনের অবস্থা-মাত্র। এখন মনে কর জগতে আমি একা আছি, এই যেন আমি কিছু দূরে একটী গরুর মূর্ত্তি দেখিলাম, কতক্ষণ পরে যেন চাহিয়া দেখিলাম, না একটী থাম মাত্র। এস্থলে উভয়ত্রই প্রত্যক্ষ অনুভব, গরুতেও যেমন থামেতেও তেমন। যখন গরু দেখিলাম তখনও মনে করিলাম আমার বাহিরে একটী গরু আছে। যখন থাম দেখিলাম তখনও মনে করিলাম আমার বাহিরে একটি থাম আছে। এখন পূর্ব্ব দৃষ্ট গরুর সম্বন্ধে যে মনের অবস্থা অতিরিক্ত বাস্তব কোন গরু ছিল, তাহা মনে করি না, তবে পশ্চাদ্দৃষ্ট থাম সম্বন্ধে মনের অব-স্থার অতিরিক্ত কোন থাম আছে মনে করিবার প্রয়োজন কি? উপলব্ধি সম্বন্ধে দুইই সমান, যতক্ষণ যাহার উপলব্ধি হইল, কিম্বা উপলব্ধির আশা রহিল ততক্ষণ উভয়কেই সত্য বলিয়া মনে করিলাম; যাহারই উপলব্ধি শেষ হইল তাহাকেই মিথ্যা বলিলাম। স্থায়ী উপলব্ধিই সত্য, ক্ষণিক উপলব্ধিই মিথ্যা, এই মাত্র প্রভেদ; কিন্তু উভয়ই উপলব্ধি, উপলব্ধির বিষয় উভয়তঃ সমান; একটী যদি মনের উপাধি হয় অন্যটীও আর কিছুই অনুমান করা যায় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় মনের অবস্থা মাত্র। যদি তদতিরিক্ত কোন বাহ্য বস্তু মানা যায়, সে কেবল অনুমান মাত্র। কিন্তু যদি ক্ষণিক দর্শনে সেইরূপ অনুমান করা প্রয়োজন না হইল, তবে স্থায়ী দর্শন সম্বন্ধে তাহা অনুমান করার প্রয়োজন কি? এখন মনে কর আমার পর আরেক

জন মানুষ সে স্থানে আসিল, সে যেন আমাকে দেখিল না। মনে কর সেও পূর্ব্বোক্ত স্থানে একটী থাম দেখিল। আমার পক্ষে যেমন হইল, তাহার পক্ষে থাম মনের উপাধি মাত্র হইতে বাধা কি? এখন মনে কর আমাদের দুজনে তখন দেখা হইল, এবং আলাপ দ্বারা জানিলাম আমরা উভয়েই তথায় থাম দেখিয়াছি। মনের উপাধি দুজনের এক হইতে বাধা কি? আমারও থাম মনের উপাধি ভিন্ন মনে করিবার অধিকার নাই, তাহারও নাই। আমরা দুজনে আলাপ করিয়া পরস্পরের উপলব্ধি জানিলাম বলিয়া কি সে অধিকার লাভ করিলাম? এবং প্রমাণিত হইল থাম মনের অবস্থা নয় একটী স্বতন্ত্র বস্তু? গরু দেখিয়াছিলাম বলিয়া গরু স্বতন্ত্র হইল না, থাম স্বতন্ত্র হইবে কেন? পৃথক উপলব্ধির সময় ছিল না, তবে মিলিত হইয়া হইবে কেন? দুজনের মিলিত জ্ঞানেও যদি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তু মন হইতে স্বতন্ত্র না হইল, তবে লক্ষ লোকের মিলিত জ্ঞানেও হইবে না। আবার এক একটী ইন্দ্রিয়ের পৃথক কার্য্য সম্বন্ধে যদি জ্ঞাতবস্তু জ্ঞাতার মন হইতে স্বতন্ত্র না হইল, তবে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মিলিত কার্য্য সম্বন্ধেও তাহাই হইবে। অন্যরূপ স্বতন্ত্র বস্তু মানিলে ইন্দ্রিয়াদির যেরূপ কার্য্য হয়, না মানিলেও দেখি সেইরূপ কার্য্য হয়, তবে স্বতন্ত্র বস্তু অনুমান করি কেন? অতএব সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিতে গেলে, ভূমিবার্য্যনিলানল ভূত চতুষ্টয়ের অস্তিত্বই জ্ঞাতার মনের অবস্থা অথবা গুণ-ক্রিয়া-বিশেষ হইল, জ্ঞাতা আবার তবে কি করিয়া তাহাদের গুণ-বিশেষ হইবে? তবে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যদি গৃহাদি দৃশ্য বস্তু দর্শকের মনে উপাধি মাত্র হয়, তবে আমি যখন বেড়াইতে যাই তখন যদি আমার ঘরে দেখিবার কেহ না থাকে, তখন কি আমার গৃহ নাই? গৃহ অর্থই দর্শন ব্যাপারের বিষয়ীভূত দ্রব্য বিশেষ। যেখানে দর্শন ব্যাপার, সেখানে মাত্রই গৃহ থাকিতে পারে, যেখানে দর্শক সেখানেই মাত্র দর্শন কার্য্য থাকিতে পারে; অতএব দর্শকের অভাবে গৃহ আকাশ-কুসুমের সুগন্ধির ন্যায় বিরুদ্ধ কথা। কিন্তু পূর্ব্ব দর্শন আমরা স্মরণ করি বলিয়াও যতক্ষণ গৃহের অভাবের কথা না জানিয়াছি; ততক্ষণ কেহ দেখুক আর না দেখুক, গৃহ আছে এই আমাদের মনের ধারণা; কিন্তু সেই ধারণার সঙ্গে গৃহের থাকা না থাকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। হয়ত গৃহ আগুনে পুড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে, তবু আমার হয়ত মনের ধারণা গৃহ আছে। এইরূপে আমরা যখন বলিব গৃহ আছে ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, যে দর্শকই সেই স্থানে যায়, সেই গৃহ প্রত্যক্ষ করে; এবং

বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে করিবে। গৃহের সত্তাই আমার প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছে ও হইতেছে, অভাব প্রত্যক্ষ হয় নাই। প্রত্যক্ষ যাহা না হইয়াছে তাহা ধারণাও করিতে পারি না। সেই স্থানে আসিয়া আমার সেই গৃহের অভাব কখন প্রত্যক্ষ হয় নাই, অতএব তাহার অভাব ধারণা করিতে পারি না। ইহারই নাম কেহ দেখুক না দেখুক গৃহ থাকে। (ক্রমশঃ)

আশা ও বিশ্বাস।

এক দিন দেবর্ষি নারদ ভগবদ্দর্শন বাসনায় বৈকুণ্ঠ ধামে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক জন যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এক অতি বিশাল প্রাচীন বট-বৃক্ষমূলে যোগীবর ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত আছেন। সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে তাঁহার তপস্যার কোন পরিবর্ত্তন নাই। শীতে অনাবৃত দেহে, নিদাঘে অগ্নিরাশির মধ্যে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, সাভিমান ব্রতানুষ্ঠান ও অপূর্ব্ব সাধন-শক্তি দেখিয়া দেবর্ষির মনে বড় আহ্লাদ জন্মিল। তিনি সসম্ভ্রমে যোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বৈকুণ্ঠে যাইতেছেন শুনিয়া যোগীবর বলিলেন, "আপনি বৈকুণ্ঠে যাইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি আর কত দিন এরূপ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিব; কবে আমার ব্রত সফল হইবে; আর কত দিন পর ভগবানের দর্শন পাইব।" নারদ সম্মত হইয়া যোগীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিছুদূর যাইয়া নারদ দেখিতে পাইলেন, এক অতি মলিন-বেশা, অনাথা স্ত্রীলোক পথ-পার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। তাহার যৌবন পাপের সেবায় জর্জ্জরিত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে; জীবনের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, যাহা কিছু শক্তি এবং যাহা কিছু অবলম্বন ছিল, পাপের কঠোর আঘাতে তাহার সকল গুলিই একে একে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহার নিকট পাপের ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, নরকের কঠোর অগ্নি তাহাকে জীবন্তে দগ্ধ করিতেছে। যাহারা তাহার পাপের সহায় ছিল, আজি এ অনাথাকে অকূলে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অতীতের স্মৃতি তাহাকে পুড়িতেছে, ভবিষ্যতের আশা-শূন্য ছায়া-শূন্য অনন্ত অন্ধকার তাহাকে গ্রাস

করিতে আসিতেছে। সে এক এক বার চীৎকার করিয়া সেই অনাথের নাথ পাপীর বন্ধু ভবকাণ্ডারীকে ডাকিতে চাহিতেছে, আবার সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে তাহার রসনা কম্পিত হইতেছে। এই ঘোর অনুতাপের সময় সেই স্ত্রীলোক দেবর্ষির দেখা পাইল। দূর হইতে গলবস্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাঁহার পদস্পর্শ করিতে সাহস পাইল না। নারদের বৈকুণ্ঠ যাত্রার কথা শুনিয়া পতিতা রমণী ছল ছল চক্ষে কহিল, "ঠাকুর, এই অভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার মত পাপীরও কি পরিত্রাণ হয়?"

নারদ বৈকুণ্ঠে প্রভুর দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেই যোগী ও পতিতা রমণীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারায়ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, সেই সাধুকে বলিও, সে যে বৃক্ষ তলে বসিয়া তপস্যা করিতেছে, সেই বৃক্ষে যত গুলি পত্র আছে, তত সহস্র বৎসর পর তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা। আর পতিতা রমণীকে বলিও, তাহার পরিত্রাণের বড় বিলম্ব নাই, অতি শীঘ্র সে বৈকুণ্ঠ-ধামে স্থান পাইবে।

মহর্ষির মনে বড় গণ্ডগোল বাঁধিল। প্রভুর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া করযোড়ে বলিলেন, ভগবন্, আমিত ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিলাম না। সেই সাধুর প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ কেন হইল? পতিতা রমণীই বা কোন্ পুণ্যফলে এরূপ দয়ার উপযুক্তা হইল? ঠাকুর, তুমি বড় নিষ্ঠুর।

নারায়ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, তাহাদের নিকট যাইয়া আমার আদেশ জানাও, তখন সকলই বুঝিতে পারিবে।

দেবর্ষি পৃথিবীতে আসিয়া প্রথমেই যোগীর নিকট যাইলেন। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহাকে ভগবানের আদেশ জানাইলেন। যোগী শুনিয়া অট্ট হাস্য করিয়া উঠিল এবং বলিল, "তুমি ঠাকুর, বৈকুণ্ঠে যাইতে পার নাই, প্রভুর দেখাও পাও নাই। শাস্ত্রানুসারে আমার তপঃসিদ্ধির সময় প্রায় উপস্থিত হইয়াছে, আর তুমি বলিতেছ আরও অনন্তকাল পরে আমার সিদ্ধি লাভ হইবে। ভাল, তুমিতো বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলে, বল দেখি সেখানে কি দেখিয়াছ?" নারদ বলিলেন, তথায় দেখিলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দিগ্‌গজ্ সমূহ সূচীরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। যোগী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "তবেই হয়েছে; সূচীরন্ধ্রে হস্তীর প্রবেশও যেমন সম্ভব, তোমার বৈকুণ্ঠ দর্শনও সেইরূপ বটে!"

নারদ অবিশ্বাসীর কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুরের আদেশ নিষ্ঠুর নহে। তার পর পতিতা রমণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া করপুটে দাঁড়াইয়া রহিল; ঠাকুর কি বলিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। নারদ কহিলেন "ভদ্রে ঠাকুর বলিয়াছেন, তোমার পরিত্রাণের আর বিলম্ব নাই। ত্বরায় তোমার বৈকণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে।" রমণী অশ্রুসিক্ত হইয়া কহিল, "আহা প্রভো, তাও কি হইতে পারে? আমার কি আর পরিত্রাণ আছে? হায়, আমার যে পাপের গণনা নাই! "শীঘ্র হইবে" কি বলিতেছেন প্রভো, আমার মত মহাপাতকীরও পরিত্রাণ হয়, যদি তাঁহার শ্রীমুখের এই বাণী একবার শুনিতে পাই, তবেই আমি আশা করিয়া অনন্ত কাল তাঁহার দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিব।"—বলিতে বলিতে রমণী শোকে ও হর্ষে অভিভূত হইয়া পড়িল; তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। দেবর্ষি প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। রমণী ভক্তের পদ-রেণু মস্তকে লইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

তখন সেখানে বড় অপূর্ব্ব শোভা হইল। পাপীর অনুতাপাশ্রুর সহিত ভক্তের প্রেমাশ্রু মিশিয়া দগ্ধ পৃথিবীর বক্ষঃ শীতল করিল। ভক্তমুখের হরিধ্বনি পাপীর কণ্ঠের ক্রন্দন ধ্বনিতে মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠে যথায় শ্রীহরি ভক্ত দলে বিহার করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। বায়ু সেই শুভ সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিল। আর পৃথিবী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইল।

ভক্তির উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইলে রমণী বলিল "ঠাকুর, আপনি এমন স্থানে গিয়াছিলেন, বলুন দেখি তথায় কি দেখিলেন?" নারদ বলিলেন, তথায় দেখিলাম, সূচীর ছিদ্র দিয়া বড় বড় হাতী যাতায়াত করিতেছে। রমণী গদ গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "হাঁ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ আর কত বড় কথা? তাঁহার ইচ্ছা হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সূচীর ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারে, হাতী আর কোন্ ছার!" নারদ রমণীর আশা ও বিশ্বাস দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

এতক্ষণে দেবর্ষি বুঝিতে পারিলেন, দয়াল হরি নিষ্ঠুর নহেন। তাঁহার পাপী উদ্ধারের প্রণালী অতি অপূর্ব্ব! সেই শুভ দিনে শুভযোগে ভক্তের মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে পতিতা রমণী নবজীবন লাভ করিল।

চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম।

হিন্দু ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতি যে ধর্ম্মের বিভাগ, তাহা ঐতিহাসিক বিভাগ মাত্র। এ প্রবন্ধে সে প্রকার বিভাগ বা ধর্ম্ম-মত আমাদের আলোচ্য নহে। ধর্ম্ম শব্দ হিন্দু শাস্ত্রে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—পরমধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, বর্ণ-ধর্ম্ম বা ব্যবসা সম্বন্ধীয় নিয়ম, জাতীয় শাসনবিধি, সামাজিক নিয়ম, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম ইত্যাদি। কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতির বিধি গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে এই সকল ধর্ম্ম-শ্রেণীতে উক্ত বিধি রাশির সন্নিবেশ হইবে। এ প্রবন্ধে এ সমস্ত ধর্ম্মও আমার আলোচনার বিষয় নহে। আমি ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক (Scientific) বিভাগ করিতে চাই। আপাততঃ সেই বিভাগ আমি চারি প্রকার করিব; যথা—(১) পরম ধর্ম্ম, (২) জাতীয় ধর্ম্ম, (৩) উপধর্ম্ম, এবং (৪) সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। (ধর্ম্মাভাসকে আমি ধর্ম্মের বিভাগের মধ্যে গণ্য করিব না, যেহেতু তাহা ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মের আভাস মাত্র বা অসত্য ধর্ম্ম; যদিচ ধর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণে তাহার জ্ঞানও আবশ্যক। মিশ্র সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মও ধর্ম্মের একটি বৈজ্ঞানিক ভাগ হইতে পারে; কিন্তু আপাততঃ ইহাকে আমি ছাড়িয়া দিতেছি, শেষে ইহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিব)। ধর্ম্ম লইয়া যখন এত বাদ বিসম্বাদ পৃথিবীতে চলিতেছে, তখন তাহার বৈজ্ঞানিক স্বরূপ নিরূপণ করিলে তাহার মীমাংসা বিষয়ে অনেক সুবিধা হয়; এই জন্যই এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। অতএব প্রথমতঃ উক্ত চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ বর্ণন করিব; পরে তাহার প্রয়োগ দেখাইব।

পরম ধর্ম্ম। সংসারে যত প্রকার ধর্ম্ম-মত (religion) প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যে অংশ সাধারণ, অথবা মনুষ্যের যাহা প্রকৃত বা সহজ ধর্ম্ম, যাহা দেশ কাল পাত্র বা বর্ণ ও জাতিভেদে কোন রূপ পরিবর্ত্তিত হয় না, যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত নিত্য সত্য তাহাই পরমধর্ম্ম নামে খ্যাত। হিন্দু শাস্ত্রের অনেক স্থলে এই পরম ধর্ম্মের বর্ণন আছে; যথা—

> "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো, নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
> বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং"
>
> (শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে)

"পরম ধর্ম্মে কৈতব বা কপটতা (policy) নাই। যাঁহারা নির্ম্মৎসর—সজ্জন, তাঁহাদিগেরই এ ধর্ম্ম। ইহাতে বাস্তব কল্যাণপ্রদ বস্তু জানা যায়, যাহাতে

আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপের উন্মূলন হয়।" পরম ধর্ম্মের নামান্তর সদ্ধর্ম্ম বা (আধুনিক নাম) ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দু শাস্ত্রে সদ্ধর্ম্মের এ প্রকার প্রশংসা আছে।

"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতোবানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপিহি।"

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১২শ স্কন্ধে)

"সদ্ধর্ম্মের শ্রবণ, পঠন, চিন্তন, আদর, বা অনুমোদন করিলে মনুষ্য (যে পূর্ব্বে দেবতা বা বিশ্বের দ্রোহী ছিল সেও) পবিত্র হয়।" পরম ধর্ম্ম যে মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, পুস্তক বা মনুষ্য বিশেষের নহে। ইহা নূতন মত নহে। প্রাচীনেরাও ইহা জানিতেন। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে:—

"স্বভাব বিহিতো ধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে"। "স্বভাবের দ্বারা বিহিত যে ধর্ম্ম, তাহা পরম শান্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত কে না ভালবাসে?"

ধর্ম্ম-বৃত্তি মনুষ্যের মধ্যে স্বাভাবিক, ইহা এখনকার সকল দার্শনিকেরাই স্বীকার করেন। সেই বৃত্তির পূর্ণ ও ঠিক বিকাশের দ্বারাই পরম ধর্ম্মের সত্য সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে ভাবেন যে, যত প্রকার ধর্ম্ম মত আছে, সকলই মনুষ্যের কল্পনা। আজি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত ও সম্মানিত, কালি তাহা কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে; অতএব ধর্ম্মের কোন স্থিরতা নাই; ইহার সত্য নিশ্চিত দর্শনের (Positive Philosophy) অন্তর্গত নহে। কিন্তু এ ভাব ভ্রান্তিমূলক, ধর্ম্মের সত্য সকল ঠিক জড়-বিজ্ঞানের সত্যের মত নিশ্চিত ও ধ্রুব। জড়-বিজ্ঞানের সত্যরাশি যেমন একে একে বিশেষ প্রতিভাশালী মনুষ্যদিগের দ্বারা ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইয়া জন সাধারণের সম্পত্তি হয়; সেইরূপ ধর্ম্মের সত্য সকল ঈশ্বর কৃপায় মহাত্মাদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া জনসাধারণের সম্পত্তি হয়। প্রাকৃতিক সত্য সমূহ সঞ্চিত ও সংগৃহীত হইলে যেমন জড়-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ ধর্ম্মের সত্য সকল সঞ্চিত ও সংগৃহীত হইলে ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উৎপত্তির এখন উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। এখন বিভিন্ন ধর্ম্মমত লইয়া পরস্পর বিবাদ না করিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞানের রচনা ও আলোচনাতে বিবেচক, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী মাত্রেরই যোগ দেওয়া উচিত। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সংরচিত হইলে এবং তাহার উপর সাধারণের আস্থা জন্মিলে, ধর্ম্মের নামে যত বিরোধ ও অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা শেষ হইয়া যাইবে।

পরম ধর্ম্মের আবিষ্কৃত সত্য সকল পরিগণন করা এস্থলে আমার উদ্দেশ্য

নহে। যদি কখনও ধর্ম্ম-বিজ্ঞান রচিত হয়, তখন তাহা প্রয়োজন মতে সংগৃহীত হইবে। তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত দিবার আপাততঃ প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসিদ্ধ মূল সত্য সকল, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ ও উপনিষৎসার-গ্রন্থে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের আবিষ্কৃত সত্য—যাহা উপনিষদ্ ও স্মৃতি প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, এবং শ্লোক সংগ্রহ, Precepts of Jesus, Conway's Sacred Anthology প্রভৃতি গ্রন্থে সকল জাতীয় মহাত্মাদিগের আবিষ্কৃত যে ধর্ম্ম-সত্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা—পরম ধর্ম্মের সত্য। ঐ সকল সত্য কাহার দ্বারা, কোন্ সময়ে, কি প্রকারে আবিষ্কৃত হইয়া প্রচলিত হইল, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ এবং তন্মধ্য হইতে কি কি সাধারণ ধর্ম্ম-নিয়ম উদ্ভূত হইতে পারে, এ সকল ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের বিষয়। তাহার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।*

জাতীয় ধর্ম্ম। পরম ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার আবিষ্কর্ত্তা বা প্রচারক-দিগের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের, অথবা সামাজিক রীতি নীতির যোগ হইলে তাহা জাতীয় ধর্ম্ম হয়। পরম-ধর্ম্ম এক, জাতীয় ধর্ম্ম অনেক। জাতীয় ধর্ম্মের একটি দৃষ্টান্ত পাঠক বিগত আষাঢ় মাসের "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকাতে "আর্য্যধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন। উচ্চ ইয়ুনিটারিয়ান দিগের ধর্ম্ম আর একটি জাতীয় ধর্ম্ম। গুরুনানকের শিক ধর্ম্ম, সয়্যদ অহমদের "নেচরী" নামক মুসলমান ধর্ম্ম জাতীয় ধর্ম্ম। জাতীয় ধর্ম্মের সহিত বক্ষ্যমান উপধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা দার্শনিক মত বিশেষের যোগ হইলে, তাহা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ জাতীয় ধর্ম্ম পরমধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে; সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কিয়দংশ পরমধর্ম্মের বিরুদ্ধ হইতে পারে।

উপধর্ম্ম। যাহা সাক্ষাৎরূপে পরমধর্ম্ম নহে, কিন্তু পরমধর্ম্মের উপকারী বা তাহার সমীপবর্ত্তী, বা ধর্ম্মাভাস মাত্র তাহা উপধর্ম্ম। উপধর্ম্ম দুই প্রকার (১) পরম ধর্ম্মের সহায়ক, (২) পরম ধর্ম্মের বিরোধী। স্নান, হোম, জপ, পাঠ, তীর্থযাত্রা, উপবাস, বলিদান, প্রতিমাপূজা; যজ্ঞোপবীত, কেশ, তুলসী বা রুদ্রাক্ষমালা ধারণ; ত্বকচ্ছেদ, রূপক রক্ত মাংস পান প্রভৃতি উপধর্ম্ম। ধর্ম্মের সঙ্গে দার্শনিক মত (Theories and hypotheses) বিশেষের

* পরম ধর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব জানিতে চাহিলে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকৃত "ধর্ম্ম কি?" পুস্তিকা দেখ।

যোগ, যথা—পুনর্জ্জন্ম, অনন্ত নরক, ভৌতিক স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, গোলোক প্রভৃতি, যমরাজের বিচার বা খৃষ্টের অন্তিম বিচার প্রভৃতি মতও এক প্রকার উপ ধর্ম্ম। উপধর্ম্ম অনেক এবং সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন। কোন্ উপধর্ম্ম ধর্ম্মের সহায়, কোন্‌টা বা তাহার বিরোধী, সেই বিচার এখানে করিব না। তাহাও ধর্ম্ম বিজ্ঞানের বিষয়।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জাতীয় ধর্ম্মের সহিত উপধর্ম্মের যোগ হইলে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম পৃথিবীতে এত অধিক যে তাহার গণনা করাও কঠিন। এক একটি প্রধান ধর্ম্ম মত শত সহস্র সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী, জরদস্তী, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মমত এক একটি ধর্ম্ম-বৃক্ষ স্বরূপ। নানা সাম্প্রদায়িক মত এই সকল ধর্ম্ম-বৃক্ষের শাখা। পরমধর্ম্ম, রস বা প্রাণ স্বরূপ।

কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে ধর্ম্মের কোন সত্যই সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, অতএব পরম ধর্ম্মের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। কেহ কেহ যখন সকল ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরকেই অস্বীকার করিতেছেন; পরকাল, আত্মার অমরত্ব, পাপ পুণ্যের অস্তিত্বে সন্দিহান, তখন কোন ধর্ম্মই বিশ্বজনীন হইতে পারে না। যাঁহারা এরূপ আপত্তি করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের বিশেষণ "সর্ব্ববাদী সম্মত" শব্দের তাৎপর্য্য বোঝেন না। পৃথিবী যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা এখন একটী সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য, অথচ লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে এমন আছেন, যাঁহারা এ সত্যে বিশ্বাস করেন না; কিন্তু যাঁহারা গণিতবিদ্যায় যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এখন উক্ত সত্যে অবিশ্বাস করেন না। এস্থলে শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের সম্মতিকেই সর্ব্ববাদী সম্মতি বলা হয়। এই প্রকার ধর্ম্ম বিষয়েও তাঁহাদিগের মতই গ্রাহ্য, যাঁহারা ধর্ম্মের যথোচিত সাধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা কৃতবিদ্য ও বিবেচক। যাঁহারা ঈশ্বরে এবং ধর্ম্মে অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা জড়-বিজ্ঞানবিৎ দার্শনিক এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিশিষ্ট পণ্ডিত হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা যোগ, ভক্তি ও ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি ধর্ম্মের মুখ্য সাধন করেন নাই বলিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের মত প্রামাণ্য হইতে পারে না। যে সকল পৌত্তলিক পণ্ডিতেরা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন নাই, তাঁহারা যদি উক্ত প্রকার উপাসনার সম্ভাবনা অস্বীকার

করেন, অপর দিকে যাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা করিয়া তাহার সারবত্তা বুঝিয়াছেন তাঁহারা যদি সকলে উক্ত প্রকার উপাসনার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা স্বীকার করেন, তবে শেষোক্ত সজ্জনদিগের মতই এ বিষয়ে সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়া গৃহীত হইবে। অতএব পরম ধর্ম্মের সত্যে যে, সকল ধার্ম্মিক দিগের একতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে:——

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং।"

"হে অর্জ্জুন, ইহলোকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সকলের এক। কিন্তু যাঁহাদিগের নিশ্চয় হয় নাই, তাঁহাদিগের বুদ্ধির অনন্ত শাখা।"

ধর্ম্মের প্রমাণ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন:—

"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং।"

এই বাক্যের ভাবার্থ গ্রহণ করিলে 'শ্রুতির' অর্থ আদেশ, যাহা আত্মা শ্রবণ করে; 'স্মৃতি' উক্ত আদেশের স্মরণ; 'সদাচার' ধার্ম্মিক সজ্জনদিগের আচরণ; 'স্বীয় আত্মার প্রিয়' অর্থাৎ যাহাতে আত্মা (Conscience) সায় দেয়; 'সম্যক্ সঙ্কল্পোৎপন্নকামনা' অর্থাৎ ধর্ম্মবৃত্তিসম্ভূত বাসনা, এই পাঁচটি ধর্ম্মের মূল; অর্থাৎ ইহাদিগের দ্বারা পরমধর্ম্ম জানা যায়। ধর্ম্মাদেশ শ্রবণ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে, এই জন্য এ রহস্য সংক্ষেপে কিছু বলিব।

ঈশ্বরভক্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া যখন আত্মাকে তাঁহাতে সমাহিত করেন, অর্থাৎ চিত্তকে নানা বিষয়ের চিন্তা হইতে ধারণা দ্বারা নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থির করেন, তখন সমাধি হয়। সেই সমাধি-অবস্থায় যখন ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা হয়, তখন জ্ঞেয় সত্য কখনও চিন্তারূপে কখনও দর্শন বা শ্রবণরূপে আত্মাতে প্রস্ফুরিত হয়। (এ প্রকার উপলব্ধি লেখক নিজ জীবনে করিয়াছে, এই জন্য ইহার সাক্ষ্য দিতেছে)। ইহাই আদেশ, ইহাই শ্রুতি। এরূপ আদেশ স্বীয় Subjective চিন্তা বা বিচারের ফল নহে। ইহা অন্তরস্থ অন্য কাহারও objective আদেশ। পরে সমাধি হইতে উত্থান করিলে উহা স্মরণ ও বিচারের বিষয় হয়। এই রহস্য নিজ সাধনের দ্বারা যাঁহারা অবগত না হইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। 'নব বিধানী' ভ্রাতাদিগের নিকট অনেকবার শুনিয়াছি যে, Conscience এর (বিবেকের)

উত্তর এবং আদেশ একই ; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। বিবেকের উত্তর সকল মনুষ্যই পাইতে পারে ; কিন্তু শ্রুতি বা আদেশ যোগী বা ভক্ত উপাসক বা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে পায় না। আমার পাঠক দিগের মধ্যে অনেকে হয়ত এ কথায় উপহাস করিবেন। তাহা করুন, আমি যাহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিতে ভয় করিব না। আবার ইহাও দেখিতেছি যে, এখন অনেকে স্ব স্ব মানসিক কল্পনাকে 'প্রত্যাদেশ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন, কথায় কথায় তাঁহাদের আদেশ হয় ; অথচ এক জনের আদেশের সহিত অন্যের আদেশের বিরোধ হয়। অতএব কেহ আদেশ বলিলেই যে তাহাকে আদেশ মানিতে হইবে, তাহা নহে। আকাশের নির্ম্মল জল পৃথিবীতে পতিত হইয়া তাহার ধূলির বর্ণনানুসারে যেমন নানা বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ আদেশও মনুষ্যের কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া বিকৃত হয়। আদেশকে কল্পনা হইতে পৃথক করা বড় কঠিন। এইজন্য বোধ করি মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জনের কথিত আদেশ যদি আর সকল "প্রেরিত দিগের" আদেশের বিরুদ্ধ হয়, তবে প্রথমোক্ত অগ্রাহ্য হইয়া শেষোক্ত গ্রাহ্য হইবে। ইহার হেতু এই যে, প্রকৃত আদেশের—যত আধারেই হউক না কেন—পরস্পর মিল হইবে ; কিন্তু কল্পিত আদেশের মিল হইবে না,—যেমন জাগ্রত অবস্থার সত্য দৃশ্যকে সকলে একরূপই অনুভব করে ; কিন্তু স্বপ্নাবস্থার কল্পিত দৃশ্য প্রত্যেক দ্রষ্টার ভিন্ন ভিন্ন। এই তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জরের" মান্য সম্পাদক কেশব চন্দ্রের উক্ত নিয়মকে দূষিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্ত নিয়ম অবলম্বন ভিন্ন শ্রুতির (Inspiration) সত্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই শ্রুতি বা দৈবপ্রকাশ স্বীকার করেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়। সে বিরোধের স্পষ্ট কারণ শ্রুতির সহিত কল্পনার যোগ। কল্পনাকে ছাড়িয়া দিয়া যে অংশে সকল মহাত্মাদিগের পরস্পর মিল আছে, তাহাকেই শ্রুতি কিম্বা বিবেকনিষ্পন্নসত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহাই বেদ, তাহাই পরম-ধর্ম্মের সত্য।

উপধর্ম্মের স্বতন্ত্র সত্বা নাই। তাহা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিত যুক্ত হইয়াই থাকে। পৃথিবীতে অবিশ্বাসী নাস্তিক ছাড়া অধিকাংশ মনুষ্যই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী। অল্প মনুষ্য বিশুদ্ধ জাতীয় ধর্ম্মাবলম্বী। তদপেক্ষাও

অল্প মনুষ্য পরম-ধর্ম্মাবলম্বী। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে যদি তাহাদিগের উপধর্ম্মের ভাগ বুঝাইয়া পৃথক করিয়া দেওয়াযাইতে পারে, তবে তাহাদের জাতীয়ধর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আবার তন্মধ্য হইতেও যদি জাতীয় অংশকে পৃথক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তবে পরম-ধর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে। কেবল জাতীয় অংশ এবং উপকারী উপধর্ম্ম যুক্ত থাকিলে ধর্ম্মের ক্ষতি হয় না; কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, উক্ত প্রকার জাতীয় ধর্ম্মের অনিত্য ভাগকে যেন নিত্য ভাগের সমকক্ষ না করা হয়, নতুবা তদ্দ্বারাই সাম্প্রদায়িক ভাবের নিবেশ হইয়া ধর্ম্ম কলুষিত হইয়া মনুষ্যমণ্ডলীর পরস্পর বিরোধের সূত্রপাত হইবে। আবার ইহাও যথার্থ যে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে একেবারে পরম-ধর্ম্মে আনা কঠিন। বিরোধী উপধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জাতীয় ভাবের সহিত মিশ্রিত পরম ধর্ম্ম তাহাদিগকে দিলে, অনেকে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়। পরে ক্রমশঃ পরম ধর্ম্মের সারত্ব এবং জাতীয় ভাবের অসারত্ব তাহারা বুঝিতে পারে। হিন্দুর পক্ষে আর্য্য-সমাজী বা আর্য্যধর্ম্মী হওয়া যত সহজ, ব্রাহ্ম হওয়া তত সহজ নহে; খৃষ্টানের পক্ষে ইয়ুনিটারিয়ান হওয়া যত সহজ, থীইষ্ট হওয়া তত সহজ নহে। কিন্তু উন্নত আর্য্যধর্ম্মী, উন্নত ইয়ুনিটারিয়ান, উন্নত শিক প্রভৃতির পরস্পর মিল হইতে পারে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধদিগের মধ্যে তত্তজ্জাতীয় ভাবে পরমধর্ম্ম প্রচার করিলে অনেকে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। পরে জাতীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা বিশুদ্ধ ও সার্ব্বভৌমিক পরমধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে। পরম ধর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, যে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মধ্যে এক, এবং তদ্দ্বারাই যে সকল ধর্ম্মের মিল হইতে পারে, ইহা আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের বা নববিধানসমাজের প্রথম আবিষ্ক্রিয়া নহে, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ এ তত্ত্ব প্রাচীন কালেও জানিতেন। তবে নববিধানে যে এক প্রকার মিশ্র সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম করা হইয়াছে,—যাহাতে কয়েকটি ধর্ম্ম মতের কোন কোন উপধর্ম্মকে একত্র করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, ইহা এক প্রকার নূতন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সৃষ্টি। এখন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বৃদ্ধি দ্বারা জনসমাজের বড় লাভ নাই; বরং রাসায়নিক যেমন মিশ্র দ্রব্যের বিন্যাস করিয়া তদুপাদান রসায়নিক তত্ত্ব গুলিকে পৃথক পৃথক করতঃ জড়বিজ্ঞানের উন্নতি করেন, সেইরূপ তত্ত্বদর্শীর উচিত যে, সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপধর্ম্মাদি অংশকে পৃথক পৃথক করিয়া পরম-ধর্ম্মে তাঁহাদের

একতা সম্পাদন করতঃ ধর্ম্মবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন ও বিশুদ্ধ পরমধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত জাতিতে প্রচার করেন। শ্রীনবীনচন্দ্র রায়, লাহোর।

সমাজের মহাবিপদ।

সভ্যতার আলোকের মধ্যে অঙ্গ ঢাকিয়া পাপের দুই যমজ সহোদরা ক্রমে দেশ যুড়িয়া বসিবার উপক্রম করিয়াছে। সর্ব্বত্রই ইহাদিগের জয়পতাকা উড্ডীন দেখা যায়, বিশেষতঃ নগরে,—নগর সকলের মধ্যে আবার মহানগর ইহাদিগের রাজধানী ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় দান স্থল। যুগল সহোদরার একটীর নাম সুরা ও অপরটীর নাম বেশ্যা। ইহাদিগের উভয়েরই উন্মাদিনী শক্তি অর্থাৎ নেসা আছে এবং উভয়ের নেসাতেই সমান অনিষ্ট উৎপাদন করিয়াছে। উভয় রাক্ষসীই কত পরিবারকে ধ্বংস করিয়াছে, দেশের কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনাঢ্য ও খ্যাতনামা সন্তানকে গ্রাস করিয়া আপনাদিগের উদর স্ফীত করিয়া বসিয়াছে, কত উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিকে নিষ্কর্ম্মা ও নিঃস্ব, কত স্বাধ্বী স্ত্রীলোককে স্বামী সত্বে বিধবা ও কত সুকুমার সন্তানকে পিতৃবিদ্যমানে অনাথ করিয়াছে! ইহাদিগের প্রভাবে কত পবিত্র তীর্থস্থান ভীষণ নরকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কত অপবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া দেশের শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সুরা বিদেশিনী বলিয়া হউক বা অধিক সরলা ও ব্যাপিকা বলিয়াই হউক, তাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাহার পরাক্রম খর্ব্ব করিবার জন্য রণসভা ও সেনাদল প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু অপর মায়াবিনীর মায়াজাল অদৃশ্য; সুতরাং দুর্ভেদ্য। তদ্দ্বারা অধিক সংখ্যক লোক বন্দীকৃত ও অজ্ঞাতসারে পাপের রাজ্যে আকৃষ্ট হইতেছে; অতএব তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টিপাত না হওয়াতে তাহার দমনের কোন উপায় অবলম্বিত হইতেছে না, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে?

আমরা নিম্নে যাহা লিখিতেছি, তাহাতে শেষোক্ত পাপপিশাচীর মহানগরী ও মহাতীর্থ কলিকাতাই আমাদিগের বিশেষ লক্ষ্য-স্থল। কিন্তু অন্যান্য সহর ও তীর্থ সম্বন্ধেও ইহা অন্নাধিক পরিমাণে খাটিতে পারিবে, আশা করা যায়।

জন সংখ্যার তালিকানুসারে বেশ্যাদল কলিকাতার কত অংশ ভূমি অধিকার করিয়া আছে, তাহা আমরা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারি না পারি; কিন্তু

তাহা যে নিতান্ত অল্প নহে, ইহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। সহ-রের বড় রাস্তা, ছোট রাস্তা, গলি ঘুঁজি যে খানে যাইবে, প্রত্যেক পল্লীতে গৃহস্থের বাটী সকলের মধ্যে মধ্যে বেশ্যালয়ের অধিষ্ঠান দেখিবে; ধর্ম্মমন্দির বিদ্যামন্দির, ছাত্রাবাস প্রভৃতির চতুপার্শ্বেও ইহার অধিকার। রাত্রিকালে এক বার রাজপথ দিয়া ভ্রমণ করিলে শিকারলুব্ধ শার্দ্দুল-দলের ন্যায় পাপ-সেনানী দলের বিষম বিক্রম দেখিয়া কাহার না প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়? বোধ হয়, সহর খানির উপর ইহাদিগের একছত্র রাজত্ব।

কলিকাতা সহরে বেশ্যালয়ের এইরূপ সংস্থান এবং বেশ্যাদিগের এইরূপ প্রাদুর্ভাবে কি বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। একত সহর মধ্যে যত দাঙ্গা হাঙ্গামা, বিবাদ কোন্দল, শঠামী মাতলামী ও খুন জখমী হয়, তাহার অধিকাংশ এই অপদেবীদিগের আশ্রমেই হইয়া থাকে। এই সকল কাণ্ডে প্রতিবেশীদিগের শান্তিভঙ্গ ও মনোবিকার কি পরিমাণ সংঘটিত হয়, তাহা নগরবাসীদিগের অবিদিত নাই। যেখানে বেশ্যালয় সেই খানেই বদমায়েসদিগের জটলা, সেই খানেই কলহ বিবাদ, হাঁকডাক, চীৎকার, অশ্লীল গালাগালি ও অবাচ্য কুবাচ্য স্রোতের বন্যা। রাত্রিকাল যখন বিশ্রাম ও শান্তির সময়, যখন সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নরনারীগণ নিস্তব্ধ নিদ্রার ক্রোড়ে মস্তক রাখিবেন, সেই সময়েই নিশাচর নিশাচরী গণের মহামেলা, ইহাতে আর ভদ্র গৃহস্থগণের সুখ শান্তির আশা কোথায়? কর্ত্তব

কেবল শান্তি ভঙ্গ সামান্য কথা, কিন্তু ইহা দূষিত বায়ু মণ্ডলের মধ্যে পবিত্র পরিবার মণ্ডলী লইয়া বাস করা কি দুর্ব্বিষহ! যে সকল কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়, যে সকল পাপের অভিনয় হইতে স্ত্রী পুত্র কন্যাগণকে বহু-দূরে রাখিতে হয়, তাহারই মধ্যে নিত্য বাস কি মৃত্যুযন্ত্রণা! সহরে কত সহস্র সহস্র পরিবার নিরুপায় হইয়া এই মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন! পাপচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্তকে নির্ম্মল করা যখন মনুষ্যের পক্ষে কঠিন কর্ম্ম, তখন সেই পাপের সঙ্গে নিত্য সহবাসে থাকিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করা কি সহজ ব্যাপার? ইংরাজ কবি পোপ এক স্থানে বলিয়াছেন, পাপ রাক্ষসী অতি কদাকার, প্রথম দৃষ্টিতে তাহার প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয়; কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহার প্রতি বিরাগ চলিয়া যায়, পরে তাহাকে ভাল বাসিতে অবশেষে আলিঙ্গন করিতে মন ধাবিত হয়। পাপের ঘৃণাকর দৃশ্য

দেখিতে দেখিতে কত লোকের পক্ষে তাহা সহ্য এবং অবশেষে লোভনীয় হইয়া সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে, কে তাহা গণনা করিতে সমর্থ? মহাত্মা যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, "আমাদিগকে প্রলোভনে লইয়া যাইও না"; কেন না, তাহা হইলে দুর্ব্বল মনুষ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে না। আর সহরে আশে পাশে সেই প্রলোভন আবেষ্টন করিয়া আছে! এরূপ অবস্থায় মানবগণ চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও ধর্ম্মের প্রগাঢ় ভাব রক্ষায় কিরূপে সক্ষম হইতে পারে?

বেশ্যালয়ের দূষিত বায়ু-সংস্পর্শে ভদ্র গৃহস্থদিগের যেমন অকল্যাণ হইতেছে, সেইরূপ তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণের সৎশিক্ষার পরিবর্ত্তে কুশিক্ষা নিত্য অভ্যস্ত হইয়া অস্থি মজ্জাতে প্রবেশ করিতেছে। সহরে যে এত "জেঠা বখাটে" ছেলে দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ এই দূষিত বায়ুসেবন। শৈশবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত বিকৃত করিতেছে এবং সেই রক্তে মনের গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কোন্ শিক্ষায় তাহার প্রভাব নষ্ট করিতে পারে? বিদ্যালয়ের দুটা হিতকথা বা নীতি উপদেশ পর্ব্বতের উপর তৃণের আঘাতের তুল্য। একটা ভাল কথা শুনিয়া মনে সাধু চিন্তার সঞ্চার হইবে কি? শত শত অশ্রাব্য কথা শুনিয়া ও কুদৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া মনের গতি অন্য দিকে ফিরিতেছে। এরূপ সংগ্রামে কয়টী ছাত্র নির্ম্মল স্বভাব ও চরিত্রবান্ হইয়া থাকিতে পারে? বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা-দান-প্রয়াস বিড়ম্বনা ও উপহাসকর মাত্র হইতেছে!

ক্ষুদ্র বালকদিগের পক্ষে এই সদৃষ্টান্ত যত অনিষ্টকর, যুবকদিগের পক্ষে আবার তদপেক্ষা শতগুণ। যে যৌবন বিষমকালে সহসা মনোবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে, প্রবৃত্তির তরঙ্গ-রঙ্গে চিত্ত নৃত্য করিতে করিতে পাপ-সাগরের দিকে সবেগে ধাবমান হয়, সেই সময় প্রলোভনের স্রোতের মুখে পড়িলে আর কি রক্ষা আছে? মুনিগণ অরণ্যে কঠোর তপশ্চারণ করিয়াও যে চিত্তবিকার এড়াইতে পারেন নাই, অগঠিত চরিত্র, অজিতেন্দ্রিয়, তরল-মতি যুবকগণ প্রলোভন ও পাপরাশিতে পরিবৃত হইয়া তাহা হইতে কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? ব্যাধ যেমন শিকার ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতে ও তাহাকে নানাদিক্ হইতে তাড়া করিয়া সেই ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করে, পাপবৃত্তি কুলটাগণও যুবকদিগকে সেইরূপে হস্তগত করিবার চেষ্টায় ত্রুটি করে না। সময় সময় ছাত্রাবাসের যুবকদিগের উপর প্রতিবেশিনী অপ-

দেবীগণের যে সকল অত্যাচারের সংবাদ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তাহাতে যুবকগণ দেবতা না হইলে আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে না।

সরল-চিত্ত সাধু ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের যখন এই দুর্দ্দশা, তখন নগরে কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ চপলচিত্ত ব্যক্তিদিগের পতনের যে সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সহরে যে সকল দাস দাসী আসে, নিকটে বেশ্যালয়ের সংস্থান হেতু তাহারা সহজেই দুশ্চরিত্র হইয়া যায় এবং বেশ্যালয়ের পাপস্রোত ভদ্র পরিবারে প্রবাহিত করিয়া থাকে। বড় মানুষের বাড়ীর বালকগণ যে এত পাপপ্রবণ ও দুশ্চরিত্র হইয়া যায়, এই দাস-দাসীদিগের সংসর্গ তাহার একটী প্রধান কারণ। কিন্তু কয়ব্যক্তি সে বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিয়া থাকেন? মধ্যবিত্ত লোকদিগের গৃহে ও বাসাবাটীতে কত বেশ্যা রাঁধুনী ও দাসীর বেশ ধরিয়া আসিয়া থাকে, তাহারই বা সন্ধান কে লয়? পল্লীগ্রাম হইতে সচ্চরিত্রা অনেক স্ত্রীলোক দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াও পাপের আকর্ষণে পড়িয়া শেষে পাপবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। যেখানে সেখানে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া এক ঘর ভাড়া করিয়া দশজনের একজন হইয়া বসে এবং পাপসেনাদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে।

সহরের মহাপাপ ও দুর্গতির কারণ এই বেশ্যা প্রাদুর্ভাব কিসে নিবারিত হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করা সমাজহিতৈষী, নীতি ও ধর্ম্মের পক্ষপাতী প্রত্যেক ব্যক্তিরই অতি গুরুতর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে একদিকে সমাজ পাপস্রোত হইতে কিসে রক্ষা পায় এবং অন্য দিকে হতভাগিনী বেশ্যাকুলের উদ্ধারের উপায় কিসে হয়, এই উভয় চিন্তাই যুগপৎ আমদিগের চিত্তকে অধিকার করে। সমাজকে পাপস্রোত হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটী উপায় আমাদিগের নিকট অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়; তাহা এই—ভদ্রপল্লী হইতে বেশ্যা-পল্লী স্থানান্তরিত করা। সহরের পক্ষে ইহা একটী গুরুতর পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইলেও কদাপি উপেক্ষণীয় নহে। সহরের বাহ্য সৌষ্ঠব ও শারীরিক-স্বাস্থ্য বিধানার্থ এত ধুমধাম হইতেছে; কিন্তু ইহার নৈতিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানার্থ এই উপায় কেন যে অবলম্বিত হইবে না, আমরা বুঝিতে পারি না। গোয়ালা, কলু ও অন্যান্য ব্যবসায়ী দিগের দ্বারা সহর ম্লেচ্ছ হয় বলিয়া তাহাদিগকে নগরের উপান্তে দূরীভূত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে প্রস্তাব হইয়া থাকে, কিন্তু বেশ্যা-পল্লী দ্বারা

সহরের মলিনতা ও ক্লেশ তদপেক্ষা সহস্রগুণ বৃদ্ধি হয়, সূক্ষ্মদর্শী শান্তিরক্ষকদিগের কি তাহা বোধগম্য হয় না এবং এই পল্লীর স্থানান্তরের ব্যবস্থা অগ্রে আবশ্যক বলিয়া কি অনুভূত হয় না ?

বেশ্যাপল্লী স্বতন্ত্র স্থানে স্থাপিত হইলে সহরের যে কত অকল্যাণ নিবারিত ও কল্যাণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভদ্র পরিবার সকলের শান্তি ও কুশল লাভ হয়, বালক-বালিকাদিগের চক্ষু-কর্ণের সম্মুখ হইতে পাপের দৃশ্য দূরবর্ত্তী হয়, ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা নিরাপদ হয়, যুবক ও দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণ প্রলোভনের আকর্ষণ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পায়, বিদ্যালয় ও ধর্ম্মমন্দির সকলের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী দূষিত বায়ু পরিষ্কার হইয়া যায়,—সমাজ ভদ্র লোকের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়। আর একটী প্রধান অকল্যাণ এখন যাহা ঘটিতেছে, এই ব্যবস্থাদ্বারা তাহার নিরাকরণ হইতে পারে। ভদ্র গৃহ সকলের সহিত বেশ্যালয় সকলের ঘনিষ্ঠ যোগদ্বারা পাপের সহিত সমাজের সন্ধিবন্ধন হইয়াছে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক আর অনিচ্ছা পূর্ব্বকই হউক, পাপানুষ্ঠান করা অনেকের পক্ষে সহজ হইয়াছে। এই বন্ধন ছেদ হইলে লোকলজ্জা ও সমাজভয় অন্তরায় হইয়া অনেকের পক্ষে পাপালয়ের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবে। এখন লোকের অজ্ঞাতসারে এবং ভদ্র পরিচ্ছদের আবরণে গাত্রাচ্ছাদিত করিয়া অনেকে পাপের পথে পদার্পণ করে, অনেক দূর অগ্রসর হইয়া শেষে ফিরিতে অক্ষম হয়, তখন জ্ঞাতচরিত্র চিহ্নিত পাপকিঙ্করগণ ভিন্ন পাপালয়ে গমনাগমনে কেহ সাহসী ও সমর্থ হইবে না। অবশ্য ইহাতে পাপালয় সকলের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভয়ঙ্কর হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে সতর্কতার কারণ হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে। আর যাহারা অনায়াসে পাপব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকেও পাপপথে পদার্পণ করিবার পূ... অনেকবার চিন্তা করিতে বাধ্য করিবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেশ্যাকুল অতি হতভাগিনী। যাহারা জীবিকার জন্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া লোক-লজ্জা সমাজভয় পরিত্যাগ করিয়া শরীর ও আত্মাকে পাপের নিকট বিক্রয় করে, তাহাদিগের ন্যায় কৃপাপাত্রী জগতে আর কে আছে ? যদি কেহ দয়াবৃত্তি সম্যক্ চরিতার্থ করিতে চান, ইহাদিগের উদ্ধার সাধনে জীবন উৎসর্গ করুন, ঈশ্বর ও মানব সমাজের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। বেশ্যাদিগের মধ্যে সকলেই যে কুপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া

পাপপথ অনুসরণ করে; তাহা নয়, ইহাদিগের মধ্যে সৎপ্রকৃতি, নিরীহ-স্বভাব, এমন কি ধর্ম্মানুরাগিণী রমণীও অনেক আছে। কেহ পাপিষ্ঠ নরাধম লোকের প্ররোচনায় বা কুচক্রে পড়িয়া, কেহ পারিবারিক বা সামাজিক অন্যায় তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া, কেহ বা সাময়িক ভ্রমবুদ্ধি ও চঞ্চলতার অধীন হইয়া কুপথে প্রথম পদর্পণ করিয়াছে, পরিণাম চিন্তা করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে যে অনুতাপিত, এবং সমাজের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পাইলেই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সৎপথে জীবন কাটাইতে প্রস্তুত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতায় ইউরোপীয় পতিতা রমণীদিগের জন্য যেমন "প্রটেষ্টাণ্ট হোম" হইয়াছে, দেশীয়া দুর্ভাগিনীদিগের জন্য সেইরূপ আশ্রয়স্থান হইলে দেখা যাইবে পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য কত নারী ব্যতিব্যস্ত। পতিতাদিগের সংশোধন ও উদ্ধার সাধন জন্য এইরূপ গৃহ স্থাপন একান্ত আবশ্যক।

পতিতদিগের হিতসাধনার্থ দ্বিতীয় উপায় এই হইতে পারে যে, তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করা। কারাগার ও হাঁসপাতালের জন্য যদি এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর হয়, তবে পাপাগারের বন্দী ও মহাব্যাধিগ্রস্তদিগের জন্য না হইবে কেন? উপযুক্ত ধর্ম্ম প্রচারকের উপদেশে যদি জগাই মাধাই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে, ইহাদিগের সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কারণ নাই। পাপীর উদ্ধার সাধনজন্য যে মহাত্মারা আপনাদের সর্ব্বস্ব তুচ্ছ করেন, তাঁহারা এই ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

বেশ্যাবৃত্তির পথ রোধ করিবার তৃতীয় উপায়—হিন্দু সমাজে যথোচিত রূপে বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণ। ভদ্র কুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে যাহারা এই শ্রেণীর পুষ্টিসাধন করিয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশই হয় বালবিধবা, নয় কুলীন-কন্যা। বেশ্যার অপর একটী নাম বিধবারই অপভ্রংশ, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? বিধবা ও কুলীন-কন্যাগণ হিন্দুসমাজে যে অসংখ্য অনির্ব্বচনীয় অত্যাচারে প্রপীড়িত, মর্ম্মাহত ও মৃতকল্প হইয়া জীবন ধারণ করেন, তাহাতে মানব স্বভাব প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। ঘাত প্রতিঘাত স্বভাবের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সমাজের কুপ্রথা ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কত অভাগিনী সমাজবিদ্রোহী হইয়া অবশেষে সমাজকেই উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া থাকে,—তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত

হয় না। তাই আজি গ্রামে নগরে রাজধানীতে পাপের এত জীবন্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সকল নিরঙ্কুশভাবে বিচরণ করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে সমাজ নিজেই এই পাপের মূল কারণ। সমাজ দূষিত দেশাচার, কুরীতি ও অত্যাচার নিবারণ করিয়া পুনরায় আত্ম-সংশোধনে মনোযোগী না হইলে কখনও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন না। দেশমধ্যে ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার করিবেন কি, পাপের শত স্রোতের মহা-বন্যায় সকলই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে!

ধর্ম্ম ও মানব চরিত্র।

নাস্তিক ব্রাডলাসম্প্রদায়ের এক খানি কাগজে এক দিন দেখিলাম, তাঁহারা বলিতেছেন—"যদিও সত্যের শত্রুগণ বিধিমতে আমাদিগকে নির্য্যাতন করিতেছে, তথাপি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই আমরা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছি যে, সত্যের জয় এক দিন হইবেই হইবে।" এই বিশ্বাসের কথা গুলি গভীর চিন্তার বিষয়। কেবল যে তাঁহারা ঐ সকল কথা বলিয়াছেন ও ঐরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে, জগতে সাধুগণ ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ যখন "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন ঐ প্রকার বিশ্বাসই তাঁহাদের অন্তরে উজ্জ্বল ছিল। সক্রেটিস্ যখন সহাস্য বদনে বিষের পাত্র মুখে তুলিয়া দেন, যীশু যখন ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ হন, মহম্মদ যখন শত্রুগণের উপদ্রবে মক্কা নগর পরিত্যাগ করিয়া মদিনা গমন করেন, লুথার যখন ইউরোপের সমুদায় ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, ম্যাট্‌সিনি যখন স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও বন্দীকৃত হইয়া বিজন কারাবাসের অসহ্য যাতনায় দিন রাত্রি যাপন করেন, তখন এই প্রকার বিশ্বাসই তাঁহাদের চিত্তে বল বিধান করিয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক সময়ে এই বলিয়া হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে, "যদিও আমার দেশবাসিগণ আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, যদিও আমার বন্ধুগণ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, তথাপি যিনি নির্জ্জনে দেখিয়া সজনে পুরস্কার করেন, সেই পরম পুরুষের নিকট আমার ভাব সকল বিদিত এবং আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা এক্ষণে আমাকে নির্য্যাতন করিতেছেন,

তাঁহাদেরই বংশধরগণ আমাকে কৃতজ্ঞতার উপহার দিবে?”. তখন সত্যের জয় হইবেই হইবে, এই বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে প্রবল ছিল।

তবে আমরা দেখিতেছি যে, এ বিষয়ে নাস্তিক আস্তিক সকলেই সমান। সত্যের জয় হইবে, ন্যায়ের জয় হইবেই হইবে—এই বিশ্বাস সকলেরই অন্তরে প্রবল দেখা যাইতেছে। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসের মূল কোথায়? কি প্রমাণ দেখিয়া সকলে বুঝিলেন যে, এ জগতে সত্য ও ন্যায়ের জয় হইয়াই থাকে? আস্তিকদিগের প্রতি এ প্রশ্ন নয়, কারণ তাঁহারা বলিবেন যে, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই বিশ্ব এক সর্ব্বশক্তিমান পবিত্র পুরুষের মঙ্গল নিয়ম দ্বারা শাসিত; সুতরাং তিনি সত্যকে জয়-যুক্ত করিবেন। নাস্তিক দিগের প্রতি বিশেষ ভাবে এই প্রশ্ন করা যাইতেছে।

তাঁহাদিগকে কে বলিল, তাঁহারা কিরূপে জানিলেন, যে সত্যের জয় হইবেই হইবে? ইতিহাসে বা বর্ত্তমান মানবসমাজে কি ইহার কোন প্রমাণ পাইয়াছেন? হয়ত আমি যে সকল মহাজনের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি, তাঁহাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা বলিবেন যে, দেখ এই সকল মহাজনকে এক সময় কত যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের সমকালীন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের হৃদয়-নিহিত সত্য সকলের উচ্চতা ও গভীরতা অনুভব করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে মানবকুলের শত্রু জ্ঞানে নির্য্যাতন করিয়াছেন, প্রাণে বিনাশ করিলেন; কিন্তু এক্ষণে জগতের লোক সেই সকল সত্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাঁহাদিগকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছে। ইহা সত্য, কিন্তু আরও গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া দেখ। ইঁহারা যে সকল উন্নত ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়াছিলেন, যে সকল উন্নত নীতির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা জগতে জয়যুক্ত হইয়াছে কি না? ইঁহারা সাম্য প্রচার করিলেন, ন্যায়ের মহত্ব ঘোষণা করিলেন, নর নারীকে পবিত্রতার উপদেশ দিলেন, কোথায় এ সকলের রাজত্ব? জাতি সকলকে সমগ্রভাবে দেখ, ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে এই কথাই বলিতেছে যে, যখনই এক সম্প্রদায় নিরঙ্কুশ ভাবে অন্য কোন সম্প্রদায়কে পীড়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তখনই পীড়ন করিয়াছে। ধর্ম্মের নামে ভারতের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে পশু প্রায় পদে দলন করিয়াছেন; আমেরিকাবাসী শুক্লবর্ণ খ্রীষ্টের শিষ্যেরা নিরপরাধ আফ্রিকাবাসী নরনারীকে বল দ্বারা পরাধীন ও বন্দীকৃত করিয়া পশু-যূথের ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করিয়াছে; যে জাতির বাহুবল অধিক হইয়াছে

সেই জাতি ছলে বলে কৌশলে অপর জাতিসকলের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে কি দেখিতেছি? কোথায় সাম্য, কোথায় ন্যায় বিচার, কোথায় সত্যের জয়? দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। যে ইংরাজজাতি ধর্ম্মভাবে ইউরোপের অন্যান্য জাতিসকলের অপেক্ষা অগ্রসর, সেই খ্রীষ্টাশ্রিত ইংরাজ-জাতির ব্যবহারের বিষয় চিন্তা কর। আয়র্লণ্ডবাসিদের প্রতি, ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি, চীনবাসিদিগের প্রতি ইহারা যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা চিন্তা কর;—কোথায় তাহার মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের আদর? ইংলণ্ডের উদার-নৈতিক রাজপুরুষগণও আয়র্লণ্ডবাসিদিগকে আত্ম-শাসনের অধিকার দিতে পারিতেছেন না; কারণ, সেখানে ইংলণ্ডের ধনী লর্ডদিগের অনেকের জমিদারী। ইংলণ্ডে ধনিদিগের প্রচুর ক্ষমতা; সুতরাং আয়র্লণ্ডের প্রজাকুলের প্রতি উক্ত ধনিগণ যে অত্যাচার করিতেছেন, তাহা নিবারণ করিতে কাহারও সাহস হইতেছে না;—ভারতবর্ষেও এদেশবাসী ইংরাজদিগের জাত্য-হঙ্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন রাজপুরুষ এদেশীয়দিগকে ন্যায্য অধিকার দিতে পারিতেছেন না! দুর্ব্বৃত্ত ইংরাজ এদেশীয় নিরপরাধ লোকদিগকে গুলি করিতেছে, অকারণ অপমান করিতেছে, স্বামীর বাহুপাশ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করিতেছে, কোথায় সুবিচার—কোথায় ন্যায়-পরতা? ইংরাজগণ বল দ্বারা চীনবাসিদিগকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের গলে অহিফেন বিষ ঢালিয়া দিতেছে। কোথায় সাম্য, কোথায় ন্যায়পরতা!! নিজ সমাজের প্রতি সূক্ষ্মরূপে দৃষ্টিপাত কর, জমিদারগণ প্রজাদিগকে পেষণের চেষ্টায় আছে, প্রজাগণ জমিদারকে ন্যায্য ধনে বঞ্চিত করিবার চেষ্টায় আছে, বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রবঞ্চনার চেষ্টায় আছে, ক্রেতা আত্মরক্ষায় তৎপর আছে; পুরুষগণ অবলা বলিয়া স্ত্রীজাতিকে কারাগার রুদ্ধ রাখিয়াছে, সুকোমল শৈশবে কিনিতেছে বেঁচিতেছে, চিরবৈধব্য দশায় বল-পূর্ব্বক রাখিতেছে; কোথায় সাম্য,—কোথায় ন্যায়পরতা? সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে যেরূপেই দেখি না কেন, বর্ত্তমান জনসমাজ, সত্য ও ন্যায়ের জয়ের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে না।

বরং এই কথা বলিলেই সত্য বলা হয় যে, বর্ত্তমান সমাজ সকল ঘোরতর সংগ্রামের ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। ধনী ও দরিদ্রে সংগ্রাম, ভূম্যধিকারী ও কৃষকে সংগ্রাম, রাজা ও প্রজাতে সংগ্রাম; পুরুষ ও স্ত্রীতে সংগ্রাম, এই রূপ

সংগ্রামই চলিয়াছে। নাস্তিকগণ কি দেখিয়া ভাবিলেন যে, সত্যের জয় হইবেই হইবে? আমাদের প্রত্যেকের জীবন যদি আলোচনা করি, তাহা হইলে কি প্রমাণ পাই? আমরা যদি আমাদের বিগত জীবনের প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? আমাদের জীবনে কি সত্য, ন্যায়, সাধুতা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছে? আমাদের কত প্রতিজ্ঞা বালির বাঁধের ন্যায় প্রকৃতি-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; আমরা কত দিন কত চেষ্টা করিয়াও কাম ক্রোধের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না। এতবার যে অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তথাপি কি আশা পরিত্যাগ করিতেছি? তাহা করিতেছি না। দশ শত বার বিফল মনোরথ হইয়াও আবার বদ্ধ-পরিকর হইতেছি, ভাবিতেছি ভূতকালে সত্য ও সাধুতার জয় হয় নাই বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে হইবে।

এই মানব প্রকৃতির এক গূঢ় রহস্য। জগতের ইতিবৃত্তে, বর্ত্তমান সমাজে কিংবা নিজ চরিত্রে সত্য ও সাধুতাকে পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইতে দেখিতে পাইতেছি না, অথচ সতৃষ্ণনয়নে ভবিষ্যতের দিকে চাহিতেছি এবং কে যেন বলিয়া দিতেছে, সত্যের জয় হইবেই হইবে। ইহা দেখিয়াই এমার্‌সন্ বলিয়াছেন:—

"We give up the past to the objector and yet we hope. He must explain this hope."—"Over-soul"

সত্যের জয় হইবেই হইবে যিনি বলিতেছেন, তাঁহার মনের ভাব বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস, এই সৃষ্টি প্রকরণের মধ্যে, মানব প্রকৃতির গঠনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে সত্য ও সাধুতার জয় লাভকে অনিবার্য্য করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এরূপ বিশ্বাসের অর্থই থাকে না। কিন্তু জগতের গতি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার দিকে, ইহা বলিলে কিরূপ সৃষ্টি প্রকরণের অভাস দেওয়া হয়? তদ্দ্বারা এই জগতকে কি ধর্ম্ম নিয়মের অনুগত বলা হয় না? তবে আর নাস্তিকতা কোথায় রহিল? ঠিক কথা গুলি স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু প্রসিদ্ধ ম্যাথু আর্নোল্ড বোধ হয় ঈশ্বরের এই লক্ষণ দিয়াছেন:—

"That stream of tendency in Nature, which maketh for righteousness."—

প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তির ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার দিকে গতি, তাহাই ঈশ্বর।

মানব প্রকৃতির গতি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার দিকে, ইহা যিনি বিশ্বাস-নয়নে দর্শন না করেন, কিম্বা অন্তরে সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস না করেন, তিনি জগতের চতুর্দ্দিকের অন্যায়, অসত্য, অসাধুতার মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতে পারেন না যে, সত্য ও সাধুতার জয় হইবেই হইবে, কিম্বা জনসমাজের নানা প্রকার পাপ প্রলোভনের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মকে স্থির ভাবে ধরিয়া বলিতে পারেন না, "যতো ধর্ম্ম ততো জয়:"। জগত ধর্ম্মের অনুকূল ইহা না জানিলে, ধর্ম্মের উপর স্থিরভাবে দাঁড়ান যায় না; সুতরাং ধর্ম্ম-বিশ্বাস ভিন্ন মানবচরিত্রের ভিত্তি স্থাপন হয় না।

হিমালয়ের গীত।

(সিমলা ধুবীঘাট দর্শনে)

ওহে হিমালয় যোগ-ধাম, আবার যে
দেখিনু তোমায় চর্ম্ম-চক্ষে ! আহা, আমি
তোমারে দেখিতে বড় ভালবাসি ! তাই
বুঝি হরি দয়াময় আনিলেন হেথা
পুনঃ। ধন্য দেব ! তব চরণে প্রণমি
বার বার। গিরিরাজ অনন্ত-শিখর !
চিরদিন ভুলাবে কি মোরে তুমি হেন
মতে ? কখন কি সখে, হবে না প্রাচীন
তুমি ? অহো ! মহাতীর্থ যোগীন্দ্র-আশ্রম,
তাই বা কেমনে বলি, তুমি যে নবীন
সদাকাল নবরসময় শ্রীহরি-প্রসাদে।
অয়ি শৈলসুতে ! প্রিয় ভগিনী আমার,
ক্ষান্ত হও, শুনি আগে কি বলে হিমাদ্রি।
চপলে, চঞ্চল-গতি, শ্রান্তি বোধ নাহি
কি তোমার ? ও কোমল তরল বরাঙ্গে

হায়, হয় না কি ব্যথা বিন্দু মাত্র ? কত
অরণ্য বন্ধুর ভূমি পায়ে ঠেলি ছুটে
ধাইছ সবেগে; কত দেশ দেশান্তর
না জানি আসিলে দেখি; বল তবে বল,
কি বলিবে, শুনি আগে তোমারি কাহিনী।
আহা! কি মধুর কলনাদ, যত শুনি,
কর্ণ তত হয় পিপাসিত শুনিবারে।
তোমার সৌন্দর্য্যে, হে তটিনি! গিরিবর
এত সুশোভিত। আছ আলিঙ্গিয়া তার
বীর-দেহ তুমি, যথা রজত মেখলা।
শীলাতলে নাচি গীত গাইছ কত যে
অবিশ্রান্ত তাহা কি বলিব! এক গীতে
জীবন নিঃশেষ। আহা! মরিবে যে দিন,
সেই দিনে হবে গীত সাঙ্গ, মিশে যাবে
অনন্ত আকাশে মৃদুরব, যথা সাধু
ক্ষীণকণ্ঠে বলে হরি হরি অন্তকালে।
চারু তরু শাখে রে পতঙ্গি! তোরো গাতে
নাহিক বিশ্রাম। পর্ব্বতের ঝিঁ ঝিঁ তোরা
দিব্য কান্তি; ঝিল্লীরবে করিলি মোহিত
অতিথিরে, ঝঙ্কারিয়া যেন বীণাতন্ত্রী
শত শত তটিনীর সঙ্গে এক যোগে।
পলক বিচ্ছেদ নাহি হেরি, দিবানিশি
গায় গীত এরা। আহা! কবে আমি মিলে
এই সঙ্গে হরি গুণ গাইতে গাইতে
হব লয়, যথা তরঙ্গিনী হয় লীন

সাগর সঙ্গমে, ত্যজি নিজ কলেবর।
বড়ই হইনু প্রীত আজ আসি হেথা,
শুনি স্বভাবের গীত-ধ্বনি। ঢালি দিয়া
প্রাণ সে আমার প্রাণ লইল কাড়িয়া,
উথলিল হিয়া স্নিগ্ধ বায়ুর হিল্লোলে।
থাক, আর কাজ নাই কবিতা কল্পনে!
তোমার লীলার নাহি অন্ত। তাই বুঝি
প্রাণের গৌরাঙ্গ মোর বলিলা, "হে হরি,
কবিতা সুন্দরী নাহি চাই, দেও দেব
ভক্তি অহৈতুকী।" এবে চিনিনু তোমারে
আমি, ধর্ম্মপথে তুমি প্রলোভন। যাও
দাসে করি আশীর্ব্বাদ, তোমার প্রসাদে
পাই হরি ধনে, লীলারসময় বেশে।
আলম্বন উদ্দীপন বিনা, নিরালম্বে
এবে কিন্তু চাহি আমি হেরিতে মহেশে।
চিরদিন প্রভু, চিরদিন তবরূপ
হেরিব কি এইরূপে? ভালবাসিব কি
গুণ স্মরি?—দৃশ্য বস্তু বিচারিয়া? যথা
স্বার্থপর নারী বাসে ভাল, দেয় যদি
পতি রত্নরাশি? তা হবে না, আমি তব
অপ্রকট নিত্যরূপ-মাধুরী নেহারি
নিত্যযোগে হব নিমগন। আহা, এই
রূপে যিশু যোগিবর, আর্য্য ঋষিবৃন্দ
মজিতেন পুরাকালে গিরিচূড়ে বসি।
স্বভাবে সুন্দর যেই, অলঙ্কার শোভে

কি তাহাতে ? তাই বলি, হে হৃদয়-সখা,
ভুলাও তূরীয় রূপে নিত্য এ দাসেরে।
স্রোতস্বিনি! শুন বলি এক কথা, যাবে
তুমি বঙ্গদেশ দিয়া, যদি যাও তবে
বলিও আমার ভ্রাতৃগণে, যেন তারা
আসি হেথা দেখে যায় বারেক তাঁহারে
গিরিশৃঙ্গে, যাঁর তরে লালায়িত সবে।
প্রিয়তমে, কূলে কূলে গেয়ে যেও এই
গীতটী আমার কলস্বরে, অনুরোধ
করিও রাখিতে মোর প্রেম-নিমন্ত্রণ।

রাগিণী—ভৈরবী; তাল—আড়াঠেকা।

"চল মন চল যাই যোগধামে হিমাচলে।
ত্রিতাপ অনলে প্রাণ জ্বলে ধরাতলে।
করে যথা নির্ঝরিণী, দিবা নিশি ব্রহ্মধ্বনি,
কলকণ্ঠ পিকগণে হরি হরি বলে।
অনন্ত তুষার রাশি, নিত্য শান্তিরসে ভাসি,
যোগানন্দে হাসি হাসি কত কথা বলে;
বসি তথা যোগাসনে, তরুতলে কুঞ্জবনে
হেরিব সচ্চিদানন্দ হৃদয়-কমলে।
চিদাকাশ অভ্যন্তরে, সমাধি ভূধর'পরে,
মহাদেব মহেশ্বর পূজিব বিরলে;
মিশিব তাঁহারি সঙ্গে, অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে,
হব লয় যথা জল-বিন্দু সিন্ধু-জলে।"

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

নূতন ও পুরাতন।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, সকল দ্রব্যেরই নূতন ভাল; কিন্তু "সেবকান্নে পুরাতনে" অর্থাৎ কেবল চাউল ও চাকরের বেলা পুরাতনের ব্যবস্থাটাই বাঞ্ছনীয়। চাউলটা পুরাতন হওয়া যে ভাল তাহাতে আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। কারণ, নূতন চাউলের ভাত খাইতে মিষ্ট হইলেও, বড় জমাট বাঁধিয়া যায়। আর আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষেই হউক, কিম্বা অন্য কোনও কারণেই হউক, বাঙ্গালীর পরিপাকশক্তি ইদানীং বড় কমিয়া গিয়াছে। এই জন্য নূতন চাউলের ভাত সহজে পরিপাক হয় না; খাইলে পেট ভার হয় এবং অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগের কারণ হইয়া পড়ে।

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের চরণে "বিহিত সম্মানপুরঃসর" প্রণাম করিয়া বলিতে বাধ্য হইলাম যে, চাকরের বেলা তাঁহাদের ব্যবস্থাটা সর্ব্বত্র খাটে না। পুরাতন চাকরের মনিবের প্রতি একটু মায়া হয় বটে এবং বহুদিনের অভিজ্ঞতা বশতঃ পুরাতন ভৃত্য অনেক কাজে লাগে বটে, কিন্তু অধিকাংস্থলে পুরাতন চাকর একটু উদ্ধত ও অবাধ্য হয়। চাকরির কাল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আব্‌দারেরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়। সে বাটীর অন্যান্য সকলকে, এমন কি কখনও কখনও মনিবকে পর্য্যন্ত, বড় একটা গ্রাহ্য করে না। বিশেষতঃ বালক বালিকাগণ তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়ে। ঐ সকল বালক বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যৌবন-পথে পদার্পণ করিলেও, তাহার 'হাতে মানুষ হইয়াছে' বলিয়া তাহার নিকট কোনও সম্মান প্রাপ্ত হয় না। এ সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকের বাল্যস্মৃতি আমার কথার পোষকতা করিবে। আমি ত জানি আমাদের বাটীতে একজন অনেকদিনের পুরাতন দাসী ছিল, সে সর্ব্বদা বাটীর সকলের সহিত কলহ করিত; বালক বালিকাদিগকে ধরিয়া প্রহার পর্য্যন্ত করিত। বধূগণ তাহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। এই ত গেল বাটীর ভিতরের কথা। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বাহির বাটীতেও একজন পুরাতন চাকর ছিল। সেও কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিত না। আমরা কোনও আদেশ করিলে ফুৎকারে উড়াইয়া দিত; এমন কি অনেক সময় বাটীর কর্ত্তাকে পর্য্যন্ত ধমক দিতে পারিলে ছাড়িত না। আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তার নিকট তাহার নামে অভিযোগ করিলে, তিনি "সেবকান্নে পুরাতনে" বলিয়া সমস্ত গোলযোগের মীমাংসা করিয়া দিতেন। এই সকল

দেখিয়া শুনিয়াই বলিতেছিলাম যে চাকরের বেলা পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাটা সর্ব্বত্র খাটেনা।

আর একটী কথা। তাঁহারা যে কেবল "সেবকান্নে পুরাতনে" বলিয়া অন্য সকল জিনিষের বেলা নূতনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়ছেন, সেটাও ঠিক্ বলিয়া বোধ হয় না। আরও অনেক জিনিষ আছে, যাহার পুরাতন ভাল। এমন অনেক পদার্থ আছে, পুরাতন হইলে যাহার উপকারিতা বৃদ্ধি পায়। নূতন তেঁতুল খাইতে ভাল বটে, কিন্তু পুরাতন তেঁতুল অধিক উপকারী। ঘৃত পুরাতন হইলে তাহাতে বিশেষ গুণ বর্ত্তে। ডাক্তারদের মতে পোর্ট ওয়াইন যত পুরাতন হয়, ততই তাহা অধিক উপকারে লাগে। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন যে, নূতন বন্ধু অপেক্ষা পুরাতন বন্ধু অধিক আদর ও বিশ্বাসের পাত্র। আবার এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা পুরাতন হইলে নষ্ট হইয়া যায় এবং কোনও উপকারে আসে না। সে সব সামগ্রীর নূতনই ভাল।

যিনি যাহাই বলুন না কেন, অনেক স্থলে পুরাতনেরই আদর ও সম্মান অধিক। এক জন হঠাৎবাবু অপেক্ষা বুনিয়াদি বড় মানুষের সম্মান বেশি। আধুনিক কোনও লোক যতই কেন বিদ্বান্ ও জ্ঞানী হউন না, তিনি কি কখনও পুরাতন আর্য্য ঋষিদের সমান শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবেন? তাহা ত বোধ হয় না। আমরা বাল্যকালে যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, সে স্থান যে পরিমাণে আমাদের স্নেহ আকর্ষণ করে, অন্য কোনও স্থান কখনই তত পারে না। আমার বাল্যকালের গ্রাম্য আবাস বাটী, সামান্য হইলেও, আমার নিকট যত প্রিয় বোধ হয়, অন্য কোনও বাসস্থান সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট হইলেও কখনও তত আদরের বস্তু হইতে পারে না। বাল্যকালে পিতার নিকট একটী দোয়াত পাইয়াছিলাম। সে আজি প্রায় কুড়ি একুশ বৎসরের কথা। তাহার পর কত দোয়াত কিনিলাম, ভাঙ্গিলাম; কিন্তু সেটী আজিও যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছি। অন্যান্য দোয়াত অপেক্ষা সেটীতে লিখিতে যেন একটু বেশি ভাল লাগে।

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, সময়ে মায়া বাড়ায়। যাহার সহিত যত অধিক দিন একত্রে বাস করা যায়, তাহার প্রতি আমাদের স্নেহ মমতা সেই পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়। এই জন্যই প্রাচীন পণ্ডিতেরা পুরাতন চাকর ভাল বলিয়া গিয়াছেন। ভৃত্য অধিক দিন এক বাটীতে থাকিলে প্রভু ও

ভৃত্য উভয়েরই পরস্পরের প্রতি একটু মায়া হয়। সহজে কেহ কাহাকেও ছাড়িতে পারে না।

এতদ্ভিন্ন সময়ের একটী মোহিনী শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয়। সময় যে কোথা হইতে এই শক্তি পাইল তাহা জানি না, কিন্তু আমিত সময়ের এই শক্তি স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। কে না জানেন, পুরাতন দুঃখেরও স্মৃতিতে একটু সুখ আছে? সময় যেন সকল পদার্থের চতুর্দ্দিকে একটী পবিত্রতার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেয়। যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই আমাদের নিকট যেন কেমন এক প্রকার শ্রদ্ধার জিনিষ হইয়া পড়ে।

মৃত্যুরও এই মোহিনী শক্তি আছে। মৃত্যু অগ্নি স্বরূপ; ইহা মানুষের দোষ সকল ভস্মীভূত করিয়া কেবল তাহার গুণরাজি আমাদের চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করে। কাল মৃত ব্যক্তির দোষোদ্‌ঘাটন করা আমরা সুরুচি বিরুদ্ধ ও নীচতার পরিচায়ক মনে করি। কাল মৃত ব্যক্তির স্মৃতির উপরে এক আশ্চর্য্য পবিত্রতার আবরণ আনিয়া দেয়। অগ্নি যেমন মৃত ব্যক্তির পার্থিব দেহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ অংশ আত্মা অবিনশ্বর থাকিয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ মৃত্যু মানুষের দোষ ভাগ ভস্মীভূত করিয়া দেয় এবং যত সময় যাইতে থাকে ততই তাহার প্রতি ভবিষ্যৎ বংশাবলির শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তোমার আমার সম্বন্ধে একথা খাটুক আর না খাটুক, জগতে যাঁহারা বড় লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রায়ই এইরূপ হইতে দেখা যায়।

প্রথম যখন রামমোহন রায় প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, তখন দেশশুদ্ধ প্রায় সকল লোক তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল। তাঁহার উপর কতই গালি বর্ষিত হইয়াছিল! কি ভয়নাক ঘৃণা ও বিরাগের বাত্যা তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইয়াছিল! কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। এখন রামমোহন রায় নমস্য ব্যক্তি, অদ্বিতীয় লোক, বঙ্গের গৌরব, ভারতের উজ্জ্বল রত্ন। সে কালের লোকে তাঁহাকে যে জন্য দোষ দিত, এখন তাহাই গুণে পরিণত হইয়াছে। মৃত্যু তাঁহাকে পবিত্রতার আবরণে আবৃত করিয়াছে। সময় তাঁহার জীবনকে আরএক ভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছে। আমরা এখন তাঁহাকে আরএক ভাবে দেখিতেছি।

প্রথম যখন বুদ্ধদেব তাঁহার বহু তপস্যার্জ্জিত নূতন ধর্ম্মমত ভারতে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন হিন্দুগণ কি ভয়ানক ঘৃণার সহিত, ক্রোধের সহিত বৌদ্ধদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন! তাঁহাদের বিদ্বেষ-বহ্নি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, অবশেষে বৌদ্ধদিগকে দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া না দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কালে সেই বুদ্ধদেব নারায়ণের অবতার বলিয়া পূজিত হইলেন। আজি কুসংস্কার বর্জ্জিত বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের মতে, সেই বুদ্ধদেব মহর্ষি ঈশার সমতুল্য লোক।

সেই ঈশার কথাই ভাবিয়া দেখ। তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিল, কিন্তু এখনকার সভ্য জগতের কতলোক তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেছে! তিনি স্বয়ংই বলিয়াগিয়াছেন, ধর্ম্ম প্রচারক স্বদেশে সম্মানিত হয়েন না (A prophet is not honoured in his own country.) কেবল তাহাই নহে,—(A prophet is not honoured in his own time). ধর্ম্ম প্রচারক নিজের জীবিত কাল মধ্যে বড় একটা সম্মানপ্রাপ্ত হয়েন না। সময় না গেলে লোকে তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারে না, সমাদর করিতে পারে না। এসম্বন্ধে আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহার আর আবশ্যক নাই।

এইত গেল মানুষের কথা। সামাজিক প্রথা সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রথম যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার প্রয়াস পান, তখন চতুর্দ্দিক হইতে কি ভয়ানক প্রতিবাদের কোলাহলই না উত্থিত হইয়াছিল! কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন যদিও অনেকে বিধবা বিবাহের বিরোধী আছেন, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক লোক বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী হইয়াছেন। যাঁহারা সাহস করিয়া নিজের বিধবা কন্যা বা ভগিনীর বিবাহ দিতে পারেন না,তাঁহারাও মুখে ইহা ভাল বলিয়া স্বীকার করেন। এখন অনেক সম্বাদপত্রের সম্পাদক প্রকাশ্যভাবে বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতে সাহস করেন। তাই বলিতে ছিলাম, এখন আর সে দিন নাই। এক কালে যাহা লোকের বিরাগের বস্তু ছিল, সময়ের গুণে তাহাই প্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

যখন ভয়ানক সতীদাহ-প্রথা দেশ হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তখন কত লোকে কত চীৎকার করিয়া ছিল! কত লোকে বলিয়াছিল, ইংরে-

জেরা ভয়ানক অন্যায়াচরণ করিতেছেন, আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে-ছেন। কিন্তু আজি আমরা বুঝিতেছি, ইংরেজেরা সতীদাহ-প্রথা উঠাইয়া দিয়া কি সৎকার্য্যই করিয়াছেন। আজি সেই কুপ্রথার উচ্ছেদকারী মহাত্মা বেণ্টিঙ্ক ভারতের পরম উপকারী বন্ধু বলিয়া সম্মানিত।

আসল কথা এই যে, মানুষ অভ্যাসের দাস। অনেক দিন ধরিয়া যাহা করিয়া আসা যায়, তাহা প্রথমে অপ্রিয় হইলেও ক্রমে প্রিয় হইয়া উঠে এবং অবশেষে তাহা ছাড়িতে কষ্ট বোধ হয়। প্রথমে ভাল মনে করিয়া যদি কোনও দুষ্কর্ম্মের পথে পদার্পণ করা যায়, অনেক দিন ধরিয়া সেই পথে চলিতে চলিতে পরে তাহা পরিত্যজ্য বলিয়া বিশ্বাস হইলেও সহজে সে পথ পরিত্যাগ করা যায় না। যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই বলিবেন যে একথা বড় ঠিক্।

মানুষের ন্যায় সমাজও অভ্যাসের দাস। অনেক দিন হইতে যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা অপকারী বলিয়া বুঝিলেও লোকে সহজে তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয় না। পুরাতন জিনিষের প্রতি আমাদের এমনি মায়া যে তাহার কোনও গুণ না থাকুক,—গুণ না থাকা দূরের কথা,—তাহার সহস্র দোষ থাকুক, তথাপি কেবল পুরাতন বলিয়াই তাহা আমাদের ভাল-বাসার বস্তু, আদরের বস্তু, সম্মানের বস্তু হইয়া পড়ে। তুমি যদি কোনও নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে যাও, অমনি সকলে তোমার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে।

কিন্তু কথা এই, যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই কি ভাল? এক দল লোক আছেন যাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহাদের মতে যাহা কিছু পুরাতন তাহাই ভাল, তাহাই রক্ষণীয়। তাঁহারা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর যুক্তি অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক পুরাতন আচার ব্যবহারের মধ্য হইতে কোন না কোন একটী মহৎ উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন, অত্যন্ত অপকারী প্রথার মধ্য হইতেও বলপূর্ব্বক কোনও না কোন উপকারিতা অবিষ্কার করিতে প্রয়াস পান। তাঁহাদের মতে বেদের সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত আমাদের যাহা কিছু ছিল ও আছে, সে সকলই ভাল। তাহার মধ্যে কিছুই মন্দ থাকিতে পারে না। এই বিশ্বাস সামাজিক উন্নতির পক্ষে একটী বিষম অন্তরায়। যাহার মনে মনে বিশ্বাস যে, আমার সকলই ভাল, সে কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের মূল

বিশ্বাসের মধ্যেই একটী মহাভ্রম রহিয়াছে। আর্য্য ঋষিগণ যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন, যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, সকলই ভাল, সকলই রক্ষণীয়, এ মতের যৌক্তিকতা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, মানুষ চিরকালই ভ্রান্ত, তা তিনি আর্য্য মহর্ষিই হউন আর যিনিই হউন। ভ্রান্ত মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত প্রথা কখনও ভ্রম শূন্য হইতে পারে না। তাহা হইলেও, আর একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সময়ের গতিতে সামাজিক অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে। সে কালের সামাজিক অবস্থার পক্ষে যাহা উপযোগী ছিল, এখনকার পরিবর্ত্তিত সামাজিক অবস্থার পক্ষে তাহা কখনই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন মোটের উপর মনুষ্য জাতির জ্ঞান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই আর্য্য ঋষিদের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে পুরুষানুক্রমে যত জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, বর্ত্তমান মানব-পরিবার সে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে। তখনকার অপেক্ষা এক্ষণে আমরা জগতের বিষয়ে ও ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য সমাজের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং এখনও যে আমাদিগকে বালকের ন্যায় নিজের বুদ্ধি শক্তির কিছুমাত্র পরিচালনা না করিয়া যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই ভাল বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইবে, অন্ধের ন্যায় ভালই হউক মন্দই হউক অন্যের প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে, এ যুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ।

পুরাতনের মধ্যে যাহা ভাল আছে, তাহাও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে; আবার নূতনের মধ্যে যাহা ভাল আছে, তাহাও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন যাহা তাহাই ভাল, নূতন যাহা তাহাই মন্দ,—আমরা এ মতের কখনই পোষকতা করিতে পারি না। আমাদের বাটীর ভৃত্য চুরি করে, অন্যের উপর অত্যাচার করে, প্রভুর অবমাননা করে, জিনিষ পত্র লোকসান করে, অথচ "সেবকাম্নে পুরাতনে" বলিয়া তাহাকে ভাল বলিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? আমাদের পুরাতন বাটীটি ভগ্ন ও ক্ষুদ্র, তাহাতে বায়ু সমাগমের ভাল পথ নাই, পরিবারের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহাতে আর ধরে না, বাটীর পার্শ্বে এমন ভূমি নাই যে বাড়ীটি বর্দ্ধিত করিয়া বহু পরিবারের বাসোপযোগী করিয়া লওয়া যায়, তথাপি আমাদিগকে পুরাতন বলিয়া, পৈতৃক ভদ্রাসন বলিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতে হইবে, এ কোন্ যুক্তি?

অথচ এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত হিন্দু সমাজ চলিতেছে। অন্ততঃ হিন্দু-সমাজের লোকেরা মুখে এইরূপ বলিয়া থাকেন। মুখে এইরূপ বলিয়া থাকেন, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যে এই বিশ্বাসের অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। আর্য্য ঋষিগণ যে সকল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কয় জন লোকে তদনুযায়ী আচরণ করিয়া থাকেন? সে সকলের এখন কিছুই নাই বলিলেই চলে। এখন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব উপবীতধারী ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মণ। উপবীত ধারণ করিতেও হয় না, মুখে আপনাকে উপবীত-ধারী বলিয়া স্বীকার করিলেই আজি কালি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। কিন্তু আর্য্য ঋষিদিগের প্রণীত শাস্ত্রানুসারে কি ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ? তুমি শ্রাদ্ধাদি প্রকাশ্য কর্ম্মের নিমন্ত্রণের পংক্তিতে ভিন্ন, শূদ্রের সহিত,—শূদ্রের সহিত কেন—শূদ্রের স্বহস্তপক্ব অন্ন ভোজন কর, মুসলমানের হাতে খাও, হোটেলে খাও, চর্ম্ম পাদুকা বা সুরা বিক্রয় কর, সুরাপান কর, প্রকাশ্যভাবে নাস্তিকতা প্রচার কর, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, উপবীত তোমার হজ্‌মি গুলি। মুখে স্বীকার করিলেই হইল তোমার উপবীত আছে! কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, আজি কালি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে আর কোনও লক্ষণের আবশ্যক করে? আজি কালি আর্য্য ঋষিদের বিধানানুসারে প্রায় কোন কর্ম্মই যে হইতেছে না, তাহার আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রবন্ধ বাড়িয়া যায় বলিয়া আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম।

এই ত গেল শাস্ত্রের সম্মান। কিন্তু তুমি তোমার বাল-বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে যাও, অমনি সকলে খড়্গ-হস্ত হইবে। তুমি যতই কেন ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হও না, যদি হিন্দু-সমাজের গুটি কতক মর্ম্ম-স্থানে আঘাত কর, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। তোমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। কিন্তু ঐ গুলিতে আঘাত না করিয়া তুমি হাজার অধর্ম্মাচরণ কর, তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না।

ফল কথা এই, আজি কালি হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম বা শাস্ত্র বলিয়া কোনও পদার্থের সম্মান নাই। মুখে থাকিতে পারে, কার্য্যতঃ নাই। কারণ অনেক স্থলেই শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রাচীন রীতি নীতিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী, হিন্দু-সমাজ মুখে না হউক কার্য্যতঃ তাহা স্বীকার করেন। এখনকার পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যে অনেক

স্থলে প্রাচীন সামাজিক রীত্যনুসারে চলা যায় না, হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পদে পদে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তথাপি পুরাতনের মায়া এমনি প্রবল যে, এখনও অনেক বিষয়ে দেশাচারের পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দেশাচার এখন শাস্ত্র অপেক্ষাও অধিক সম্মানের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ত শাস্ত্রের অনেক প্রমাণ দিয়া দেখাইলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত, তথাপি সকলে সাহস করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে পারিতেছেন না কেন ? ইহার একমাত্র কারণ সমাজভয়। সমাজের সকলে পুরাতন দেশাচার বলিয়া ইহার মায়া কাটাইতে পারিতেছেন না। আর যাঁহারা ইহা যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের অবশিষ্ট লোক কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পোষকতা করিতে অসমর্থ হইতেছেন। কিন্তু এমন দিন থাকিবে না। ক্রমে দুই চারিজন দৃষ্টান্ত দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কালে যখন আবার ইহার নূতনত্ব দূর হইয়া; ইহা একটী পুরাতন সামগ্রীর মধ্যে দাঁড়াইবে, তখন লোকে ইহার আদর করিতে শিখিবে; কিন্তু তাহার জন্য দুই চারিজনের প্রথমে অগ্রসর হইয়া দৃষ্টান্ত দেখান উচিত।

একদা কোনও গ্রামে ভয়ানক বন্যা উপস্থিত হইয়া গ্রামের সমস্ত স্থান ডুবিয়া যায়। বন্যার জল সরিয়া গেলে একজন আসিয়া গ্রামের মধ্যে সংবাদ দিল যে, নদীকূলে এক ভয়ানক বিকটাকার মূর্ত্তি অবির্ভূত হইয়াছে। তাহার বর্ণ কৃষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও শরীর দশহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ। গ্রামের স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলে দলে দলে নদীতীরে সেই ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিতে চলিল। গিয়া দেখিল, কথা যথার্থ বটে; নদীতীরস্থ এক বৃক্ষের গায়ে ঠেস্ দিয়া এক বিরাট মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। গ্রামে শিক্ষিত লোকের সম্পর্কের মধ্যে এক ডাক্তার। তিনি তখনও আসিয়া উপস্থিত হয়েন নাই। গ্রামের সকলে ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। বৃদ্ধেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ঐ মূর্ত্তি আর কেহ নহে বন্যাসুর; অতএব সকলে মিলিয়া উহার পূজা দাও, তাহা হইলে দেশে আর বন্যা হইবে না। স্ত্রীলোকেরা তাহা শুনিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "ও কিছু নহে; এই দেখ"— এই বলিয়া তিনি তাহার উপর এক লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন। গ্রামস্থ সকলে একেবারে 'হাঁ,' 'হাঁ,' 'করেন কি ?' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ

কেহ বলিল, "ডাক্তার বাবুর ইংরাজী পড়িয়া খৃষ্টানী মত হইয়া গিয়াছে।" কেহ বা দুই একটা কটূক্তি করিতেও ত্রুটি করিল না। কিন্তু হইলে কি হয়, ঐ বিকট মূর্ত্তি একটী বাঁশের ফাঁপা ফ্রেমে কাপড় জড়াইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই এক লোষ্ট্রেই কাপড় ছিঁড়িয়া গেল। ক্রমে ডাক্তারের দেখাদেখি আরও দুই একজন অলক্ষ্যভাবে তাহার উপর ঢিল মারিতে লাগিল। তাহাতে বস্ত্র আরও ছিন্ন হইয়া তাহার প্রকৃত অসারত্ব বাহির হইয়া পড়িল। অবশেষে বালকেরা নির্ভয় হইয়া তাহার উপর আরও ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল। বিরাট-মূর্ত্তি বন্যাসুর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। বালকেরা পদাঘাত করিতে করিতে তাহাকে লইয়া কাদার উপর টানাটানি আরম্ভ করিল। স্ত্রী লোকেরা পূজার উপকরণ লইয়া আসিয়া দেখে, তাহাদের পূজ্য দেবতা বালকের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধেরা তখনও সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা এই ব্যাপার হইতে মহা অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছিল। অবশেষে যখন তাহারা একখানি নৌকার নাবিকদের প্রমুখাৎ অবগত হইল যে, ঐ মূর্ত্তি দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোনও গ্রামের বারোয়ারি পূজার সং, তখন তাহারা সকলে ডাক্তারের সাহসের প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে প্রতিগমন করিল।

কেবল পুরাতন বলিয়া, সমাজে অনেক দিন প্রচলিত বলিয়া যে সকল কুপ্রথা সম্মান প্রাপ্ত হয়, তাহার দশাও ঐরূপ। একবার কেহ সাহস করিয়া যদি তাহাতে আঘাত করিতে পারে, ক্রমে অন্য দুই এক জন তাহার অনুগামী হয় এবং অবশেষে যখন উহার অসারত্ব ও অপকারিতা বাহির হইয়া পড়ে, তখন বালকেও উহাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায়।

পুরাতন হইলেও হয় না, নূতন হইলেও হয় না। যাহাতে সার আছে, যাহা উপকারী, যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, তাহা নূতন হইলেও কালে স্থায়ী হয়। আর যাহা অসার, যাহা অপকারী, যাহা অসত্য ও অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আর্য্য ঋষিদের কেন, ডারুইনের মতে যাঁহারা মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষ সেই নমস্ত ও পূজ্যপাদ জীবদিগের সময় হইতে প্রচলিত হইলেও কখনই স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

ফেরেডে বলিয়াছিলেন, "আজ উনত্রিশ বছর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এই কাল মধ্য আমাদের প্রণয়-সুখ দিন দিন বাড়িয়াছে।" বর্ক কহিয়াছেন, "বাহিরের কলহ বিবাদ ও অশান্তি ছাড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসি, শরীর যেন জুড়াইয়া যায়, আত্মা শীতল হয়।" জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ১৮৫১ অব্দে বিবাহ হয়, ১৮৫৯ অব্দে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। পরিণীত জীবনের সুখের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

"For seven and a-half years that blessing was mine ; for seven and a-half onely ! I can say nothing which could describe, even in the faintest manner, what that loss was and is. But because I know that she would have wished it, I endeavour to make the best of what life I have left, and to work on for her purposes with such diminished strength as can be derived from thoughts of her, and communion with her memory."

ফ্রান্সের অন্তর্গত কোন স্থানে মিলের সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর মিল যত দিন জীবিত ছিলেন, প্রতিবর্ষে কয়েক মাস কাল যাইয়া তিনি স্ত্রীর সমাধিস্থলের নিকটে বাস করিতেন। তিনি আপনার জীবনীতে লিখিয়াছেন:—

"Since then I have sought for such alleviation as my state admitted of, by the mode of life which most enabled me to feel her still near me. I bought a cottage as close as possible to the place where she is buried, and there her daughter (my fellow-sufferer and now my chief comfort) and I live constantly during a great portion of the year. My objects in life are solely those which were hers ; my pursuits and occupations those in which she shared or sympathised, and which are indissolubly associated with her. Her memory is to me a religion, and her approbation the standard by which, summing up as it does all worthiness, I endeavour to regulate my life."

আমার কোন বিশেষ বন্ধু ১৮৮০ অব্দে আপনার পরিণয়-সুখের বিবরণ সহিত এক খানি পত্র লেখেন, তাহা হইতে নিম্নের অংশটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (পত্রের দুই বৎসর আগে তাঁহার ব্রাহ্ম- মতে বিবাহ হইয়াছে)।

"ভাই—

ভালবাসায় এত সুখ, আগে জানিতাম না। বিবাহের পূর্ব্বে সুখী ছিলাম,—বই ছিল, প্রাণের বন্ধুরা ছিলেন, নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল, কোন দিন সুখের অভাব বোধ করি নাই। কিন্তু, ভাই, সে সুখ বর্ত্তমান সুখের সঙ্গে তুলনায় আসিতে পারে না। এ যে মিষ্টতা, ইহার সমান দেখি না। এ যে অমৃতময় রস, মধুরের মধুর, মিষ্টের মিষ্ট, ইহার মিষ্টতার ইয়ত্তা নাই। যত পান করি, আরো পান করিতে ইচ্ছা করে। যত ডুবি, আরো ডুবিতে সাধ করে। এ যে উন্মাদকারী আনন্দ, যেন হৃদয়ে ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। এত মিঠা কোন সুখ নাই—এত তৃপ্তিকর কোন আহ্লাদ নাই—হৃদয়কে এত পূর্ণ করে এমন আনন্দ নাই। ভাই, আমাকে গরিব বলিও না। আমার মত ধনী কে? সময়ে সময়ে ভাবি, কোন্ পুণ্যে আমার ভাগ্যে এত সুখ ঘটিল? কত বিদ্বান্, উন্নতচরিত, বুদ্ধিমান্ লোক আছেন—যাঁহারা আমা অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগকে ফেলিয়া বিধাতা আমাকে কেন এমন সুখী করিলেন? বাস্তবিক, সুখময়ী স্ত্রী পাওয়া যেন অদৃষ্টের গুণ বলিয়াই বোধ হয়। * * * *

"লোকে বলে কোর্টসিপের সুখ বিবাহের পরবর্ত্তী সুখ অপেক্ষা মিষ্টতর। আমার জীবনে এরূপ দেখি না। যিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রী হইয়াছেন, বিবাহ-সময়ে ও অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে ভাল বাসিতাম। কিন্তু সে ভাল বাসা ও এখনকার ভাল বাসা—এ দু'য়ে অনেক প্রভেদ। বর্ত্তমানের গাঢ়তা ও মিষ্টত্ব চিন্তা করিলে পূর্ব্ব-ভালবাসাকে ভালবাসার ছায়া বলিতে হয়। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের এ সুখ চিরদিন বিদ্যমান থাকে। এ সুখের বৃদ্ধি ত কল্পনা করিতে পারি না।

* * * * *

উপরে যেরূপ দাম্পত্য-সুখের উল্লেখ হইল, সকলেই ত বিবাহ করেন, সকলের ভাগ্যে কেন এরূপ সুখ ঘটে না? ইহার কারণ—জ্ঞানাভাব ও চরিত্রের ত্রুটি। পতি ও পত্নীতে যে ভালবাসা হয়, সংসারের অপর কোন স্থলে তেমন গভীর, তেমন মিষ্ট, তেমন মধুরের মধুর ভালবাসা হয় না। দেস্‌দিমোনাকে ছাড়িয়া ওথেলো যুদ্ধে গিয়াছিলেন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে দেখিয়া বলিতেছেন:—

"O my soul's joy!
If after every tempest come such calms,
May the winds blow till they have waken'd
death!
* * * * * *
If it were now to die,
'T were now to be most happy; for, I fear,
My soul hath her content so absolute
That not another comfort like to this
Succeeds in unknown fate."—
(*Othello*, II. i.)

এ কথায় কল্পনা নাই, অত্যুক্তি নাই। দাম্পত্য-সুখ বাস্তবিকই সংসারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। যদিও সকলেই জানি, "যত্ন বিনা রত্ন লাভ হয় না," অথচ সকলেই কার্য্যতঃ বিশ্বাস করি, এই সর্বোৎকৃষ্ট রত্ন লাভের নিমিত্তে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন নাই! হিন্দুসমাজস্থ পিতামাতা যখন কন্যাকে দশ বছর এবং পুত্রকে পনর বছর বয়সে বিবাহ দেন, তাহাদিগকে দাম্পত্য-সুখের জন্য প্রস্তুত করা কিছু মাত্র আবশ্যক বোধ করেন না— করিলে বিবাহ দিতে ভয় করিতেন। ব্রাহ্মসমাজস্থ যুবক যুবতী যখন পরস্পরের সহিত পরিণয়-সূত্রে গ্রথিত হন, তাঁহাদিগকেও এজন্য প্রস্তুত হইতে দেখি না। কিরূপে পাদুকা নির্ম্মাণ করে জানিতে গেলে, ১ বৎসর কি ১॥ বৎসর কাল রীতিমত শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়; সূত্রধর, কর্ম্মকার, নাবিক বা কৃষক হইতে চাহিলে রীতিমত শিক্ষাদ্বারা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু সংসারের সর্বোচ্চ সুখের অধিকারী হওয়ার জন্য কিছু মাত্র বিশেষ শিক্ষা দ্বারা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক নহে! রন্ধনে নিপুণা হইতে চাহিলে কন্যা দীর্ঘকালের শিক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করেন, সঙ্গীতে পারদর্শিতালাভ বহুকাল ব্যাপিনী বিশেষ শিক্ষার উপর নির্ভর করে বুঝিতে পারেন; কিন্তু কিসে স্বামীকে সুখী করিয়া আপনি পরমসুখে সুখী হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিশেষ শিক্ষার আবশ্যকতা দেখেন না! যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল। যে যেমন বপন করে, সে তেমন সংগ্রহ করে। পরম সুখের জন্য প্রস্তুত হই না, পরম সুখ লাভও করি না।

কিরূপে এই সুখের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়? অর্থাৎ কিসে ভাল বাসিতে পারা যায়? ভাল বাসিবার ক্ষমতা স্বাভাবিক,—অল্পাধিক পরিমাণে সক-

লেরই আছে। যাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাতে যদি ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে এমন গুণ থাকে,তবে স্বভাবতঃ তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিবে। ঐ রূপ গুণ যত অধিক ও অধিক পরিমাণে থাকে, তোমার ভালবাসা তত গাঢ় ও স্থায়ী হইবে। তাহা হইলে আলোচ্য এই,—কি গুণে অন্যের প্রণয় আকর্ষণ করে? যথাসাধ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

(১) প্রশংসনীয় যে গুণ থাকে, তাহাতেই অনুরাগ আকৃষ্ট হয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, জ্ঞান (wisdome), বিদ্যা, বাক্‌পটুতা, শৃঙ্খলানুরাগিতা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বাক্‌পটুতা যে একটী বিশেষ আবশ্যকীয় গুণ, বাল্যকালে এ কথা কেহ বলিয়া দেন না; সুতরাং প্রথম হইতে এ জন্যে চেষ্টা হয় না। ইহা আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ ত্রুটি, এবং তদ্দ্বারা জীবনে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। শৃঙ্খলা-প্রিয়তাও অত্যাবশ্যক। ইহার প্রতিও বাল্যকাল হইতে মনোযোগ দেওয়া হয় না বলিয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। পাঠ্যাবস্থা অতীত করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে অনেকে আপনাপন কাজ গুলি যথা সময়ে শেষ করিয়া উঠিতে পারেন না—কাজ বাকী পড়িয়া যায়। শৃঙ্খলার অভাব বলিয়াই এরূপ ঘটে। যিনি শৃঙ্খলা জানেন, তিনি অল্প সময়ে যত অধিক কাজ সমাপ্ত করেন, অপরে তত পারেন না।

যে সকল গুণের কথা বলা হইল, তদপেক্ষা যে গুলিকে নৈতিকগুণ (moral virtues) বলি, তাহা অধিকতর অনুরাগ আকর্ষণ করে। সৎসাহস, ন্যায়পরতা, দয়া, সত্যবাদিতা প্রভৃতি স্বভাবতঃ অন্যের ভালবাসা টানিয়া আনে।

এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। মনুষ্য স্বভাবতঃ শক্তির উপাসক। আমরা কাহারো অসাধারণ ক্ষমতা দেখিলে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকি। সুতরাং বিবাহার্থী পুরুষ বা স্ত্রীর যদি কোন অসাধারণ শক্তি থাকে, তিনি নিশ্চিত স্ত্রীর বা স্বামীর গাঢ় অনুরাগ জন্মাইতে পারিবেন।

(২) যে গুণ থাকিলে অন্যকে আহ্লাদিত করিতে পারি, তাহাতেই তাহার ভালবাসা পাইব।

সৌন্দর্য্য যে প্রথম দর্শনেই অত গভীর ভালবাসা উদ্রিক্ত করে, তাহার কারণ এই। পরিচ্ছন্নতার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে—পরিচ্ছন্নতা আনন্দদায়ক, ইহার বিপরীত গুণ কষ্টকর। প্রফুল্লচিত্ততা একটী মহৎ ধর্ম্ম। প্রফুল্ল ব্যক্তি ভাগ্যবান্ তিনি ধন্য। তিনি অনায়াসে লোককে সুখী

করেন। তাঁহার নিকটে থাকিলে দুঃখিত জনও দুঃখ ভুলিয়া যায়। তাঁহার মধুর হাসি অন্ধকারেও আলো আনয়ন করে।

কিসে ভালবাসা জন্মায় তাহা জানা আবশ্যক বটে; কিন্তু কিসে ভালবাসা বিনষ্ট হয়, তাহা জানা আর আবশ্যক। নবদম্পতী স্বভাবতঃ পরস্পরকে ভাল বাসেন। সে ভালবাসা যদি বজায় থাকে, সংসার স্বর্গধাম হয়—জীবন অমৃতসরোবর হয়—দুঃখ কষ্ট কাহাকেও ছুঁইতে পারে না। কিন্তু হায়, সে প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্বভাব দোষে তাহা কমিয়া যায়। কোন্ কোন্ দোষে কমে, তদ্বিষয় দুই একটা কথা বলা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ক্রোধ। ক্রোধের মত প্রণয়ের শত্রু আর নাই। শুধু দুর্জয় রাগের কথা বলিতেছি না। সামান্য রাগ, irritability, সহজে বিরক্ত হওয়া, অভিমান—সকলই অনুরাগের প্রবল বিনাশক। যিনি রাগ করিতে জানেন না, মান করিতে জানেন না—বিরক্ত হইতে জানেন না, তাঁহার এই স্বর্গীয় গুণ অনেক দোষসত্বেও প্রণয়ীর ভালবাসা বজায় রাখিবে। যিনি রাগ সংযমন করিতে পারেন না, যে পুরুষ সহজে চটিয়া উঠেন, যে নারী সহজে রাগ করেন বা যাঁহার সহজে অভিমান হয়, আমার পরামর্শ এই—তিনি বিবাহ করিবেন না, যদি বিবাহ করেন বেশী সুখের প্রত্যাশা রাখিবেন না। এ কথা যে কত দূর অভ্রান্ত, বলিয়া শেষ করিতে পারি না।—যিনি অতিরিক্ত কলহপ্রিয়, তাঁহার বিবাহ করার প্রয়োজন নাই।*

দ্বিতীয়তঃ, কোন বিষয়ে হঠাৎ-সিদ্ধান্ত (hastily judge) করা। স্ত্রী কোন কাজ করিলে স্বামী সহসা যেন তাঁহার দোষ স্থির করিয়া বসিয়া না থাকেন, স্বামী কোন কাজ করিলে স্ত্রী সহসা যেন তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া না রাখেন। এ দোষটী মহৎ দোষ। ইহা ছাড়িতে না পারিলে ভালবাসা স্থায়ী রাখিবার আশা নাই। যাঁহারা বিবেচনায় খাট, তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ সাবধনতা আবশ্যক,—তাঁহারাই অধিকতর এ দোষে দোষী হন।

তৃতীয়তঃ, অশ্রদ্ধেয় গুণ। মিথ্যাবাদী, ঈর্ষাপরায়ণ, স্বার্থপর, কুৎসাপ্রিয় স্ত্রীর আচরণে স্বামী সুখী হইতে পারেন না, অমন স্বামীর আচরণে স্ত্রীও

---

* একটী কথা বলিয়া রাখি। যে পিতা মাতা সন্তানকে বড় মারেন, গালি দেন বা সহজে তাহার উপর চটেন, তাঁহারা যেন তাহার ভালবাসা পাইবার প্রত্যাশা করেন না।

সুখী হইতে পারেন না। যাহাতে ক্ষুদ্রতা বা নীচাশয়তা ও অশ্রদ্ধা জন্মায়, যিনি ভালবাসা চাহেন, তাঁহার উহা ত্যাগ করা আবশ্যক।

চতুর্থতঃ, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব। যাঁহার বুদ্ধির জোর নাই, তিনি গভীর ভালবাসা উদ্রিক্ত করিতে পারিলেও রক্ষা করিতে পারিবেন না। শত শত বার অন্যের পরামর্শের উপর নির্ভর না করিয়া, নিজের বুদ্ধির অনুযায়ী কাজ চালাইতে হয়। যদি ভ্রমে পড়, ক্রমে প্রণয়ীর অশ্রদ্ধাভাজন হইবে। বিদ্যোপার্জ্জনের সময়ে যাঁহারা বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার উপায় অবহেলা করেন, তাঁহাদের যেন মনে থাকে, তাঁহারা আপন সুখের পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন।

পঞ্চমতঃ, সন্দিগ্ধচিত্ততা। বিশ্বাস বন্ধুত্বের প্রাণ। যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে না পারেন, তিনি বিবাহ করিতে পারেন বটে,—কিন্তু যেন সুখের আশায় না করেন। আমার পরিচিত কোন উকীল এক দিন কথায় কথায় প্রকাশ করিলেন, তিনি মাকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন না! আমার মনে হইল, "ভাই, তোমার ভাগ্যে সুখ নাই।"

ষষ্ঠতঃ, আলস্য। যদি আলস্যকে বড় ভাল বাস, গাঢ় দাম্পত্য-সুখের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। পরিশ্রমশীলতা একটী মহৎ ধর্ম্ম। যদি শ্রদ্ধাভাজন হইতে চাও, অলসতা ছাড়। পরিশ্রমেই সুখ। অসৎকাজ ভিন্ন অপর কাজকে ঘৃণা করিতে নাই। সামান্য কাজও আবশ্যক হইলে করিতে প্রস্তুত হইও। যিনি মনে করেন, দাসদাসীর অধিস্বামিনী হইয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া গল্প করাই সার সুখ, তিনি সেই 'সার সুখ' পাইতে পারেন—অপর সুখ পাইবেন না। অলসকে কে না ঘৃণা করে? সকলেরই জীবনের একটা সৎ উদ্দেশ্য থাকা উচিত। এমন একটা কাজ হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়, যাহা শীঘ্র শেষ হয় না এবং দৈনিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াই যাহাতে লিপ্ত হইতে পারা যায়। এমন কাজ থাকিলে জীবন ভার-বহ বা শূন্য বোধ হয় না।

সপ্তমতঃ, যিনি প্রকৃত দাম্পত্য-সুখের অভিলাষ করেন, তিনি যেন ভোগবিলাসিতাকে জীবনের সার স্থির না করেন। যে ধন ঐশ্বর্য্য বিবাহ করে, সে ধন ঐশ্বর্য্য পায়, সুখ পায় না। যে বস্ত্রালঙ্কার এক মাত্র প্রার্থনীয় মনে করে, সে বস্ত্রালঙ্কার পাইতে পারে—স্বর্গীয় সুখ পাইবে না। তবে কি না, বানর বানরের সুখ ছাড়া অপর সুখ জানে না, শূকর শূকরীর

সুখের অতীত কোন সুখ কল্পনা করিতে পারে না। এ প্রবন্ধ তাহাদের জন্যে লেখা হয় নাই। অপর সকলকে অনুরোধ করি—তাঁহারা এমন সদ্‌গুণের প্রয়াসী হউন এবং এমন সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করুন, যাহাঁতে অন্যের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়। যে স্বামীর স্ত্রীর প্রতি, যে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাঁহারাই যথার্থ সুখে সুখী হইতে পারেন। তাঁহাদের প্রণয় গভীর, স্থায়ী, পাহাড়ের মত অটল; তাহার ক্ষয় নাই।

যে সকল গুণের কথা বলা হইল তাহা না থাকিলে, যে সকল দোষের কথা বলিলাম তাহা থাকিলে, কেহ বিবাহ করিবেন না, এরূপ নির্দ্দেশ আমার অভিপ্রায় নহে। যাঁহাদের সে সকল গুণ আছে, দোষ নাই, তাঁহারা ভাগ্যবান্—তাঁহারা পরম সুখের অধিকারী। অপর সকলে বিবাহ করিবেন না এমন হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহারা যেন উচ্চ সুখের আশা না করেন। উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া যে সুখ কল্পনা করিয়া রাখা হইয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয় যে, সেই সুখ লাভের উপযোগী কি গুণ আছে? যিনি জিজ্ঞাসা করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, তিনি সাবধান, বিবেচনাশীল। অপর সকলকে আশা-ভঙ্গ জন্য নিয়ত কষ্ট পাইতে হইবে।

জাতীয় ভাব, উন্নতি ও একতা।

মানবসমাজ এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। উত্তরোত্তর ইহা উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সমাজের শৈশবাবস্থার ইতিহাস যদি প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার যে কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা তুলনা করিয়া দেখান যাইত। যে সময়ের ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহার সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলেও সমাজ যে সকল বিষয়ে উন্নত হইয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সাধারণতঃ, যদিও কেহ উন্নতি অস্বীকার করেন না, অনেকে স্বজাতি-অনুরাগ, স্বধর্ম্মানুরাগ, স্বদেশানুরাগ নিবন্ধন এরূপ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের স্বদেশে এককালে যে উন্নতি হইয়াছিল, জগতে এপর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু হয় নাই। ইহারা স্থিতি-বাদী নহেন, কারণ অন্যান্য সকল বিষয়ে উন্নতি স্বীকার করেন; কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্যজাতি সেই ঐতিহাসিক সময়ের প্রাক্‌কালে যাহা করিয়া

গিয়াছেন, তাহার উপর আর উন্নতি হয় নাই, ইহাতে তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস। কোন বিশেষ তত্ত্বে আর্য্যজাতি বর্ত্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন বলিলেও এক দিন লোকের অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হইত; কিন্তু যখন আর্য্য জাতিকে সর্ব্বতত্ত্ব-বিশারদ বলিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করা হয়, তখন লোকের সহিষ্ণুতা থাকা সম্ভবপর নহে। তখন আর সে বাক্যের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি হয় না, তখন বিজ্ঞসমাজ সেই উক্তিকে স্বদেশ পক্ষপাত-দোষাশ্রিত বলিয়া অগ্রাহ্য করেন।

কতকগুলি লোকের এই প্রকার সংস্কার যে, ভারতবর্ষে সকল প্রকার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা সেই জন্য সমস্ত প্রাচীন প্রথা পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহেন। নূতন প্রণালী ও সংস্কারের ইহারা অত্যন্ত বিরোধী। ইহারা বলেন পৌত্তলিকতার ন্যায় আর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রণালী হইতে পারে না এবং সেই জন্য পৌত্তলিকতা-সংরক্ষণী সভা করিতেছেন, পৌত্তলিকতা প্রচার করিতেছেন, পৌত্তলিকতা বিরোধীদিগকে ভ্রান্ত বলিতেছেন, নিরাকার উপাসনা অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। আমাদের দেশে যে জাতিভেদ প্রথা এক সময়ে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, যাঁহারা শূদ্র তাঁহাদিগকে কেবল ব্রাহ্মণের দাসত্বে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, এখন ইংরাজীশিক্ষার প্রসাদে সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আবার সেই জাতিভেদের নিগূঢ় কল্যাণকর কৌশলের প্রশংসা করিতেছেন! যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা ইংরাজ দিগের কার্য্যালয় হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় জাতিভেদ-প্রথা সমাজ সংরক্ষার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, মধ্য সময়ে তাহা রহিত হয়। যদি ঐ সকল লোককে জিজ্ঞাসা করা যায় যে কোন্ প্রথাটী ভাল, তাঁহারা বলিবেন যে, যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা ভালই ছিল, এখন নাই তাহাও ভাল, কারণ উভয় প্রথাই ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির প্রথা।

যাঁহারা এই প্রাচীন প্রথা সকল সংরক্ষার জন্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে কোন জাতি অন্য-সাহায্য ব্যতীত উন্নত হইতে পারে না। কোন মনুষ্য যেমন অভ্রান্ত নহে, সেইরূপ কোন জাতিও অভ্রান্ত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের সকল আচার ব্যবহার যে নির্দ্দোষ ছিল, তাহা কখনই বলা যায় না। তাহাহইলে সংশোধন আবশ্যক হইত না,

সমস্ত প্রাচীন রীতি এখনো প্রচলিত থাকিত। কিন্তু কাল-সহকারে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীন পদ্ধতি সকল এখনকার সময়ের উপযোগী নহে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে প্রকার অবস্থা ছিল, লোকের যে প্রকার অভাব ছিল, তদনুরূপ নিয়ম তখন প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু এখনও কি সেই অবস্থা ও সেই অভাব আছে? তখন ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রালোচনা করিতেন, লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন, তাঁহাদের অন্য কোন কার্য্য ছিল না। তখন আমাদের দেশের রাজা ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিতেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে অন্য কর্ম্ম করিতে হইত না। এখন আমাদের রাজা বিদেশীয় এবং ব্রাহ্মণ জাতির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কত বৃদ্ধি হইয়াছে। রাজা সকল ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের সে প্রকার মতও নহে যে, এক বিশেষ জাতিকে এইরূপ প্রতিপালন করিবেন; সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ক্রমে অন্য বৃত্তিসকল অবলম্বন করিতেছেন। সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের এই ফল। আবার লোকের মতও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের যখন অন্য জাতির সহিত বড় ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যত দিন আপনাদের আদর্শেই চলিতাম, তখন আপনাদের আচার ব্যবহারের দোষ গুণ বিচার করিতে পারিতাম না, যাহা কিছু সকলই ভাল বোধ হইত। কিন্তু যখন অন্য আদর্শ সম্মুখে আসিল, তখন তাহার সহিত আমাদের আচারের তুলনা করিতে লাগিলাম এবং যাহা কিছু বিদেশীয় আচারের মধ্যে ভাল বোধ হইল তাহা অনুকরণ করিতে লাগিলাম, এবং আপনাদের মধ্যে মন্দ ভাগগুলি পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম। এইরূপে আমরা কত বিদেশীয় আচার পদ্ধতি অনুকরণ করিতেছি।

আর এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা যাহা কিছু দেশীয় তাহাই ঘৃণা করেন এবং যাহা কিছু বিদেশীয় তাহাই অনুকরণ করেন। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষে কোন উন্নতিই হয় নাই। এদেশে প্রকৃত সভ্যতা কখনও ছিল না। আমাদিগকে সকল পুরাতন পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং নূতন সকল প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আমাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, আচার ব্যবহার সকলই অসভ্যাবস্থার পরিচয় দিতেছে। সভ্যতার আদর্শ ইংরেজ।

এই দুই সম্প্রদায়ের লোকই প্রকৃত ভাব দ্বারা এখনো পরিচালিত হয়েন

নাই। এই উভয় পক্ষের একটী সন্ধিস্থল আছে, সেখানে উপনীত না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। ভারতবর্ষে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহাই পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করিয়া বসিয়া থাকিলে আমরা উন্নতির সংগ্রামে নিশ্চয়ই পরাস্ত হইব এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বসঞ্চিত ধন সকল, স্বজাতীয় গৌরবের ইতিহাস সকল, স্বদেশ-বাসীদিগের কীর্ত্তি সকল অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া, সমস্তই কেবল অণুকরণ করিতে গেলে জাতীয়স্বভাব হারাইব। স্বজাতীয় পূর্ব্বমহত্ব স্মরণ হইলে মনুষ্যের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, সেই মহত্ব পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা হয়। আমাদের দেশে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কবিত্ব, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বাহুল্যরূপে প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের স্মরণ হয় যে পঠদ্দশায় আমরা মনে করিতাম যে, আমাদের দেশে কেবল পৌত্তলিক ধর্ম্মই আছে, একেশ্বরবাদ কখন ছিল না। গৃহে এবং পাঠ্যপুস্তকে ভয়ানক বিরোধ দেখিতাম। গৃহে পৌত্তলিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কুসংস্কার, এবং ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকে একেশ্বরবাদ ও মার্জ্জিত সংস্কার। আমাদের দেশের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল তখনও বাহুল্যরূপে প্রচার হয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের উপন্যাস মিশ্রিত সত্য সকল নবীন উৎসাহের মুখে কি দাঁড়াইতে পারে? তাহাও আবার কেবল কীর্ত্তিবাসী ও কাশিদাসী পদ্যে? এইজন্য কত যুবক যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। আমরাও খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং যদি সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রকাশিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ আমাদের হাতে পতিত না হইত, হয়ত সেই উদ্যমে খৃষ্ট-ধর্ম্ম আশ্রয় করিতাম। রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র-প্রচারের পথ প্রমুক্ত করিয়া এদেশের যে কি অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। এখন আমাদের বেদ, উপনিষৎ, দর্শন ও পুরাণ সকল প্রতি গৃহে দেখিতে পাওয়া যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি শাস্ত্রের কঠোর-শাসন লোকে মানিত, তাহা হইলে কি বেদ কেহ প্রচার করিতে সাহসী হইত? কিন্তু সময়ের গুণে সে বাধা এখন তিরোহিত হইয়াছে। সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে এইরূপে অগ্রসর হইতেছে। এখন প্রাচীন রীতি সংরক্ষণ করা কঠিন। যাহা কিছু যুক্তিসিদ্ধ, ন্যায়সঙ্গত তাহাই কেবল সমাদৃত হইবে; কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ ও অন্যায় প্রথা সকল আদৃত হইবার আর সময় নাই। প্রত্ন-সংরক্ষণকারীদিগকে সেই জন্য উদারতা আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহারা যদি শাস্ত্রশাসন দেখাইয়া

লোককে ভীত করিতে যান, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন না। লোকে এখন আর বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করে না। হিন্দু-সমাজের বক্ষে বসিয়া প্রকাশ্যে এখন এই কথা লোকে বলিতেছে, কিন্তু কাহার কিছু বলিবার সামর্থ্য নাই।

বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি সমাজের ভিত্তি হওয়া উচিত। যদি দ্বেষ, স্বার্থপরতা, অন্যায় ও অত্যাচার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করা হয়, তাহাতে কখন সমাজ গঠিত হইতে পারে না। আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজ ধর্ম্মনীতির উপর সংস্থাপিত ছিল বলিয়াই তাহার উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যকালে সমাজ মধ্যে স্বার্থপরতা আসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে এই দুর্দ্দশায় নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রাচীন কালে স্ত্রীজাতির জ্ঞান ধর্ম্মে পারদর্শিতা ছিল, পুরুষদিগের মধ্যে ধর্ম্মহীন লোক বিরল ছিল, সমাজ মধ্যে সেই জন্য সুনীতি ও কুশল বিরাজমান ছিল। এখন ধর্ম্মহীন লোকের সংখ্যা অধিক। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, লোকের ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস শিথিল হইতেছে, অনেকের একেবারেই নির্ব্বাণ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মনীতি থাকিতে পারে না। ধর্ম্মহীন সমাজ ও জাতীয় মহত্বও সম্ভব নহে। আমাদের সমাজের মধ্যে এখন সেই জন্য ধর্ম্মভাব যাহাতে লোকের মনে বদ্ধমূল হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। কোন ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের কোন আধিপত্য থাকিবে না। একজন যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, প্রেরিত দূত অথবা অবতার বলিয়া কাহারও উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিবেন, তাহা করিতে দেওয়া হইবে না। এইরূপ বিভীষিকা দেখাইয়াই প্রভুতাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্ম-যাজকেরা সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমরা আর সেরূপ যাজকীয় প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইতে দিব না। সেই জন্য ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সংশয়বাদ বিনাশ করিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ ন্যায়পরতার উপর সমাজের ভিত্তি হইবে। কোন মনুষ্য অন্যায় পূর্ব্বক কাহারও অধিকার হরণ করিবেন না। সকলকে উন্নতি বিষয়ে সমান অধিকার দিতে হইবে। জাতিভেদ বিনাশ করিতে হইবে। কেহ জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিবেন, আর কাহাকেও তাহা হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে, এরূপ অন্যায় আচরণ সমাজে থাকিবে না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই উন্নতিলাভে অধিকারী হইবেন। এখন আমাদের সমাজে স্ত্রী জাতিকে তাহার অঙ্গস্বরূপই গণনা করা হয় না।

পুরুষ লইয়াই আমাদের সমাজ। পুরুষে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেছে, সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ বিচার করিতেছে, বিবাদ করিবার ভার কেবল স্ত্রীলোকদিগকে দেওয়া হইয়াছে। পুরুষের সকল স্বাধীনতা, নারীর কেবল পরাধীনতা। পুরুষ একবারে বা পর্য্যায়ক্রমে শত স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু স্ত্রী একবার বিধবা হইলে জন্মের মত বিধবা। এ প্রকার অন্যায় প্রথার উপর সমাজ থাকিতে পারে না।

সমাজের প্রত্যেক লোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। আহার, পরিচ্ছদ, জ্ঞান ও ধর্ম্মোপার্জ্জন, এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র নিষেধ থাকিবে না। আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মানুসারে,এক শত লোক একটী সমাজে থাকিতে পারে না। বঙ্গদেশের লোক মৎস্যাহারী বলিয়া পশ্চিমাঞ্চলে ঘৃণিত, একেশ্বরবাদীদিগের নিকট পৌত্তলিকগণ ঘৃণিত, পৌত্তলিকদিগের নিকট ব্রাহ্ম ঘৃণিত, ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী এতদ্দেশীয় যুবকেরা অন্যান্য লোকের নিকট ঘৃণিত, এ অবস্থায় কাহাকে লইয়া সমাজ গঠিত হইবে? যে কয়েকজন লোক মুখে হিন্দুয়ানির পরাকাষ্ঠা দেখান, আর গোপনে সকল অধর্ম্মই করিয়া থাকেন, তাঁহারা কয়েক জন সমাজ গঠন করিবেন, তাঁহাদের মহা ভ্রম যে এ প্রকার বাসনা তাঁহাদের অন্তরে উপস্থিত হয়। তাঁহারা বলেন, দুই চারি জন লোক বিলাতে গিয়া জাতিভ্রষ্ট হয়, তাঁহাদের জন্য কি সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইবে? আমরা বলি সেইরূপ চারি জন সিবিলিয়ান ও তোমাদের ন্যায় চারি সহস্র লোক সমান হইতে পারে না। যদি সামাজিক নিয়ম বর্ত্তমান কালের উন্নতির প্রতিরোধ করে, সে সামাজিক নিয়ম রাখিবার জন্য চেষ্টা করা বিফল হইবে। যে সকল লোক জ্ঞান, পদমর্য্যাদা ও সদ্গুণে ভূষিত, তাঁহারা পরিত্যক্ত ও পতিত, আর তুমি আমি সমাজের কর্ত্তা! ইহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, নীতি বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কথা।

যে যে কারণে জাতীয় উন্নতি ও একতা সাধনের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ, জাতিভেদ এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা। আমরা কেবল বঙ্গদেশীয় আহার ও বিবাহ-মূলক জাতিভেদের কথা বলিতেছি না। এক প্রদেশের লোক আর এক প্রদেশের লোকের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, সেই জাতীয় বিদ্বেষ এস্থলে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই বিদ্বেষ ভাবের জন্য বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীর মধ্যে ঐক্য নাই। বাঙ্গালীর উন্নতিতে হিন্দু-

স্থানীর হিংসা, হিন্দুস্থানীর উন্নতিতে বাঙ্গালীর হিংসা; এইরূপ বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রভৃতি পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হিংসাভাব থাকিলে ভারতবর্ষের কখনই উন্নতি হইবে না। আমরা স্বীকার করি, অনেক পরিমাণে এই বিদ্বেষভাব ক্রমে হ্রাস হইতেছে, সম্প্রতি কয়েকটী ঘটনা দ্বারা এই শুভ পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে; কিন্তু আমরা আরও অধিক ঘনিষ্ঠতা ও যোগ দেখিতে চাই। সকল প্রদেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তি-দিগের মধ্যে এরূপ একতা চাই যে, তাঁহারা সকল কার্য্যে পরস্পরকে সাহায্য করিবেন। কোন সংস্কার কার্য্য করিতে হইলে সকলে সম্মিলিত হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন। বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, বোম্বাই নগরে বেরামজী মালাবারী মহাশয়ও এই হিতব্রতে নিযুক্ত; কিন্তু বোধ হয় উভয়ে এক প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চান না, মালাবারী মহাশয় কিছু চান। আমাদের বোধ হয় যে মালাবারী মহাশয় প্রবীণ ও বহুদর্শী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অধিকতর সফলতা লাভ করিতেন। তিনি যে আকারে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশের কোন পত্রিকা প্রতিপোষকতা করিতেছে না। আমরা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, এইরূপ সকল প্রদেশের প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে একতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা ভারতবর্ষ ক্ষত বিক্ষত। এক বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিকের মধ্যে যুদ্ধ, ব্রাহ্মদিগের ঘরে ঘরে যুদ্ধ, পৌত্তলিক-দিগের সিবিরেও এইরূপ যুদ্ধ। আবার বঙ্গদেশের সহিত অন্যান্য দেশের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রাম। কোন সংস্কার কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে গেলে সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে। এ অবস্থায় সংস্কার ও উন্নতি অসম্ভব। ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা শিক্ষা না করিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি কখনই হইবে না। অবশ্য নাস্তিকতা ও ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধাচরণ বিষয়ে উদারতা থাকা উচিত নহে, কিন্তু যতক্ষণ লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও নীতি পরায়ণ থাকিবে, তাহাদিগের মতের বিভিন্নতা জন্য বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অত্যাচার করা অবিধেয়।

বাল্য-বিবাহ প্রথা আমাদের দেশের উন্নতির আর একটী অন্তরায়। এই বাল্য-বিবাহ নিবন্ধন আমাদের শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য নষ্ট হইতেছে,

আয়ুক্ষয় হইতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শতায়ু হইতেন, এখন পঞ্চাশৎবর্ষ অতিক্রম করাই কঠিন হইয়াছে। পূর্ব্বেও বাল্য বিবাহ ছিল, কিন্তু কতকগুলি শাস্ত্রশাসন থাকাতে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল যাহা এখন আমরা ভোগ করিতেছি, তাহা বিদ্যমান ছিল না। এখন শাস্ত্র-শাসন নাই, কিন্তু বাল্য-বিবাহ সেইরূপই আছে। শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এখনকার সময়ে অসম্ভব, সেই জন্য বিবাহ প্রথা সংস্কার করা আবশ্যক। বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকায় স্ত্রীজাতির উন্নতি অসম্ভব হইয়াছে। বালিকাবস্থায় যাহাকে গৃহিণী হইতে হয়, তাহার নিজ উন্নতির অবসর থাকে না। অতএব বাল্য-বিবাহ দ্বারা যেমন পুরুষ জাতির আয়ুক্ষয় হইতেছে, স্ত্রী জাতিরও সেইরূপ আয়ুক্ষয় হইতেছে ও উন্নতি হইতেছে না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে।

ব্যভিচার ও সুরাপান দ্বারা সমাজের অনেক লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আমরা অনেকগুলি গুণবান্ লোককে এইরূপে হারাইয়াছি। তাঁহারা যদি দীর্ঘায়ু হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা সমাজের অনেক কল্যাণ সাধিত হইত। সমাজের মধ্যে যদি উন্নত চরিত্রের লোক না থাকে, যদি প্রধান প্রধান লোকের চরিত্র আদর্শস্বরূপ না হয়, সে সমাজের কল্যাণ নাই। অতএব যাঁহারা সমাজের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকেন, যাঁহাদের দৃষ্টান্ত লোকে অনুকরণ করে, যাঁহারা সাধারণকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের চরিত্র বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী কারণ মাত্র উল্লেখ করিলাম। এই সমস্ত অত্যাচার তিরোহিত না হইলে আমাদের সমাজ কখনও উন্নত হইতে পারিবে না। ধর্ম্ম-নীতি ও বিশুদ্ধ সামাজিক নিয়ম সকল উন্নতির মূল। তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি ও একতা কখনই সংসাধিত হইবে না।

জীবন মরণ।

ওরা যায়, এরা করে বাস ;
অন্ধকার উত্তর বাতাস
বহিয়া কত না হা-হুতাশ
ধূলি আর মানুষের প্রাণ
উড়াইয়া করিছে প্রয়াণ।
আঁধারেতে রয়েছি বসিয়া ;
এক(ই) বায়ু যেতেছে শ্বসিয়া
মানুষের মাথার উপরে,
অরণ্যের পল্লবের স্তরে।

যে থাকে সে গেলদের কয়,
"অভাগা কোথায় পেলি লয় !
আর না শুনিবি তুই কথা,
আর না হেরিবি তরু লতা,
চলেছিস্ মাটিতে মিশিতে,
ঘুমাইতে আঁধার নিশীথে।"

যে যায় সে এই ব'লে যায়,
"তোদের কিছুই নাই হায়,
অশ্রুজল সাক্ষী আছে তায়।
সুখ যশ হেথা কোথা আছে
সত্য যা' তা' মৃতদেরি কাছে।
জীব, তোরা ছায়া, তোরা মৃত,
আমরাই জীবন্ত প্রকৃত।"

Victor Hugo হইতে অনুবাদিত।

সংগীত।

রাগিণী বড়হংস সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ
তাঁর জগত মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা মগন
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দ রে।
বিহগগীত গগন ছায়,
জলদ গায়, জলধি গায়
মহা পবন হরষে ধায়
গাহে গিরি কন্দরে।
কতকত শত ভকত প্রাণ,
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম
টুটিছে মোহ বন্ধ রে।

রাগিণী আসাবারি—তাল ঝাঁপতাল।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকসিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে॥
সে পুণ্য-নির্ঝর-স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃত ধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ন নীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে॥
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দ রস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহেনা সংসার তাপ সংসার-মাঝারে র'য়ে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদর্শ।

কে জানে যে কত বর্ষ হয়েছে অন্তর
মানবের খোঁজ-হারা অরণ্য ভিতর
পাষাণে খোদিয়া আনা মুর্ত্তির মতন
মহাধ্যানে মহামুনি মুদিয়া নয়ন।
ঈষদ্ হাস্যের রেখা ওষ্ঠ দুটি চিরে
আত্মার সম্বাদ তার আনিল বাহিরে—
দেখিছেন ধ্যানে ঋষি প্রশান্ত হৃদয়
স্থির প্রলয়ের কোলে নিদ্রিত প্রলয়।
ভুলিয়া গিয়াছে ঋষি বাহ্য পরকাশ
নাহি চন্দ্র নাহি সূর্য্য সাজায়ে আকাশ।
কোথায় আছেন ঋষি? কোথা বসুন্ধরা
অরণ্য প্রান্তর গিরি তৃণ গুল্ম ভরা?
বহিতে অনিল নাই জ্বলিতে অনল,
সকলি অদৃশ্য আজি, সকলি নিশ্চল!
দিক্ কি দিগন্ত নাই; বিন্দুতে মিশিয়া
রয়েছে অনন্ত শূন্য স্তম্ভিত হইয়া।
কেবল একটি প্রাণ অবাত-কম্পিত
আপনা আপনি আছে হ'য়ে জাগরিত।
আনন্দ সেখানে ধীর শুভ্র পরকাশ,
তাই আচম্বিতে হেরি ঋষির উল্লাস।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

সারধর্ম্ম।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমাদিগের প্রথম প্রস্তাবে সারধর্ম্মের গুরুত্ব ও ধর্ম্ম প্রচারের একটী কল্পিত আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীরা ক্রমে সারধর্ম্মের গুরুত্বানুভব ও ঐ আদর্শের কিরূপ নিকটবর্ত্তী হইতেছেন।

আমাদিগের প্রথম প্রস্তাবে সার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রচারের তিনটী লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম, মতামত লইয়া তর্ক ও বিবাদ অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান; দ্বিতীয়, প্রচার সময়ে মতামত লইয়া তর্ক ও বিবাদ অপেক্ষা ধর্ম্মের সারভাগ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের উপর বিশেষ জোর প্রদান; তৃতীয়, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য প্রদর্শন করিয়া সকল মনুষ্যের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন।

ইউরোপ খণ্ডের অনেক বিজ্ঞ খ্রীষ্টীয়ানেরা অন্যান্য ধর্ম্ম কেবল ভ্রমময় নহে, তাহাতে সত্য আছে, মুক্তকণ্ঠে এক্ষণে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বকার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকেরা যেরূপ উগ্রভাবে অন্যান্য ধর্ম্ম আক্রমণ করিতেন, তাঁহারা সেরূপ করেন না; তাঁহাদিগের মত এক্ষণে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, অন্যান্য ধর্ম্ম উগ্রভাবে আক্রমণ না করিয়া তাহাতে যে সকল সত্য আছে, তাহা পত্তন-ভূমি করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করা আবশ্যক। এ বিষয়ে খ্রীষ্টীয় জগতের মত ক্রমে উদার ভাব ধারণ করিতেছে। বিজ্ঞ খ্রীষ্টীয়ানেরা এক্ষণে বুঝিতেছেন যে, লোককে চটাইয়া নূতন ধর্ম্মে আনা যায় না। ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি উদার খ্রীষ্টীয়ানেরা একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, সে সভা হইতে প্রচারক সকল পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরিত হইবে, সেই প্রচারকেরা ধর্ম্ম প্রচারকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মতামত অপেক্ষা তাহার সারভাগ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের আবশ্যকতার প্রতি বিশেষ জোর দিবেন। কিছু দিন হইল উক্ত সভার সম্পাদক তাঁহাদিগের সভার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি

প্রার্থনা করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে পত্র লিখিয়াছেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে স্থফী নামক এক সম্প্রদায় আছে। তাঁহাদিগের মত এই যে, সকল জাতিই সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও প্রকারে পূজা করিয়া থাকে। স্থফী কবি হাফেজ বলিয়াছেন যে কি মষিদ, কি গির্জা সকলই ঈশ্বর প্রেমের স্থান। এই সম্প্রদায়ের জনৈক কবি তাঁহার কবিতাতে ঈশ্বরের ঔদার্য্য বিষয়ে একটী স্থন্দর আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকা এই যে, দেবদূত জিব্রিল— যাঁহাকে ইংরাজেরা গেব্রিয়েল বলিয়া ডাকে, তিনি—এক দিন ঈশ্বরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার ভক্তদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ঈশ্বর উত্তর করিলেন, অমুক মন্দিরে যাও, সেখানে দেখিবে একটী ব্যক্তি উপাসনা করিতেছে, সেই আমার ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জিব্রিল তথায় গিয়া দেখিলেন যে, উক্ত মন্দিরে একটী লোক একটী পুত্তলিকা সমীপে অত্যন্ত ভক্তির সহিত প্রণত হইয়া তাহার উপাসনা করিতেছে। জিব্রিল তাহাকে পুত্তলিকার পূজা করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া ঈশ্বরকে আসিয়া বলিলেন যে, তুমি যে ব্যক্তির কথা বলিয়াছিলে, সে যে পৌত্ত-লিক, সে তোমার প্রকৃত ভক্ত কি প্রকারে হইতে পারে? ঈশ্বর উত্তর করি-লেন যে, ঐ ব্যক্তির চিত্ত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াও ধর্ম্মের অনির্ব্বচ-নীয় শান্তি উপভোগ করিতেছে। কি উদার ভাব! স্থফী কবিদিগের কবিতা ও গীত সকল এইরূপ উদারভাবে পরিপূর্ণ। স্থফী কবিরা বলেন যে, ঈশ্বর প্রেমই সারধর্ম্ম এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা সেই একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে। তাঁহারা সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য প্রদর্শন করিয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন করিতে যত্নবান্। এই স্থফী কবিদিগের কবিতা ও গীত কৃতবিদ্য মুসলমানদিগের অত্যন্ত প্রিয়; অতএব মুসলমানেরা যে ক্রমে সারধর্ম্মের গুরুত্ব অনুভব করিতেছেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। *

হিন্দুধর্ম্ম যেমন সারধর্ম্মের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছে, এমন খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের অত্যন্ত অগ্রসর সম্প্রদায় সকলও করে নাই।

* ব্রাহ্মেরা পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া স্থফী কবিদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক উপকার লাভ করিতে পারেন।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক ও বিবাদ হইতে যেমন বিরত, এমন অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা নহেন। সকল হিন্দুরা এরূপ বিশ্বাস করেন যে, যে জাতির যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম যাজন করিলেই সেই জাতি পরিত্রাত হইবে। এই বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মের মত যেরূপ উদার, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের নহে। সকল হিন্দু মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেন, যে যেরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করে, করুণাময় ভক্তবৎসল ঈশ্বর তাহার সেই ভজনা গ্রহণ করিয়া নিজে তাহাকে তিনি সেইরূপ ভজেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে স্তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, হিন্দুরা ঈশ্বর-ভক্তিকে সারধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম উপধর্ম্ম ও ক্রিয়া-কলাপের প্রাচুর্য্য দ্বারা এমনি আচ্ছন্ন যে, সারধর্ম্মের প্রতি লোকের দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা এমনি প্রচার-বিমুখ যে হিন্দুধর্ম্মে যে সকল চমৎকার উদার ভাব আছে, তদ্দ্বারা জগতের উপকারের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ ব্রাহ্মধর্ম্ম সারধর্ম্মের গুরুত্ব যেরূপ অনুভব করিয়াছে এবং সেই ধর্ম্ম ও প্রচারের প্রতি যেরূপ মনোযোগী, এমন অন্য কোন ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ধর্ম্ম-মত লইয়া তর্ক ও বিবাদ অপেক্ষা সারধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রচারের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত যেরূপ বিবাদ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেরূপ করেন না; এক্ষণে অনেক পরিমাণে ধর্ম্ম-বিবাদ হইতে বিরত হইয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মেরা অন্য ধর্ম্মকে আক্রমণ না করিয়া উপাসনা দ্বারা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন দ্বারা অন্য লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মে আনিতে চেষ্টা করেন। যদি কখনও কোন ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হয়েন, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ না করিয়া কেবল সারবান্ যুক্তি ও সেই ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা—অর্থাৎ সেই ধর্ম্মের নিজের কথা দ্বারাই—তাহাকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ ও পরকাল বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের যে বিশেষ মত আছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কালে সেই বিশেষ মত বিষয়ে উপদেশের প্রতি তাঁহারা যেরূপ মনোযোগ প্রদান করেন, তদপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিষয়ে—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন বিষয়ে—উপদেশ দিতে অধিকতর মনোযোগী। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সত্য গ্রহণ করিয়া সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রেম

সংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হয়েন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ব্রাহ্মেরা পৌত্ত-লিক হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ উদারভাবাপন্ন, নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত মত বিভেদ হইলে তাহাদিগের প্রতি সেরূপ উদারতা দেখান না। কিন্তু খুব সম্প্রতি এই ভাবের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। এক্ষণে ব্রাহ্ম-সমাজ যে তিন ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-প্রমুখ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—যাহার সভ্যেরা ব্রাহ্মধর্ম্মকেই নববিধান ধর্ম্ম বলেন—নিজ নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া এই তিন সমাজের এক্ষণে মিলের দিকে গতি হইতেছে। পরিশেষে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা বলা যায় না।

মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনিই মনুষ্যের ধর্ম্ম মতও ভিন্ন ভিন্ন। কতকগুলি মনুষ্য ধর্ম্ম বিষয়ে এক মত হইলে সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া থাকে। সম্প্রদায় বদ্ধ হওয়া ও সাম্প্রদায়িক মত প্রচার করা স্বাভাবিক; কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উচিত যে সারধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে। উপরে প্রদর্শিত হইল যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক সারধর্ম্মের গুরুত্ব ক্রমে অনুভব করিয়া তাহার অনুষ্ঠান ও প্রচারের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে এবং এ বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ মনোযোগী এমন অন্য কোন ধর্ম্ম নহে। এমত ভরসা করা যাইতে পারে যে, এমন সময় পৃথিবীতে আসিবে, যখন ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের মতাংশ অপেক্ষা তাহার সারভাগ প্রচারে অধিকতর যত্নবান্ হইবে এবং পরস্পরের ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য সন্দর্শন করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য আনয়ন পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল প্রচ-লিত ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মদিগের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, প্রচার সময়ে সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এই শান্তি ও ভ্রাতৃভাবের রাজ্য শীঘ্র আনয়ন করেন। তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য, "Strengthening the bonds of union between men of all religious persuasion and creeds." আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্ট-ডীডের এই মহৎ উদার বাক্য অনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করেন।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

বিশ্বাসবিপ্লব।

যেমন এক সময় এক জাতীয় শিক্ষা, দর্শন, পরীক্ষা ও চিন্তা দ্বারা মানুষের মনে এক প্রণালীর বিশ্বাসাদি স্থাপিত হয়, তেমন অন্য সময় আবার অন্য জাতীয় শিক্ষা, দর্শন, পরীক্ষা ও চিন্তাদি দ্বারা পূর্ব্ব কালের স্থাপিত বিশ্বাস সকল অংশে কি সাকল্যে বিনষ্ট হইয়া তাহাদের যায়গায় নূতন প্রণালীর বিশ্বাস সমস্ত জন্মে। সুতরাং শিক্ষা, দর্শন, পরীক্ষাদিকে নদী-প্রবাহ এবং ইহাদের ক্রিয়াবলকে স্রোতস্থ বেগবলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আর মনুষ্য-মনের যত বিশ্বাস প্রত্যয় তাহা এই প্রবাহেরই চড়া এবং চটান বলিয়া ভাবিতে পারা যায়। প্রবাহ-বেগ যেমন যায়গায় যায়গায় থিতাইয়া আপনার শরীরস্থ বিবিধ জাতীয় মৃদ্‌রেণুজালে স্থানে স্থানে নূতন নূতন পুলিনাদি উৎপন্ন করে; কোন খানে বা ফলফুল সুশোভিত লোকের অতিশয় পুরাতন পৈতৃক আশ্রয়নিবাস সকল উৎক্ষালিত করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়; এবং কোথাও বা সেই সমুদয় প্রাচীন নিবাস-ভূমির চূর্ণীকৃত পদার্থাণু দ্বারা আবার নবীন প্রণালীতে, ও কোনখানে বা দূরবর্ত্তী দেশ হইতে আনীত নূতন কর্দ্দম-কণা সকলকে সেই পুরাতন বাটির ভগ্ন চূর্ণের সহিত মিশাইয়া অন্যরূপ অভিনব পদ্ধতিতে নানাবিধ দ্বীপ, পুলিন, কূল ও উপকূলাদি উৎপন্ন করে; শিক্ষা, দর্শন, পরীক্ষা এবং চিন্তাদির বেগও মনুষ্য-মনের বিশ্বাসভূমিতে রাত্রি দিন এইরূপে গড়িয়া ভাঙ্গিয়া বিবিধ প্রকার বিপ্লব জন্মাইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। লোকের সামান্য দৃষ্টি প্রয়াশঃই এই বিপ্লব দেখিয়া অত্যন্ত বিভ্রান্ত এবং ভীত হয়। কিন্তু চিন্তাশীলের চক্ষে ইহার কিছুই আশঙ্কা অথবা আক্ষেপের কারণ বলিয়া বোধ হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম যেরূপ জড়-জগতে, সেইরূপ অন্তর্জগতে। গড়া ভাঙ্গা প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সজীবের কোষে কোষে ও নির্জীবের অণুতে অণুতে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত। যেখানে এ দুইটি নাই, সেখানে প্রকৃতির অস্তিত্বও নাই। আমরা যখন একান্তে কোন্ এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া অতি গভীর দৃষ্টিতে, ভূত ও বর্ত্তমানে ছড়ান সজীব ও নির্জীব জগতের পরিচিত ক্রিয়াকলাপ সমষ্টি লইয়া আলোচনা করি, তখন জগদ্রাজ্যের অবিশ্রান্ত সৃষ্টি প্রলয়ের মধ্য হইতে, আমাদের মনোবুদ্ধির গাঢ়তর প্রদেশস্থ মুকুরে,

এইরূপ একটি ছবি আসিয়া প্রতিফলিত হয়, যেন প্রকৃতি তাহার চেতন এবং অচেতন শরীরদ্বয় লইয়া ভাঙ্গনে গড়নে বিবর্ত্তিত হইতে হইতে ক্রমশঃ সোপানারোহণে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট উচ্চতম প্রদেশে উঠিতেছে। আর, এই পৃথিবীতে আমাদের এবং আমাদের নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণী ও উদ্ভিদ্বর্গের যত কিছু কাণ্ড কারখানা সমস্তই যেন তাহার সেই সুবিশাল সিঁড়ি ভাঙ্গিবার উদ্যম ও চেষ্টা। এই চেষ্টা যেমন সমস্ত বাহ্য জগতে সেইরূপ অন্তর্জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষা ও পরীক্ষার আঘাতে মনোরাজ্যে এক প্রকারের বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, আবার তাহার স্থানে অন্যরূপ বিশ্বাস আসিয়া অমনি দাঁড়ায়। এক বিশ্বাসের বিনষ্টি ও অপরের সৃষ্টি, মনের ক্রমশঃ জ্ঞান-সোপান আরোহণের ফল। ইহাতে কোনরূপ দোষের কথা নাই। তবে কতকগুলি লোক আছে তাহারা বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন দেখিলেই ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিজন্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করেনা। এই প্রকৃতির লোকেরা আপনার মনকে জগৎ সংসারের মনের নমুনা মনে করে। ইহাদের পা যখন জুতায় ঢাকা থাকে, তখন ভাবে সমস্ত পৃথিবীই চামের ভিতরে। বিশ্বাসাদি যেন ইহাদের কাছে পানে পানীয় তুল্য, আর পানান্তে পাহাড়। একবার লোককে গিলাইতে পারিলে অটল হিমাদ্রি হইয়া পেটের ভিতর জমিয়া বসিবে, এটি দৃঢ় সংস্কার! এ ভাবে না যে বিশ্বাসলতা সত্যের শরীর বিনা আর কিছুকেই আলিঙ্গন করে না। সত্যও আবার পরীক্ষা, চিন্তা, যুক্তি ও বহুদর্শনাদির ভূমি বিনা অন্যত্র কোথাও দাঁড়াইতে পারে না। যে মনের যখন যেরূপ দর্শন চিন্তন, সে মনের সত্যও তখন সেইরূপ। যুক্তি পরীক্ষাদির নিকষ্টি পাথরে যে যতকাল অবিকৃত থাকে, সে ততকাল মাত্র স্থায়ী। সত্য গুরুমুখের মূল মন্ত্র নয় যে কর্ণকুহর তাহার পথ, আর স্মৃতি তাহার আশ্রয় স্থান। বিশ্বাসও রাজমুখের আদেশ নয় যে বলপ্রয়োগ অথবা কষ্টিছেঁড়া প্রণালীতে কারো অন্তরে সংস্থাপিত হইতে পারে। তবে জগতে পেটেণ্ট সত্য-বিক্রেতা অনেক আছে, এবং তাহার প্রতারিত ক্রেতাও বহু।৺

সত্য যত নিত্য নূতন আবিষ্কৃত এবং পরিবর্ত্তিত হইবে, বিশ্বাসও তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত বদলিবে। আর বিশ্বাসের প্রবাহও যেরূপ বদল হইতে থাকিবে, তাহার আঘাত প্রতিঘাতে ধর্ম্ম, নীতি এবং সমাজসম্বন্ধও রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে। এ ভাব আজি নূতন নয়। মনুষ্য এ অবনী-গায়ে যত কাল,

এ ভাবও নিশ্চয় জানিতে হইবে যে তত কাল। অগ্নিমীলের সময় হইতে আজি কম্‌টিমিলের কাল পর্য্যন্ত যত লেখা, পত্র ও দলিল কিতাবে কোরাণে পাওয়া যায়, তাহার সমুদয় দ্বারা ইহা সপ্রমাণিত। যে ব্যক্তি নিরপেক্ষ-চিত্তে অনুসন্ধান করে এবং গোঁড়ামি ছাড়িয়া এক সময়ের ঘটনাদিকে অন্য সময়ের সহিত মিলায়, সে ই মাত্র ইহা টের পায়। মধুচ্ছন্দার যেরূপ ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সংরচনা ছিল,—বৈদিকস্তোত্রাদিতে আভাস পাওয়া যায়,—সংহিতা-প্রণেতা মহর্ষি মনুর সেরূপ ছিল না। আবার মনুর ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ গঠন যেরূপ, মধুস্থদন বিদ্যাবাগীশের আজি সেরূপ নয়। এখন এই ভাবে দৃষ্টি করিয়া দেখ, বনমানুষের প্রস্তরযুগ হইতে আজি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের যন্ত্রযুগ পর্য্যন্ত, সত্য ও বিশ্বাসে, ধর্ম্ম ও নীতিতে, এবং সমাজ ও সংস্কারে মনুষ্য ক্রমে গঠিত হইয়া আজি এ পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার এখান হইতে কোথায় যে ধাবিত হইবে তাহা আজি কোন্ চিন্তা-চক্ষু লক্ষ্য করিতে পারে? তুমি ও আমি, এবং তোমার ও আমার সমাজ-সম্পত্তি এই ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎব্যাপী মানব-মহাসমুদ্রের দুইটী ও একটী অণু এবং কণা। এই সমুদ্র যে তোমার ও আমার জন্য তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাহা নয়। ইহার লক্ষ্য মনুষ্যমনের অতীত ও দুষ্প্রবেশনীয়। আমরা আপন আপন বিশ্বাস ও কার্য্য লইয়া ইহাতে সন্তরণ মাত্র করিতে পারি। এবং তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জীবন। যে পর্য্যন্ত মিশিতে না পারি, দূরে থাকি। এবং যখন একের রাসায়নিক বলে অপরে আন্দোলিত ও আকৃষ্ট হই, তখনই মিলিয়া যাই। সেইখানে এবং সেই কালেই আমাদের সমাজবিন্দু রচিত হয়। এই বিন্দুতে বিন্দুতে মিলিয়াই আবার ফোটা হয়। ফোটায় ফোটায় মিলনে গোষ্পদ হয়। গোষ্পদের পরস্পর সম্মিলনই খাত ও তড়াগ। এবং তড়াগাদির মিলন বাহুল্যই হ্রদ ও সাগর। কবে যে এই ফোটা বিন্দু ও গোষ্পদে প্রবাহিত আজিকার মনুষ্য-সাগর তড়াগ হ্রদে সম্মিলিত হইয়া এক তরঙ্গসমুদ্রে ভবিষ্যৎকে প্লাবিত করিবে, এবং কখনও করিবে কি না, এই ঐকান্তিক মনুষ্যৈক্যের কল্পনা ও সংশয়, কোন্ মনুষ্যবুদ্ধির নিরূপণাধীন? তবে এই মাত্র বলা যায় যে, আমরা এক একটী মানবাণু পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ক্রিয়া দ্বারা ক্রমে জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও কার্য্যে বিশোধিত হইতে হইতে আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষ-পরম্পরায়ের দেহে ও মনে

অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকিব। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ যে কি, তাহা অনন্তের হাতে। তোমার আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। অতএব বিশ্বাসাদির বিপ্লবে কাহারও ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। বিবর্ত্তমানা প্রকৃতি যেমন আপনার অপরাপর অঙ্গে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ পরিপক্কতা লাভ করিতেছে, সেইরূপ তাহার মনুষ্যাঙ্গেও জ্ঞান, চিন্তা ও কার্য্যে অহর্নিশ বিপ্লব উৎপন্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতেছে। এই বিপ্লবে একবার, পাঁচটা ভালর সঙ্গে দুটা মন্দও আসিতেছে। আবার এক সময় পাঁচটা মন্দের সঙ্গে দুটা ভালও বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। মনুষ্য-দৃষ্টিতে কোথাও এ ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে অবিমিশ্র ভাল এবং মন্দ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়—আগ্রা।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ঊনবিংশ শতাব্দী।

(ত্রিত্ব)।

কোন বিষয় নূতন অবস্থায় যেরূপ সুন্দর, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ দেখায়, তাহা যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহার সেই সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা যেন হ্রাস পাইতে থাকে। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি যে কোন বিষয় হউক না কেন, সকলই কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিণামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইতে দেখা যায়। রাজনীতি কিংবা ব্যবহারনীতির বিষয় আলোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে—খৃষ্টধর্ম্মের দুই একটী মতের আলোচনা করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল। আশা করি, খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণ জ্ঞানালোক দ্বারা আমার ও সর্ব্বসাধারণের অজ্ঞতান্ধকার দূর করিয়া বাধিত করিবেন।

জগতের পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, নানক প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে উপরিউক্ত অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে—দিন দিনই যেন ঐ সকলপ্রাচীন ধর্ম্মমত কুসংস্কারাপন্ন হইতেছে, তাহাদের প্রাথমিক সরলতা ও বিশুদ্ধতা হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। গূঢ়ভাবে ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা

যায় যে, ধর্ম্মপ্রচারকগণের স্বকপোলকল্পিত মত প্রচারই ইহার একটী নিগূঢ় ও প্রধানতম কারণ। অদ্য ঊনবিংশশত বৎসর গত হইতে চলিল খ্রীষ্টীয় বিধান জগতে আগমন করিয়াছে। গূঢ় ভাবে অনুধাবন করিলে জানিতে পারা যায়, খ্রীষ্টের ভক্তগণ খ্রীষ্টের মুখনিস্থত বাক্য গুলিকে নানা সময়ে নানাভাবে গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছেন। খ্রীষ্ট যখন এজগতে ছিলেন, তখন তাঁহার উপদেশের সারাংশ শিষ্যগণ ভিন্ন অতি অল্পলোকেই প্রকৃত-ভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মহর্ষি পৌলের গ্রন্থ হইতেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহর্ষি পৌল বহুল নিগূঢ় বিষয়ের সন্দেহ সকল তাঁহার লিখাদ্বারা দূর করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও অনেক বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই। সে যাহাহউক তজ্জন্য তাঁহারা দোষী নহেন, পরিমিত-বুদ্ধি ও পরিমিত-জ্ঞানী সসীম মানব অনন্তজ্ঞানী ও অনন্ত শক্তিশালী ঈশ্বরের অসীমভাব সর্ব্বতোভাবে ধারণ করিতে কিরূপে সক্ষম হইবে? কোন পশুকে কূপেতে নিক্ষেপ করিলে তাহার উদরে যত জলধারণ করিতে পারে সে তত জলই পান করিবে,—কূপের পরিবর্ত্তে নদীতে নিক্ষেপ করিলে সে কখন ততোহধিক জল পান করিবে না। সেইরূপ খ্রীষ্ট পরিশুদ্ধ, পবিত্র ও নির্ব্বিকার ছিলেন; মানব অপবিত্র হইয়া যদি সেই পবিত্রতাময় খ্রীষ্টের বাক্য গুলি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারে, তজ্জন্য ক্ষুদ্রজীব মানব দোষী নহে। কিন্তু যে ধর্ম্ম মানবের পরিত্রাণের একমাত্র হেতু—পার্থিব কোন পদার্থ যাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না—তাহাতে স্বকপোলকল্পিত মত মিশ্রিত করা কতদূর যুক্তি যুক্ত, বলিতে ইচ্ছা করিনা।

খ্রীষ্টীয় বিধানে তিনটী (Creeds) "প্রতীতি বাক্য" দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তিনটী প্রতীতি বাক্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছে। (১)—প্রেরিতদের প্রতীতি বাক্য, (২)—নাছিনদের প্রতীতিবাক্য, (৩)—এথেনেসিয়ানদের প্রতীতি বাক্য। প্রথমের অর্থ দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয়ের অর্থ তৃতীয়ে প্রকাশ করে বলিয়া ধর্ম্ম-যাজকগণ জগতের নরনারীগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু মস্তিকবিহীন ব্যক্তিও যদি এই প্রতীতিবাক্য-ত্রয়ের বিষয় চিন্তা করে, তবে দেখিতে পাইবে যে, ইহার কোন একটির মতের সহিত অপরটীর মতের কোন প্রকার সামঞ্জস্য বা সংযোগ নাই। পরন্তু ধর্ম্মযাজকগণ আরো বলিয়া থাকেন যে, এই প্রতীতি বাক্যত্রয়ই ধর্ম্ম-

গ্রন্থের (Bible) একমাত্র সারভাগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ম্মগ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া কোথাও প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রতীতি বাক্য ভিন্ন তৃতীয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। এথেনেসিয়ানদের প্রতীতি বাক্য পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এই কুসংস্কারাপন্ন প্রতীতি-বাক্যেই যে পবিত্র খ্রীষ্টীয় বিধানকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? স্বদেশবাসী খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন কি না? যদি খ্রীষ্ট স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন,তবে আমরা কাহার বাক্যে বিশ্বাস করিব?—খ্রীষ্টের কি এথে-নেসিয়ানদের? এথেনেসিয়ানদের গন্ধও আমাদের নাসিকাতে প্রবেশ করে নাই, আমাদের চক্ষু কর্ণ কখন তাঁহাদিগকে দেখে নাই কিংবা তাঁহাদের কথা শুনে নাই। তবে যে খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁহার ধর্ম্ম আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া এথেনেসিয়ানদের কথায় প্রতীতি স্থাপন করিব কেন?

এথেনেসিয়ানদের প্রতীতি বাক্য লম্বা চওড়ায় মন্দ নয়; দেখিতেও বেশ, পড়িতেও বেশ। কিন্তু নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে,রচয়িতাগণ "ত্রিত্ব" ও "অনন্তনরক" এই দুইটী বিষয় লইয়া কেবলই বাক্‌চাতুর্য্যজাল বিস্তার করিয়াছেন। অনন্ত নরকের বিষয় পাঠক মহা-শয়দের সঙ্গে পরে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল; এখন একবার ত্রিত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ত্রিত্ব সম্বন্ধে কত শত সুবিজ্ঞ পণ্ডিত লেখনী ধারণ করিয়াও ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সক্ষম হন নাই। আমি আর তবে কোন্ ছার? যদিও এত গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবে-চিত হইতে পারে, তথাপি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা যাহা কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি-য়াছি। ত্রিত্বের অর্থ প্রকাশকগণ যদি তাহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারি-তেন, তবে বোধ হয় খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণ কখনও তিন ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিতেন না কিম্বা তিনি বিভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া শিক্ষা দিতেন না।

St. Athanasian's creed.—"For there is one person of the Father, another person of the Son and another person of the Holy Ghost."

সেণ্ট্ এথেনেসিয়ানের প্রতীতি বাক্য—"যেহেতু পিতা এক ব্যক্তি, পুত্র অন্য এক ব্যক্তি ও পবিত্র আত্মা অন্য এক ব্যক্তি।"

"The Father is Almighty, the Son is Almighty and the Holy Ghost is Almighty. The Father is God, the son is God and the Holy Ghost is God."—"পিতা সর্ব্বশক্তিমান্, পুত্র সর্ব্বশক্তিমান্ এবং পবিত্র আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর"। পরক্ষণেই আবার বলিয়া থাকেন "তিন ঈশ্বর নহে, কিন্তু এক ঈশ্বর"।

লিটানিতে তিন-ব্যক্তি-এক-ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়। পাঠক মহোদয়গণ একবার নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়া দেখুন দেখি, কোন্ বিজ্ঞান বা কোন্ তত্ব দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, তিন ব্যক্তি তিন ঈশ্বর! খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মগ্রন্থের (Bible) কোথায় কোন্ অংশে লিখিত আছে যে, তিন ব্যক্তি তিন ঈশ্বর? আদি হইতে অন্তভাগ পর্য্যন্ত কোথাও এক ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয়ের উল্লেখ নাই। যথা—"Thou shalt have none other Gods but me"—"তোমাদের আমা ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নাই।" এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত পুস্তকের পদ সমূহে এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ঈশ্বরের উপাসনা কি চিন্তার বিষয় স্পষ্ট নিষিদ্ধ আছে। যথা:—

Deut. V Ch. 7 v—"Thou shalt have none other Gods before me." "তোমাদের আমার সমীপে অন্য কোন ঈশ্বর নাই।" অন্যত্র "Ye shall not go after other Gods." "তোমরা অন্য কোন ঈশ্বরের নিকট যাইবে না"। 2 King XVII Ch. 35 V—"Ye shall not fear other Gods nor bow yourselves to them nor serve them nor sacrifice to them." রাজাবলী ১৭ অ, ৩৫ পদে—"তোমরা অন্য ঈশ্বরদিগকে ভয় করিও না, তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, তাহাদিগকে অর্চ্চনা করিও না, তাহাদের নিকট বলিদান করিও না।"

Jer. XXV Ch. 6v.—"And go not after other Gods to Serve them and to worship them." জেরিমা ২৫ অ ৬ পদে "অন্য ঈশ্বরের পশ্চাদ্গামী হইও না এবং তাহাদিগকে অর্চ্চনা করিও না।" ৩৫ অধ্যায় ১৫ পদে এইরূপ আর প্রমাণাদি পাওয়া যায়।

খ্রীষ্ট যখন পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখ নিস্মৃত বাক্য এই— "Tou shalt worship the Lord thy God and him only shalt thou Serve." "তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রণাম করিও এবং কেবল তাঁহারই সেবা করিও।" পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিবেন, খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণ কি প্রকৃতই খ্রীষ্টের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া লোকদিগকে তাহাই শিক্ষা দিতেছেন, না স্বকল্পিত মত শিক্ষা দিতেছেন? হে খ্রীষ্টাশ্রিত ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্মযাজকগণ পঞ্চম শতাব্দীতে যেরূপ যাহা তাহা দ্বারাই জগতের নরনারী-গণকে ভুলাইতে পারিয়াছিলেন, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতাবস্থায়ও তদ্রূপ প্রত্যাশা করা দুরাকাঙ্ক্ষা। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানোন্নত সমাজের নিকট কিছু প্রচার করিতে হইলে, তাহা আদি অন্ত বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। ধর্ম্ম সময়োপযোগী করিয়া লোকের নিকট প্রচার না করিলে তাহা লোপ না পাইলেও হত-শ্রদ্ধেয় হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকদিগের তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই। যদি পাদ্রী মহাত্মাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, মহাশয়গণ, ত্রিত্ব কি অন্যান্য যে সকল বিষয়ের নিগূঢ়-মর্ম্ম সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না, অনুগ্রহ করিয়া তাহা লোকদিগকে বুঝাইয়া দিন না কেন? তাঁহারা তদুত্তরে বলিয়া থাকেন যে, "হাঁ এই সকল অতি নিগূঢ় বিষয় বটে, তোমাদের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই।" তাঁহাদের এইরূপ উত্তর দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, এই সকল ব্যক্তিরা খ্রীষ্টের শিষ্য মধ্যে গণ্য হয়। কারণ, খ্রীষ্ট বলিয়াছেন "It is given unto you to know the mysteries of the kingdom of Heaven. স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ় কথা জানিবার ক্ষমতা তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে।" মথি—১৩ অ ১১ পদে, এতদ্ভিন্ন লুক—১৮ অ ৪০ পদে, মার্ক—৪ অ ১১ পদে, ১ করি—১৮ অ ১ পদে, ১০ অ ২ পদে, ১৪ অ ২ পদে এবং রোম—১১ অ ২৫ পদে এই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন।

ভারতবাসী চিরকাল ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে, আর আজ পাদ্রী মহোদয়েরা বলিতেছেন, আমাদের ঐ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি নাই! যখন সমগ্র ভূমণ্ডল অসভ্য, ভারত তখন সভ্য। ভারত হইতেই জ্ঞান, ধর্ম্ম জগতে বিস্তারিত হইয়াছে। এসিয়াবাসী—বিশেষতঃ ভারতবর্ষবাসী—ধর্ম্মপ্রধান জাতি, ইহা পাশ্চাত্য জগতের অগ্রণী ভট্ট মোক্ষমূলর প্রভৃতিও

স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু খ্রীষ্ট এসিয়ার, ইউরোপের নহেন। ইউরোপ-বাসীরা খ্রীষ্টের বাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিল, আর পাদ্রী সাহেবেরা বলিতেছেন, আমরা এসিয়াবাসী হইয়াও সেই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম! বরং ইহাই বলা সঙ্গত, আমরা তাঁহার কথা যত বুঝিতে পারিব, অপরের সে শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। খ্রীষ্ট এবং ত্রিত্বে বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস করি না। আমি চিন্তা ও অনুধাবনা দ্বারা যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই আপনাদের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছি। তবেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, ত্রিত্বের প্রকৃত অর্থ কি?

ব্যক্তি (Person)—লাটিন পারসনা (Persona); পারসনা শব্দের অর্থ বেশকরণ (Mask), অর্থাৎ বিভিন্ন স্বভাবে দর্শান। তবে তিন ব্যক্তি নয়, এক ব্যক্তি—তিন কর্ম্ম (One person, three functions)। পিতা সৃষ্টিকর্ত্তা, পুত্র মুক্তিদাতা, পবিত্র আত্মা পাপরূপ পিশাচের সংহার কর্ত্তা। ইহাকেই বলা যায় "ত্রিত্ব"। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরত্ব বিরাজ, এবং ঈশ্বরত্বের পূর্ণতাই "ত্রিত্ব"। সেই ত্রিত্ব খ্রীষ্টেতে ছিল। তিনিই পিতা; কারণ খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকেও দেখিয়াছে; তবে কেন বলিতেছ পিতাকে দেখাও?" তিনি পিতা ছিলেন ঈশ্বরত্বে, পুত্র মনুষ্যত্বে, পবিত্র আত্মা মানব আত্মাকে পবিত্র-করণে। ত্রিত্বে একত্ব, তিন একেতে বিরাজ করিতেছে, কখনও তিন ঈশ্বর কি তিন ব্যক্তি নহে।

কেবল যে ঈশ্বরেতে তিন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। পরম নিধান বিশ্বপালকের অনন্ত কৌশল দ্বারা আমরাও আমাদের মধ্যে ইচ্ছা, শক্তি ও জ্ঞান এই তিন দর্শন করিতে পারি। প্রেমরূপী ইচ্ছা, শক্তি এবং জ্ঞান এই ত্রিত্বেই এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি।

জনৈক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক।

বাঙ্গালির বাল্যক্রীড়া ও তাহার বিষময় ফল।

(প্রথম প্রস্তাব)

মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বন্ধুগণের নিকট একটী বড় সুন্দর গল্প করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে যে পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের একটী বালক তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিত। ক্রমে যখন কেশব বাবুর দেশে ফিরিবার সময় নিকট হইল, তখন এই বালকটী মহা উদ্বেগে পড়িল। কেশব বাবু তাহাকে ছাড়িয়া দেশে আসেন, এটী তাহার কোনও মতে ইচ্ছা নহে; এবং সে নানা উপায়ে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি মত তাঁহাকে সেখানে রাখিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। মাতা পিতাকে, অপরাপর বন্ধুবান্ধবদিগকে এবং কেশব বাবুকে এই জন্য বিস্তর কাকুতি মিনতি, বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিল; কিন্তু কিছুতেই ফল দর্শিল না। তখন তাহার আর এক বুদ্ধি খুলিয়া গেল। বালকটী সর্ব্বদা যোদ্ধৃবেশ পরিয়া থাকিত; এবং তাহার ক্রীড়া-সহচরগণও অনেকেই যুদ্ধের খেলা খেলিত। বুদ্ধিমান বালক এই সমুদায় ক্রীড়া-সহচরদিগকে একত্রিত করিয়া কেমন করিয়া কেশব বাবুর দেশে ফিরিবার পথ বন্ধ হইবে, সে বিষয়ে নির্জ্জনে মন্ত্রণা করিল। এবং তাহার ক্ষুদ্র কল্পনায় সশস্ত্র সহচরগণ দ্বারা সমুদায় নির্গমন পথ সুরক্ষিত করিবার উপায় করিয়া কেশব বাবুকে গিয়া বলিল,—"এখন সেন মহাশয়, আপনাকে আটকাইয়াছি।" এই বলিয়া তাহার মন্ত্রণার পূর্ব্বাপর সমুদায় রহস্য বুঝাইয়াদিল। কেশব বাবু বালকের কথা শুনিয়া হাসিলেন; এবং মনে মনে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির জীবনীতেও এইরূপ একটী ঘটনা বিবৃত আছে। নেপোলিয়ান যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন একদা শীতকালে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে বরফের দুর্গ ও গুলি গোলা নির্ম্মাণ করিয়া কৌতুক-যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্কুলের বালকগণ দুই দলে বিভক্ত হইল; এক দল দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল ও অপর দল দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বরফের গুলি গোলাতে স্কুল-প্রাঙ্গন ছাইয়া ফেলিল। বহুক্ষণ দুই দলে

মহা যুদ্ধ হইল। নেপোলিয়ান এক দলের সেনাপতি ছিলেন। এইরূপ ক্রীড়া ইংলণ্ডে বা ফরাসী দেশে বিরল নহে। যোদ্ধার জাতি, বালকেরাও সে দেশে যুদ্ধের খেলা খেলিয়া থাকে।

আমাদের দেশের লোকের যুদ্ধ ব্যবসায় অবলম্বন করিবার অধিকার নাই; কাজে কাজেই আমাদের বালকগণের মন সে দিকে আকৃষ্ট হয় না; এবং তাহারা এইরূপ সাংঘাতিক ক্রীড়ার কথা শুনিলে কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকের প্রধান প্রধান ব্যবসায় যাহা, যে পরিবার যে ব্যবসায় অবলম্বী, বালকগণও সেই সেই কার্য্যের খেলা খেলিয়া থাকে। মাষ্টারের পরিবারের বালকেরা মাষ্টারী খেলা খেলে, মুন্সেফের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরা অনেক সময় মুন্সেফী খেলা খেলে। যদি বাঙ্গালীর যোদ্ধা হওয়ার সুবিধা ও ক্ষমতা থাকিত, তবে যোদ্ধা বাঙ্গালীর বালকেরাও ইংরাজ বা ফরাসী বালকদিগের ন্যায় মাটীর গোলা গুলি দিয়া মহাসমরে প্রবৃত্ত হইত। পূর্ব্ব অঞ্চলের লোকদিগের নাকি আজিও প্রাচীনকালের সামরিক ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, সে দেশে নাকি আজিও খুব দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে; সুতরাং সেই দেশের বালকগণকে কখন কখন লাঠালাঠির খেলা খেলিতে দেখা গিয়া থাকে।

মোট কথা এই, কোনও সমাজের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া যেরূপ সেই সমাজের সাধারণ ভাব স্বভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সমাজের বালক বালিকাদিগের ক্রীড়া-প্রণালীর মধ্য দিয়াও সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

নেপোলিয়ানের মন শৈশবাবধিই সামরিক বিষয় সমূহে আকৃষ্ট হইয়াছিল; সমর,—রাজ্যলাভ,—শত্রু পরাজয় তাঁহার জীবনের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। কেশব বাবু যে বালকটীর কথা বলিয়াছেন সেও যে কালে এক জন সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি হইবে না, এ কথা কে বলিবে?

আমাদিগের দেশের অবলাগণ যে গৃহকর্ম্মে এত পটু, তাঁহারা যে আজীবন আপনারা উপবাস করিয়া বা অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইয়া, অথবা পরিবারের ভুক্তাবশেষের সাহায্যে কোনওরূপে উদর পূর্ত্তি করিয়া পরিবারবর্গের নিঃস্বার্থ সেবা শুশ্রূষায় আপনাদিগের শরীর মন পাত করেন, তাহার মধ্যে কি তাঁহাদের শৈশব-ক্রীড়ার আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায় না? বালক বালিকাগণ শৈশব জীবনের অধিকাংশ শিক্ষা ক্রীড়ার ভিতর দিয়া লাভ করিয়া থাকে।

তাহারা ক্রীড়াশীল, খেলিতেই জানে, খেলিতেই ভাল বাসে, খেলিতেই তাহাদের ক্ষুদ্র বৃত্তি নিচয় সমধিক নিয়োজিত হয়; এবং শৈশবের শৈশব-ক্রীড়ার অদৃশ্য, অননুভূত ফলরাশি আজীবন তাহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগের জীবনকে আংশিকরূপে পরিচালিত করিয়া থাকে। এই জন্যই শৈশব-শিক্ষার গুরুত্ব এত অধিক।

জেমস্ মিল তাঁহার পুত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মন শৈশবাবধি কঠোর দর্শনালোচনার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। শৈশব হইতে এই সমুদায় কূট বিষয়ে চিত্ত নিবেশ করিতে করিতে মিলের বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করিল। অপরাপর বালকগণের যে বয়সে বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অতি যৎসামান্য বিকাশ হইয়া থাকে, শিক্ষা প্রভাবে বালক মিলের বুদ্ধিবৃত্তি সেই বয়সে কূট দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা করিতে সক্ষম। যে বৃত্তি যত পরিচালনা করা হয়, সেই বৃত্তি তত বিকাশ প্রাপ্ত হয়,—ইহা প্রকৃতির সার্ব্বভৌমিক নিয়ম।

বাঙ্গালায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? বাঙ্গালীবালিকা যখন পুতুল লইয়া খেলিতে শিখে, তখনই পুতুলের বিবাহ দিতে আরম্ভ করে। পুতুলের গায়ে হলুদ, অধিবাস, বিবাহ, বাসর-ঘর,—সকলই অভিনীত হয়। এমন কি বাঙ্গালী গ্রন্থকার পর্য্যন্ত সুকুমারমতি বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়াও তাহাদিগকে এই খেলা শিক্ষা দিয়া থাকেন।—

> "আয় দিদি দুই জনে বাঁধি খেলা-ঘর,
> আমি কুটি আলু, তুই রান্নাবান্না কর।
> পুতুলের হবে বিয়ে,—তোর ভাই বর,
> কন্যাটি আমার দেখ কেমন সুন্দর।"

কেবল তাহাই নহে। এদেশের অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ নিজেরা পর্য্যন্ত ক্রীড়াস্থলে বর কন্যা সাজিয়া বিবাহের অভিনয় করিয়া থাকে! তবে আর ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি যে বাঙ্গালী বালিকা স্তন্যত্যাগ করিতে না করিতে বিবাহ-শাস্ত্রে ও আনুসঙ্গিক বিদ্যা সমূহে যেরূপ পারদর্শীতা লাভ করে, অপর দেশের বয়স্থা অনূঢ়া যুবতীগণও অনেক সময়ে তদনুরূপ পারদর্শীতা লাভ করিতে পারেন না?

আর একটী কথা। শীতপ্রধান বিলাতে যে সকল ফসল হয়, গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালায় তাহা ভাল হয় না। জলবায়ুর গুণে ফল মূলের পূর্ণ বা আংশিক

বিকাশ হইয়া থাকে। চরিত্র বিকাশেও তাহাই ঘটে। যে নৈতিক বায়ুতে এক ভাব পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, অপর নৈতিক বায়ুতে তাহা তত বিকশিত হইতে পারে না। বঙ্গ-পরিবারের আব-হাওয়া বৈবাহিক বৃত্তির অযথা-বিকাশের অতিশয় উপযোগী; বিশেষতঃ বালিকাদিগের এই বৃত্তি এই হাওয়াতে অতি সত্বর ফুটিয়া উঠে। পিতা পুত্রে হিন্দু পরিবারের যে সঙ্কোচভাব, মাতা ও কন্যার মধ্যে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। গৃহিণী গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে—দিবা দ্বিপ্রহরে যে দরবার খুলিয়া বসেন, তাহাতে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা হইতে নবতিবর্ষীয়া গলিতানখদন্তা লোলিত-চর্ম্মা পলিতকেশা বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে।

শুনিয়াছি সাহেবদিগের সমাজে পুরুষে পুরুষে কোনও সঙ্কোচ, কোনও চক্ষুলজ্জা নাই। পুরুষ পুরুষের নিকট যথেচ্ছাঅশ্লীল হইতে পারে। আমাদের দেশে পুরুষে পুরুষে লজ্জা আছে; কিন্তু রমণীতে রমণীতে কোনও প্রকারের অশ্লীল কথাবার্ত্তা বা আচার আচরণ লজ্জাকর বা দূষণীয় বলিয়া গৃহীত নহে। গৃহিণীর দরবারে শ্লীল অশ্লীল সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। বালিকাগণ নিকটে বসিয়া হা করিয়া সে গুলি গলাধঃ করে। তাহাদের কুতূহলপ্রবণ মনোবৃত্তি নিচয় এই সকল কথা-বার্ত্তার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হয়;—এবং ফল এই দাঁড়ায় যে, এই দেশে গর্ভাষ্টমেই বালিকাগণ বিবাহ-বিজ্ঞানের শারীরিক ও সাংসারিক বিভাগ আয়ত্ত করিয়া বসে।

মনের সঙ্গে শরীরের অচ্ছেদ্য, নিগূঢ় ও অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সমুদায় বিষয় মনোমধ্যে আলোচনা করিতে করিতে শরীরে অনতিবিলম্বে তাহার ফল প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আর অস্বাভাবিক উপায়ে শারীরিক বৃত্তি সমূহের অকাল বিকাশ সাধন করিয়া আমরা গ্রীষ্মপ্রধান আব-হাওয়ার স্কন্ধে সমুদায় দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই!

ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদিগের শারীরিক বৃত্তি সমূহের বিকাশকালের মধ্যে তারতম্য আছে। বাহ্য প্রকৃতির বৈচিত্র এই বৈচিত্রের মুখ্য কারণ; সামাজিক রীতিনীতির বিভিন্নতা ইহার গৌণ কারণ। প্রথম কারণ অনি-বার্য্য, তাহার ক্রিয়া স্বরূপ যে ফল ফলিবে তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেই হইবে। দ্বিতীয় কারণ নিবার্য্য, তাহার ফল যে পরিমাণে দুর্গতির কারণ হয়, সেই পরিমাণে দুর্গতি নিবারণ করা সাধ্যায়ত্ত।

বাহ্য প্রকৃতির গুণে, জল, বায়ু ও বিভিন্ন ঋতু সমূহের প্রভাবে,—এই দেশের বালক বালিকাদিগের শারীরিক বিকাশকাল কি, এতৎসম্বন্ধে শরীর-বিদ্যা-পারদর্শী সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতই অবশ্য গ্রাহ্য। মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন আজ প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল যে মতামত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই দেশের বালিকাগণ সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ বর্ষে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হওয়া এবং বৈবাহিক জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হওয়া, এক কথা নহে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলিয়াছেন যে, শিশুর দন্তোদ্গম হইলেই কঠিন পদার্থ চর্ব্বন ও আহার করিতে তাহার ক্ষমতা জন্মিতেছে, ইহা বোঝা যায়। কিন্তু তখন যদি তাহাকে সর্ব্ব প্রকারের কঠিন পদার্থ চর্ব্বন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার ফল যে কি শোচনীয় হইবে ইহা আর কাহাকেও বলিতে হয় না। শিশুর দন্তভেদ হইলেই কোনও মাতা পিতা তাহা দ্বারা কঠিন অস্থি বা সুপারী চর্ব্বিত করাইতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে হস্তিমূর্খ বলিয়া কে না অবজ্ঞা করিবে? কিন্তু দশম একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেই সন্তান ধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী জ্ঞানে যে পিতা তাহাকে স্বামীগৃহে নির্ব্বাসিত করেন, তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান এবং সমাজের মান্য!

না হয় স্বীকারই বা করিলাম যে, বালিকাগণ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেই সন্তান ধারণোপযোগী হইয়া থাকে;—দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষে বালিকাগণ সন্তান পালনের উপযুক্ত হইতে পারে কি? কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ লোক এখনও বিবাহের নৈতিক দিক্‌টা দেখিতে শিক্ষা করে নাই। বিবাহের প্রকৃত গুরুত্ব শতকরা নিরনব্বই জন লোকে বুঝে কি না সন্দেহ। যদি বিবাহভারের গুরুত্ব তাহারা বুঝিত, যদি বৈবাহিক জীবনের মহান্ কর্ত্তব্য রাশির সম্যক্‌জ্ঞান তাহাদিগের থাকিত, তবে বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিতে না করিতে ইহারা কদাপি স্নেহের পুত্র কন্যাগণকে এক একটী শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিয়া সংসারের দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিত না। এদেশে বিবাহ ক্রীড়া-স্থলাভিষিক্ত, খেলার চক্ষুতে বাঙ্গালী বিবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাই এ দেশে বৈবাহিক জীবনে এত কষ্ট, বিবাহের এত দুর্গতি।

বালিকারা পুতুলের বিবাহ দিয়া থাকে। একবার ভাব দেখি, দুইটী পুতুল একখানি ক্ষুদ্র ক্রীড়াপর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছে; বিবাহান্তে বাসর-ঘর

হইতেছে; এমন সময় যদি কোন যাদু-প্রভাবে তাহাদের সেই ক্ষুদ্রতম দেহে প্রাণ সঞ্চার হয়, আর তাহারা চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পায় যে, হাঁটিতে শিখিবার পূর্ব্বে ও ভাল করিয়া চারিদিকে দেখিতে শিখিবার পূর্ব্বেই তাহারা চিরজীবনের মত একে অন্যের গলগ্রহ হইয়াছে! ইহাদের জীবন তাহাতে কেমন সুখের হইবে বল দেখি? একে অন্যের ভারগ্রস্ত এই দুটী পুতুল জীবন পাইয়াও চলিতে শিখিতে পারিল না! দুর্ব্বল পদ এই ভীষণ ভারের নীচে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল! কি দুর্দ্দশা! আমরা যে বর্ষে বর্ষে রাশি রাশি জীবন্ত পুতুলের বিবাহ দিয়া থাকি তাহাদের অবস্থা কি এতদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক শোচনীয় নহে?

এই বাল্যক্রীড়ার বিষময় ফল পরিবারে পরিবারে দৃষ্ট হইতেছে। তাহার সংখ্যা গণনা করা দুঃসাধ্য। প্রধান প্রধান কয়টীর মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

১ম। শরীর ক্ষয়—শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রোগ ভোগ। এই দুর্ব্বলতা বৈজিক তত্ত্ব অনুসারে বংশ-পরম্পরায়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। বুদ্ধিমান কৃষকেরা ও পশু ব্যবসায়ীগণ উপযুক্ত বয়সে সবল ও হৃষ্টপুষ্ট না হইলে গোশাবক বা কুক্কুর-শাবক উৎপাদন করায় না। কিন্তু পশু জাতির বল এবং আয়ু রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সভাসমাজে যত টুকু চেষ্টা করা হয়, অপরাপর এবং অল্পে অল্পে এদেশেও করা হইতেছে; মানব-বংশ রক্ষণ ও তাহার শারীরিক তেজ বৃদ্ধির জন্য আমরা ততটুকু চেষ্টা করিতেও বিমুখ। অকাল বিবাহ নিবন্ধন বাঙ্গালী জাতির যে দিন দিন অবনতি হইতেছে, তাহার পরিণাম ভাবিতেও ভয় হয়। অবশেষে এই দেশে শাস্ত্রোল্লিখিত দ্বি-অঙ্গুলী পরিমাণ নর-দেহের উৎপত্তি হইবে।

২য়। শিক্ষার ব্যাঘাত।

৩য়। পারিবারিক অসদ্ভাব।

৪র্থ। দারিদ্র্য বৃদ্ধি।

৫ম। অযথা বংশ বৃদ্ধি।

৬ষ্ঠ। শিশুগণের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি।

৭ম। হৃদয়ের তেজ ও বল হানী; আত্মসম্মান হ্রাস। যৌবন-প্রান্তে উপস্থিত হইতে না হইতে যে হতভাগা বালক স্ত্রীপুত্র ভার-গ্রস্ত হয়, তাহার যে এইরূপ নৈতিক দুর্গতি হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

৮। সংসার-ভারগ্রস্ত ও বিবিধ অত্যাচার-পীড়িত হইয়া শান্তি অন্বেষণে কুপথে গমন।

৯। বাল-বৈধব্য ও তজ্জনিত যাতনা ও পাপ রাশি।

১০। অকাল মৃত্যু।

১১। অপ মৃত্যু।

এই সমুদায় বিষময় ফল যে আমরা দেখিতে পাইনা, তাহা নহে। অন্ততঃ এই সকল কথা এদেশে নূতন নহে। কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও আমরা এই কুপ্রথার হস্ত হইতে মুক্তি পাইতেছি না কেন? কি আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, কি প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী পর্য্যন্ত এই বিষময়ী জঘন্য প্রথাকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন? প্রশ্নটী অতি গুরুতর; ইহার সম্যক উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ধর্ম্মের উপদেশে যে শিক্ষিত বাঙ্গালী এ কুপ্রথা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় না। প্রথমতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু-ধর্ম্মের এই সমুদায় অনুশাসনে আস্থাবান্ নহেন। দ্বিতীয়তঃ বাস্তবিক বাল্যবিবাহ হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ আদিষ্ট কিনা, পূর্ণ বয়সে বিবাহে হিন্দুধর্ম্মমতে কোনও প্রত্যবায় আছে কি না, সন্দেহের বিষয়। "অষ্ট-বর্ষা ভবেৎ গৌরী" ইত্যাদি শ্লোকের উপর হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু যেরূপ ভাবে, যেরূপ স্থলে এই শ্লোকটী সন্নিবেশিত আছে, তাহা দেখিয়া ইহারা বস্তুতঃ প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের রচিত কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ জন্মে। পরাশর-সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে বিবাহ সম্বন্ধে আর কোনও কথাই নাই। ইহা দ্রব্য সংশুদ্ধির অধ্যায়:—

"অথাতো দ্রব্যসংশুদ্ধিঃ পরাশরবচো যথা।
দারবাণাস্তু পাত্রাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥ ১।
মার্জ্জনাদ্যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু॥ ২।
চরূণাং স্রুক্স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি॥ ৩।
রজসা শুধ্যতে নারী বিকলং যা ন গচ্ছতি।
নদীবেগেন শুধ্যেত লেপো যদি ন দৃশ্যতে॥ ৪।
বাপীকূপতড়াগেষু দূষিতেষু কথঞ্চন।

উদ্ধৃত্য বৈ ঘটশতং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধতি ॥ ৫।
অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ৬।
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭।
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যা রজস্বলাম্ ॥ ৮।
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥ ৯।
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ।
স ভৈক্ষ্যভুগ্ জপন্নিতং ত্রিভির্বর্ষৈর্বিশুদ্ধতি ॥ ১০।
অস্ত গতে যদা সূর্য্যে চাণ্ডালম্ পতিতম্ স্ত্রিয়ম্।
সূতিকাং স্পৃশতশ্চৈব কথং শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ১১ ॥

"অতঃপর পরাশরের বচন অনুসারে দ্রব্য শোধন বলিতেছি। কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্র চাঁচিয়া ফেলিলে শুদ্ধ হয়। যজ্ঞস্থলে যজ্ঞপাত্র হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে। চাম্‌চে ও কাঁটা জলে প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। ২ চরুর সময় স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞ পাত্র সমুদায় উষ্ণ সলিলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্য পাত্র ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত করিলেই পবিত্র হয়। অম্ল দ্বারা মার্জ্জিত করিলেই তাম্র পাত্র শুদ্ধ হয়। ৩ যদি পরপুরুষ সম্ভোগ দ্বারা কোন অঙ্গ বৈকল্য না হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি নারীর সমুদায় অঙ্গ পূর্ব্ববৎ অক্ষত থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার রজস্বলা হইলেই পরপুরুষ সংসর্গ-দূষিতা নারী শুদ্ধ হয়। যদি মল ভূমিতে সংলগ্ন না থাকে, তাহা হইলে নদী-বেগ দ্বারাই তাহা পরিশুদ্ধ হয়। ৪ যদি বাপীকূপ তড়াগ প্রভৃতির জল কোন কারণে অপবিত্র হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে এক শত কলস জল উঠাইয়া দিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলেই তাহা পবিত্র হইবে। ৫

অষ্টমবর্ষবয়স্কা কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষবয়স্কা কন্যাকে রোহিণী, দশম বর্ষ-বয়স্কা কন্যাকে কন্যা বলা যায়। দশম বর্ষের পর কন্যা রজস্বলা হইয়া থাকে। ৬ কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও যে ব্যক্তি কন্যা সম্প্রদান না করে তাহার পিতৃগণ মাসে মাসে সেই কন্যার মাসিক আর্ত্তব পান করিয়া থাকে। ৭ কন্যা যদি অবিবাহিতাবস্থায় রজস্বলা হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিবা

মাত্র তাহার মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জনেই নরকগামী হন। ৮ যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞান দ্বারা মোহিত হইয়া ঐ ক্ষতযোনি কন্যা বিবাহ করেন, সে ব্যক্তি শূদ্রাপতি সদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিবে না, এবং কেহ তাহার সহিত সম্ভাষণও করিবে না। ৯

যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রি মাত্র শূদ্রাগমন করিবে, সে তিন বৎসর ভিক্ষান্ন ভোজন পূর্ব্বক নিত্য জপ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১০ সূর্য্য অস্ত গমন করিলে যদি কোন ব্রাহ্মণ চাণ্ডালকে, পতিত ব্যক্তিকে ও সূতিকা স্ত্রীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে, তাহা বলিতেছি। ১১" (জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের পরাশর-সংহিতা—৫৮-৬০ পৃষ্ঠা)।

এই শ্লোক গুলি দেখিয়া সহজেই অনুমতি হইবে যে, ইহারা সকলে এক ব্যক্তির দ্বারা বা এক সময়ে লিখিত হয় নাই। দ্রব্য সংশুদ্ধি বিধির মধ্যে বিবাহের কাল নিরূপক বিধি কিরূপে আসিতে পারে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইহা যে পরবর্ত্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, কে বলিতে পারে?

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র এত বিভিন্ন ও বিরোধী মতে পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন কি, ইহা বাহির করা অতি কঠিন; আমার মত ব্যক্তির সম্পূর্ণ অসাধ্য। মনু অন্বেষণ করিয়া প্রথমতঃ ইহা জানিতে পারা যায় যে, অষ্টম বর্ষের নিম্নে বালিকাদিগের বিবাহ অনুমোদিত নহে। যথাঃ—

"উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাস্তস্মৈ কন্যান্দদ্যাদ্বথাবিধি॥" ৯। ৮৮।

"উৎকৃষ্ট, সুন্দর, এবং স্বজাতিসম্ভব বরে বিবাহের বয়সের পূর্ব্বেও যথাবিধি কন্যা দান করিবে।" "অপ্রাপ্তাম্—অপ্রাপ্ত কালামপি বিবাহ-য়েদষ্টবর্ষামেব ধর্ম্মো নহীয়তে ইতি দক্ষ স্মরণাৎ—তস্মাদপি কালাৎ প্রাগপি" ইত্যাদি রূপে ব্যাখ্যা করিয়া কুল্লুক ভট্ট অষ্ট বর্ষকেই বালিকাদিগের বিবা-হের নিম্নতম বয়স বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঊর্দ্ধতন বিবাহ বয়স যে কি, তাহা সুস্পষ্ট কোথাও উল্লেখ করিয়াছেন কি না, অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই। তবে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেও কন্যাগণ তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিনা দোষে পিতৃ-গৃহে অবস্থিতি করিতে পারেন, ইহা মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত। যথাঃ—

"ত্রীণিবর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥" ৯। ৯০।

"স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া কন্যা পিতা প্রভৃতি গুরুজন কর্ত্তৃক সদ্‌গুণ সম্পন্ন বরে অর্পিত হইবার প্রতীক্ষায় তিন বৎসর কাল থাকিবে, তৎপরে সমান-কুল-শীল-বরকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করিবেক।" এই শ্লোক দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী-স্বভাবপ্রাপ্তা বালিকাও অন্ততঃ তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতে পারে।

এত গেল শাস্ত্রের বিধান। প্রাচীন সময়ের রীতি নীতির যত টুকু জানিতে পারা যায় তাহাতেও উপযুক্ত বয়সে, স্ত্রীস্বভাবপ্রাপ্তান্তর হিন্দু বালিকাদিগের বিবাহ যে দূষণীয় নহে, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ও নাটকাদির অধিকাংশ নায়িকা পূর্ণ বয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা হইয়া বিবাহিতা হইয়াছেন। কাব্য নাটকাদি যে যে কালে রচিত তত্তৎকালের সামাজিক রীতি নীতির আভাস প্রদান করিয়া থাকে; এবং এই সমুদায় হইতে অন্ততঃ কালিদাসের সময় পর্য্যন্ত বালিকা বিবাহ যে এদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল না, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। উমা, ইন্দুমতী, শকুন্তলা প্রভৃতির বিবাহের পূর্ব্বাবস্থার বর্ণনা আমাদিগের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে।

বাল্যবিবাহ-প্রথা হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত হউক আর নাই হউক, ইহা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রথা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতিভেদের পরিস্ফূর্ত্তিতে এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ বাঙ্গালায় বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথা যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল এবং আজও আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। বাল্যবিবাহের মূল সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিগত ভাদ্র সংখ্যার আলোচনাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় জাতিভেদ প্রথার বিষময় ফল নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই কুপ্রথা—"বিবাহ সম্বন্ধকে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর স্থানে বদ্ধ করিয়া বাল্য-বিবাহ, কন্যাবিক্রয় ও পুত্রবিক্রয় প্রভৃতি প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে।" যখন বৈবাহিক সম্বন্ধ বদ্ধ করিবার জন্য জাতিভেদ প্রথার পূর্ণ বিকাশে "ঘর বাঁধা" হইতে লাগিল, তখনই পুত্র কন্যার বিবাহ-প্রার্থী পিতা ও অভিভাবকদিগের মধ্যে মহা প্রতি-

যোগীতা আরম্ভ হইল; এবং এই প্রতিযোগীতা হইতেই শিশু-বিবাহ-প্রথা বিশেষ প্রচলিত হইয়া গেল। যে যে জাতির মধ্যে উপবিভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প, আজও সেই সেই জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ-প্রথা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে প্রচলিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। মান্দ্রাজের শূদ্র শ্রেণী ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। মান্দ্রাজ বিভাগে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বাল্য-বিবাহ বহুল প্রচলিত, কিন্তু শূদ্রগণের মধ্যে প্রায় বাল্য-বিবাহ দৃষ্ট হয় না। কদাচিৎ যা দু একটী দেখা যায়, তাহাও ব্রাহ্মণদিগের নৈকট্য জনিত। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, মান্দ্রাজের শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে উপবিভাগ অতি অল্প থাকাতে বিবাহক্ষেত্র প্রশস্ততর। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিবাহক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ বলিয়া বাল্য-বিবাহ প্রচলিত।

ঘটনাস্রোতের আবর্ত্তনে সমাজ মধ্যে যে সময়েই হউক না কেন, বাল্য-বিবাহ কুপ্রথা প্রবেশ করিয়াছিল; এবং এই সমুদায় ঘটনার মধ্যে জাতি-ভেদই সর্ব্ব প্রধান। জাতিভেদ দ্বারা প্রসূত হইয়া এই কুপ্রথা তাহার দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত ও পরিচালিত হইতেছিল। জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিতে গেলে বাল্য-বিবাহকে পরিত্যাগ করা একরূপ অসাধ্য। কিন্তু জাতিভেদ প্রথাকে বিকলাঙ্গ করিয়াও, আজ কেন যে শিক্ষিত বাঙ্গালী এই কুপ্রথার প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। "কুলভাঙ্গা" ও "ঘরভাঙ্গা"—বঙ্গ সমাজের অতি সচরাচর ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে। পরিবর্ত্তিত সামাজিক ভাবের অন্তঃসলিলের আঘাতে কুল ও ঘর উভয়ই ভাসিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় ইহাদের দেহজ কন্যা বাল্যবিবাহ প্রথাকে কেন যে রক্ষা করা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। এই বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য নিরতিশয় নিন্দনীয় ও ঘৃণার্হ।

দশবৎসর পূর্ব্বে এই কুপ্রথা এ দেশে যত প্রচলিত ছিল, আজ তত প্রচলিত নাই সত্য; কিন্তু যাহা আছে তাহাও ভয়ানক। বিগত জন সংখ্যা অনুসারে সমগ্র বঙ্গবিভাগে বাল্যবিবাহের অবস্থা কি, নিম্ন তালিকা দৃষ্টে জানা যাইবে। প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ বর্ষের নিম্নে বালিকাগণের ও দ্বাবিংশতি বর্ষের নিম্নে যুবকগণের বিবাহকেই বাল্যবিবাহ বলা উচিত। কিন্তু শিক্ষিত সাধারণে আজও এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতেই বোধ হয় বালিকার পূর্ণ চতুর্দ্দশ ও বালকের বিংশতি বর্ষই বিবাহের নিম্নতম বয়স বলিয়া বিবেচিত

হইয়া থাকে। এতদনুসারে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকা ও পূর্ণ বিংশতিবর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকের বিবাহকেই বাল্যবিবাহ বলিয়া অভিহিত করা গেল।

পুরুষ।

	বয়স। ০—৯	বয়স। ১০—১৪	বয়স। ১৫—১৯	মোট। ০—১৯।
মোট হিন্দু বালক	৬৪৫১৮১৬	২৫২২৪৫৫	১৭৩৮৮৬৮	১০৭১৩১৩৯
মোট অবিবাহিত	৬০৮৪৩৯৪	১৯১০২৫৮	৯৩১২৪৬	৮৯২৫৯৯৮
মোট বিবাহিত	৩৫৭৮৮০	৬০৭৭২২	৮০৪০৮১	১৭৬৯৬৮৩
অনুপাত (বিবাহিত)	১/১৮	১/৪	১/২	১/৬

স্ত্রীলোক।

মোট হিন্দু বালিকা	৬৪৬৪৯০৩	২০৩৬২২৮	•	৮৫০১১৩১
মোট অবিবাহিত	৫৫৫৭৪১১	৬০৮৭৪১	•	৬১৬৬১৫২
মোট বিবাহিত	৮৯৬২৮৬	১৪২৪১৯৭	•	২৩২০৪৮৩
অনুপাত (বিবাহিত)	১/৮	১/৩	•	১/৪

স্ত্রী পুরুষ উভয়।

মোট বালক বালিকা	১২৯১৬৭১৯	৪৫৫৮৬৮৩	১৭৩৮৮৬৮*	১৯২১৪২৭০
মোট অবিবাহিত	১১৬৪১৮০৬	২৫১৮৯৯৯	৯৩১২৪৬	১৫৯২০৫২
মোট বিবাহিত	১২৫৪১৬৬	২০৩১৯১৯	৮০৪০৮১	৪০৯০১৬৬
অনুপাত (বিবাহিত)	১/১১	১/৩	১/৩	১/৪

শ্রীহট্ট আসাম-প্রদেশভুক্ত বলিয়া এই তালিকায় তত্রস্থ বাঙ্গালি হিন্দুগণের মধ্যে বাল্যবিবাহের বর্ত্তমান অবস্থা দেওয়া হয় নাই। অপর পক্ষে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের হিন্দুগণ বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত বলিয়া তাহাদিগকেও এই তালিকায় ধরা হইয়াছে। যাহা হউক ইহাতে বড় একটা আসিয়া যায় না। এই কুপ্রথা আজও কি বহুল পরিমাণে বাঙ্গালার জীবরক্ত শোষণ করিতেছে এই তালিকা হইতে পাঠক তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইবেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

* চতুর্দ্দশ বর্ষের উর্দ্ধে বালিকাগণ বিবাহের উপযুক্তা হয় বলিয়া এস্থলে কেবল বালকদিগের সংখ্যা ধরা হইয়াছে।

আরনা।

(প্রবাসে লিখিত)

(১)

একদা সায়াহ্নে শ্রান্ত সন্ধ্যার তপন
বিমল অম্বর শিরে
শেষ রশ্মি-কণা ধীরে
মাখাইয়া, ঘুমাইল নীরব শোভায়,
শান্তির মাধুরী আনি প্রদোষ ধরায়।

(২)

দিবা অবসান দেখি কুটীর ছাড়িয়া
চিন্তাক্লান্ত চিত-ভারে
জুড়াতে, যমুনাতীরে
আসি ধীরে বসিলাম, আবার নির্জ্জনে
জাগিল শতেক স্মৃতি ব্যথিত পরাণে।

(৩)

পবিত্র সলিলে যেন চিত্রিতের প্রায়
অস্ফুট স্বপন সম
আর্য্য-ভূমি নিরুপম
হেরিলাম, স্মৃতি-স্রোতে হৃদয় আমার
ভাসিল, নয়নে সব হইল আঁধার।

(৪)

ভারতের ইতিহাস, বিগত গৌরব
যখনি মানসে জাগে
সেই তীব্র চিন্তারাগে
রঞ্জিত সংসার হেরি, তখন নয়নে
এক দৃশ্য, এক স্মৃতি জীবন মরণে।

(৫)

পুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত, যমুনা, জাহ্নবী
অচল পর্ব্বতরাজ
ভারতে বিরাজে আজ,
তবে কেন মহিমার জীবন্ত কিরণ
নিবিয়াছে, এবে সব বিস্মৃত স্বপন।

(৬)

আর্য্যের সমাধি ক্ষেত্র এখন ভারত,
গৌরবের দীপচয়
সকলি আঁধারময়,
বিশাল শশ্মান-ভূমে সমীর বিষাদে
শোকের উচ্ছ্বাস সহ অবিরত কাঁদে;

(৭)

ভগ্ন স্বরে কভু কেহ তাহার সহিত
কাঁদে, সেই শোকানল
যমুনা, জাহ্নবী জল
পারে না নিবাতে, হায়! শান্তি কোথা আর?
এই যমুনার তীরে আসি কতবার।

(৮)

কত বার আসিয়াছি কাঁদিতে নীরবে
এই যমুনার তীরে,
এই যমুনার নীরে
ঝরিয়াছে অশ্রুবারি, হৃদয়ে কখন
পাই নাই শান্তি আমি, বিফল রোদন।

(৯)

সে দিনের পূর্ণ স্মৃতি যদিও যমুনা,
তথাপি একটি বার
হেরি চিত্তে শান্তিধার
নাহি পাই যমুনার বিষণ্ণ অন্তরে
রহিয়াছে কত ছায়া আঁধারিত করে।

(১০)

নীরবে শোকের ছায়া করিয়া বহন
ভগ্নকণ্ঠে ক্ষীণতানে
গাইয়া বিষাদ গানে
বহিছে কাতরে, কই জীবন তাঁহার ?
তাই বলি, যমুনা গো বহিওনা আর।

(১১)

আর বহিওনা তুমি ভারত হৃদয়ে,
পারিনা নয়ন তুলি
বিষাদ তরঙ্গ গুলি
হেরিতে তোমার বক্ষে, সদা সমীরণ
হা হা স্বরে দুঃখ গীত করিছে কীর্ত্তন।

(১২)

পারি না সহিতে প্রাণে, মানব হৃদয়
কঠিন পাষাণ নয়,
কেমনে এসব সয়,
কতবার কত ব্যথা নীরবে সহিয়া
হৃদয়ের তন্ত্রী গুলি গিয়াছে ছিঁড়িয়া।

(১৩)

যমুনা তোমায় দেখি আপন জীবন
শতবার ভুলে যাই
কেবল যন্ত্রণা পাই ;
কি যমুনা, কি জাহ্নবী, কিবা হিমালয়,
বিষাদের স্মৃতি আজি সকলিত হায় !

(১৪)

ভারতে যমুনা তুমি বহিও না আর,
আর্য্যের মহিমা গীতে
ভারত সন্তান চিতে
জাগিবেনা মহাশক্তি, সাধনা জীবনে
শিখিবে না আর্য্যসুত স্বদেশ কারণে।

(১৫)

হাসিবে না আর্য্যাবর্ত্ত, অনন্ত তিমির
রহিবে ঢাকিয়া নিতি,
রবি শশী ক্ষীণ জ্যোতি
বরষিয়া পারিবে না নাশিতে আঁধার,
এ দুর্দ্দিনে তোমাকে গো দেখিব না আর।

নীহারিকা রচয়িত্রী।

সার সিদ্ধান্ত।

(১)

কেন ভাই এত গণ্ডগোল ?
বাজাইয়া করতাল খোল—
যথা নদীয়ার চাঁদ ভাঙ্গি দলা দলি বাঁধ
যবনে চণ্ডালে দিত কোল—
নাচ আর বল হরিবোল।

(২)

ভেদবুদ্ধি দুঃখের নিদান,
হরিপ্রেম স্বর্গের সোপান,
সর্ব্ব ঘটে বর্ত্তমান চিদানন্দ ভগবান,
তাঁর চক্ষে সকলে সমান ;
গীতা ভাগবতের প্রমাণ।

(৩)

ধর্ম্ম কর্ম্ম করি লোকে, সাধু হয় ইহলোকে,
পরলোকে পায় সুখ শান্তি হরি-চরণে ;
জীবে দয়া নামে ভক্তি, যোগসিদ্ধি অনাসক্তি,
এইত ধর্ম্মের লক্ষ্য কহে শাস্ত্র-বচনে।

(৪)

তার জন্যে ঘরে ঘরে, কেন দ্বন্দ্ব করে নরে,
একে অন্যে কেন দেয় পাঠাইয়া নরকে ?

বিবাদে কি প্রয়োজন, দেখাও সাধু জীবন,
অশান্তির কোলাহল ঘুচে যাবে পলকে।

(৫)

উদ্দেশ্যে নাহিক ভেদ, এক ব্রহ্ম এক বেদ,
যোগ ভক্তি পুণ্য এক উপাদানে রচিত ;
এক দয়া এক স্নেহ, এক ছাঁচে গড়া দেহ,
হৃদে হৃদে বহে রক্ত এক বর্ণ লোহিত।

(৬)

তাই বলি ভাই, গোলে কাজ নাই,
এস গলা ধরা ধরি করি ;—
যাই প্রেম-ধাম, গাই হরিনাম
আনন্দে বদন ভরি !

(৭)

ভিন্ন ভিন্ন পথ, ভিন্ন ভিন্ন মত,
কিন্তু এক গম্য স্থান ;
যে যেমনে পারে, ট্রেণে ইষ্টীমারে,
হোক সেথা আগুয়ান।

(৮)

উপায় লইয়া উদ্দেশ্য ভুলিয়া
যে জন বসিয়া থাকে ;
মাঝ পথে পড়ি যায় গড়াগড়ি
দুধ বলে ঘোল চাকে !

(৯)

ঢেঁকি ভজে যদি এই ভবনদী
পার হতে পার বঁধু ;
লোকের কথায়, কিবা আসে যায়,
পিবে সুখে প্রেম-মধু।

(১০)

এস ভাই তবে হরিপ্রেমে সবে
নাচি গাই অবিরাম ;
প্রেম সার ধর্ম্ম, প্রেম সাধু কর্ম্ম,
প্রেমে হয় পূর্ণ কাম।

(১১)

হরির ভিতরে দেখি সব নরে,
তাহার ভিতরে হরি ;
ভুলি আপনারে বিশ্ব পরিবারে
রাখি হিয়া মাঝে ধরি।

(১২)

ছাড়ি ধর্ম্ম ভাণ বৃথা অভিমান
হও প্রেমযোগে লয় ;
প্রেম আলিঙ্গনে বাঁধ জগজ্জনে
গাওহে প্রেমের জয়।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

ভারতী, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, প্রচার, সখা, বস্তুবিদ্যা। নববিভাকর, ঢাকা-প্রকাশ, পতাকা, Social Reformer and the Marriage Advertiser. তত্ত্ববোধিনী, সঞ্জীবনী, তত্ত্বকৌমুদী, ধর্ম্মবন্ধু। মিশর যাত্রী বাঙ্গালী, বীরোত্তর কাব্য।

অনেকে সমালোচনার্থ পুস্তক ও পত্রিকাদি আমাদের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। "আলোচনার" আয়তন যেরূপ ক্ষুদ্র, তাহাতে সকল পুস্তক পত্রিকাদির উপযুক্ত রূপ সমালোচনাদি হওয়া অসম্ভব। তজ্জন্য আমরা ইচ্ছা করিয়াছি যে, সুবিধামতে কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক গ্রন্থ এবং পত্রিকাদিই সময় সময় সমালোচন করিব। গ্রন্থকার এবং পত্রিকাসম্পাদক-গণ সমালোচনার্থ অন্য প্রকারের পুস্তক বা পত্রিকাদি পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। বিনিময়ার্থ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি সাদরে গৃহীত হইবে।

সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম।

শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ কাল ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিতেছেন দেখিয়া আমরা যে কত সুখী হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহাদের এই প্রথম উদ্যম ও অনুসন্ধানের সময়ে তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। ধর্ম্মতত্ত্ব অতি নিগূঢ় ব্যাপার। যুগ যুগান্তর অনুসন্ধান করিয়া সাধকেরা যাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তাহা আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি, অনধিকারী, মোহাসক্ত ব্যক্তি কি দুই দিন অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া শেষ করিতে পারিব? আমাদের কোন কোন সহযোগী এই নবীন উদ্যমকে যেরূপ তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেছেন, আমরা তাহা সুরুচি-বিরুদ্ধ ও গর্হিত কার্য্য মনে করি। "নবজীবন" ও "প্রচার" পত্রিকার লেখকেরা তাঁহাদের যতদূর জ্ঞান ও অধিকার আছে, তদনুরূপই আলোচনা করিতেছেন; তাঁহারা শিক্ষিত যুবকগণের মতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছেন, নিরীশ্বরবাদীদিগের মনে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উদয় করিয়া দিতেছেন, অজ্ঞেয়তা-বাদীদিগের মনে সংশয় উপস্থিত করিয়া দিতেছেন—তাঁহাদের এই চেষ্টার সাধুবাদ না করিয়া তিরস্কার করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। তাঁহাদের ভ্রম থাকিতে পারে—থাকিতে পারে কেন, আছে; কিন্তু ভ্রম কাহার নাই? তাঁহাদের মত আমাদের মতের সহিত অনৈক্য হইতে পারে; কিন্তু ইহা ত হওয়াই সম্ভব। তাঁহারা একটী সংস্কৃত ধর্ম্ম-পদ্ধতি নিরূপণ ও প্রচার করিতেছেন। কোন শাস্ত্রকে তাঁহারা অভ্রান্ত বলেন না, তাহাতে যাহা সত্য আছে তাহাই তাঁহারা অবলম্বনীয় ও অবশিষ্ট বর্জ্জনীয় বলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম কলুষিত এবং "এই বিমিশ্র ও কলুষিত হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুসমাজের উন্নতি হইতেছে না।" (প্রচার ১ম সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠা)। সেই জন্য তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের সারসংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই যত্নকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রশংসা করিতেছি এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, তাঁহাদের এই শুভ ইচ্ছা সুসিদ্ধ হউক। হিন্দুশাস্ত্রের সারোদ্ধার কার্য্যে যে অনেক অসুবিধা আছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াও তাহাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাগুক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আর একটী গোলযোগ এই যে হিন্দুশাস্ত্রের কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা, ইহার মীমাংসা কে করিবে? কোন্ টুকু ধর্ম্ম, কোন্ টুকু ধর্ম্ম নয়? কোন্টুকু সার, কোন্টুকু অসার? উত্তর, আপনারাই তাঁহার মীমাংসা করিতে হইবে। সত্যের লক্ষণ আছে, যেখানে সেই লক্ষণ দেখিব, সেই খানেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিব। যাহাতে সে লক্ষণ না দেখিব, তাহা পরিত্যাগ করিব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে, হিন্দুশাস্ত্রে কি কি আছে? কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্পলোকেরই আছে। কিন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য করিলে, সকলেরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিব।" (প্রচার ১ম সংখ্যা, ২৩ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু আমাদের বোধহয় এখন সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া সত্য নির্ব্বাচন করা বড় সহজ হইবে না। আর যদিও বঙ্কিম বাবু তাহা করিয়া উঠিতে পারেন, তাঁহার অনুশাসনের বলে একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইতে পারে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যে হিন্দুজাতি রেখামাত্র শাস্ত্রমার্গ উল্লঙ্ঘন করিতে অনিচ্ছু, যাহারা বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাক্য বলে, তাহারা যে এখনকার কোন ব্যক্তির কথা (তিনি যতই না কেন পণ্ডিত হউন) শাস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিবেক, তাহা আশা করা বৃথা। আমরা বঙ্কিম বাবুর মনের ভাব দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ করিতেছি। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, "আদিব্রাহ্মসমাজদ্বারা এদেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে।" (প্রচার, অগ্রহায়ণ, ১৮৩ পৃষ্ঠা) তথাপি তিনি রাজা রামমোহন রায়, পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রদর্শিত পথকে প্রকৃতপথ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না। রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষা যে তাঁহার কথায় লোকে অধিক শ্রদ্ধা করিবে, তাহা বোধহয় না। বঙ্কিম বাবু আমাদিগের উক্তির কু-অর্থ গ্রহণ করিবেন না। আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এই যে. হিন্দুজাতি শাস্ত্র ভিন্ন কোন বাক্য বিশ্বাস করিবে না। ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুসমাজ উন্নতিশীলতার বিরোধী। ঋষি পূর্ব্বে হইয়াছিলেন, এখন আর জন্মে না। শাস্ত্র পূর্ব্বে হইয়াছিল, এখন আর হয় না। যদি কেহ বলেন যে, এখন সেরূপ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোক কোথায়? আমি বলি তবে তিনি মহাভারত পড়েন নাই, শাস্ত্র দেখেন নাই। কোন কোন ঋষি যেরূপ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ছিলেন,

এখনকার বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র তদপেক্ষা অধিকতর স্ববশচিত্ত। ঋষি ধ্যানে বসিয়া আছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকের শব্দ পাইয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল—কেবল তাহাই নহে—!! হিন্দুসমাজ বলেন যে, যেমন ইঁহাদের দুর্ব্বলতা ছিল, তেমন আবার ক্ষমতা ও তেজ ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে লোক ভস্ম করিতে পারিতেন এবং জীবনও দিতে পারিতেন। এইরূপ লোকের সহিত বঙ্কিম বাবুকে যুদ্ধ করিয়া স্বমত স্থাপন করিতে হইবে। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কার্য্যে সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বঙ্কিম বাবু কি পারিবেন? আর কতকগুলি ধর্ম্মবীর—মহাপুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি যাঁহারা এখন দেবত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহারাও এই ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—চৈতন্য, শাক্যসিংহ, নানক—তাঁহারাও হিন্দুধর্ম্মকে সংশোধন করিতে পারেন নাই। কেবল এক একটী স্বতন্ত্র দল রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আর একটী শাখা হইয়াছে, বঙ্কিম বাবু কি আরও একটী শাখা করিতে চান? আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই! যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ কোন কারণে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁহারা যদি বঙ্কিম বাবুর কথায় ধর্ম্মপথাশ্রয়ী হন, হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার কার্য্যে আমাদের সহযোগী বা সহকারী হন, তাহাতে সমাজের লাভই হইবে। আর ইহাও আশা করি যে, এমন দিন আসিবে, যে দিন আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারিব, শ্রদ্ধা করিব, এবং হয়ত একত্রে মিলিয়াও যাইব। যদি আমরা সকলে সরল ও সত্যানুরাগী হই, তবে একদিন এই দৃশ্য নিশ্চয়ই দেখিব।

কিন্তু সেই দৃশ্যটী শীঘ্র দেখিতেই বাসনা হয়। তবে বলিতে ভয় হইতেছে; কারণ রাজনারায়ণ বাবু এই কথা বলায় কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি সরল লোক। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই হিন্দু-ধর্ম্মের সার এবং তাহার উপাসনা প্রণালী অতিশয় চিত্ত-শুদ্ধিকর। বঙ্কিম বাবু তবে আর একটী ধর্ম্ম মত প্রচার না করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করিলে বঙ্গদেশের কল্যাণ হইবে। রাজনারায়ণ বাবুর একথায় বঙ্কিম বাবুর বিরক্ত হইবার কোন কারণ থাকিত না, যদি তিনি বঙ্কিম বাবুকে "ঘৃণিত কোমতবাদের" প্রবর্ত্তক না বলিতেন। কিন্তু আমরা বঙ্কিম বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিত লোকের নিকট সুবিচার, ধৈর্য্য, সরলতা ও উদারতা প্রত্যাশা করিব। তিনি যে হিন্দু-ধর্ম্মের সার সঙ্কলন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা

কি রূপে করিবেন ? তাঁহাকে কতকগুলি ঈশ্বর-প্রতি-পাদক ও নীতি-বিষয়ক শাস্ত্র-বচন সংগ্রহ করিতে হইবে। কি কি গার্হস্থ-অনুষ্ঠান এই নূতন ধর্ম্ম-পথাশ্রয়ীরা করিবেন, তাহার পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে। উপাসনার পদ্ধতিও স্থির করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ ত্রিসন্ধ্যা করেন তাহা থাকিবে কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক ? শূদ্রেরা যেরূপ আহ্নিকাদি করেন, তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না ? বেদ-পাঠ সম্বন্ধে শূদ্রের অধিকার, ব্রহ্মোপাসনাতে অধিকার, পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক হইলে ব্রাহ্মণের সহিত সমান অধিকার থাকিবে কি না ? যখন এই সমস্ত স্থির হইবে, তখন এই সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটী স্বতন্ত্র দল বিধিবদ্ধ হইবে। কারণ শাস্ত্রাবলম্বী হিন্দুগণ তখন তাঁহাদিগের সহিত আর সংস্রব রাখিবেন না। এখন দেখা যাইতেছে, সেই পরিণত অবস্থায় এই সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের ;—

১। এক খানি স্বতন্ত্র সারসংগ্রহ শাস্ত্র আবশ্যক।

২। সংস্কৃত উপাসনা পদ্ধতি আবশ্যক।

৩। বিশুদ্ধ গার্হ্যানুষ্ঠান (দশকর্ম্ম) বিধি আবশ্যক।

৪। সংস্কৃত ব্যবস্থা শাস্ত্র আবশ্যক।

রাজনারায়ণ বাবু তাই বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গীয় রামমোহন রায় ও মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাই করিয়াছেন, তবে তাঁহাদিগকে একেবারে ছাঁটিয়া আর একটী দল করিবার প্রয়োজন কি ? যদি বলেন যে, ব্রাহ্মেরা হিন্দু-সমাজচ্যুত ; সুতরাং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে আপনাদেরও ঐ দশা হইবে এবং লোকে আপনাদের কথায় শ্রদ্ধা করিবে না ; সে ভয় আপনাদের স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিলেও যাইতেছে না। আপনারা যদি বেদকে অভ্রান্ত, শাস্ত্রকে অবিচারে প্রতিপাল্য, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচারকে পাপ না বলেন, তবে আপনাদেরও ঐ দশা হইবে। ব্রাহ্মেরা কেবল সত্য-নিষ্ঠা ও উদারতার জন্যই সমাজভ্রষ্ট হইয়াছেন। আপনারাও যদি সত্যনিষ্ঠ ও উদার হন, আপনারাও হইবেন।

বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম উন্নতির ধর্ম্ম—"যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম" ; কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ইহার ঠিক বিপরীত। যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই করা হিন্দুধর্ম্ম। উন্নতি, পরিবর্ত্তন, সংস্কার হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ে যেমন, সামাজিক বিষয়েও সেইরূপ বঙ্কিম বাবুকে সংস্কার

করিতে হইবে। এই স্থানেই মহাবিপদ। যদি বলেন জাতি-ভেদ রক্ষা করিতে গেলে এখন সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত হয়, হিন্দু সমাজ অমনি খড়্গা-হস্ত হইবেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে গিয়া এক জন দেশ-বিখ্যাত, সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও সমাজচ্যুত হইয়াছেন। যদি এই সকল সংস্কার কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে—যে মূল মন্ত্রের উপর সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন, তাহাই পরিত্যক্ত হইল। আমরা দেখিতেছি, হিন্দু-সমাজের একাংশ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। কোন জাতি এক অবস্থায় চিরকাল থাকিতে পারে না। অনেক দিন আমাদের সমাজের উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছিল, আর তাহা থাকিতে পারে না। নৈসর্গিক নিয়মকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজের দৃষ্টান্ত কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। এখন মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে, গমনাগমনের সুবিধার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পরের অবস্থা সন্দর্শন করিতেছে; হিন্দু-জাতির আর সে প্রকার সীমাবদ্ধতা ও অনুদারতা নাই। ইংরেজ ও মুসলমানকে স্পর্শ করিলে আর স্নান করিতে হয় না। সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলে আর জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। হিন্দু কোরাণ ও বাইবেল পড়িতেছেন এবং ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির জন্য বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি বিজাতীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন; এরূপ উদারতার সময় যদি শিক্ষিত-সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করেন, কি সুখের হয়! আমরা একটী বৃহৎ সম্প্রদায় করিতে পারি। কিন্তু যদি কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাতে ভবিষ্যতের কোন আশা নাই। আমাদের দেশের চিরকালই এই দুর্ভাগ্য। উইলসন সাহেব ৫৬টী প্রধান প্রধান সম্প্রদায় নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহার পর আরও অনেকগুলি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অভ্যুদিত হইয়াছে, আবার একটী বৃদ্ধি না করিয়া বর্ত্তমান সকল একেশ্বরবাদীদিগের সমন্বয় চেষ্টা কি আরও প্রশস্ততর কার্য্য নহে?

ব্রাহ্মধর্ম্মের কি কি বিষয়ের সহিত বঙ্কিম বাবুর মতভেদ আছে, তাহা জানিতে পারিলে, আমরা তাহার উপায় অবলম্বন করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে পরস্পরের মধ্যে অধিক মতভেদ নাই। তিনি যে ভাবে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজকে সংস্কৃত করিতে চান, ব্রাহ্মেরাও তাই চান ও করিতেছেন। হিন্দু-সমাজের কুসংস্কারকে তিনি যে চক্ষে দেখেন, ব্রাহ্মেরা ঠিক সেইরূপ দেখেন। এখন

হিন্দুধর্ম্মের কি কি সার বিষয় তাহা ও সত্য চিনিবার লক্ষণ গুলি পরস্পর মিলাইয়া দেখিতে হইবে। বঙ্কিম বাবু এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে যে, যদ্দ্বারা শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত তাহাই শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, তবে দুই একটী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া কিছু মতভেদ থাকিতে পারে; যেমন একজন শরীর বিষয়ে ভীম, চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি বিষয়ে রাফেল বা সরস্বতী, অথবা সর্ব্ব বিষয়ে কালিদাসের দিলীপ সদৃশ—ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু, মহাভুজ,—আসমুদ্রক্ষিতীশ, আনাকরথবর্ত্ম,—শৈশবে অভ্যস্ত-বিদ্য, যৌবনে বিষয়ৈষী, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি, যোগেনান্তেতনুত্যাগী—একজন এই সমস্ত গুণ সম্পন্ন না হইলে যে ধার্ম্মিক হইতে পারে না, ধার্ম্মিকের এই লক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। সে যাহা হউক, স্থূল বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের বড় অনৈক্য নাই। তাঁহার পত্রিকায় যেরূপ সাকার উপাসনা প্রভৃতির পক্ষ সমর্থিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে কিছু সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার সে বিষয়ে কিরূপ মত তাহা সুস্পষ্ট না বলিলে লোকে এখনো তাঁহার বিষয়ে কিছু স্থির-সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছে না। তিনি যদি তাঁহার সহযোগীদিগের ন্যায় প্রতিমার আবশ্যকতা স্বীকার করেন এবং বলেন যে "প্রতিমূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের রূপ ও গুণ প্রস্ফুটিত দেখিলে মন তাঁহার পূজায় উৎসাহিত, উত্তেজিত এবং মুগ্ধ হইয়া থাকে—মানুষ ঈশ্বরে মজিয়া যায়"—তাহা হইলে আমরা যথার্থই দুঃখিত হইব। তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালির বাল্যক্রীড়া ও তাহার বিষময় ফল।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে পাঠক, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয়, ইহা অবশ্যই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন। এই বিষময়ী কুপ্রথার সাংঘাতিক ফলও যে গৃহে গৃহে প্রতিদিন ফলি-

তেছে তাহাও সকলেরই চক্ষু-সমীপে রহিয়াছে। আজও যে শিক্ষিত হিন্দুগণ এই কুপ্রথার অনিষ্ট-কারিতা বোঝেন নাই, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যাহারা ভুক্তভোগী, তাহারাই ইহাকে সযত্নে পোষণ করিতেছে। তাহারা নীরবে ইহার দুর্ব্বিসহ যাতনা রাশি সহ্য করিতেছে, আর তাহাদের যাতনা দূর হইতে দেখিয়া একজন বিধর্ম্মী ও ভিন্নসমাজের লোক কৃপা করিয়া এই যাতনা নিবৃত্তির উপায় চিন্তা ও তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিতেছেন। বোম্বাইসহরের একখানি সর্ব্বপ্রধান দেশীয় ইংরাজি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাইরামজি মালাবারী আজ প্রায় চারিমাস হইল বাল্য-বিবাহ ও বৈধব্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া সাধারণের বিচারার্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বাইরামজি মালাবারী পার্সী; তাঁহার সমাজে বাল্য-বিবাহ ও বাল-বৈধব্য এই দুইটী ভীষণতম কুপ্রথার একটীও প্রচলিত নাই; তিনি অসম্পর্কিত হইয়াও আমাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য যতটুকু ব্যাকুল, আমরা স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়াও সংস্কারের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যগ্র নই; একি অল্প দুঃখের কথা?

মালাবারী মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তিনি যে যে উপায়ে এই বিষময়ী কুপ্রথা নিবারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা সমীচীন যুক্তিসঙ্গত না হইলেও, তাহার প্রবন্ধ অবলম্বনে সমগ্র হিন্দুভারতে যে মহা আন্দোলন উঠিয়াছে, তদ্দারা কিঞ্চিৎ উপকার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। মালাবারীর মূল প্রস্তাব কটী এই;—

১ম—বাল্য-বিবাহ জাতীয় অধোগতির প্রধান কারণ; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে দূরতঃ কোনও নিয়ম করিয়া ইহা নিবারণ করিতে পারেন, ও করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ অপরাপর যোগ্যতা সমান হইলে বিবাহিতের কর্ম্ম প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া অবিবাহিতের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন; এবং বৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা বয়স্থ অবিবাহিত বালক ও বালিকাদিগকে বিশেষ প্রকারে উৎসাহিত করিবেন।

২য়—বিশ্ব-বিদ্যালয় এই নিয়ম করুন যে, কিছু দিন পরে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে আর বিবাহিত বালকগণ প্রবেশিকাপরীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে না; এবং বৃত্তি প্রভৃতিও বিবাহিত বালকগণকে প্রদত্ত হইবে না।

মালাবারীর এই প্রস্তাবের একটীও আমাদিগের নিকট সম্যক্ যুক্তিসঙ্গত

বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই উঠিবে যে, সকল কর্ম্ম প্রার্থীগণকেই কি বিবাহিত বলিয়া অগ্রাহ্য করা হইবে? তাহা যদি হয়, তবে ত্রিংশৎবর্ষীয় পরিপক্ক-বুদ্ধি এবং বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ এবং অপক্ক-বুদ্ধি—কিন্তু অবিবাহিত—একোবিংশতি-বর্ষীয় যুবকের নিকট পরাজিত হইবেন। ইহাতে যে ক্ষতি হইবে তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যুবকগণ সাধারণতঃ দ্বাবিংশতিবর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্মান্বেষণ করিয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, মালাবারী কি যুবকদিগের পক্ষে দ্বাবিংশতিবর্ষ বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া মনে করেন না? আমরা যতটুকু বুঝি ও জানি, সাধারণ যুবকের পক্ষে দ্বাবিংশতিবর্ষ নিম্নতম বিবাহোপযোগী বয়স বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধ রূপে স্থিরীকৃত হইতে পারে। তবে দ্বাবিংশতি বা ততোঽধিক বর্ষের কোনও যুবক কর্ম্ম প্রার্থী হইলে সে বাল্যবিবাহ করিয়াছে কি না, এ কথা কি করিয়া জানা যাইবে? তৃতীয় আপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইলে সরকারী কর্ম্মচারী-নিয়োগ-কর্ত্তাগণ আপন আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইবেন।

মালাবারীর দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধেও প্রধান আপত্তি এই যে, মাতা পিতার দোষে গরিব শিক্ষার্থী বালকদিগের দণ্ড বিধান করা ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত হইবে না। আর এই নিয়মের দ্বারা যে বাল্য-বিবাহ বেশী পরিমাণে হ্রাস হইবে তাহাও বোধ হয় না। আমাদের দেশের লোকেরা এখনও উচ্চ শিক্ষার এতদূর পক্ষপাতী হয় নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বা উপাধির অনুরোধে একটী বহুকাল প্রচলিত সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন। যে সকল পিতা বা অভিভাবক শিক্ষার এতটুকু পক্ষপাতী, তাঁহারা আজি কালিই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আপন আপন সন্তানগণকে প্রায় স্বেচ্ছায় দারাভারগ্রস্ত করেন না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় এই রূপ নিয়ম করিলে বাল্যবিবাহ তো হ্রাস হইবেই না, লাভের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তৃতির ঘোর অনিষ্ট হইবে। তবে কি এই বিষময়ী কুপ্রথা নিবারণ করিবার কোনও উপায় নাই? জোর করিয়া এইরূপ সামাজিক প্রথা নিবারণ কোনও দিন হয় নাই, আজিও হইবে না। আর গবর্ণমেণ্ট-বিধি দ্বারা বল পূর্ব্বক বাল্য-বিবাহ প্রথা নিবারিত হইলেও তজ্জনিত সমুদায় অনিষ্ট নিবারিত হইবে কি না ঘোর সন্দেহ স্থল। এই জগতে অধিকাংশ

নরনারী ঘটনা-স্রোতের কৃপাপাত্র। ঘটনা-স্রোত যে দিকে তাহাদিগকে পরিচালিত করে, ঘটনা-স্রোত মিলিয়া তাহাদিগের জীবন ও চরিত্র যে ছাঁচে ঢালে, তাহারা সেই রূপই হইয়া থাকে। যে সকল নরনারী আপনার জীবনের গুরুত্ব ও দায়ীত্ব উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগের অভ্যন্তরীণ তেজঃ প্রভাবে চতুর্দ্দিকস্থ প্রতিকূল ঘটনাবলীকে পদানত করিয়া বীরদর্পভরে আপনাদের জীবনের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন,তাঁহারা মহাপুরুষ—এইরূপ দেবতা এ সংসারে কয় জন? আর মানুষ যদি ঘটনা-স্রোতেরই দাস হইল, তবে এই মূল ঘটনা-স্রোত পরিবর্ত্তিত না করিয়া তাহাদিগকে বল প্রয়োগে ভিন্ন পথগামী করে কার সাধ্য? তাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্ট বিধি বদ্ধ করিয়া বাল্য-বিবাহ বা অপর কোনও সামাজিক কুপ্রথা নিবারণ করিতে পারিবেন না।

তবে গবর্ণমেণ্টের বল প্রয়োগে এই সমুদায় কুপ্রথা নিবারিত হইবার নহে বলিয়া একেবারে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। সমাজের সাধারণ মত গঠন করিয়া স্ত্রী সমাজে শিক্ষার বহুল প্রচার এবং সর্ব্বোপরি-সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও সামাজিক ভ্রুকুটীর সমক্ষে নির্ভীক অন্তরে বীরের মত সমুদায় কষ্ট যন্ত্রণা ও নির্য্যাতন সহ্য করতঃ এই কুপ্রথা পরিবর্জ্জন করিয়া ক্রমে সমাজ হইতে ইহাকে বিদূরিত করিতে পারা যাইবে। কোনও সংস্কার কার্য্য জগতে একদিনে সংসাধিত হয় নাই; আজ আমাদের দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত একটী বিষময়ী কুপ্রথাকে আমরা একদিনে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারিব কেন?

এদেশে আজ পর্য্যন্ত সমাজে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে বাল্য-বিবাহ একেবারে বন্ধ করিতে পারা অসম্ভব,—অসাধ্য; এবং সাধ্য হইলেও ইষ্টকর হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বঙ্গপরিবারের জলবায়ু বৈবাহিক বৃত্তি সমূহের অকাল ও অযথা বিকাশের বিশেষ সহায়কারী। এ অবস্থায় যতদিন না এই পারিবারিক হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে পারা গিয়াছে, ততদিন অকালে বালক বালিকার, বিশেষতঃ বালিকাদিগের বৈবাহিক বৃত্তিনিচয় অতিশয় পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। বিবাহের কথা শুনিতে শুনিতে এবং বিবাহের খেলা খেলিতে খেলিতে স্বভাবতঃই ইহারা অতি অল্প বয়সে বিবাহের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই অবস্থায় যাহাতে বালিকাগণের বিবাহ বৃত্তি অকালে বিকাশ না হয়, সেইরূপ উপায় অবলম্বন

না করিয়া বলপূর্ব্বক এক দিনে বিবাহপ্রথা বন্ধ করিয়া দিলে তাহার ফল নিরতিশয় অনিষ্টকর হইবেই হইবে। অতএব বাল্য-বিবাহ নিবারণের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপায়ই ;—অন্তঃপুরে শিক্ষা বিস্তার।

এ বিষয়ে বাঙ্গালার স্থানে স্থানে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে; ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সম্মিলনী সমূহের যত্ন ও উৎসাহ নিতান্ত প্রশংসার্হ। কিন্তু উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তকের অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয়। বিশেষতঃ মাতৃশিক্ষা বিষয়ে একখানিও ভাল এবং সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর পুস্তক আছে বলিয়া জানি না। কোন সুযোগ্য লেখক এই বিষয়টী বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক রচনা করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। এবং এইরূপ পুস্তক যে ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলনী কর্ত্তৃক অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার পাঠ্য রূপে নির্দ্ধারিত হইবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মালাবারী যে বিবাহিত ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা অতি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের গ্রেডুএটস্ অ্যাসোসিয়েশন এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করিতে পারেন।

এই দেশে কি পরিমাণে এই কুপ্রথা প্রচলিত এবং তাহা উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছে না বৃদ্ধি হইতেছে, এবং হ্রাস হইলে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মধ্যে হ্রাস হইতেছে, আর বৃদ্ধি হইলে কোন্ কোন শ্রেণীর মধ্যে বৃদ্ধি হইতেছে, এই সকল বিষয়ে যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করা ভবিষ্য কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্য কোনও উপায় অবলম্বিত হওয়া প্রার্থনীয়। এতদর্থে আমরা এই প্রস্তাব করি যে, গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সর্ব্বত্র জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টারি করিবার বিধান করিয়াছেন, সেইরূপ বিবাহ রেজিষ্টারি করিবার বিধান করুন। বিবাহের রেজিষ্টারিতে জাতি ও বর কন্যার বয়স লিপিবদ্ধ থাকিবে। এই রেজিষ্টারি দ্বারা সকলে বাল্য-বিবাহের হ্রাস বৃদ্ধির ঠিক পরিমাণ জানিতে পারিবেন। এবং কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কুপ্রথা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ইত্যাদি বিবরণ জানিয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। সমগ্র দেশকে সংস্কার করা অপেক্ষা একটী বিশেষ শ্রেণী বা গ্রামকে সংস্কার করা সহজতর ব্যাপার সন্দেহ নাই।

এই রেজিষ্টারি দ্বারা ভবিষ্যতে বাল্য-বিবাহের হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ

জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু বাল্য-বিবাহের বর্ত্তমান অবস্থা জানাও নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করিলে মন্দ হয় না। আজ কাল এবিষয়ে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহাদ্বারা সাধারণের মতামত নির্দ্ধারণ করা যায় না। একটী কমিশন নিযুক্ত হইয়া স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া এই বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ ও অপরাপর উপায় দ্বারা সাধারণের মনোভাব জানিতে পারিলে কোনও বিশেষ কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করা সহজ হইবে। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কাজে হাত দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, এবং দিলেও কৃত-কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

জন সাধারণের মত গঠিত করাই সর্ব্বপ্রকার সামাজিক কুপ্রথা নিবা-রণের প্রকৃষ্ট উপায়। বাল্য-বিবাহ নিবারণার্থ এই উপায় অবলম্বিত হওয়া প্রার্থনীয়। এক সময় বঙ্গদেশে এই বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উঠিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রকৃতিই দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার বিরোধী। এই আন্দোলনের শেষ তরঙ্গ বহু কাল নিবৃত্ত হইয়াছে; এখন আর এই বিষয়ের বেশী কথা বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায় না। পুনরায় আন্দোলন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তজ্জন্য একটী সভা সংগঠন করা মন্দ নহে। ছাত্র-সমাজের অধীনে একটী বাল্য-বিবাহ নিবারণী সভা আছে, কিন্তু সেও জীবন্মৃত; এবং সাধারণ সমাজের উপর তাহার আধিপত্য অপেক্ষাকৃত অল্প। চারিদিক্ দেখিয়া বোধহয় যেন বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত একটুকু পরিবর্ত্তিত হই-য়াছে; এখন বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা গৃহে থাকিলে কোনও বাঙ্গালী হিন্দুকে সমাজের নির্য্যাতন বেশী ভোগ করিতে হয় না। বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়ে কাহাকেও সমাজচ্যুত হইতে হয় না। এ অবস্থায় একটী হিন্দু বাল্য-বিবাহ নিবারণী-সভা প্রতিষ্ঠা করিলে কিঞ্চিৎ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয়।

বাল্য-বিবাহের বিষময় ফল বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়া পুস্তক রচনা এবং প্রচার করিলেও কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে। এই সকল পুস্তক বিদ্যা-লয় সমূহের পাঠ্যশ্রেণী-ভুক্ত করিলে আরও ভাল হইবে। এই প্রস্তাবটী কোনও সংবাদপত্রে ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক সদুপায় অবলম্বিত হইতে পারে।

যাঁহারা কোনও মতে আপন আপন পুত্রকন্যাগণকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত

অবিবাহিত রাখিতে অস্বীকৃত এবং অনিচ্ছুক হইবেন, তাঁহারাও অতি সামান্য উপায় অবলম্বন করিয়া এই বিষময়ী কুপ্রথার অনিষ্ট-নিচয় কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিতে পারেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে কেবল ব্রাহ্মণদিগের এবং ব্রাহ্মণ-পদানুশরণ-প্রিয় চেটী অথবা বৈশ্যদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। মান্দ্রাজী শূদ্রগণ সপ্তদশ, অষ্টাদশ কিংবা ততোঽধিক বয়স পর্য্যন্ত আপন আপন কন্যাদিগকে সাধারণতঃ অবিবাহিত রাখিয়া থাকেন। আমরা মান্দ্রাজী শূদ্রগণকে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বাল্য-বিবাহ কুপ্রথার জন্য ঈষৎ ঘৃণা প্রকাশ করিতে পর্য্যন্ত শুনিয়াছি। মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ-সমাজে বাল্য-বিবাহ বাঙ্গালীর মত অনিষ্টকর নহে। অন্ততঃ বাল্য-বিবাহের শারীরিক কুফল সেখানে এত অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই যে, মান্দ্রাজে নিতান্ত বাল্য অবস্থায় বিবাহিতা হইলেও বালিকাগণ পূর্ণ বয়স্কা না হওয়া পর্য্যন্ত পতিগৃহে গমন করে না। মান্দ্রাজে দুই প্রকার বিবাহ হইয়া থাকে, প্রথম বিবাহ প্রকৃত পক্ষে বাগ্দানের সমান। এই বিবাহে কন্যার বয়স বিচার নাই। দ্বিতীয় বিবাহ প্রকৃত বিবাহ;—তাহা কন্যার স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির পরে হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কন্যা কখনও পতিগৃহে গমন করে না। এই দ্বিতীয় বিবাহকে মান্দ্রাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণতঃ ইংরাজিতে Nupteal বলিয়া থাকেন। যাঁহারা পূর্ণ-বয়স্কা হইয়াও বিবাহিত হন, তাঁহাদেরও এই দ্বিতীয় বিবাহ বা Nupteal সাধারণতঃ প্রথম বিবাহের পর এক বৎসর কাল অতীত না হইলে হয় না। বাঙ্গালায় এপ্রথা নাই। দ্বিতীয় বিবাহ একটা আছে বটে; কিন্তু তাহাতে সাধারণতঃ যে সমুদায় জঘন্য ও লজ্জাকর আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, তাহা মনে হইলে এইরূপ প্রথা সমাজে না থাকাই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। এই সমুদায় আনুসঙ্গীক জঘন্য কার্য্য-কলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুগণ সংস্কার-বিবাহপ্রথা সমাজ হইতে অনেক স্থলে উঠাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। কিন্তু যত দিন না বাল্য-বিবাহ সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে, তত কাল এই সংস্কার-বিবাহ-প্রথার কথঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করিয়া ইহার সাহায্যে মান্দ্রাজী হিন্দুদিগের মত বাল্য-বিবাহ-কুপ্রথার বিষময় ফল কিয়ৎপরিমাণে নিবারণ করিতে পারেন। কন্যাকে অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয় সত্য; কিন্তু প্রচলিত প্রথানুসারে বিবাহ দিয়া উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কন্যাকে

পতিগৃহে প্রেরণ না করিলে বিশেষ কোনও নিন্দাবাদ সহ্য করিতে হইবে না। আর একটী কথা; সাধারণতঃ কন্যার স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির অতি অল্প কাল পরে বর্ত্তমান সময়ে সংস্কার-বিবাহ হইয়া থাকে; কিন্তু এই প্রথার সাহায্যে বাল্য-বিবাহের কুফল কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিবারণ করিতে চাহিলে, স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি এবং সংস্কার-বিবাহের মধ্যে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল ব্যবধান রাখা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ যখন অনায়াসে সংস্কার-বিবাহ-প্রথাই উঠাইয়া দিতেছেন, তখন ইহার এইরূপ সংস্কার সাধন করা কিছু মাত্র কঠিন বলিয়া বোধ হয় না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা বিচারের জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। শিক্ষিত সাধারণে এই বিষয়ে আপন আপন মতামত প্রকাশ করুন, আমাদিগের বিশেষ ইচ্ছা। আমরা আশা করি, "আলোচনার" স্তম্ভে বাল্যবিবাহ ও এই প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তাশীল শিক্ষিত লেখকদিগের মতামত প্রকাশ করিতে পত্রিকা-পরিচালকগণ বোধ হয় বিমুখ হইবেন না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শান্তি কোথায় আছে ভাই?

জীবনের পথে, এই সংসার-বিদেশে কত রোগ, কত শোক, কত ভয়, কত অত্যাচার—অনন্ত দুঃখ। রৌদ্রের প্রখর কিরণ, বরষার প্রবলধারা পতঙ্গের প্রাণে বড় ক্লেশ দান করে। পতঙ্গ পরিশ্রম করিতে চায় না, বহন করিতে পারে না; পরিশ্রমের যে আনন্দ, সহিষ্ণুতায় যে সুখ তাহা পতঙ্গ জানে না। পতঙ্গ-প্রকৃতি বিলাসী কাল্পনিক সুখের জন্য নিয়ত আকুল, তাই তাহার অবোধ চিত্তও সংসার-সংগ্রামে—রোগ শোকের তাড়নায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। সংসার-সুখের সাধক নিয়তই হাহাকার করিয়া বলিয়া থাকে—"হায় হায়, এ সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই, কেবলই দুঃখ!"

জ্ঞানের উপাসক কি বলিতেছেন? জ্ঞানী বলিতেছেন—"সংসারে সুখ আছে, দুঃখও আছে। জগৎ কেবল সুখের ভাণ্ডার নয়, কেবল দুঃখের শ্মশানও নয়। দুঃখ যাহাকে বল সে সুখের অন্তরায়; সুখ যাহাকে বল সে কেবল দুঃখের পূর্ব্ব-সূচনা। উহার একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব,

একের গভীরতায় অপরের তীব্রতা অনুভূত হয়। এ জগতে সুখও আছে, দুঃখও আছে; সংসারে সুখভোগ অনন্ত, দুঃখও অপরিহার্য্য।”

এক দিন আমিও ঐ কথা বলিতাম। যখন কেবল জ্ঞান-রাজ্যে পর্য্যটন করিয়া আপনার চিন্তাতে আপনি বিভোর থাকিতাম, যখন কেবল কার্য্য-কারণ ও ফলাফল গণনা অন্তর-রাজ্যের একমাত্র অবলম্বন ছিল, তখন পৃথিবীর হর্ষ-বিষাদ, উত্থান-পতন, সংযোগ-বিয়োগের পর্য্যায় দেখিয়া আমিও ভাবিতাম, আমিও বলিতাম—“এ জগৎ সুখ দুঃখের ক্রীড়া-ভূমি, জগতে সুখও অনন্ত, দুঃখও অসীম—অপরিহার্য্য!”

এখন আর আমার প্রাণ সে কথা বলিতে চাহেনা। এখন এক অভিনব রাজ্যে আসিয়াছি। চক্ষু দেখিতেছে নূতন দৃশ্য, কর্ণ শুনিতেছে নূতন ভাষা; এখানে সকলই নূতন। এখন আমার চিত্ত বলে—জগত আনন্দধাম, জীবন কেবলই সুখের জন্য। এপ্রাণে কেবল শান্তি, শান্তি, কেবলই শান্তি। যত দিন মানুষ কেবল জ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করে, তত দিন এ জীবনকে কেবল সুখ দুঃখের অভিনয় স্থলই দেখিতে পায়। কিন্তু একবার ভক্তি-মার্গে উঠিলে, একবার বিশ্বাস-চক্ষুতে জ্ঞানের অঞ্জন পড়িলে, জীব সে কথা বিশ্বাস করেনা, ঐ যুক্তি মানে না, ঐ কথা আর বলে না। যোগী দেখিতে পায় জীবনপথে দুঃখ যন্ত্রণা অপরাজেয় নহে। দেখ ভাই, দুঃখ যন্ত্রণা কেবল মায়াতে। একবার মোহের অন্ধকার ঘুচাইতে পারিলে, একবার সেই মন্ত্র, সেই কৌশল শিক্ষা করিতে পারিলে, পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা মানুষের প্রাণকে স্পর্শও করিতে পারে না।

সে মন্ত্র কি—সে কৌশল কি? সে কৌশলের কথা বলিতে পারি বটে; কিন্তু ভাই, সে কৌশল সাধিতে হয়, কেবল শুনিলে বা বলিলে হয় না। সে কৌশলের কথা বিস্তর অবগত আছি, কিন্তু সাধিতে পারি নাই বলিয়া জীবনের দুঃখ ঘুচে নাই। সে কৌশল বড় সহজ, কত বার বলিয়াছি, কত লোককে শুনাইয়াছি। আজও একবার সে কৌশলের কথা বলি।

তুমি আমি সকলেই সুখের প্রয়াসী। প্রাণ কেবল সুখ চায়, কেবলই শান্তি চায়। কিন্তু তুমি আমি এ জীবনে কখন সুখী হইয়াছি? যখন আপনাকে ভুলিয়াছি, তখনই সুখী হইয়াছি। একটুকু চিন্তা করিয়া দেখ, আত্ম-বিস্মৃত হইলেই লোক সুখী হয়। পুত্র-মুখ দর্শনে মায়ের প্রাণে বড় সুখ হয়—কেন? না পুত্রের মত প্রিয় পদার্থ পাইয়া মায়ের প্রাণ যত

আত্মবিস্মৃত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। সন্দেশটী হাতে পাইলে শিশু আপনাকে ভুলিয়া যায়, তখন শিশুর প্রাণ বড় সুখী। রূপের পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া লম্পট সুখী, শৌণ্ডিকালয়ে আত্ম-বিক্রয় করিয়া মাতাল সুখী; আবার পরমুখে আত্ম-বিক্রয় করিয়া যশার্থী সুখী; পরহিতে আত্ম-বিস্মৃতি হইয়া সাধু সুখী। কি উন্নত সুখ, কি ইতর সুখ সকলেরই মূলে আত্মবিস্মৃতি। আত্মগরীমায় যে সুখ তাহারও মূলে আত্মবিস্মৃতি; কেন না অহঙ্কারের মত এমন আত্মবিস্মৃতি আর কি আছে? যাহাকে নিয়া যে পরিমাণে আত্মবিস্মৃতি, তাহাকে নিয়া সেই পরিমাণে সুখ। ঐ দেখ ভাই, রুগ্ন সন্তানের জন্য পরিশ্রম, জাগরণ বা উপবাস করিতে আত্মবিস্মৃত জননীর দুঃখানুভব নাই। ঐ দেখ, রূপ মোহে যে আত্মবিস্মৃত, সর্প-পুচ্ছ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে তাহার ভয় বা দুঃখ নাই। জন্ম ভূমির জন্য যে আত্মবিস্মৃত রণ-ক্ষেত্রে শত তরবার প্রহারেও তাহার কত সুখ! তবে ভাই জানিয়া রাখ যে, আপনাকে ভুলিতে পারিলেই পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণাকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

কিন্তু ভাই আর এক কথা। যাহাকে লইয়া আত্মবিস্মৃত হইবে সে যদি বঞ্চনা করে, তবে যে দুঃখের বেগ দ্বিগুণ হইবে? তাই বলি যত কাল অসত্যের জন্য, অসার পদার্থের জন্য আত্মবিস্মৃত হইবে, ততকাল দুঃখের কার্য্যই থাকিবে, দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিবেনা। যদি চিরদিনের জন্য সুখ শান্তি লাভ করিতে চাও, যদি চিরকালের জন্য দুঃখকে পরাজয় করিতে চাও, তাহাহইলে নিত্য ধন সার ধন ব্রহ্মধনে মন বাঁধ, তাঁহার তরে আত্ম-বিস্মৃত হও; ব্রহ্মে আত্মোৎসর্গ কর। দেখ ভাই, ইহারই নাম "আমিত্ব বিসর্জ্জন" করা। ঐ কথার আর কোন অর্থ নাই, আর কোন ব্যাখ্যা তোমরা শুনিও না। তাই বলি ভাই, ধন, জন, রূপ ও যশের মমতা পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ কর, তিনি অক্ষয় কবচ রূপে —অপরাজেয় দুর্গ রূপে তোমাকে সকল দুঃখ হইতে রক্ষা করিবেন।

ব্রহ্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে না, ভাই? ভগবানের প্রেমে আত্মবিস্মৃত কেন হইবে না, ভাই? ব্রহ্ম কি তোমার কেহ নন? তিনি কি তোমাকে সুখী করিতে পারেন না? তুমি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া মস্তকের স্বেদ ভূমিতে ফেলিয়া নিজের জন্য যে অর্থ উপার্জ্জন কর, এক জন অপরিচিত লোক অনাহারে তোমার দ্বারে আসিলে সেই অর্থ তাহার জন্য ব্যয় করিয়া

—তাহাকে আহার দান করিয়া—তাহার জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া—তুমি সুখী হইয়া থাক। আর ব্রহ্মের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলে কি তোমার সুখ হইবে না? তোমার জীবনপথে চলিবার সময়ে জগৎকার্য্যের প্রয়োজনে—সুতরাং ভগবানের ইচ্ছাতে যদি তোমার ধন ক্ষয় হয়, তুমি দরিদ্র হও, তাহাতে তুমি সুখী হইবেনা কেন? তাহাতে তুমি ম্রীয়মান হইবে কেন?

তোমার কোন প্রতিবেশী তোমাকে যদি ভাল বাসিয়া স্বহস্তে তোমার বৃক্ষের সুপক্ক ফলটী ছিঁড়িয়া লইয়া যায়, তাহাতে তোমার কি সুখ হয় না? তবে মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমার ফলাফল চিন্তাকে ব্যর্থ করেন বলিয়া, তোমার আরব্ধ কার্য্য অভীপ্সিত ফল দেন না বলিয়া তুমি দুঃখিত হও কেন? দূর দেশ হইতে কোন প্রিয় বন্ধু আসিলে যদি তোমার প্রিয়তম সন্তানকে কিয়দ্দূর সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, তুমি তখন তাহার বিচ্ছেদে কাতর হও না, বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া সুখী হও। পরমেশ্বর কিছু কালের জন্য তোমার পুত্রকে তোমা হইতে দূরে লইয়া গেলে—তোমার পুত্রের মৃত্যু হইলে তুমি ব্যাকুল হও কেন? সে স্থলে ব্রহ্মের জন্য আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না কেন?

সত্য কথা বলিলে ভাই রাগ করিও না। ফল কথা তোমার আমার সকলেরই এক অবস্থা। আজিও আমরা উজ্জ্বল রূপে ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। আজিও পরলোক পরমার্থে আমাদিগের অলড় আস্থা জন্মে নাই। তাই আমরা এক এক বার প্রকৃতিস্থ হই, আর এক এক বার মায়াবশে ক্রন্দন করি। তাই এক একবার আনন্দের উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠি, আর এক একবার নিরানন্দে মগ্ন হইয়া হাহাকার করিয়া থাকি। হায়, যদি পরব্রহ্মকে বিশ্বাস করিতে পারিতাম, যদি সেই পরম পদার্থকে জানিতাম, যদি সেই পরমাত্মীয়কে চিনিতাম, তাহা হইলে কি আর রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য আমাদিগকে আকুল করিতে পারিত? কখনই পারিত না।

ভক্তি কি আমরা জানি না, প্রেমমন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হই নাই। আত্ম-বিস্মৃতির কৌশল আমরা জানি না, সে কৌশল আমরা সাধন করি নাই। তাই আমরা সংসারের ক্রীড়া-পুতুল, ক্ষণে হাসি ক্ষণে কাঁদি! হায়, কবে সে দিন আসিবে, কবে প্রেমময়কে চিনিব,. কবে তাঁহাতে প্রাণ উৎসর্গ করিব, কবে তাঁহার জন্য আপনাকে ভুলিয়া অক্ষয় কবচে আত্মরক্ষা করিব? হায়, কবে

সে দিন হবে, কবে তাঁহার ইচ্ছাতে ইচ্ছার মিলন করিয়া ভবযন্ত্রণা এড়াইব। হায়, কবে মানব জনম সফল হবে। ভাই, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায়—মায়ার খেলায় মুগ্ধ হইয়া অনর্থক ক্রন্দন করিও না; তাঁহার জন্য ক্রন্দন কর; প্রেমময়ের প্রেম ভিক্ষা করিয়া অশ্রুপাত কর।

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

মহাসঙ্গীত

যখন নিদ্রার অঙ্কে
ঘুমায় জগৎ জন,
অচল জড়ের মত
পড়ে থাকে জীবগণ;—

বহেনা জীবন-স্রোত
আঁধারে আবৃত দিশি,
পূরব আকাশে সুধু
উষার উথলে হাসি।

পঞ্চমে বাঁধিয়া কণ্ঠ,
পল্লবে লুকায়ে দেহ,
কোথা হ'তে উথলিছে
সুস্বর না জানে কেহ।

হে পাখি, ললিত স্বরে
ধর যে ললিত তান,
মৃত প্রায় জীবগণ
সেই তানে পায় প্রাণ।

সিহরে প্রকৃতি সতী,
জীবন-তরঙ্গ ছুটে,
জীব-কণ্ঠ-কলরব
চৌদিকে উথলি উঠে।

কহ মোরে কে তোমারে
সেই গান শিখাইল?—
তোমার কণ্ঠেতে হেন
সঞ্জীবনী শক্তি দিল?

এ মৃত ভারতবর্ষে
আমি ত হে কতবার,
সঙ্গীতে ঢালিয়া দিনু
হৃদয়ের দুঃখ ধার।

কেহ ফিরিল না পাশ
কেহ মিলিল না আঁখি,
কণ্ঠের সঙ্গীত মোর
কণ্ঠেতে মিলাল, পাখি!

তাই বলি, হে বিহঙ্গ,
যে গানে জাগাও জীবে,
দয়া করে সেই গান
আমারে কি শিখাইবে?

তাহলে সঙ্গীতে মন
একবার ঢালিতাম
জাগে কি ভারতবাসী
এক বার দেখিতাম।

যখন ভীষণ বেগে
বহ তুমি প্রভঞ্জন,
লণ্ড ভণ্ড কর ধরা
হস্তী যথা নলবন।

অভ্রভেদী গিরিচূড়া
গুঁড়া করে ভূমে ফেল,
মহাদ্রুম, গৃহ, দ্বার
লইয়া কেন্দুক খেল।

এক দিকে হিমাদ্রির
পাষাণ প্রাচীর খাড়া,
অন্য দিকে মহাসিন্ধু
লক্ষ জটা দেয় নাড়া।

লক্ষ গিরি, লক্ষ গুহা
উঠিছে পাইছে লয়,
ভীষণ প্রলয় নাদে
ভুবন আতঙ্কময়।

সেই কালে রুদ্র তালে
ভৈরবে যে গান ধর,
সেই গান, প্রভঞ্জন,
মোরে কি শিখাতে পার?

সঙ্গীতে সমাজ স্তর
আলোড়িত করিতাম,
জাগে কি ভারতবাসী
একবার দেখিতাম।

যে গীত গাইয়া সুখে
তোমরা, হে গ্রহগণ,
অনন্ত আকাশ-মার্গে
কর সদা বিচরণ।

যে গানের ব্রহ্ম-তালে
রবি শশি নৃত্য কর,
সেই গান, রবি, শশি,
মোরে কি শিখাতে পার?

আমার পার্থিব কণ্ঠে
করি রে পার্থিব গান,
সে গানে এ মৃত দেশ
পায় না জীবন দান।

তাই বলি মহা শূন্যে
যে মহা সঙ্গীত গাও,
পার্থিব পঙ্গুরে যদি
সে গীত শিখায়ে যাও।

মনোসাধে কণ্ঠ খুলে
একবার গাইতাম।
জাগে কি ভারতবাসী
একবার দেখিতাম।

শ্রীদীনেশচরণ বসু।

ধর্ম্ম ও বিবর্ত্তনবাদ।

বর্ব্বর, অসভ্য ও সভ্য মানব সমাজ তিন প্রকার। প্রেত পূজা, প্রকৃতি পূজা ও প্রতিমা পূজা মানবধর্ম্ম তিন প্রকার। বর্ব্বর সমাজে প্রেত পূজা,

অসভ্য সমাজে প্রকৃতি পূজা এবং সভ্য সমাজে প্রতিমা পূজা প্রধান। যেখানে প্রতিমা পূজা, সেখানে প্রকৃতি ও প্রেত পূজা; এবং যেখানে প্রকৃতি পূজা প্রধান, সেখানেও প্রেত পূজা দেখা যায়।

ধর্ম্ম বিশ্বাস স্বাভাবিক—কথাটী প্রাচীন, আমার অর্থটী নূতন। ধর্ম্ম বিশ্বাস অবস্থোচিত বলিলে হয়ত ভাল বুঝা যাইবে না। যাহার প্রকৃতি যেমন, তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস তেমনি। যাহার প্রকৃতি রুক্ষ, সে শান্তিময় দেবতাকে ইষ্ট দেবতা করিতে চাহে না। যে নিজে স্থূলবুদ্ধি, তাহার দেবতা সূক্ষ্মবুদ্ধি নহেন। আবার মানব প্রকৃতি নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির ফল। প্রতিবেশীগণের প্রকৃতি প্রতিবেশী মনুষ্য, পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা, আকাশ, বাতাতপ সকলেই মনুষ্যের দেব-প্রকৃতির উপর আপন আপন প্রাধান্য পরিচালিত করে। ইহারা সকলেই মানব প্রকৃতি নিয়ত করে,—মানব প্রকৃতির অনুরূপ মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস। চোরের দেবতা চোর, লম্পটের দেবতা লম্পট। ধর্ম্মবিশ্বাস মানব হৃদয়ে পরমেশ্বর আরোপিত করেন নাই, মানব প্রকৃতিতে উহা স্বতঃই জন্মিয়া থাকে, এই অর্থে ধর্ম্ম বিশ্বাস স্বাভাবিক। মানবপ্রকৃতির ব্যাবৃত্তি পরিমাণে মানবের ধর্ম্ম বিশ্বাস স্বতঃই বিবর্ত্তিত হয়। ঈশ্বর মনুষ্যের ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ কারণ নহেন, মনুষ্য নিজেও ইচ্ছা পূর্ব্বক দেবপ্রকৃতি নির্ব্বাচন করে না। এই জন্য সভ্যের ধর্ম্ম অসভ্যে ধারণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে আস্তিকতা যেমন স্বাভাবিক, নাস্তিকতা তেমনি স্বাভাবিক। প্রকৃতি পরিবর্ত্তন না হইলে নাস্তিক আস্তিক হইতে পারে না, আস্তিক নাস্তিক হইতে পারে না। ব্যাবৃত্তির পরিমাণে প্রেতোপাসক প্রকৃতি-পূজক হয়। পরিমিত ব্যাবৃত্তি সম্পন্ন না হইলে প্রকৃতি-পূজক প্রতিমা-পূজক হইবে না। শিশু পুতুলকে মানুষ বলিয়া আদর করে, খাওয়ায়, বসায়, শোয়ায়, ঘটা করিয়া বিবাহ দেয়। সে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক পুতুলকে মানুষ বলিয়া মনে করে? যখন মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনে, তখন সে পুতুল ছাড়িয়া মনুষ্যকে আদর করে। পুতুলকে মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করা যেমন স্বাভাবিক, মানুষকে মানুষ বলিয়া জানাও তেমনি স্বাভাবিক; পূর্ব্বের বিশ্বাস যেমন সরল যেমন সত্য, শেষের বিশ্বাস তেমনি সরল তেমনি সত্য, কোনটীকেই অগ্রাহ্য করিবার নহে। বালকের সুখ নাশ হইবার ভয়ে তাহার বিশ্বাস দূর করিতে তুমি বিরত হও না, তোমার সাধ্য নাই তাহার বিশ্বাস টলাইতে পার।

তাহাকে পুতুলের পরিবর্ত্তে মানুষ দেও, সে গোবরের পায়েস রাঁধিয়া পুতুলের মত তোমাকেই খাওয়াইতে বসিবে।

অব্যাবৃত-মস্তিষ্ক বালক পুতুলকে মানুষ ভাবিত বলিয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিলে, মানুষের প্রতি যথোচিত আদর করিতে ক্রটী করে না। অসভ্য উদ্ভিদকে পূজা করিত বলিয়া ব্যাবৃত অবস্থায় ঈশ্বরকে চিনিলে পূজা অধিক করিবে, অল্প করিবে না বা অধিকার উপেক্ষা করিবে না। অব্যাবৃত-মস্তিষ্ক বালক পুতুলকে মানুষ ভাবিয়াছিল, ব্যাবৃত মস্তিষ্কে মানুষকে মানুষ ভাবে, তাহার মনে কখন সন্দেহ হয় না যে ব্যাবৃতি বৃদ্ধি হইলে ভবিষ্যতে কোনও দিন মানুষকে মানুষ ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে। ইহাও ভাবে না যে প্রথমে ঠকিয়াছিল বলিয়া এবার সতর্ক হওয়া ভাল, মানুষকে মানুষ বলিয়া আদর করিয়া কাজ নাই।

উচ্চের সোপান নিম্ন-সোপানের ঊর্দ্ধতন, কিন্তু উহার পরিণতি নহে। প্রকৃতি পূজা অপেক্ষাকৃত ব্যাবৃতির ফল, উন্নত অবস্থার পরিচায়ক; কিন্তু প্রেত-পূজা প্রকৃতি-পূজায় পরিণত হয় না, প্রকৃতি-পূজা প্রতিমা-পূজায় পরিণত হয় না, প্রতিমা-পূজা চৈতন্য-পূজায় পরিণত হয় না, হইলে শূন্যের পরিণতি শূন্য—ভ্রমের পরিণতি ভ্রম, প্রেতের পরিণতি ঈশ্বর প্রেতের ন্যায় অবিশ্বাস্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিতে। যে বিবর্ত্তনবাদ বুঝে না, সে বিবর্ত্তনবাদ ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া সন্দেহ করে।

বালক বড় হইয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনিলেও ব্যাবৃতি আরো অধিক না হইলে মানুষের গুণ কি কি চিনে না। সভ্য সমাজ ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ জানে না। আমরা যাহা ঈশ্বরের গুণ বলিতেছি, তাহা নাও হইতে পারে। সহস্র সহস্র বৎসর পরে ব্যাবৃততর মনুষ্য ঈশ্বরের স্বরূপ কিরূপ অবধারণ করিবে, আমরা জানি না। বর্ব্বরেরা জানে না সভ্য-সমাজ যাঁহাকে ঈশ্বর বলে।

সোপান রাজির কোনও সোপান উপেক্ষা করিবার নহে। অতীত উপেক্ষা করিলে বর্ত্তমান বুঝা যায় না এবং বর্ত্তমান উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যৎ মিলিবে না। প্রেত-পূজা প্রকৃতি-পূজা বা প্রতিমা-পূজা কোনটী উপেক্ষ করিবার নহে, তাহা হইলে চৈতন্য-পূজা করিতে পারিবে না। মানব সমাজ যে যে স্তরের ভিতর দিয়া আসিয়া সভ্য হইয়াছে, সভ্য মনুষ্যের প্রত্যেককে সেই সেই স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। অনুবৃত্তির

নিয়মই এই। সভ্যতম মানব এক বয়সে প্রেত পূজক, এক বয়সে প্রকৃতি পূজক, এক বয়সে প্রতিমা পূজক। কারণ ভেদে কেহ একটী স্তর কদাচ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, কেহ বা শেষ স্তরে না পৌঁছিতেও পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সকলকেই চৈতন্য স্বরূপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পিতৃ পুরুষ প্রকৃতি ও প্রতিমার উপাসনা করিতে হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী

সারধর্ম্ম।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা ব্রাহ্মেরা সারধর্ম্মের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন; কিন্তু কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন না করিলে এই কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত হইবে না। সে নিয়ম গুলি কি, পরে বিবৃত হইতেছে।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম প্রচারকালে অন্য কোন ধর্ম্মকে আক্রমণ করা উচিত হয় না। পার্কার বলিয়াছেন যে অনেক অসভ্য অজ্ঞান লোক নরবলির শোণিতাক্ত হস্ত লইয়া স্বর্গে যাইবে, কিন্তু কপট খ্রীষ্টিয়ানেরা স্বর্গে যাইতে পারিবে না। ঈশ্বর তাঁহার উপাসকের লক্ষ্য দেখেন, সে অন্তরের সহিত উপাসনা করিতেছে কি না তিনি কেবল এই মাত্র দেখেন; উপাসক তদ্গতচিত্ত ও তদ্গত প্রাণ হইলে তিনি তাহার ঈশ্বরজ্ঞান ও উপাসনা প্রণালী ধরেন না। যখন ঋজু কুটিল পথদ্বারা সকলেই সেই সকলের গম্যস্থান ঈশ্বরেরদিকে যাইতেছে এবং যখন প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম যাজন করিলেই শীঘ্র অথবা গৌণে হউক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেই হইবে, এবং যখন পৃথিবীতে চিরকাল ধর্ম্মবিষয়ক মত-বিভেদ থাকিবেই থাকিবে, ধর্ম্ম বিষয়ে মতবিভেদ কোন মতে উঠাইবার জো নাই,—তখন অন্য লোকের ধর্ম্মমত আক্রমণ করা উচিত হয় না। এক্ষণে যেমন কোন লোকের সম্পত্তি আক্রমণ করা অথবা শরীর আক্রমণ করা লোকে অন্যায় মনে করে, যখন লোকে অন্য লোকের ধর্ম্মমতকে আক্রমণ করা সেইরূপ বিগর্হিত কার্য্য মনে করিবে, তখন পৃথিবী সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে। যেমন এক্ষণে কাহারো শরীরের গঠন অথবা চরিত্র বিষয়ে কটাক্ষ করা অভ-

ভদ্রতার চিহ্ন লোকে জ্ঞান করে, সেইরূপ যখন অন্য লোকের ধর্ম্মমতের প্রতি কথোপকথনে অথবা লেখায় কটাক্ষ করা লোকে অভদ্রতার চিহ্ন জ্ঞান করিবে, তখন মনুষ্য ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের চরম সীমায় উপনীত হইবে। এখনই কথোপকথনের সময় এইরূপ শিষ্টাচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিডে লেখা আছে যে, বেদীতে বসিয়া কখন কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিবে না। আমরা সমাজের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাচীরের মধ্যে বসিয়া যাহা করি না, তাহা বাহিরেও করা উচিত হয় না। ধর্ম্ম নিন্দা ব্রাহ্মের পক্ষে বড় বিগর্হিত কার্য্য। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অন্য ধর্ম্ম না আক্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কি প্রকারে প্রচারিত হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন ধর্ম্মকে আক্রমণ না করিয়া কেবল উপাসনা এবং আপনার বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট মত ব্যাখ্যা দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্য প্রদর্শনদ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। ব্রাহ্মেরা এক্ষণে এই প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন, সম্যক্ পরিমাণে করিলে ভাল হয়।

অন্যধর্ম্মকে আক্রমণ করা উচিত হয় না বলিয়া যে লোকে নিজের ধর্ম্মমত সমর্থন করিবে না এমত নহে। বিধিমতে সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজের ধর্ম্মমত উষ্ণতাহীন যুক্তি দ্বারা অবশ্য সমর্থন করা কর্ত্তব্য। সভ্য জগতে এক্ষণে এ বিষয়ে সুপরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে ধর্ম্মবিষয়ে তর্কের শেষ মীমাংসা যেমন প্রতিবাদীকে পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা ছিল, এখন সেরূপ নাই। এক্ষণে ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক কলমযুদ্ধে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাহাও আবার শিষ্টাচারের সহিত সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বপক্ষ অপরপক্ষের প্রথমে গুণ স্বীকার করিয়া তর্ক আরম্ভ করেন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যখন স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মমত সমর্থন করিবার সময়ে এরূপ শিষ্টতা প্রদর্শন করেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের তাহা অপেক্ষা কত অধিক না করা কর্ত্তব্য! ধর্ম্ম-মত অপেক্ষা ধর্ম্ম অসংখ্য গুণে গুরুতর; ধর্ম্মমত লইয়া বিবাদ অপেক্ষা ধর্ম্ম পালনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। যখন মানুষের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্ম মতও ভিন্ন ভিন্ন. ধর্ম্মবিষয়ে মতবিভেদ কখন পৃথিবী হইতে উঠাইবার সম্ভাবনা নাই এবং যখন আমাদিগের নিজের ধর্ম্মমতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, বিশ বৎসরের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখন ঠিক সেরূপ নাই, যখন এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মত তাহা অর্দ্ধশতাব্দী পরে ঠিক সেইরূপ থাকিবে না, যখন মনুষ্যের ধর্ম্মমত এত বিচিত্র ও পরিবর্ত্তনশীল, তখন মত

লইয়া এত মারামারি কেন? যদি ধর্ম্ম বিষয়ে একান্তই তর্ক করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার ও চাতুরি প্রয়োগ না করিয়া উগ্রতাহীন যুক্তি দ্বারা বিধিমতে সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তর্ক চালান কর্ত্তব্য। তর্ককালে নাস্তিকের প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করা উচিত।

ব্রাহ্মদের কেবল শুদ্ধ অন্য ধর্ম্ম আক্রমণ না করিলেই হইল, এমন নহে। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে,কথোপকথনে,বক্তৃতায় ও লেখায় অন্য ধর্ম্মের গুণ পদে পদে স্বীকার করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কথোপকথনে ও লেখায় অন্য ধর্ম্মের গুণ এরূপ স্বীকার করিতেন ও তাহার সহিত এরূপ সাহানুভূতি প্রকাশ করিতেন যে,লোকে তাঁহাকে সেই ধর্ম্মাবলম্বী মনে করিত। হিন্দুরা তাঁহাকে হিন্দু মনে করিত, মুসলমানেরা তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, খ্রীষ্টিয়ানেরা তাহাকে খ্রীষ্টিয়ান মনে করিত; কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এই কয়েকটী ধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই ছিলেন না। তিনি এই বিষয়ে কিছু অধিক যাইতেন, কিন্তু তাঁহাকে এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের ডীন ষ্ট্যানলীর (Dean Stanley's) মৃত্যুর পরে ইংলণ্ডের সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার ভবনে গিয়া তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিল। এই সহানুভূতির প্রধান কারণ কি? তিনি কথোপকথনে, বক্তৃতায় এবং তাঁহার পুস্তকে প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার বিশেষ গুণ স্বীকার করিতেন এবং তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তিনি এত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, কিন্তু কে না জানিত যে তিনি চর্চ্চ অব-ইংলণ্ড (Church of England) মতাবলম্বী চর্চ্চ-অব্-ইংলণ্ডের মতে যে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কেহই সন্দেহ করিত না। ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ ঔদার্য্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মদিগের কেবল যে অন্য ধর্ম্মের গুণ স্বীকার করা কর্ত্তব্য এমত নহে; সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাবের সঞ্চার যাহাতে হয়, তাঁহাদিগের তাহাও করা কর্ত্তব্য। "Strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds." । তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে একটী বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীকে বুঝাইয়া দেন যে, সে ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের কি বিষয়ে ঐক্য আছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের যাহা কিছু দোষ ও ভ্রম থাকুক না কেন, তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে বিশেষ প্রশংসা

করিতে হইবে। অন্যান্য ব্রাহ্ম সমাজ এ বিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রম ও দোষ পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মদিগের এই মহান্ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন।

মনুষ্য কখন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। হয় এগোবে, নয় পেছোবে। যদি ব্রাহ্মেরা এই সকল নিয়মানুসারে কার্য্যে ক্রমোন্নতি প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে পশ্চাৎগামী হইতে হইবে। যদি পশ্চাৎ-গামী হয়েন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এমন একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্কারকের উদয় (ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় সংস্কারাধীন নহে, এমত বলা যাইতে পারে না) আবশ্যক হইবে, যিনি সকল ব্রাহ্ম দল হইতে লোক নির্ব্বাচন করিয়া এমন এক প্রচারক দল সৃষ্টি করিবেন, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতের মধ্যে লোককে প্রভেদ দেখাইয়া এবং সার ধর্ম্মের প্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া কেবল ঈশ্বর-প্রেম ও মনুষ্য প্রেম প্রচার করিয়া এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্ম বিষয়ে এবং তদ্দ্বারা অন্যান্য সকল বিষয়ে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য আন-য়ন করা যাঁহাদিগের এক মাত্র ব্রত হইবে।* ইঁহারা উভয় সাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন হইবেন, যেহেতু মনুষ্য হাজার বিশ্বজনীন হইলেও সাম্প্রদায়িক না হইয়া থাকিতে পারে না। ইঁহারা সারধর্ম্ম প্রচার করিবেন, কিন্তু গার্হস্থ্য ক্রিয়াকলাপ-সম্পাদন ও অন্যান্য বিষয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিয়ম পালন করিবেন।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

ঈশ্বর যেমন মানুষকে সৃজন করিয়াছেন; মানুষও সেই রূপ সময়ে সময়ে ঈশ্বরকে সৃজন করিয়া থাকে। যাহার হৃদয়ের ভাব যেরূপ, তাহার ঈশ্বরও সেইরূপ হইয়া থাকেন; তাহার ধর্ম্মও তদনুযায়ী রচিত হয়। শত্রু-পরি-বেষ্টিত, উৎপীড়িত ইহুদীগণের ঈশ্বরে শত্রুপীড়ন-ভাব বেশী। ইহুদীগণ যখন

---

* সম্প্রতি "জীবনালোক" গ্রন্থের লেখক ও "ধর্ম্মবন্ধু" নামক পত্রিকার সম্পাদক ঐ গ্রন্থ ও ঐ পত্রিকা হিন্দু, মুসলমান কি খ্রীষ্টিয়ান সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য প্রকাশিত বলিয়া তাঁহাদের বিজ্ঞাপন দিতেছেন। এই প্রকার সম্পূর্ণ রূপ অসাম্প্রদায়িক গ্রন্থ অথবা পত্রিকা যত প্রকাশিত হয়, ততই জগতের মঙ্গল। প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক গ্রন্থই এইরূপ।

জেরুজেলমে পুনঃ প্রবেশ করিতে প্রয়াসী, তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে সামরিক ভাব বলববান; সুতরাং তৎসময়ের ইহুদি-ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরেরও সামরিক ভাব অত্যন্ত প্রবল। সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে ঈশ্বরের দয়ার ভাব অতি অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আবার যখন রোম-সম্রাটদিগের বিজয়ী পতাকা তদানীন্তন সভ্য জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়া প্রায় সমগ্র জগৎ একচ্ছত্রাধীন করিল, যখন ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি একে অন্যের সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে লাগিল, যখন সভ্যজগত হইতে সামরিক বিদ্বেষ ভাব বিদূরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে প্রীতির ভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিল, তখনকার খৃষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরের সামরিক বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রীতির সাজে সজ্জিত করিল। আমাদিগের দেশেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রাচীন আর্য্যগণ যখন প্রধানতঃ কৃষি-ব্যবসায়ী, তখন তাঁহাদের দেবতাগণও কৃষক-প্রভু—সূর্য্য, বরুণ, ইত্যাদি। তৎপরে যখন ভারতে যুদ্ধযোগ আরম্ভ হইল, তখন আর্য্য দেবতাগণ কৃষকবেশ পরিত্যাগ করিয়া সমরবেশ ধারণ করিলেন;—তখনকার প্রধান দেবতা মহাশক্তি—খড়্গ-চক্রধারিণী, অসুরনাশিনী, করালবদনী। তৎপরে ক্রমে যখন শান্তিযোগ উপস্থিত হইল, তখন ভারতের আর্য্যগণ আপনাদের আরাধ্য দেবতাকেও সামরিক বেশ বিবর্জ্জিত করিয়া শান্তিসুশোভিত, প্রীতিবিমণ্ডিত বেশে সুসজ্জিত করিলেন। প্রচারশীল ধর্ম্মমত সমূহের ইতিহাস পড়িলে এইটী আরো বিশদরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এক বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ অর্দ্ধ আসিয়াখণ্ড জুড়িয়া বসিয়া আছে; কিন্তু সিংহলের, চীনের ব্রহ্মের বা তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম কি এক? ইংরাজের খৃষ্টধর্ম্ম ও মান্দ্রাজী হিন্দু-খৃষ্টানদিগের খৃষ্টধর্ম্ম, এই উভয়ের মধ্যে এই দুই দিনের ভিতরে কত প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, অন্য পরে কা কথা?

বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মও তাহার জাতীয় চরিত্রের ঠিক অনুরূপ। আজ যদি "বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম বিড়ম্বনার বিষয়" হইয়া থাকে, সে তো সুখেরই কথা! তবে বাঙ্গালীর চিরাগত জাতীয় চরিত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে;—ইহা কি আশার সংবাদ নহে? যে বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া শক্তিপ্রাণ শাক্তধর্ম্ম শক্তিহীন হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, সে বাঙ্গালীর আর এই আবেশময়, কোমলতাময়, বিলাসিতাময়, স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ বৈষ্ণব-

ধর্ম্মে মতিগতি নাই, এ তো বড় আনন্দের কথা! কিন্তু তাহা হইয়াছে কৈ? কৃষ্ণকে "অপকৃষ্টই" বলুক আর "উৎকৃষ্টই" বলুক, বাঙ্গালী যে আজও ঘোর বৈষ্ণব, কৃষ্ণলীলার ঘোর পক্ষপাতী, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি কিছু সন্দেহ থাকিত, ভাদ্র-সংখ্যার "নবজীবনে" "বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের সুযোগ্য ও সুললিত লেখক সে সন্দেহ দূর করিয়াছেন।

এ স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। "বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম" সমালোচনার ভার যোগ্যতর হাতে পড়িলেই ভাল হইত। তজ্জন্য চারি মাস কাল অপেক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন অপর কেহ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না, তখন সত্য ও নীতির অনুরোধে এবং এ দেশের ভবিষ্য-মঙ্গলের মুখ চাহিয়া অগত্যা আমাদিগকেই তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে হইল।

জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই প্রাচীন বিষয়ের নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়া থাকে। বেকন্ গ্রীশীয় দেবদেবীগণের উপাখ্যান সমূহের মধ্যে অতি উচ্চ শ্রেণীর রূপক অলঙ্কার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই; এবং মহাত্মা নিউটনও তাহাদিগকে কাব্য নিহিত প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্ষপীয়রের প্রতিকথায় যে রাশি রাশি তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে সেক্ষপীয়রের প্রেতাত্মাই হয়ত বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকেন। এ দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক টীকাকারেরাও এ বিষয়ে ন্যূন নহেন। বেদব্যাস, মনু, কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যগণের লেখা হইতে দিন দিন যে সমুদায় সূক্ষ্মতত্ত্ব বাহির করা হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া এই সকল মহাত্মাগণও বহুতর শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। আজ আমরা যে বৈষ্ণব-তত্ত্বের সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহারই সম্বন্ধে কত না তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে! শিক্ষিত বৈষ্ণব মাত্রেই প্রায় রাধাকৃষ্ণের লীলাকে আধ্যাত্মিক রূপক রূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কোনও কোনও সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখকও কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র লিখিয়াছেন (Orissa. Vol. I);—

"Associating it (the dogma of Bhakti) with the Vedantic doctrine of the relation of the human to the Divine soul, they—the Bhagavata particularly—have developed a system in which the passions of affection and love are brought to bear

upon the Divinity more prominently and earnestly than religious devotion, and the God-head is represented in such mystic, allegorical language as to thinkers of the present fastidious age, appears highly unbecoming, insulting, licentious and even blasphemous; in which the substitution of the impassioned eloquence of the poet addressing his mistress for the sober language of respectful adoration with reference to the Deity, is held the most sacred. This is the result of a "hypertrophy of the religious feeling" which envelopes the religious sentiment with the charms and imagery of mundane life,—of an excessive fervour of devotion, which rising above all the amenities of sober society longs to hold communion with the God-head in a manner of which sexual love is the most perfect type known to man."—অর্থাৎ ভক্তির সঙ্গে বেদান্তের মতে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা যোগ করিয়া বৈষ্ণবগণ মানুষিক প্রেমভাব ঈশ্বরে আরোপ করিয়াছেন। ভক্তির আতিশয্যে সামাজিক রীতি নীতি ছাড়াইয়া তাঁহারা পরমাত্মার সঙ্গে সেই ভাবে মিলিত হইতে চাহিয়াছেন,—স্ত্রী পুরুষের কামজ প্রীতিই এই জগতে যে ভাবের উৎকৃষ্টতম আদর্শ। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় তাঁহার এই তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য একাধিক ইংরাজ লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হার্টওয়েল থরণ সাহেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"In further confirmation of the preceding view of the spiritual design of this sacred oriental poem, we may observe that this allegoric mode of describing the sacred union between mankind at large or an individual pious soul and the Great Creator, is common to almost all Eastern poets from the earliest down to the present age. . . . This is particularly the case with the *Gitagovinda*, or Songs of Joyadeva, the subject of which is the loves of Krishna and Radha, or the reciprocal attraction between the Divine goodness and the soul of man, and the style and imagery of which, like those of the royal Hebrew poet, are in the highest degree flowery and amatory.—অর্থাৎ জয়দেব বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম, মানাবস্থা ও পরমাত্মার মধ্যে যে প্রেমভাব তাহার রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী হইতে এইরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব "নবজীবনের" লেখক যে আজ নূতন উদ্ভাবিত করিলেন, তাহা নহে। "সাহেবে যাহা সাহেবিআনায় বুঝাইয়াছেন," লেখকও তাহাই বাঙ্গালিআনায় তরজমা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা সাহেবের দ্বারা বৈষ্ণবতত্ত্ব সাহেবি-আনায় বুঝিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট—"বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্মে"—নূতনত্ব

কিছুই নাই। তবে "নবজীবনের" ভাষা, ভাব, ছাপা, কাগজ, সকলই নাকি নূতন, তাই বলিয়া এই বৈষ্ণব তত্ত্বকেও যদি কেহ নূতন বলিতে চাহেন বলুন,—আমাদের তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই।

প্রাচীন বিষয় সমূহের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ইহা দ্বারা প্রাচীন সমাজের অনেক দুর্ব্বোধ্য বিষয় সহজ ও বোধগম্য হয়; প্রাচীন সমাজের রীতিনীতির প্রকৃত আভাস পাওয়া যায়; এবং সাহিত্য ও ইতিহাসের অনেক অন্ধকার স্থান আলোকিত হইয়া থাকে। প্রাচীন বিষয় সমূহের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়াই, আজ আমরা জানিয়াছি যে, বাইবেলে লিখিত পুরুষের পঞ্জরাস্থি হইতে নারীর সৃষ্টি-ব্যাপার রূপকের ভাষা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের মতে, অর্থাৎ অতি প্রাচীনকালের ইহুদীদিগের মতে ঈশ্বর পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আফ্রিকাবাসী জুলুগণ বলে যে, তাহারা বাঁশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ প্রাচীন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়াই আমরা আজ জানিয়াছি যে, ইহুদীদিগের নারীসৃষ্টি প্রকরণের ভাষার মত জুলুদিগেরও সৃষ্টি-প্রকরণের ভাষা বিশুদ্ধ রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে।* এই সকল তত্ত্ব উদ্ভাবিত হওয়াতে সাহিত্য, ভাষা-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে। "নবজীবনের" লেখকও যদি সাহিত্য, ভাষা-বিজ্ঞান, ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যার্থ এই বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রচার করিতে যাইতেন, তবে শত মুখে তাঁহার এই সুললিত প্রবন্ধের প্রশংসা

* "—if speaking and thinking in a modern language Adam might have been made to say to Eve, "Thou art the same as I am," such a thought would in Ancient Hebrew be expressed by: "Thou art bone of my bone and flesh of my flesh." Let such an expression be repeated for a few generations only and a literal, that is to say a material and deceptive interpretation would soon spring up. . . . Thus only can it be explained that the account of the creation of the woman obtained its place in the second chapter, though in clear opposition to what had been said in the first chapter of Genesis."

"In the Zulu language a reed is called Uthlanga, strictly speaking a reed which is capable of throwing out offshoots. It comes thus metaphorically to mean a source of being. A father is the Uthlanga of his children, who are supposed to have branched off from him, &c."—Max Muller.

করিতাম। কিন্তু তিনি নাকি বঙ্গীয় সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্মের,—রাধাকৃষ্ণের লীলাঘটিত বৈষ্ণবধর্ম্মের—পুনঃ প্রচারের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা তাঁহার এই অনিষ্টকর অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

"বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম" পড়িতে গিয়া প্রথমেই তো দেখি, লেখক যে এক মহা বিস্তৃত বাক্যারণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ভিতরে পদে পদে পাঠকের পথহারা হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। লেখক প্রবন্ধের মধ্যে তিনশতবাষট্টি বার ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন, অথচ ধর্ম্ম কি?—একথাটী একটীবার বুঝাইয়া বলেন নাই। মূল ধর্ম্মের সংজ্ঞা না পাইলে কোনও বিশেষ ধর্ম্মের বিচার করিব কেমন করিয়া? প্রসঙ্গক্রমে একটী স্থলে কেবল লেখক ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন:—"সকল শ্রেণীর ঐশ্বরিক সাধনাই ধর্ম্ম।"—কিন্তু ঐশ্বরিক সাধনা কাহাকে বলে? ঐশ্বরিক সাধনার অর্থ বুঝিতে গেলে, ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করা পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বহুল পরস্পর-বিরোধী মত প্রচলিত আছে। এই সকল মতানুযায়ী ঐশ্বরিক সাধনাও পরস্পর বিরুদ্ধগুণ-সম্পন্ন। এস্থলে কি তাহারা সকলেই ধর্ম্ম? অর্থাৎ জল ও আগুন উভয়েই এক পদার্থ? লেখক অতি সুললিত ভাষায় উপদেশ দিয়াছেন;—"যে যে পথে পার, ধর্ম্মের উজ্জ্বল, বিমানব্যাপী পতাকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও।" কিন্তু এই পতাকার পরিচায়ক চিহ্ন যে কি, তিনি কৃপা করিয়া তাহা বলিয়া-দেন নাই। তবে কি লেখক মনে করেন যে, এ পৃথিবীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত মতভেদ আছে, তাহা কেবল "পথ" লইয়া, উপায় লইয়া, সাধনার প্রণালী লইয়া? গম্যস্থান, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি ধর্ম্ম জগতে মতভেদ নাই? স্বর্গ, পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে কি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারশী, বৌদ্ধ, সকলেরই একমত? তাহাতেই বলি লেখক ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে, সাদা কাল, জল আগুন, উভয়েই এক পদার্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হয়।

প্রেম-ভক্তির উপরই লেখক তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন:—"বিশ্রব্ধা নায়িকার প্রেমভক্তিই আমার (বৈষ্ণবের) অবলম্বনীয় সাধন। নায়কে নায়িকার যেরূপ প্রেম-ভক্তি, ঈশ্বরে সেইরূপ ঐকান্তিকী প্রেমভক্তিই ভগবদ্ভক্তির প্রধান সাধন।" কিন্তু

প্রেম-ভক্তি কি তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই। নায়কে নায়িকার যে ভাব তাহাই কি প্রেম-ভক্তি? তাই বা কেমন করিয়া বলি? "নায়কে নায়িকার যেরূপ প্রেম-ভক্তি"—অর্থাৎ অন্য কোনও সম্পর্কেও যে প্রেম-ভক্তি আছে, লেখক তাহা আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন। অথচ স্পষ্ট ভাবে প্রেম-ভক্তি কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া দেন নাই।

সচরাচর লোকে যাহাকে ভাল বাসা বলে, তাহারই সাধুভাষা "প্রেম"। আমরা পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে ভাল বাসি, ইহাদের সকলের প্রতিই প্রেম সম্ভব। প্রেম জাতিতে সবই এক, ওজনের বেশী কম মাত্র। কিন্তু পিতা মাতাকে যে আমরা ভাল বাসি, তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তি মিশিয়া তাহার রূপান্তর জন্মাইয়া দেয়। স্বামী স্ত্রীর যে ভালবাসা তাহাতেও অপর একটী ভাব মিশিয়া তাহার রূপান্তর জন্মাইয়া দিয়া থাকে। এই কারণেই এক ভালবাসার মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, সন্তান-বাৎসল্য, দাম্পত্য-প্রেম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। ভক্তি কথায় সাধারণতঃ ঈশ্বর ভক্তিই বুঝাইয়া থাকে। ভক্ত বলিলে কেহ মাতৃভক্ত বা পিতৃভক্ত বোঝেন না। ভক্তি মিশ্রিত ভাব। গভীর প্রেম ও গভীর শ্রদ্ধার মিশ্রণে ভক্তির উৎপত্তি। ভক্তি বড়র প্রতি ছোটর, মহতের প্রতি ক্ষুদ্রের, উচ্চের প্রতি নীচের। স্নেহ ছোটর প্রতি বড়র। প্রেম সমানে সমানে। প্রেম-ভক্তি বলিলে দুইটী বিরুদ্ধ ভাব বোঝায়। প্রেমভক্তি কেবল তাঁহাকেই করা যায়, যিনি সমান নহেন, অথচ সমান;—যিনি বড় হইয়াও নিজগুণে আমি যে নীচাদপি নীচ, আমাকে সমানের অধিকার দিয়াছেন। এই অর্থে যদি প্রেম-ভক্তি ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তবে ইহা যে একটী অতি মধুর, অতি সুন্দর ভাব তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা মাতার প্রতি পুত্রের অসম্ভব কেন? পুত্রের আবদারের ভিতর দিয়া এই ভাব কি পরিলক্ষিত হয় না? এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব বলেন, মাতৃভক্তিতে যে, ঈশ্বর সাধনা হয় না, তাহা বলি না, কিন্তু আমরা যেরূপ বুঝিয়া এই পন্থা অবলম্বন করি, তাহা বলিতেছি। শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, তিনেতেই একটি পালটীপ্রকৃতি ভাব আছে। * * পালটী-প্রকৃতি থাকিলে সাম্য ভাব আসিয়া পড়ে। এই সাম্য ভাব পিতা পুত্রে যত টুকু আছে; মাতা পুত্রে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আছে; নায়ক নায়িকার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় আছে।

পিতার কাছে সঙ্কোচ আছে, মাতার কাছেও কতকটা আছে, নায়ক নায়িকার মধ্যে সৎকার্য্যের কোনও কথারই আর সঙ্কোচ নাই। ইহাই প্রকৃত বৈকুণ্ঠভাব।"

এ স্থলে বাঙ্গালীর চরিত্র অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মাতার কাছে সৎকার্য্যের কোনও সঙ্কোচ থাকিবে কেন? এক ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ভিন্ন এমন কিছু "সৎকার্য্যের কথা" নাই, যাহার বিষয়ে মাতার নিকট পুত্রের সঙ্কোচ থাকিতে পারে। সরল শিশু তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটীকে দিবা রাত্রি মাতার কাছে খুলিয়া রাখে। এক জন নব্যহিন্দু লেখক এই "বৈকুণ্ঠ ভাব" সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—(বৈকুণ্ঠ) "মনের ভিতরে, যখন তোমার মনের এরূপ অবস্থা হইবে যে, ইহ জগতের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবে না—যখন চিত্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সুখ,—তখন তুমি পৃথিবীতে থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা না থাক তুমি তখন বৈকুণ্ঠে।...কুণ্ঠাশূন্য নির্ব্বিকার যে চিত্ত, তিনি (বিষ্ণু) সেইখানে বাস করেন" (প্রচার—২১৩ পৃষ্ঠা।)

এই বৈকুণ্ঠভাব মাতৃ-ভক্তিতে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইবে না কেন? রামপ্রসাদ তো ঈশ্বরকে মাতা বলিয়াই সর্ব্বদা সম্বোধন করিতেন; কিন্তু তাঁহার সেই গভীর ভক্তিতে কি ঘুণাক্ষরেও কুণ্ঠাভাব বিদ্যমান ছিল? নায়িকার প্রেমের "বৈকুণ্ঠ" ভাবের প্রধান প্রমাণ অভিমান। সাধকের ঈশ্বর-প্রেমেও যে সেই অভিমান আছে, "বৈষ্ণব ধর্ম্মের" লেখক তাহা অস্বীকার করেন না। তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"এই অভিমান ছিল বলিয়াই সাধকপ্রধান রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন,—"মায়ের এম্‌নি বিচার বটে।"

বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন; "যে প্রেমভক্তি কর্ত্তব্যের সহচরী, তাহা বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি নহে। * * কর্ত্তব্যজ্ঞানের দায়িত্ব ইহাতে নাই, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে।" আমরা স্বীকার করি প্রকৃত প্রেম-ভক্তি স্বভাবজা, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যবোধের সহচরী। কিন্তু দায়িত্ব কি প্রেমের চির সহচর নহে? প্রেম-পাত্রের প্রতি কি প্রেমিকের কর্ত্তব্য নাই? কিন্তু প্রেম যেমন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়ায় না, আনন্দ আপনি আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং

দায়িত্ববোধও প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। সে যাহা হউক, প্রেম-ভক্তি যে ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতম ও সহজতম সাধন ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু প্রেম-ভক্তির মধ্যেও ইতরবিশেষ আছে। প্রেম-ভক্তির নিজের মুক্তিদায়িনী শক্তি কিছুই নাই। প্রেম-ভক্তি তাহাদের উদ্দিষ্ট পাত্রের গুণে কখনও বা মানুষকে স্বর্গে লইয়া যায়; আর কখনও বা গভীর নরক-পঙ্কে ডুবাইয়া দেয়। প্রেমের প্রধান লক্ষণ এই যে, প্রেমিক ব্যক্তি প্রেম-পাত্রের দোষগুণ অল্পাধিক পরিমাণে লাভ করিয়া থাকেন। প্রেমের এই গুণ আছে বলিয়াই বাঙ্গালী-বৈষ্ণবের আজ এত দুর্গতি! প্রেমভক্তির ধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম। কিন্তু বাঙ্গালী চিরদিন বিলাসপ্রিয়, চিরদিন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, চিরকালই আদিরসের ঘোর পক্ষপাতী। তাই এই উচ্চ ধর্ম্ম তাহার হাতে পড়িয়া সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা বর্জ্জিত হইয়া সমাজের কলঙ্করাশি বর্দ্ধিত করিতেছে।—তাই শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী লেখক অসঙ্কোচিত ভাবে সীতা ও সাবিত্রী চরিত্রের উপরে "ব্রজের লীলাময়ী প্রেমময়ী" রাধার চরিত্রকে স্থাপন করিলেন!—এলজ্জার কথা আর কাহাকে বলি?

বাঙ্গালীবৈষ্ণবের প্রেমভক্তির পাত্র কে?—শ্রীকৃষ্ণ,—মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন; ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন; কিন্তু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ, জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ, ষোলশ গোপিনীর নাগর শ্রীকৃষ্ণ;—যে কৃষ্ণ চরিত্রের অস্থি-মজ্জা ইন্দ্রিয়াশক্তি ও বিলাসিতা—সেই শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্গালী-বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির উপজীব্য। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হইবার, তাহা হইতেছে।

এই ধর্মের কৃপায় বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে নূতন নূতন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করিয়া অপবিত্রতার স্রোতে দেশকে ভাসাইতেছে! তাহারই কৃপায় আজ সহস্র সহস্র পুরুষ কৃষ্ণলীলা জীবনে পরিণত করিতেছে! আর সহস্র সহস্র কুলরমণী কুল-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া "আদর্শ সাধিকা শ্রীমতী রাধিকার" পদানুশরণ করিতেছে! আবার এই ধর্ম্মেরই প্রশংসা-বাদন ও পুনরুদ্ধারসাধনের চেষ্টায় শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন! এলজ্জার কথা,—এ ঘৃণার কথা আর কাহাকে বলি?*

শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী।

---

* স্থানাভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের দুর্গতির বিশেষ বিবরণ এবার প্রকাশিত হইল না।

সাহস।

সাহস মনের শক্তি। গায়ের জোরের নাম বল। মনের জোরের নাম সাহস। বল না থাকিলে শরীর যেমন কিছুই নয়,—অসার ও অকর্ম্মণ্য; সাহস না থাকিলেও মন কিছুই নয়,প্রাণ-শূন্য এবং শবতুল্য। সংস্কৃত ভাষার অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে,সাহস শব্দে চুরি ডাকাতি বলাৎকার প্রভৃতিরূপ নানাবিধ অত্যাচারকে বুঝাইয়াছে। যথা—মৃচ্ছকটিক নাটকের চতুর্থাঙ্কে কোন এক স্থানে শর্ব্বিলকের প্রেমাসক্তা মদনিকা শর্ব্বিলককে কহিতেছে "অথ শর্ব্বিলক! কুতস্তে এতাবান্ বিভবঃ যেন মামার্য্যা সকাশাৎ মোচয়িষ্যসি?" শর্ব্বিলক! তোমার এত সম্পত্তি কোথায়, যদ্দ্বারা তুমি আমাকে আর্য্যার (বসন্তসেনার) নিকট হইতে মোচন করিতে পার? তাহার উত্তরে শর্ব্বিলক কহিতেছে "দারিদ্র্যেণাভিভূতেন, ত্বৎস্নেহানুগতেন চ। অথ রাত্রৌ ময়া ভীরু! ত্বদর্থে সাহসং কৃতং।" দরিদ্রতাদ্বারা অভিভূত এবং তোমার স্নেহেতে আসক্ত হইয়া হে ভীরু! তোমারই জন্য আমি রাত্রিতে সাহস অর্থাৎ চুরি করিয়াছি। যদিও এখানে সাহসের অযথা এবং অনুচিত ব্যবহার ও বিনিয়োগ নিবন্ধন চুরি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্যত্র কোথাওবা অন্য কোনরূপ অত্যাচার বুঝাইয়াছে; কিন্তু তথাপি দেখিবে যে কোথাও ইহার মৌলিক অর্থ এক মাত্র মনের বল ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় নাই। চুরি ডাকাতি করিতেও যেমন সাহসের দরকার, চোর ডাকাতকে ধরিতেও তেমন সাহসের দরকার। কারুর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে গেলেও যেমন সাহস চাই, কারুর কোন প্রকার দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতেও সাহস চাই। আঘাত করিতেও যেমন শারীরিক বলের প্রয়োজন, আঘাত নিবারণ করিতেও সেইরূপ শারীরিক বলের দরকার। অতএব সাহস-শূন্য মন ঠিক শক্তি-শূন্য শরীরের মত। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাধন এবং শরণি সকলই মজুত আছে, কিন্তু একমাত্র বল নাই বলিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। সাহস যে কতদূর প্রয়োজনের জিনিস, সে বিষয় বুঝাইয়া দিতে অনেক বলা কওয়ার আবশ্যক হয় না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যেমন প্রাণের দরকার, সেইরূপ তার সঙ্গে সাহসেরও অত্যন্ত আবশ্যক। জীবনের এমন ব্যাপার নাই, যাতে নাকি ইহার অভি-

শয় প্রয়োজন না হয়। বিঘ্নবিপদ ও শত্রু সমাকুল এই পৃথিবীর পৃষ্ঠে তুমি যেখানে যাইবে সেই খানেই সাহসের প্রয়োজন। অন্নপানের সংস্থান করিতে চাও, ভূরিপ্রমাণে সাহসকে বুকে বাঁধিতে হইবে। বেপার বণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে চাও, সাহসের ঢের সম্বল আবশ্যক। দেশ বিদেশ দেখিতে চাও, সাহস চাই। পাহাড় পর্ব্বতে বেড়াইতে চাও, সাহস চাই। ঘোড়া গাড়ী দৌড়াইতে চাও, সাহস চাই। দশজনের কাছে দাঁড়াইয়া কোন কথা কহিতে চাও, সাহস চাই। আপনার মানসম্ভ্রম ধন সম্পত্তি বাড়ীঘর রক্ষা করিতে চাও, সাহস চাই। দয়ার কার্য্য করিতে চাও, সাহস চাই। ধর্ম্মের কার্য্য করিতে চাও, সাহস চাই। স্বাধীনভাবে পরিবার প্রতিপালন করিয়া একটু সুখে শান্তিতে থাকিতে চাও, সাহস চাই। যে কাযে তুমি প্রবৃত্ত হইবে, সেই কাযেই সাহস চাই। জীবনের এমন অতি অল্প কাযই পাইবে, যাতে নাকি অল্প কি অধিক পরিমাণেও সাহসের বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

মন যেমন শরীরের সারথি ও প্রাণ, সাহসও তেমনি মনের সারথি ও তাহার সমস্ত উদ্যমের জীবন। যে জাতি কি জন্তুতে ইহার মাত্রা অতি কম, সে এই পৃথিবীতে অত্যন্ত বিড়ম্বিত। কিন্তু প্রকৃতি কাহাকেও এককালে ইহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। দেখ ইহার বলে শকুন গৃধ্র সমাকীর্ণ আকাশে অতি ক্ষুদ্র টুনি টিটিভেরাও আপনাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া স্বচ্ছন্দে আহার বিহারাদি করিয়া থাকে। ইহার প্রভাবে এক অরণ্যমধ্যে হস্তী ও পিপীলিকা পাশাপাশি বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ডুসালো সাহেব যখন মধ্য-আফ্রিকাতে গরিলা বানর শিকার করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেখানে যাইয়া একজাতীয় পিপ্‌ড়া দেখেন। এই পিপ্‌ড়াদের দৌরাত্ম্যে অরণ্যের সমস্ত জীব জন্তু অস্থির। তাদের জাঙ্গাল যেখানে থাকে, তাহার আশপাশে হাতিও ভয়ে আসে না। যদি ভ্রমে কোথাও কোন জন্তুর পা কখনো তাহাদের কোন জাঙ্গালের উপর পতিত হয়, তাহাহইলে অমনি তাহারা আত্মবলাবল বিবেচনা নাকরিয়া সেই জন্তুর পায়ে আক্রমণ করে। চট্‌কিয়া যায়, তবু কামড়াইতে ছাড়েনা। তাহাদের দংশন এমনই বিষাক্ত যে, হয় সেই জন্তুকে ছটফট করিয়া সেই স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইতে হয়, অথবা পদ স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতে হয়। মাটিতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। তখন সমস্ত পিপীলিকার ঝাঁক তাহার উপরে চড়িয়া বসে। কয়েক মিনিট পরেই দেখ যে, সেখানে আর কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না; কেবল এক

টিপি পিপীলিকা। ঘণ্টা কয়েক পরে আসিয়া দেখ, সে পিপড়াও নাই. সে জন্তুও নাই। কেবল কয়েক খানা হাড় পড়িয়া আছে। দেখ পিপীলিকা এত ক্ষুদ্র, তবু তাহার ভিতরে প্রকৃতি এত সাহস পুরিয়া রাখিয়াছেন যে, তুমি তাহাকে যতই টিপ, সে তোমাকে কিছুতেই কামড়াইতে ছাড়েনা। দলিয়া ফেল, তবু তাহার দন্ত তোমার আঙ্গুলে বিদ্ধ থাকে। লিবিংষ্টোন সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা যায় যে, শিকারি যদি দৃঢ়স্নায়ুবিশিষ্ট এবং সাহসী হয়, তাহাহইলে সিংহকে নাকি মাটিতে দাঁড়াইয়াই শিকার করা অতি সহজ। সিংহ তাহার আক্রমণকারীর সম্মুখ হইতে কোন কালেও পলায়ন করে না। মুখব্যাদান করিয়া শিকারিকে গ্রাস করিতে আইসে। যদি শিকারি ভাল সন্ধানী হয়, কোন মতেও লক্ষ্য স্থানে ভুল না করে, তাহা-হইলে সিংহ নিশ্চয়ই বধ্য। আর যদি একবার লক্ষ্য বিচলিত হইয়া যায়, তাহাহইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু। সিংহের এই বিস্ময়কর অলৌকিক সাহস দর্শন করিয়াই পৃথিবীর দিগ্‌বিদিগন্থ কবিগণ বীরপুরুষদিগকে কেশরীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

যখন এই সমস্ত ইতর প্রাণীতেও সাহসের আমরা এত বাহুল্য দেখিতে পাই. তখন মনুষ্য শরীরে যে ইহা কত অধিক পরিমাণে থাকা কর্ত্তব্য এবং তাহার কত দরকার, তাহা আর গণিয়া বাছিয়া ও তৌলিয়া বলিতে হয় না। এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই এক মুষ্টি ইংরাজ আজি দেখ সাতসমুদ্র পেরাইয়া এই ভারতবর্ষে আসিয়া সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছে। এই সাহসে ভর করিয়াই আলেকজাণ্ডার মাসিডন হইতে আসিয়া পঞ্জাবে পোরস্‌কে পরাজয় করিয়াছিলেন। এবং এই সাহসকে সম্বল করিয়াই বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারকেরা দুর্গম গিরিগুহা ও বন পার হইয়া, সমুদ্র সন্তরণ করিয়া, নানা দিগ্‌দেশে রাক্ষস ও বন্য মনুষ্য সকলের মধ্যে আপনাদের ধর্ম্মসূত্র সকলকে প্রচার করিয়াছেন। অতএব দেখ সাহসই তাবৎ বৃহৎ কর্ম্মের প্রাণ। সমাজ সংস্কারই কর আর ধর্ম্মই পরিষ্কার কর, সকলরূপ করণেতেই সাহসপরিকর হইতে হইবে। অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, যাদের গায়ে মবলগ বল আছে, তাহারাই অত্যন্ত সাহসী; কিন্তু তাহা নয়। সাহস শারীরিক বল বীর্য্যের উপর নির্ভর করেনা। ইহা যদি কখন কেহ ভাবেনও, তাহা তাঁহাদের নিতান্ত ভুল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাহস মনের বল—শরীরের বল নয়। তবে কিনা যেমন শরীরের স্বাস্থ্য মনের সুস্থতাকে

পুষ্টি করে, সেইরূপ শারীরিক বলও মানসিক-বল সাহসকে সর্ব্বদা সহায়তা করে। অনেক কার্য্য আছে, যেখানে শরীরের বল ও সাহস উভয়েরই দরকার। আর বহুতর বিষয় এরূপও আছে, যেখানে কেবল সাহসেরই প্রয়োজন। সাহসী ব্যক্তি যদি অতিশয় দুর্ব্বলও হয়, কারু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সে কদাচ পশ্চাৎ-পদ হয় না। মরে তবু আঘাত করে। কিন্তু সাহস শূন্য যে অসুর, সে যখন কোন একটি পিপ্ড়াকেও রুখিয়া আসিতে দেখে, তখন সমস্ত ফেলিয়া ছড়িয়া চীৎকার করিয়া ভয়ে পলায়ন করে। সাহস যখন মনের বল ও প্রাণ, তখন সাহস-শূন্য মনের যত কিছু বৃত্তি বৈভব সকলই দুর্ব্বল ও নিষ্প্রাণ। সাহস রহিতের সহিত প্রেম কর কি বন্ধুতা কর, সে তোমার বিপদ, বিঘ্ন ও শত্রুর আগমন দেখিলে ছাড়িয়া দিয়া সকলের আগে পলায়ন করিবে। সাহস হীনের মনে দয়া আছে এবং পরোপকার করণেচ্ছাও আছে; কিন্তু যখন সে তোমার বাড়িতে কোন দস্যু প্রবেশ করিতে দেখিবে, তখন কাপড় মুড়িদিয়া এক কোণে গিয়া লুকাইয়া থাকিবে। তুমি তাহার সহায়তা পাওয়া দূরে থাক, খুঁজিয়াও দুই চক্ষে দেখিতে পাইবে না। আর যদি কখন তুমি নদী-তরঙ্গে পড়িয়া প্রাণ লইয়া হাবুডুবু খাইতে থাক, তখন দেখিবে যে সে তোমার শরীরের কাছেই তীরে দাঁড়াইয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জনই করিতেছে, জলে নামিয়া তোমাকে যে হাত বাড়াইয়া দিবে, তাহার কম্পিত হৃদয় তাহাকে সায় দিতেছে না। সাহসহীন রেলওয়ের প্রথমশ্রেণীর টিকিট কিনে; কিন্তু গাড়ীর ভিতরে কোন মোটা তাজা লোক দেখিতে পাইলে তৃতীয়শ্রেণীতে বসিয়া যায়। পথে ঘাটে পরের মান সম্ভ্রমকে কিরূপ যত্নে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়, তাহা সে বিলক্ষণ জানে; কিন্তু কোথাও আপনার কিম্বা পরিবারের সম্মান রক্ষা করিয়া পুরুষের মত চলা ফিরা করিতে পারে না। সাহস হীন যদি কোন স্থানে কারুর তিরস্কার দ্বারা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়, তবে তাহা ঘরে আনিয়া স্ত্রী ও শিশু সন্তানদিগের উপরে বর্ষণ করিতে থাকে। "নরথাবে না পেলে ঠাঁই ঘরে এসে মাগ কিলাই"—এই যে প্রবাদ আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত আছে, ইহা সাহসহীন ব্যক্তিদেরই প্রণয়িনীবর্গের মর্ম্মের কবিতা। এবং হতভাগিনী এলোকেশীর স্বামী তাহার অশেষ সাহসহীন লোকেরা কোন মৃদু কর্ম্মের জন্য যতদূর সবলে করতালি প্রদান করে, কোন প্রকৃত সাহসের কার্য্য তাহাদের কাছে কৃত হই-

লেও তাহা তাহাদের সাহসানভিজ্ঞ চিত্ত কোন মতে ধারণা করিতে সমর্থবান হয় না। সুতরাং তাহার সম্মান করণে তাহারা একপ্রকার সম্যক্ উদাসীন থাকে। বরং অনেক সময় তাহারা সে সকল কার্য্যকে গোঁয়ার, দস্যু ও অবিবেকী লোকের কার্য্যবৎ দর্শন করে। সকল বিষয়েই ভীরুতা তাহাদের নিকট ধাম্মিকতা, শীলতা ও ভদ্রতা। আর কাপুরুষতা কি ভীরুতা, ধীরবুদ্ধিমত্তা ও গভীর বিবেচনশীলতা। সকল কার্য্যেই একবার এগুনো ও একবার পেছুনো এবং এইরূপে চিরন্তন দোলকান্দোলনই সাহসহীন চিত্তের কাছে ধীরতা ও ধী-সম্পন্নতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য! যদি কখন কোন বলবান্ ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তাহার বগল হইতে টানিয়া লইয়া যায়, তখন সেই লোককে একটি কথাও না বলিয়া অমনি দৌড়িয়া পুলিশে গিয়া এজাহার লিখানই তাহার কাছে অত্যন্ত বিবেকশীলতা। কারণ, সে নিশ্চয়ই জানে যে, বলিষ্ঠের সহিত দুর্ব্বলের হাতাহাতি সর্ব্বদাই প্রাণ বিনাশের নিমিত্ত এবং গোঁয়ারতাম। যখন কোন সাহসহীনের কোন বিষয়ে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস কি ঘৃণা জন্মে, তখন সে সে বিষয়কে শত অনিষ্টের হেতু বলিয়া জানিলেও সাহসীর মত—অর্থাৎ যাহাদিগকে সে সর্ব্বদাই হোৎকা-গোছের এবং গোঁয়ারের তুল্য বলিয়া ঘৃণা করে, তাহাদের মত—হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে পারে না। পাড়ার কুকুর বিড়ালের জন্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। মনে করে পাছে বা সে উহাতে কার্য্যতঃ আগে কোনরূপ ঘৃণা দেখাইলে পাড়ার বিড়াল আর তাহার বাড়ীর ইন্দুর না মারে! এবং কুকুরও ঘরের শেয়াল না তাড়ায়! কারণ সে ছোটকাল হইতেই শুনিয়া আসিয়াছে যে, "অবিবেকতা পরমাপদামপদং"। সাহসের কাযে বড় একটা ভাবনা চিন্তা থাকে না; সুতরাং সর্ব্বদাই মহা বিপদের আস্পদ। এবং শ্লোকে পড়িয়াছে যে, "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ"—কোন কাযেও কোন দলের আগে যাইবে না। ইত্যাদি।

যখন খ্রীষ্টের প্রায় ৩৩২ বৎসর পূর্ব্বে আলেক্জ্যাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন ম্যাগিস্তানিস্ নামক তাঁহার এক কর্ম্মচারী পাঞ্জাব হইতে ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে আসিতে আসিতে পাটলীপুত্র নগরে (যাহা নাকি বর্ত্তমানে পাটনার সহর) আসিয়া তথায় অনেকদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের ছাউনীতে অধিবাস করে। সেখানে থাকিয়া তখন সে যাহা যাহা দেখিতে পায়, এবং এরিয়ান ও অন্যান্য গ্রীক লেখকেরা পাঞ্জাবে বসিয়া এদেশের লোকদিগের

রীতি নীতি ও স্বভাবাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা সংগ্রহ করে, তাহার সমস্ত দ্বারাই তৎকালীয় ভারবাসীদিগের সাহস, শক্তি ও সাধুতার বহুল বাহুল্যই প্রমাণিত হয়। গ্রীকেরা সেকালের অসম সাহসিক জাতি। তখন পৃথিবীতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বলে ইহাদের সমকক্ষ আর দ্বিতীয় ছিল না। যদিও এরূপ, তবু ইহারা তাৎকালীক ভারতবাসীদিগের শক্তি, সাহস ও স্বভাবাদি দেখিয়া তাহার কিছুরই প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করে নাই। বরং অনেক বিষয়ে প্রশংসাই করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর যখন মুসলমানেরা আসে, তাহারাও আপনাদের ইতিহাসাদিতে হিন্দুদিগকে কাফরইসিনি বলিয়াছে, কিন্তু কোথাও ভীরু বলিয়া অথবা ভেড়ার পালের সহিত উপমা করিয়া গালাগালি দেয় নাই। তাহার পর যখন সর্ব্বশেষে মহাত্মা ক্লাইব সাহেব আসিলেন, রাঙ্গা লেখা ও কালা লেখার দস্তাবিজ বাহির হইল, এবং বাংলা উড়িষ্যা দখল করিলেন, তখন হইতেই মিল সাহেবের ইতিহাস ও ম্যাকলে সাহেবের প্রভাষায় ভারতবাসীরা ভীরু ও ভেড়ার পাল বলিয়া অভিহিত হইল! ইহার কারণ কি? বোধ হয় ইহার দুইটি কারণ। একটী কারণ এই যে, হিন্দুরা বাস্তবিকই পূর্ব্বাপেক্ষা আত্যন্তিকরূপে সাহস শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই বা কেন? তবে কি যোগ সাধনা ও অহিংসাদি ধর্ম্মের রাত্রি দিবা আন্দোলনে এবং শান্তদান্তউপরতস্তিতিক্ষু ভাবাদির ঐকান্তিক পরিমার্জ্জনে মন এখন আর কোন মতেও কিছুরই সম্মুখীন হইতে চায় না? কোন কিছুতেও একটু গোলমাল দেখিলেই কি হস্ত পদ সমস্ত পেটের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কূর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া বসে? ইহা কি এই সাধনার ফল? যদি না হইবে, তবে এমন দশা হইবারই বা হেতু কি? কিছু দিন হইল যখন উত্তর পশ্চিমের স্থানে স্থানে গোচারণ ও মহরম লইয়া হিন্দু মুসলমানে কলহ হইয়াছিল, তখন প্রায়ই গো-রূপ মৃদু প্রকৃতি বাণিয়া ও কায়স্থদিগকে মুসলমানদের দ্বারা নির্দ্দয়রূপে প্রহারিত হইতে দেখা গিয়াছে। আর মুসলমানেরা আপনাদের সাহস দ্বারা হিন্দু ও ফিরিঙ্গি উভয়বিধ লোককেই সুন্দররূপে শাসন করিয়াছে। ইহার আগেও কোন কোন যায়গায় কতবার এই সাহস ধরিয়া তাহারা আপনাদের সম্মানকে বজায় রাখিয়াছে। মুসলমানদের সাহস কিসে রহিল? তাহারাও ত বিজিত। হাঁ একথা সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে শমদমতিতিক্ষু ভাবাদির বড় একটা বিশেষ চর্চ্চা

নাই। ফকিরি আছে, কিন্তু যোগে বিমুগ্ধতা নাই। সহীদ হওয়া অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়াটাই ফকিরির চরম সীমা মনে করে। কাযে কাযেই তাহাদেরে কেহ কোন ইতিহাসে কোথাও ভীরু বলে নাই, ভেড়োও বলে নাই। ধর্ম্ম-গোঁড়া মাত্র বলা হইয়াছে। যেহেতু তাহারা এখনও সময়ে সময়ে আপনাদের সাহসাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া থাকে। হিন্দুদের সে শক্তি সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহারা মেষবৎ শাম্য হইয়া পড়িয়াছে। যদিও জীবনের প্রতি ব্যাপারেই এই শাম্য ও উদাসীন মূর্ত্তি হিন্দু-সামান্যেই ছাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহার সাকল্য কমনীয়তা ও মৃদুতা এক-মাত্র বাঙ্গালিতে যে পরিমাণে দেখা যায়, এরূপ আর কুত্রাপি কাহাতেও দৃষ্ট হয় না। আমাদেরই স্বভাবের এই কুৎসিত কোমলতা-কলঙ্ক যেন জীবনের সকল কাযেই একপ্রকার মর্ম্মভেদী হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশ দখলের দিন হইতে ইহা আরো সমুজ্জলরূপে লোকের চক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এই কলঙ্কটি যাহাতে এই পৃথিবীর বুক হইতে অপনীত হয়, তাহারই সাধনা করা সমস্ত কার্য্যে সকলের আগে আমাদের কর্ত্তব্য। এবং এই প্রস্তাবটী লিখিবার ইহাই উদ্দেশ্য। কারণ, আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর আর্য্যসন্ততি অপেক্ষা আমরাই প্রকৃত সাহস বিষয়ে শোচনীয়রূপে অপদস্থ। শিখ, পুরবী, গুর্খা, মান্দ্রাজী, তৈলঙ্গী ও মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি আর আর ভারতের সন্তানেরা সকলেই আপনাদের পৈতৃক নাম দাঙ্গা হাঙ্গামায়, খাটিয়া খুটিয়া কোন একরকমে বজায় রাখিয়া চলিয়াছে; কিন্তু আমাদের এপর্য্যন্ত ওকর্ম্ম হয় নাই। আমাদের মধ্যেই সাহসের অত্যন্তাভাব✓ যাহাতে এ অভাব কিছু কিছু করিয়া দূর হয়, সকল কাযেই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এ অভাব আমাদের পুরুষানুক্রমে সর্ব্বত্রই পুঞ্জিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া যে মোচনীয় নয় এবং কোনও প্রকারে ছাড়া যায় না এমন নহে। কারণ সাহস মনেরই একপ্রকার ধর্ম্ম এবং কর্ষণীয়। মনের যেমন অন্যান্য বৃত্তিনিচয়কে তাহাদের বিষয়াদি দ্বারা কর্ষণ ও পোষণ করা যাইতে পারে, সাহসকেও সাহসের বিষয়াদি দিয়া সেইরূপ ক্রমে পরিপুষ্ট করিয়া তোলা যায়। শরীরের মধ্যে সহানুভব করিবার একটী শক্তি পরম আশ্চর্য্যরূপে নিহিত আছে। সেই শক্তি থাকাতে একের মনের ক্রোধ দ্বারা অন্যের মনের ক্রোধ, একের ভয়দ্বারা অন্যের ভয়, দয়া দ্বারা দয়া, ভক্তি দ্বারা ভক্তি, ও সাহস দ্বারা সাহস প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া

থাকে। যদি প্রত্যেক পরিবারস্থ প্রত্যেক অভিভাবক আপন আপন জীবনের প্রাত্যহিক ব্যাপার সকলে সর্ব্বদাই সাহস প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রেরাও তাহা প্রতি নিয়ত দেখিয়া দেখিয়া ক্রমশঃ সমস্ত কর্ম্মেই সাহসী হইয়া দাঁড়ায়। ক্রোড়স্থ শিশু কি পার্শ্ববর্ত্তিনী সহধর্ম্মিণী যদি তাঁহাদের পিতা কি ভর্ত্তাকে প্রতি কর্ম্মেই জুজুর ভয়ে জড়-সড় হইতে দেখে, তাহা হইলে সে পরিবারের কেহই আর কোন কার্য্যে পেটের ভিতর হইতে হাত পা খুলিতে শিখে না। পিতাকে পুত্র এবং স্বামীকে স্ত্রী যদি কাযে কর্ম্মে, কথা ও বার্ত্তায়, চলা এবং ফিরায়, যেখানে সেখানে, যারকাছে তার কাছে নির্ভীকচিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে নিরীক্ষণ করে, তাহা হইলে সেই পুত্র কলত্রদেরও চিত্ত ক্রমে নিঃশঙ্ক ও সাহসযুক্ত হইয়া উঠে। সাহসী করিতে চাহিলে লোককে সর্ব্বদাই সাহসিক কর্ম্মে সমধিক উৎসাহ প্রদান করিতে হয়। আর ভীরুতার প্রতিনিয়তই গর্হন করিতে হয়।

সর্ব্বদাই ভীরুকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়। আজি যে জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি ও বল তোমার ও আমার চক্ষে ধাঁধা জন্মাইতেছে, দেখ, তাহারা প্রতি কার্য্যে মনের সত্বা সাহসকে কেমন যত্নের সহিত পালিয়া তুলিতেছে। তাহাদের ক্রীড়া ভূমিতে যাও, দেখ সাহস সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। প্রেমের প্রাঙ্গণে ঢোক, দেখ সাহস তাহারও পাশে পাশে কেমন কমনীয়তার সহিত পদনিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে। ধর্ম্ম-মন্দিরে যাও, সাহস সেখানেও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রচার রাজ্যে প্রবেশ কর, দেখ সাহস সেখানে কত বলের সহিত ও জীবনের সহিত দুর্গম গিরিগহ্বরে এবং হিংস্র পশু মনুষ্য নিকরে, অপ্রতিহত উৎসাহে, ভ্রাম্যমান রহিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের সাম্রাজ্যে গমন কর, আহা! দেখ, সাহস সেখানেও কিরূপ অলৌকিক ও অদ্ভুত শক্তিতে ঝঞ্ঝাবাত ও উত্তাল তরঙ্গাদির মধ্যে নানা প্রকার সম্পদ-শয্যায় নৃত্য গীত করিয়া বেড়াইতেছে। রণক্ষেত্রের তো কথাই নাই। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে গিয়া দেখ, তাহারা কিরূপে খেলা ও দোলায়, কথা এবং বার্ত্তায় বালক বালিকাদিগের মনে প্রত্যহ সাহস শিক্ষন করিয়া থাকে। যখন যে জাতি এই পৃথিবীর যে প্রদেশে জীবিতভাবে সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়, তখন এই প্রাণের প্রাণ সাহসকে সজীবিত রাখিবার জন্য কতপ্রকার উপায় এবং শরণিই না তাহারা অবলম্বন করে। মৃগয়াদি কর্ম্ম ইহার এক পোষণ-ক্ষেত্র। বন্য জন্তু প্রভৃতির

সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধাদি করা এবং তাহাদের পরস্পরের যুদ্ধাদি প্রত্যক্ষ করা সাহস পুষ্টি করিবার আর এক উপায়। দুরারুহ ও দুর্গম স্থানাদি পরিভ্রমণ এবং দূর দূর স্থানে উপনিবেসাদি সংস্থাপন এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বাণিজ্যাদি করণ ইহার অন্যতর পুষ্টি সাধনোপায়। সৈন্য সেনাপতি ও বিগ্রহাদি বেষ্টিত বিবিধ ব্যাপার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া সাহস পুষ্টি করিবার আর একটী উপায়। যে সকল কার্য্য যুক্তি বুদ্ধি ও তর্কে অথবা পরীক্ষায় পরম হিতকর বলিয়া জানা যায়, তাহার প্রবর্ত্তন জন্য নির্ভীকচিত্তে আপনার জীবন দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা এবং কাহারও ধন মান এবং প্রাণ রক্ষার জন্য সর্ব্বদা বিঘ্ন বিপদে সম্মুখীন হওয়া, সাহস মুকুলিত করিবার অপর একটী উপায়। বালক বালিকাদিগকে চলা ফিরায়, দৌড়ধাপে এবং ক্রীড়া কৌতুকে কোন প্রকার হৃৎকম্পজনক বিভীষিকাদি প্রদর্শন করা এবং সকল প্রকার সাহসিক কার্য্যেই সমধিক উৎসাহ প্রদর্শন করা সাহস শিক্ষার শিশুশিক্ষা-প্রণালী। পৃথিবীতে যত জীবিত এবং সাহসী জাতি আছে, তাহাদের সকলের মধ্যেই দেখিতে পাইবে যে, এইরূপে কি অন্য কোনরূপে ক্রীড়া ও কার্য্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা আপনাদের সাহসসম্পত্তিকে অতি যত্নে পরিবর্দ্ধন করিতেছে। কিন্তু তুমি আমি বাঙ্গালী ভীরুতার দৃষ্টান্তের পরম পরাকাষ্ঠা। অহ! কি কলঙ্কিত এবং কুৎসিত ভাবেই কোথা না জীবন যাপন করিতেছি? ধর্ম্ম প্রচারে বসি, সাহস-হীনতা আমাকে বড় বড় বাবুদের বৈঠকখানার বৈদ্যুতিকালো ছাড়িয়া দুরারুহ অন্ধকারময় স্থান সকলে যাইতে দেয় না। রাজনীতির উন্নতি করিতে যাই, সেখানেও সাহসহীনতা আমাকে রাজ-প্রতিনিধির সম্মুখে মন যোগান কথা বই সাধারণের প্রকৃত হিতকর কিছু কহিতে দেয় না। সমাজ সংস্করণে উঠিয়া দাঁড়াই, তাহাতেও সাহসহীনতা আসিয়া ধোবা নাপিত, গুরু পুরোহিত বন্ধের বিবিধ বিভীষিকা চক্ষের কাছে বিস্তার করে। অহ! আমি আজি কি শোচনীয় জীব! দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম ও দেশ হিতৈষীতা সকলই একমাত্র সাহসিকতার অভাবে আমাতে কেবল দিবা রাত্রি বাক্যই প্রসব করিতেছে!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়—আগ্রা।

নিশীথ প্রার্থনা।

১

গভীর রজনী,

চন্দ্র নাই আলো দিতে, বসুধার সুপ্তচিতে

ঘুমাইছে শান্তি-কোলে বিশ্ব চরাচর,

নিদ্রাহীন নেত্র মম, অন্তরে বাহিরে তম,

অতীত দিনের স্মৃতি, কল্পনা কেবল

২

নিশীথে একাকী

শূন্য ঘরে, কেহ নাই, ক্ষীণ দীপ যাই যাই

করিতেছে, পরিহরি ব্যথিত আমায়,

আজি এই বর্ত্তমানে, শূন্যতা জড়িত প্রাণে,

ভাবিতেছি অনিবার চরণ তোমার।

৩

পারি না সহিতে—

তোমার দূরতা হায়! ক্ষতচিত্ত ভেসে যায়

নির্ম্মল শোণিত ধারে, বেদনা অসীম,

তোমা ছাড়া হয়ে কবে, বাঁচি নাথ এই ভবে,

তোমার আশ্রয় বিনা মুকতি কোথায়

৪

প্রাণের ঈশ্বর!

দেখা দেও একবার, মুছি তপ্ত অশ্রুধার,

মৃত্যু-ছায়া দূরে রাখি ওপদ পরশে,

যন্ত্রণা পীড়িত হিয়া, তোমাকে হে না দেখিয়া,

কাতরে কিঙ্কর চাহে বারেক দর্শন।

এ দীর্ঘ জীবনে—
এমনি বিলাপ করে, রহিব কি শূন্য ঘরে ?
তব অদর্শনে চিত্ত সতত অস্থির।
ধন, মান, যশ লাগি, কভু নহি অনুরাগী,
তোমার চিন্তায় সব গিয়াছে ডুবিয়া।

৬

হৃদয় আসন—
রাখিয়াছি সুখে পাতি, তব তরে দিবা রাতি,
বসো তাহে শোভাময়, পরম দেবতা
অতৃপ্ত নয়ন ভরে, দেখিব হে অকাতরে,
আনন্দে পূজিয়া নিতি বাঞ্ছিত চরণ।

৭

এ নর সংসারে—
তব অদর্শন সয়ে, আশা মাত্র প্রাণে লয়ে,
কত কাল আর দেব ! বহিবে জীবন ?
মৃত্যু যেন সংগোপনে, আসিতেছে দিনে দিনে,
আঁধারিয়া জীবনের ভবিষ্যৎ হায় !

৮

অন্তিম বাসনা—
জানত হৃদয়-স্বামি ! কি আর কহিব আমি !
ভকতের শেষ সাধ পূর্ণ যেন হয়,
শ্মশান-অনলে যবে, এই দেহ দগ্ধ হবে,
তখন দর্শন দিও জুড়ায়ে আত্মায়।

৯

জগতে কখন—
ঘটে নাই নর ভালে, এ জীবনে কোন কালে
দেবতা দর্শন। হায় ! কি পুণ্য আমার,

দেখিব হে প্রাণেশ্বর, তব পদ নিরন্তর
জীবিতে, মানব-জন্মে, রহিয়া ধরায়।

১০

যাইব যখন—

পরিহরি ইহলোক, ভুলি অদর্শন শোক
পাইব তোমার দেখা, অনন্ত জীবনে।
প্রার্থনা আমার নাথ! চিরদিন তব সাথ
রহিতে কামনা সদা প্রাণের উচ্ছ্বাসে।

১১

আজি এ নিশায়—

তিলেক দর্শন চাই, করযোড়ে ভিক্ষা তাই,
যাচিতেছি দেও প্রভু ভকতে দর্শন,
একবার, একবার, দেখা দিয়ে প্রাণাধার
অশান্ত দর্শন-তৃষা কর নিবারণ।

শ্রীমতী নীহারিকা-রচয়িত্রী।

সারধর্ম্ম।

(চতুর্থ বা শেষ প্রস্তাব)

তৃতীয় প্রস্তাবের শেষে আমরা বলিয়াছি যে সারধর্ম্মের নিয়মানুসারে চলা বিষয়ে যদি ব্রাহ্মদিগের ক্রমোন্নতি না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এমন একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কারকের উদয় আবশ্যক হইবে, যিনি সেই সকল নিয়মানুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বসুন্ধরাকে কৃতার্থ করিবেন। তাঁহার প্রচারের এই ধুয়া হইবে,—"আমি কোন বিশেষ ধর্ম্ম তোমাদিগের নিকট প্রচার করিতে আসি নাই; আমি ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছি। আমি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন প্রচার করিতে আসিয়াছি। যে ধর্ম্মের বিষয় সকল দেশের সকল শাস্ত্র বলে, আমি সেই ধর্ম্ম তোমাদিগের নিকট প্রচার করিতে আসিয়াছি।" তিনি সর্ব্বদা

লোকদিগকে বলিবেন, "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতের মধ্যে প্রভেদ আছে। ধর্ম্মমত অপেক্ষা ধর্ম্মের উপর জোর দেওয়া উচিত। ধর্ম্মমত লইয়া বিবাদ অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।" তিনি পৃথিবীতে ধর্ম্ম. বিষয়ক বিবাদ প্রশমনার্থ বিশেষ যত্নবান্ হইবেন। আমরা তৃতীয় প্রস্তাবের শেষে তাঁহাকে "সংস্কারক" বলিয়া ডাকিয়াছি; কিন্তু পূর্ব্বকার ধর্ম্মসংস্কারকেরা যেমন তরবারি হস্তে করিয়া পৃথিবীতে উদিত হইয়াছিলেন, তিনি সেরূপ হইবেন না। পূর্ব্বকার ধর্ম্মসংস্কারকেরা যেমন মুখে বলিয়াছিলেন,—"On earth peace and good will towards men."—পৃথিবীতে শান্তি ও মনুষ্যের শুভ কামনা অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি প্রেম, কিন্তু কাজে সেরূপ করিতে পারেন নাই, তিনি সেরূপ হইবেন না। তিনি পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও প্রেম আনয়ন করিতে যত্নবান্ হইবেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার দলের বিশেষ মত যাহা হউক এবং তিনি নিজে তাঁহার বিবেকানুসারে অনুগ্র অথবা উগ্ররূপে উন্নত প্রণালী অনুসারে গার্হস্থ্য অথবা সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদন করুন; কিন্তু কোন ব্যক্তির অথবা জাতির ধর্ম্মমত অথবা গার্হস্থ্য ও সামাজিক রীতি নীতি আক্রমণ করিবেন না। তিনি কেবল ঈশ্বর-প্রেম ও মানব-প্রেম প্রচার করিবেন। তিনি কোন বিশেষ ধর্ম্মমত প্রচার না করিয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বীর উপযোগী উপদেশ দ্বারা উক্ত প্রেম প্রচার করিবেন। তিনি সেই উর্দ্দু সুফী কবির বাক্যানুসারে কার্য্য করিবেন, যিনি বলিয়াছেন :—

"হম তো এস্কি বন্দে হো। মজহবসে নেহি ওয়াকেফ্। গর কাবা হুওয়া তো তব কিয়া? গর বুতখানা হুওয়া তো তব কিয়া?"

"আমি প্রেমের দাস; মতামত আমি জানি না। যদি মুসলমানদিগের কাবা হয় ত তাহাতেই বা কি? আর যদি পৌত্তলিকের দেবমন্দির হয়ত তাহাতেই বা কি?"

তিনি মুসলমানের কাবাতে কি হিন্দুর দেবমন্দিরে সকল স্থানে ঈশ্বর-প্রেমের কার্য্য দেখিবেন; তিনি এমনি উদারভাবে সকল ধর্ম্মকে দৃষ্টি করিবেন।

আমাদিগের প্রথম প্রস্তাবে আমরা বলিয়াছি যে, প্রীতি জ্ঞানে লইয়া যায়। আন্তরিক প্রীতি দেখিলে ঈশ্বর প্রেমিকের হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান উদিত করিয়া দেন।

"কেবল সেই পারে জানিতে তাঁরে
ভক্তিভাবে ডাকে যে জন;
তিনি সরল সাধকের নিকটে
আত্মস্বরূপ করেন প্রকটন।"

আমাদিগের ভাবী ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কারক জানেন যে, আমাদিগের প্রথম প্রস্তাবে যাহা বলিয়াছি, যতই লোকের ঈশ্বর-প্রেম পরিপক্ক হইবে ততই তাহাদিগের দ্বারা পৌত্তলিকতা পরিত্যক্ত হইবে; এবং তিনি মানব-প্রেম বিষয়ে যে উপদেশ দিবেন, তাহার ফলস্বরূপ সামাজিক কুরীতি উন্মূলনের প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হইবে। কিন্তু এরূপ ফলের জন্য তিনি ব্যস্ত হইবেন না, তিনি সে ফল অতি আস্তে আস্তে ফলিতে দিবেন। তিনি জানেন যে, তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা নহেন; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আর এক জন। তিনি জানেন যে, কর্ম্মে তাঁহার অধিকার আছে, কর্ম্মের ফলে কদাচ নাই। তিনি সেই নির্ব্বোধ বালকের ন্যায় কার্য্য করিবেন না, যে বীজ কিরূপে অঙ্কুরিত হইতেছে তাহা প্রত্যহ ভূমি খুঁড়িয়া দেখে। তিনি জানেন যে ঈশ্বর নিজে রক্ষণশীলের প্রধান; তিনি নিজে অতি আস্তে আস্তে কাজ করেন। তিনি বিবাদের কথা আদৌবে উত্থাপন করিবেন না ও তাহাতে সংলিপ্ত থাকিবেন না। তিনি যত পারেন তর্ক হইতে বিরত হইবেন, যেহেতু "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া"—তর্কের দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না; কিন্তু যদি একান্ত তর্ক করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া তর্ক করিবেন। তিনি পৃথিবীতে কেবল শান্তি ও প্রেম আনয়নে যত্নবান্ হইবেন। তিনি প্রকাশ্য ঈশ্বরোপাসনা এরূপ সম্পাদন করিবেন যে, কোন ধর্ম্মাবলম্বীর অপ্রীতিকর হইবে না। তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে উপদেশ দিবেন, তাহাদিগকে দেখাইয়া দিবেন যে, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মই তাহাদিগের ধর্ম্মের সার ভাগ এবং তাহাদিগের ধর্ম্ম প্রকৃতরূপে ঐ ধর্ম্ম, আর ঐ ধর্ম্মই পৃথিবীস্থ সকল ধর্ম্মের ঐক্য স্থল। তিনি যাহাদিগকে উপদেশ দিবেন, তাহাদিগেরই শাস্ত্র হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বর-প্রেম ও মানব-প্রেম বিষয়ে এরূপ উপদেশ দিবেন যে, লোকে তাহা প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবে। তিনি কোন ধর্ম্মকে আক্রমণ করিবেন না। তিনি সকল ধর্ম্মের গুণ-ভাগের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইবেন। তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনে সম্পূর্ণ যত্ন করিবেন।

এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি শান্তি ও প্রেমের অবতার হইয়া সংসারে বিচরণ করিবেন এবং ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

ধর্ম্ম প্রচার।

যেমন জলের ধর্ম্ম নিম্নে যাওয়া, বাষ্পের ধর্ম্ম ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া, সেইরূপ মানবের ধর্ম্ম পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হওয়া। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া যতক্ষণ না তাঁহাকে দৃঢ়তর রূপে ধরিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্ম সে গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ ঈশ্বর প্রাপ্তিই তাহার ধর্ম্ম। তাপের অভাব হইলে জল জমিয়া বরফ হয়—তাহার নিম্নগামিত্ব ধর্ম্মের লোপ হয়, বাষ্পের ঊর্দ্ধগামীত্ব শক্তির বিরাম হয়, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় সুতীক্ষ কিরণ হৃদয়ে প্রতিফলিত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের মুক্তি-উন্মুখী-গতি স্থগিত থাকে এবং আপন ধর্ম্মে মানব সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহে।

এই অসীম দৃশ্য-রাজ্য সন্দর্শন করিয়া মানব মন স্বতঃই স্রষ্টার জন্য প্রধাবিত হয় এবং সকল রাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া আপনার হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানেই তাঁহার দর্শন পায়। তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মের অপার মহিমা-তত্ব বুঝিতে পারিয়া একেবারে স্থির ও গম্ভীর ভাব ধারণ করে। ঈদৃশ ভাবাপন্নব্যক্তিকেও ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না। কেবল আপনার ধর্ম্ম কি এই মাত্র সে তখন বুঝিতে পারিয়াছে। ঈশ্বরকে অনুভব করা এবং ঈশ্বর তত্ব জ্ঞাত হওয়া, আর ঈশ্বরকে লাভ করা, কখন সমান নহে। ব্রহ্মের আয়ত্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত মানব সম্পূর্ণ রূপ ধর্ম্মে অদীক্ষিত থাকে। ইহা স্বীকার করিলে—স্বীকার করিলে কেন—নিশ্চয় আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা এখনও আমাদের ধর্ম্মে কেহই দীক্ষিত হইতে পারি নাই। ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারিব যে, ধর্ম্ম তত্বও আমরা অল্পই বুঝিতে পারিয়াছি। এই রূপ স্থলে ব্রহ্মকে পাওয়া যে কত দূরের কথা, ইহা না বলিলেও অনায়াসে অনুভূত হয়। আমরা ঈশ্বরের কোন একটী স্বরূপও বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমাদের কথা এখানে উত্থাপিত করাই

অন্যায়; কারণ যে সকল মহাত্মাদিগের ধর্ম্ম-জীবনের জন্য আজও পৃথিবী গৌরবান্বিত এবং উন্নত, সেই সকল মনীষা সম্পন্ন লোকদিগের মধ্যেও যখন ধর্ম্মবিরোধী ভাব সকল দেখিতে পাই, তখন আমরা আর কোন্ ছার? পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত কত সাধকের অভ্যুদয় হইয়াছে, "কত প্রেমিক বৈরাগীর এখানে জন্ম হইয়াছে এবং ঈশ্বরের ভক্তগণ দ্বারা অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্যও এখানে যথেষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তথাপি অন্ধকার বিবর্জ্জিত ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি কখনও বিস্ফূরণ হইল না। কখনও মানব-ভাগ্যে দুঃখ-বর্জ্জিত সুখ মিলিল না এবং অমিশ্র সত্যে কখনও মানব দাঁড়াইতে পারিল না। কোন মাহাত্মাই এ পর্য্যন্ত সেই ভূমা মহান্‌কে সম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। ইহা বুঝাইবার জন্য আর কিছুরই আবশ্যক করে না, তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিরোধী-ভাব-মিশ্রিত জীবনই সুন্দর রূপে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং প্রকৃত রূপে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া মানব জীবনে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই, ইহা বলিলে হয় বোধ অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সকল কঠিন সাধন ভজন সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, সকলই আংশিক রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, এক ঈশ্বরের জন্য সকল সাধকের হৃদয়ই ধাবিত হইতেছে। সকলের হৃদয়েই সেই একই পিপাসা নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের জীবন কি তাহার পরিচয় দেয়? কোন সাধকের সহিত কোন সাধকের মিল নাই। কার্য্যে, বাক্যে কি জীবনে—প্রত্যেক বিষয় দ্বারাই প্রত্যেক সাধকের স্বতন্ত্র অবস্থা প্রতিপন্ন হইতেছে। এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়াও কেন এই স্বতন্ত্রতা? কেন এই পরিবর্ত্তনশীল জীবন? এক বিষয়ের প্রার্থী হইয়াও কেন বিভিন্ন পথে গতি? সাধনের বৈষম্যাবস্থাই কি ইহার কারণ নহে? ঈশ্বরের অপার মহিমার্ণবে মগ্ন হইয়া যিনি যে পরিমাণে যে বিষয়ের সাধন করিয়াছেন, ব্রহ্মতত্ত্ব সেই পরিমাণে জ্ঞাত হইয়া তিনি ঈশ্বরের সহিত তদনুরূপ মিলিত হইয়াছেন এবং জগতেও তদনুরূপ যোগী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কেহ প্রেম, কেহ দয়া, কেহ প্রীতি, কেহ ক্ষমা, এই রূপ এক এক বিশেষ ভাবের ভাবুক হইয়া সাধক ঈশ্বর লাভে চেষ্টিত হইয়াছেন এবং জীবনেও কেবল তাহারই ফল প্রত্যক্ষ রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ একাধিক সাধন-তত্ত্বে সিদ্ধকাম হইতে পারিলেই আপনাকে একজন মহা ভক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভক্তের এই অহং ভাব হইতেই

সত্যের এবং জ্ঞানের দ্বার সাধক-জীবনে রুদ্ধ হইয়াছে। সাধক জীবনের এই বিরুদ্ধ ভাব যে কেবল এক জীবনে ঘটিয়াছে, তাহা নহে; সকল সাধকেই ঘটিয়াছে। যখনই মানব ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, যখনই ধর্ম্মপিপাসু হইয়া সেই মহান্ বস্তুর অন্বেষণে জগৎ অতিক্রম করিয়া অবোধ্য অগম্য অসীম অনন্ত রাজ্যে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়াছে, তখন কোন এক দিক্ দিয়া সেই অমূল্য রত্নের জ্যোতি দেখিয়াছে, না অমনি অহং ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে একবারে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। দেখুন, কি আশ্চর্য্য, এত কষ্ট ব্যাকুলতার অন্বেষণে যে রত্নের তত্ত্ব মিলিল, তাহা প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই সে আপনাকে আর কিন্তু তদ্‌বিষয়ে অক্ষুণ্ণরূপে নিযুক্ত রাখিতে পারিল না! তত্ত্ব বুঝা মাত্রই বিশ্বাস হইল, আর কি আমিতো পাইয়াছি। এই যে অহং স্রোতে জীবন ভাসাইল, অমনি সকল তত্ত্বে অন্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ পথে চির দিনের তরে আবদ্ধ হইল! জগতে ভক্ত জীবনের গতির প্রতিবন্ধকতার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই দেখিতে পাই যে, অন্ধতা রূপ কুহকিনীই সাধকের প্রতিবাদিনী হইয়া চলিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই সংক্রামিত অন্ধতা রোগেই সকল সাধকের গমনোন্মুখী ভাব অবরুদ্ধ হইয়াছে। সময়ে স্থানে স্থানে অনুকূলাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও এই অন্ধতাই চিরদিন ধর্ম্মপথের অন্তরায় হইয়াছে। আমরা সাধকগণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া, অমানুষিক নিস্বার্থের কার্য্য দেখিয়া এবং সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ দেখিয়া অনেক সময়েই স্তম্ভিত হই এবং বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিতও হইয়া থাকি; কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোক্ত কারণের জন্য স্বীকার করিতে পারি না যে, তাঁহারা আপনার ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জানি না, এমন কি সকল বিষয়েই আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ আছি, ধর্ম্মতত্ত্বের কেবল কিঞ্চিন্মাত্র আভাস বুঝিতে পারিয়াছি, এই মাত্র। সুতরাং তাহাতে সেই বিশেষ তত্ত্বজ্ঞদিগের শক্তি দেখিয়া এবং তাঁহাদের কার্য্যাদি দর্শন করিয়া যে স্তম্ভিত হইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যে উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কোন কথাই বলিবার অধিকার নাই। সমস্ত জীবন তাঁহাদের চরণতলে বসিয়া শিক্ষা করিলেও আমাদের আশা নাই, তাঁহাদের লব্ধ সত্য ও জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারি। ধর্ম্মে মনুষ্যকে কি করে কল্পনায়ও আমাদের সাধ্য নাই, তাহা বুঝিয়া উঠি;—যেমন

আহার না করিয়া কল্পনায় কেহ আপনার উদর পূর্ণ করিতে পারে না, সেই-রূপ ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও কেহ কল্পনার বলে ধর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মের আস্বাদ কেবল ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে সক্ষম। সমুচিত জ্ঞানে যখন ভগবানের সমস্ত স্বরূপের বিশ্বজনীন ভাব উপলব্ধি হয় এবং তৎ কর্ত্তৃক আত্মা অধিকৃত হয়, তখনই মানব আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বর লাভে সমর্থ হয়। চক্ষু খোলা মাত্রই যেমন আমরা এ দৃশ্যরাজ্যের সৌন্দর্য্য-রাশি অনায়াসে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, ঈশ্বরের মহিমারাজ্যে বাস করিতে পারিলেও সেইরূপ আমরা অতি সহজভাবে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি। বাহ্য দৃশ্য দেখিবার জন্য চক্ষু মেলিতে হয়; কিন্তু অন্তর্য্যামী পর-মেশ্বরকে দেখিবার জন্য আমাদের তাহাও আবশ্যক করে না। সরল অন্তরই অন্তর্য্যামীর সাক্ষাতের প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের দৃষ্টিকে এক দেশার্থে নিয়োগ না করিলেই আমরা অন্ধতার হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া ঈশ্বরের সহিত অকাট্য-যোগে সংমিলিত হইতে পারি। সত্য, জ্ঞান, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, শুদ্ধাদি সমান্তরাল সূত্র গুলির সাহায্যে যদি ঈশ্বরকে ধরিতে পারি, আর সমসূত্রে অবস্থান করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগের গতি ব্রহ্ম-কেন্দ্রাভিমুখী হইবে এবং তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হইয়া সকল বিষয়েই আমাদিগকে অন্ধতাহীন করিবে। তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বরস নিঃসৃত হইয়া হৃদয়ের সমস্ত দ্বার পূর্ণ রাখিবে। জীবনের এই অবস্থাই প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা এবং ইহাই মানবের প্রার্থনীয়।

কিন্তু এই অবস্থা হইতে আমাদের জীবন কত দূরে অবস্থিত? ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন আমাদের এইরূপ উচ্চ অবস্থা নহে, তখন প্রচার করিব কি? যাহার কিছু মাত্র অর্থ সম্পত্তি নাই, সে যদি আজ দানপত্র ঘোষণা করে, তবে তাহাকে যেমন বাতুল বলিয়া সমস্ত জগৎ ব্যঙ্গ করিবে এবং তাহার পরিণাম মিথ্যারূপে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে, আমাদের ধর্ম্ম-প্রচারও কি এইক্ষণ তাহাই নহে? আমাদের এই এক মহারোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাদের যাহা নাই, তাহা এই জগতকে প্রদান করিতে চাই; হৃদয়ে একটু মাত্র সত্য নাই, কিন্তু বাক্য দ্বারা সত্যের জলন্ত জ্যোতি দেখা-ইতে প্রয়াসী হই! নিজের জীবন যাহার জন্য ব্যাকুল নহে কিংবা যাহার অনুশীলন নিজে করি না, অপরকে তাহাতে ব্যাকুলিত করিতে যাই ও অপরকে তাহাতে অভিষিক্ত করিয়া নিজে গুরু হইতে ইচ্ছা করি। নিজ

সম্বন্ধে আমরা এত দূর অন্ধ যে, জানি না আপনার হৃদয়ে কতটুকু শক্তি আছে, যাহা অপরের জন্য নিয়োজন করিতে পারি। এইক্ষণ এই বিষম রোগ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের আত্মদৃষ্টি প্রখর করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহা না হইলে অচিরে আমাদের অনুকূলাবস্থা পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া বসিবে। বাক্যের দ্বারা কখনও ধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে না। যখন যে সাধক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, সকলই জীবনের সঞ্চিত রত্ন দিয়া। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রচার কার্য্য তাঁহাদের জীবনের প্রতি নির্ভর ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাঁহারা প্রাণের সম্পত্তি দিয়া জগতের দুঃখ দূর করিতে পারিয়াছেন। সেই সময়ে যাহা প্রচার হইয়াছে, বুদ্ধির বলে কি বাক্যের জোরে সহস্র বৎসরেও তাহা হইতে পারে নাই। বাক্যেতে কখনও কখনও জীবনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতে আছে বটে; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। উচ্ছ্বাসের ন্যায় তাহার উত্থান ও পতন। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরাম হইয়াছে, দীপ জ্বলিল আর নিবিয়া গেল, কিংবা যাই উত্থান তাই পতন। বাক্যের প্রচার ঠিক এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রকৃত পরিবর্ত্তন ইহাতে সাধিত হয় না। যিনি প্রচার করেন তিনিও সাময়িক উচ্ছ্বাসে এবং যিনি তাহাতে ব্যাকুলিত হন তিনিও সাময়িক উচ্ছ্বাসে,—স্থায়ীত্ব ভাব কাহাতেই নাই। এই বাক্যের প্রচারও এক সময়ে কার্য্যকরী হইতে পারে, যখন সত্য পথ অভ্যাস দ্বারা অভ্যস্ত হয়; কিন্তু তাহা অতি বহু দূরের কথা। পাপ যেমন সহজেই অভ্যস্ত হয়, পুণ্য অভ্যস্ত হওয়া তেমন সহজসাধ্য নহে। সময়ে ঈশ্বর-প্রেমের ভিখারীগণও যখন প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া পুনঃ পৃথিবীর প্রলোভনে পড়িয়া গিয়াছেন, মলিন স্বার্থের নিকট আবার আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছেন, তখন অভ্যাস দ্বারা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হওয়া ও তাঁহার কার্য্যে যোগ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। যখন যে ধর্ম্ম প্রকৃতভাবে জগতে প্রচারিত হইয়াছে তখনই সংখ্যাতীত নরনারী তাহাতে দীক্ষিত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে এবং জগতেরও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সেই প্রকৃত উচ্ছ্বাসে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, মানব তাহা চিন্তা করিতেও অক্ষম। পরে তাহার বিরোধী হইয়া এবং বিকৃত ভাবে প্রচার করিয়াও মানব অদ্যাপি তাহার লোপ করিতে পারে নাই। সেই সত্যের কম্পনে যে প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে, কখনও যে তাহার বিনাশ হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। সত্য

স্বরূপ হইতে যে সত্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে, মানব তাহা বিকৃত করিতে সক্ষম নহে।

প্রচারব্রত তবে কে গ্রহণ করিতে পারে? যিনি ধর্ম্মের আবহ সেই পরাৎপর সারাৎসার ঈশ্বরের আদেশবাণী যে পরিমাণে শুনিতে পান এবং জীবনে তাহা পালন করেন, তিনি সেই পরিমাণে প্রচার ব্রত গ্রহণে সক্ষম এবং জগতের দুঃখও সেই পরিমাণেই হরণ করিতে পারেন। যে সত্য জীবনে লব্ধ হইয়াছে, কেবল তাহাই প্রচারের যোগ্য এবং জগৎও কেবল তাহাই গ্রহণ করে। হৃদয়ের বাহিরের বিষয় লইয়া যখন যিনি যাহা অর্পণ করিতে যান, জগৎ তখনই তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করে। আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের হৃদয়ের কি সম্পত্তি প্রচারের জন্য সঞ্চয় করিয়াছি। যদি অনাহারে থাকিয়া শূন্যহৃদয় লইয়া কেবল শুষ্ক বাক্য সংগ্রহ করতঃই প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকি, তবে এখনই কার্য্যের অন্যায় স্মরণ করিয়া ঈশ্বর সমীপে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। যাহা জীবনে লাভ করি নাই, তাহা কি করিয়া জগতে প্রচার করিব? যাহার আস্বাদ নিজেই গ্রহণে অসমর্থ, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মন কিরূপে আকর্ষণ করিব? কল্পনার জোরে সত্য রাজ্যে কেহই বেড়াইতে পারে না, এবং প্রকৃতরূপে তাহার মধুময় ভাবও জানিতে পারে না।

আরেকটী কথা। নিজের পাপ স্মরণ করিয়া যাহার প্রাণ কান্দে না, কি অভাব পূরণে ব্যাকুলতা জন্মে না, জগতের নরনারীর পাপ যন্ত্রণা দেখিয়া কি তাহার প্রাণ কান্দিতে পারে?—দুঃখ মোচনে ব্যাকুলতা আসিতে পারে? আপনি অসত্যের মধ্যে থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে অব্যাকুলিত অবস্থায় রহিয়াছি, আর অন্যের অসত্যতা দেখিয়া প্রাণের দুঃখ দমিত করিতে পারিতেছি না, ইহা কি আমার স্বাভাবিক অবস্থা? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? আমার এই অস্বাভাবিক কার্য্য দেখিলে জগৎ আরো অবিশ্বাসী হ্ইবে, ধর্ম্মের মধ্যে কৃত্রিমতা দর্শন করিলে ধর্ম্মেতে জগৎ আরো হীন হইয়া পড়িবে। সত্যের ভাণে অসত্য প্রচারিত হইলে সকলকেই আন্দোলিত করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। যদি বাক্যের বলে ধর্ম্ম প্রচার হইত, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, পৃথিবীর অর্দ্ধেক মনুষ্য আজ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত। শুধু বাক্যের কায কিরূপ বিষময়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রত্যেকেরই তদ্‌-

বিষয়ে এক্ষণ সতর্ক হওয়া আবশ্যক; নতুবা সম্মুখের পথ অতি ভয়ঙ্কর ও ভাবীজীবনের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়—বগুড়া।

কর্ম্মফল।

আমি মূর্ত্তিমান কর্ম্মফল। আমার শরীর, আমার মন, আমার চেহারা, আমার গঠন, মাথার কেশ, চোখের চাহনি, গায়ের রঙ্গ, চলন ধরণ ধারণ, বুদ্ধি বিদ্যা, আমার বিশ্বাস কর্ম্ম,—আমার সকলই কর্ম্মফলে এরূপ হইয়াছে। আমার যাহা কিছু, আমি যাহা কিছু—কর্ম্মফলানুযায়ী। আমার কিছুই নাই, যাহা কিছু কর্ম্ম ফলে তেমনটী হয় নাই।

কাহার কর্ম্মফল? আমার। আমি চিরদিন ছিলাম, চিরদিন থাকিব। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, আমার অতীত কেহ নহে। আমি সর্ব্বকাল-ব্যাপী। জীব যখন জন্মে নাই, তখন আমি অজীবে ছিলাম, অণুশায়ী-নেত্র, গুপ্ত-চৈতন্য, নিদ্রিত। জীবে জীবে স্তরে স্তরে সোপানে সোপানে যত জীবের অভ্যুদয় হইয়াছে, সকলেই আমার অস্তিত্ব ছিল। পিতা আমার গর্ভে পুত্ররূপ ধারণ করেন। পিতামহ পিতারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আমি পিতার মধ্যে, পিতামহের মধ্যে, লিঙ্গ ভেদ নাই। আমি পুরুষ, কিন্তু স্ত্রীরূপে মাতার দেহে—মাতার মাতার দেহেও আমিই ছিলাম। আমি সকল জীবে লিঙ্গে অভেদে চিরজীবী। বিশ্বের সহিত আমার জ্ঞাতিত্ব। "বসুধৈব কুটুম্বকম্", পর আমার নাই,—বৃক্ষ লতা তৃণ পশু পক্ষী সরীসৃপ সকলের সহিত আমার কুটুম্বিতা। আজি নররূপে আমাতে যাহা দেখিতেছ, ইহার নূতন কিছুই নহে। আমি প্রাক্তন, কোটী কোটী পূর্ব্ব পুরুষের সর্ব্বস্ব আমি, আমি বংশাবতংশ। পুরাতন পরমাণু লইয়া আমার নবীন দেহ নূতন ভাবে গঠিত, প্রাক্তন কর্ম্মফল। পুরাতন গুণে আমি গুণবান্। জড় বা অজড় আমার সকলই পুরাতন।

আবার সকলই নূতন। আমি এখন যেমনটী, এমনটী আর কখনও ছিলাম না। আমি ছিলাম, কিন্তু সে আমি এ আমি নহে। আমি আজ যাহা, পূর্ব্ব নিমেষে তাহা ছিলাম না। এখন যাহা, পর মুহূর্ত্তে তাহা থাকিব না। আমি চিরদিন থাকিব, কিন্তু এমন আমি থাকিব না।

আমি পুত্র দেহে পৌত্র দেহে অনন্তকাল অমন্তরূপে জীবিত থাকিব। আমি অজর, আমি অমর। এই অনন্ত অতীতে যে যাহা করিয়াছে, অনুসন্ধান কর আমাতে পাইবে। আমি পিতার পুণ্যলক্ষণ, পিতার পাপলক্ষণ। পিতামহের কর্ম্মফল, পূর্ব্ব পুরুষের কৃতাকৃতের জীবন্ত নিদর্শন; অতীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভবিষ্যতের ভবিষ্য-পুরাণ। এই মুহূর্ত্তে আমি যাহা করিতেছি, ইহার ফল কোটী কোটী বৎসর অধস্তন পুরুষেরা উপভোগ করিবে। যাহা হয় তাহা চিরকালে যায় না। কিছুই জগতের মর্ত্ত্য নহে। আমি যেমন অমর, আমার প্রতিবাসী সকলেই তেমনি অমর। আমি যাহা দেখিতেছি, ধ্বংস হইবে না। গোপনে তোমাকে কানে কানে যে কথাটী বলিয়াছি, তাহা চিরদিন বিদ্যমান রহিবে। ব্যোমমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত (Photographed) হইবে না। তোমার হাড়ে হাড়ে শোণিতের কণায় কণায় তাহা আমি খুদিয়া দিয়াছি। সাধ্য কি তুমি ভুলিয়া যাইবে। কেহ কখন তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।

আমি কর্ম্মফল মূর্ত্তিমন্ত। দেবতার সাধ্য নাই কর্ম্মফল ভোগ হইতে আমাকে রক্ষা করেন, কর্ম্মফলের এক কণা লোপ করিতে পারেন। অন্য পরে কা কথা। অকিঞ্চিৎকর মনুষ্য, দেবনর বা নরদেব,ঈশা মুসা মহম্মদ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, যাহা জ্বলিয়াছে তাহা নির্ব্বাণ হইবে না। নমস্কার শাক্যসিংহ, নির্ব্বাণ জীবের অসম্ভব। নির্ব্বাণ নাই, কর্ম্মফল ভুগিতেই হইবে। অজ্ঞানতা হইতে সকলি, কিন্তু অজ্ঞানতা কোথা হইতে? অজ্ঞানতা কর্ম্মফল। একদিনের নহে, একজনের নহে। কোটী কোটী যুগে তাহার বৃদ্ধি, কোটী কোটী জীবে তাহার আলবালে জল সিঞ্চন করিয়াছে। অজ্ঞানতাও যাইবে না, বাসনারও ধ্বংস নাই। অদৃষ্ট কেবল ভবিষ্যৎ নহে, অতীত অদৃষ্ট। কত শাখা প্রশাখায়, কত নালী উপনালীতে উৎপাদন করিয়াছে অদৃষ্ট। অনুসন্ধান কর আজীবন, তবুও তাহা অদৃষ্ট থাকিবে। কারণ খুঁজিয়া মিলে না, কার্য্যফল ভুগিতে হয়, সমস্ত হিসাব মাটী হয়, গণনা ভ্রান্ত হয়, যাহা ভাবি না তাহা ঘটিয়া পড়ে। তাই বলে অদৃষ্ট। অদৃষ্টে যাহা, প্রাক্তন যাহা—তাহা ঘটিবেই ঘটিবে।

"বর বড় না কনে বড়?" "কনে বড়।" প্রকৃতি বড় না পুরুষ বড়? প্রকৃতি বড়। প্রকৃতি অন্নপূর্ণা, পুরুষ ভিখারী। প্রকৃতি পুরুষকে স্বেচ্ছামত উঠাইতে বসাইতে পারেন। প্রকৃতির আদেশে পুরুষ কখন

শ্মশানচারী, কখন সংসারবাসী, কখন কবি, কখন যোগী। পুরুষের ছায়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পুরুষ মুগ্ধ। প্রকৃতি-মদে পুরুষ উন্মত্ত। পরম জ্ঞানী পরম যোগী প্রকৃতি-পরায়ণ। প্রকৃতি ফল— প্রকৃতি কর্ম্মফল—দুল্লঙ্ঘ্য, দুরতিক্রমণীয়। পুরুষ তাহার উপর আপন ছায়া ফেলিতে পারে। সে ছায়ার কোন ফল হইবে কি না, সে প্রকৃতি-অভিপ্রায়-সাপেক্ষ। পুরুষের সাধ্য নাই প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে পারে? তোমার সাধ্য নাই তোমার প্রকৃতি আয়ত্ত কর। দেবতার সাধ্য নাই প্রকৃতি আয়ত্ত করিয়া দেন।

মানুষ স্বাধীন, বাতুলের প্রলাপ। কর্ম্মফল, কর্ম্মফল—যাহা দেখ যাহা ঘটে, সকলেই কর্ম্মফলে। আমি চুরি করি ললাট-লিখন। আমি ব্যভিচার করি, সেও কর্ম্মফল। আবার সেই ব্যভিচারের ফল আমাকে ও আমার অনন্ত অধস্তন পুরুষকে ভোগ করিতে হইবে। যমদণ্ড কঠোর, তুমি কাঁদ আর তোমার মা ই কাঁদুন, সে দণ্ড সংযত হইবে না; কঠোর কুলিশ-ঘাতে মস্তক চূর্ণিত হইবে। অনুতাপ পরিতাপ, অতীত বিমুখ করিতে সক্ষম নহে। পূর্ব্ব-জনে যাহা করিয়াছেন তাহাও ভুগিব, যাহা করিতেছি তাহাও ভুগিব। ইচ্ছা একটী করণ, সহস্রের একটী। ইচ্ছা কর্ম্মফল সম্ভূত, প্রকৃতি-সিদ্ধ, নদী-জলের বুদ্‌বুদ্ জলে উঠিয়া জলে মিশায়। আমি কে? কর্ম্মফল। করি কি? কিছুই না।

যাহা কিছু করি সকলি কর্ম্ম ফলে করায়। "যথা নিযুক্তোইস্মি তথা করোমি"। সাধু কার্য্যের কর্ত্তাও আমি নহি, করিলে গৌরব আমার নহে; পাপ কার্য্যেরও কর্ত্তা আমি নহি। "জানামি ধর্ম্মংনচ মে প্রবৃত্তিঃ জানম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ"। কর্ত্তা কর্ম্মফল, কর্ম্ম কর্ম্মফল, করণও কর্ম্মফল। অধিকরণ মাত্র আমি। সে অধিকরণও কর্ম্মের রূপান্তর। আমার আমিত্ব নাই, আমার অহঙ্কার নাই। কর্ম্মে কর্ম্মযোগ, ফলে ফলযোগ—এই লইয়া আমার আমিত্ব। আশাও কর্ম্মফল, পূর্ত্তিও কর্ম্মফল, অপূর্ত্তিও কর্ম্মফল। উৎপত্তি নিবৃত্তি কর্ম্মে কর্ম্মে। জলে জলাঞ্জলি। নদী জলের এক অঞ্জলি লইয়া তাহাতেই জলাঞ্জলি দিলে এক বিন্দুও বাড়ে না। কিন্তু কর্ম্মফলে কর্ম্মফলের বৃদ্ধি হয়। কঠোর আয়স-শৃঙ্খল দুশ্ছেদ্য, দুর্ভেদ্য, নিরন্তর কেবল বাড়িতেছে। আমি পাপী কর্ম্মফলে, তুমি পুণ্যবান্ কর্ম্মফলে। উভয়েই কর্ম্মফল, ভিন্ন কর্ম্মের ভিন্ন ফল। পাপী পুণ্যবান্ হয় কর্ম্মফলে,

কর্ম্মফলে পুণ্যবান্ পাপ সঞ্চয় করে। তুমি পাশ্চাত্য কর্ম্মফলে, আমি প্রাচ্য কর্ম্মফলে। ব্রাহ্মণ শূদ্র, আস্তিক নাস্তিক—কর্ম্মফলে, প্রকৃতিসিদ্ধ। উন্নতি অবনতি কর্ম্মফলে। আস্তিক নাস্তিক হয়, জীব জীবত্ব হারায় কর্ম্মফলে। যোনি ভ্রমণ কর্ম্মফল মাত্র। Development and Degeneration উন্নতি ও অবনতি। নীচযোনি হইতে ঊর্দ্ধযোনি, ঊর্দ্ধযোনি হইতে নীচযোনি ভ্রমণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। দর্শন ও বিজ্ঞান সহচর, সখা; আবার না বুঝিলে আত্ম-বিরোধ।

যাহা জানি ইন্দ্রিয় হইতে। জড় অজড়, ঈশ্বর অনীশ্বর জ্ঞানই ইন্দ্রিয় মূলক। ইন্দ্রিয় কোথা হইতে? তোমার আমার ইন্দ্রিয়ে প্রভেদ কেন? দুই ভাই,—একজন লৌকিক একজন পারলৌকিক কর্ম্মে নিযুক্ত কেন? প্রতি-নিয়ত ক্রিয়া, প্রতি-নৈমিত্তিক ক্রিয়া—সকলই কর্ম্মমূল। ইন্দ্রিয় কর্ম্মমূলক। তাই তোমার অদৃষ্টে নাস্তিকতা, আমার অদৃষ্টে ভগবদ্ভক্তি। আমার জ্ঞান অজ্ঞানতা আমার কর্ম্মফলে। বৃক্ষ আছে দেখিনা কর্ম্মফল, দেখি কিন্তু ঠিক দেখি না কর্ম্মফল, ঠিক দেখি সেও কর্ম্মফল। আমার দেখায় না দেখায় জড়ের জড়ত্ব যায় না। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লোপ হয় না।

কেহ পড়িয়া ঘুমায় সেও কর্ম্মফল। কেহ মোহ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে সেও কর্ম্মফল। সফলতা বিফলতা চেষ্টা-মূলক, চেষ্টা কর্ম্মমূলক। আমার কর্ত্তব্য কি?—কর্ম্ম যাহা করায়। যদি কর্ম্মফলে উদ্যম জন্মিয়া থাকে, তাহা অধিকার করিয়াছি। যদি অধিকার করিয়া থাকি, চেষ্টা জন্মিবে। যদি চেষ্টা করি, অনন্তকালে সফল হইব। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাই পাপ না করিবার চেষ্টা করিব; আর যদি অদৃষ্টে থাকে চেষ্টা করাও হইবে না। আমার সুকৃতে কোটী কোটী বংশ সুখী হইবে, তাই সুকৃতি করিব। যাহা-দিগকে জগতে আনিতেছি, তাহাদিগকে সচ্চরিত্র দিয়া যাইতে চেষ্টা করি। চেষ্টা করিব—সফল হইব কি বিফল হইব, আমিও বলিতে পারি না তুমিও বলিতে পার না। সে আমার অদৃষ্ট মত ঘটিবে।

কর্ম্মফল যাহা ঘটিবেই ঘটিবে। দেবতার সাধ্য নাই তাহা নিবারণ করেন। কিন্তু কর্ম্মে কর্ম্মফল আরও করিতে পারে। কর্ম্ম দুই প্রকার, প্রতি-নিয়ত ও প্রতিনৈমিত্তিক। প্রতিনিয়ত ক্রিয়া প্রকৃতির অনুসারী, প্রতি-নৈমিত্তিক ক্রিয়া প্রকৃতি ও অবস্থার অনুসারী। উভয়েই কর্ম্মফল মূলক; কিন্তু প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টীতে কর্ম্মফলমূলকতার পরিমাণ অল্পতর।

আবার একটী সাক্ষাৎ প্রকৃতিসিদ্ধ, অপরটী অসাক্ষাৎ সিদ্ধ। প্রতিনৈমিত্তিক ক্রিয়া নিত্যক্রিয়ার অনুরূপ হইলে প্রাক্তন ফল পরিপুষ্ট। অননুরূপ হইলে কর্ম্মফলে প্রকার ভিন্নতা জন্মে। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। নিত্য বা নৈমিত্তিক উভয় ক্রিয়া অন্যতর ক্রিয়ার অন্যতর কারণ। প্রতিনৈমিত্তিক অননুরূপ ক্রিয়া যত অধিক হইবে, প্রাক্তন জন্মানুগত প্রকৃতি তত সঙ্কুচিত হইবে। চালনায় স্ফূর্ত্তি। চালনায় বিকাশ, সমপ্রসারণ। চালনা অভাবে অপ্রসারণ, সঙ্কোচন। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে সংকুচিত হয়। কর্ম্মের পূর্ব্বে ইচ্ছা, ইচ্ছার পূর্ব্বে বাসনা, বাসনার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় বিকার। চালনার অভাবে কর্ম্ম-ফল জনিত কর্ম্ম প্রথমে ইচ্ছায়, তাহার পর বাসনায়, তাহার পর ক্রমে ইন্দ্রিয় বিকারে সংকুচিত হয়। উর্দ্ধস্তর হইতে নিম্নতর স্তরে যত সংকুচিত হইয়া আইসে, ততই নৈমিত্তিক ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয়, আওতা কাটিয়া যায়। নৈমিত্তিক ক্রিয়া পরিবর্ত্তনের মূল। এই জ্ঞান নির্ব্বাণের মূল। জ্ঞানীর পুত্র জ্ঞানীর নির্ব্বাণ লাভে সুবিধা অধিক। অজ্ঞানীর পুত্র জ্ঞানীর জ্ঞান অজ্ঞা-নতা-জড়িত। পূর্ণজ্ঞান ঘটে না। পূর্ণ জ্ঞান না হইলে মুক্তি মিলে না। পূর্ণজ্ঞান মিলে না। মুক্তিও ঘটে না। নির্ব্বাণ মুক্তি মোক্ষ কল্পতরুর সুপক্ক ফল। জ্ঞান ভিন্ন ইন্দ্রিয় বিকার নিরাকরণ হয় না, মোহ মায়া অজ্ঞানতা কাটে না। মুক্তি জ্ঞানে, মুক্তি কর্ম্মে। কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞান-কাণ্ড শ্রেষ্ঠতর। ধর্ম্মোপদেশের সার্থকতা নৈমিত্তিক ক্রিয়ায়। ধর্ম্মকর্ম্মের সার্থ-কতা এই খানে; উপাসনা, বন্দনা; প্রার্থনা, যজন, যাজন সকলের সার্থ-কতা এই খানে—Heredity ও Adaptation অনুবৃত্তি ও পরিবৃত্তির এই অর্থ। নিত্য ক্রিয়ার ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে প্রবলতর কে?—নিত্য ক্রিয়া। গতিশীল কে?—নৈমিত্তিক ক্রিয়া। নিত্যক্রিয়া Conservative, নৈমিত্তিক ক্রিয়া progressive.

নিত্য না নৈমিত্তিক? তুমি চলিবে কোন্ পথে, করিবে কি? তোমার বলিবার সাধ্য নাই। নির্ব্বাচন ক্ষমতা তোমার নহে। তুমি ভাবিতেছ, তুমি একাকী; মনে করিতেছ, যাহা খুসি তাহাই করিবে। তুমি একটী জীব নহ। কোটী কোটী জীবের উপাদানে যেমন তুমি গঠিত, তেমনি কোটী কোটী জীবস্থ জীবনকোষের সমষ্টি তুমি। আকারে প্রকারে ইহাদের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। এই কোটী জীবন-কোষের সাধারণতন্ত্র দরবারে যাহা আদেশ হইবে, সে আদেশ কর্ম্মফল-জনিত, তুমি তাহাই করিবে। মাথা

নাড়িবে না, হুঁহা করিবে না। আনন্দের সহিত তাহাই করিবে। মানুষ গোলামের গোলাম।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী

অসীম ও সসীম।

(প্রথম প্রস্তাব)

এক পক্ষে অসীমের মধ্যদিয়া সসীমের দিকে মানুষ দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম কি অক্ষম, অন্যপক্ষে সসীমের মধ্যদিয়া মানুষ অসীম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম কি অক্ষম, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনার জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইতেছে।

মীমাংসার বিষয় অতি গুরুতর, তদ্বিষয়ে আলোচনা করাও বাস্তবিক অতি কঠিন ব্যাপার। এইরূপ আলোচনার ভিতরে মগ্ন হইয়া প্রাণ যখন স্তব্ধ হয়, ইন্দ্রিয়-বন্ধন যখন শিথিল হয়, তখনই কেবল আমরা কথঞ্চিৎ ফল লাভ করিতে সক্ষম হই; নতুবা সমস্তই পণ্ডশ্রম বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ইহার ভিতর হইতে অনুভবাত্মক বিচার-গ্রাহ্য অর্থ নিষ্পত্তি করিতে হইলে শান্ত সমাহিত চিত্তে অর্জ্জিত সংস্কার সমূহ বর্জ্জন পূর্ব্বক সত্য-নিষ্ঠ ও সত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া ধীরে ধীরে পদ সঞ্চারণই শ্রেয়স্কর।

মীমাংসার বিষয় অতি গুরুতর, কিন্তু তা বলিয়া কোন্ মনুষ্যহৃদয় ইহার আলোচনা না করে? সাধু হউক অসাধু হউক, পণ্ডিত হউক মূর্খ হউক, সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিবিধ প্রকারে এই বিষয়টি নিজ নিজ হৃদয়ে মীমাংসা করিবার নিমিত্ত দিবা নিশি চেষ্টা করিতেছেন। কিছু মীমাংসা করিতে অক্ষম হইলেও ইহার আলোচনায় মানুষ বড়ই ব্যাকুল। অসীমই জীবনের আদি বিন্দু, মধ্য বিন্দু ও অন্ত-বিন্দু, তাই মানুষ ইহার আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না। অনুভব ও বিচার সত্য নির্দ্ধারণের দুইটী উপায়। আলোচনাকালে এই সমতা রক্ষা করিয়া চলিলে প্রকৃত অর্থ নিষ্পত্তি হইতে পারে। আমরাও এই দুইটীর উপর নির্ভর করিয়াই আলোচ্য বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

প্রস্তাবারম্ভে শব্দার্থ নির্ণয় সর্ব্ব প্রথমেই প্রয়োজনীয়। অসীম বলিতে মোটামুটি ইহা সকলেই বুঝিয়া থাকেন যে, যাহার সীমা নাই তাহাই অসীম; কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলে চলিবে না। এইরূপ বুঝাইয়া আমরা কেবল অসীম সম্বন্ধে নিজ নিজ অজ্ঞতাকে বাক্য-কোষে

আবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকি মাত্র; তাহার ফল ভ্রম কল্পনা ভিন্ন আর কিছু হয় না। প্রকৃত অসীম পদার্থ হইতে পূর্ব্বে আমরা যতদূরে অবস্থিতি করিতেছিলাম, পরেও ঠিক ততদূরে অবস্থিত থাকি; দূরত্ব সম্বন্ধে কিছুই ইতর বিশেষ ঘটে না। অতএব অসীম শব্দার্থ এইরূপ ভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য, যাহাতে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তৎসম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের ভাব উজ্জ্বল ও বিকশিত হইতে পারে।

অসীম সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, অসীম পদার্থ আপেক্ষিক কি নিরপেক্ষ, তাহা বিবেচনা করা উচিত। যদি বলা যায় যে অসীম পদার্থ অন্যান্য পদার্থবৎ আপেক্ষিক (Relative), নিরপেক্ষ (Absolute) নহে, তাহা হইলে অপরাপর বিষয়ের সহিত তৎসম্বন্ধত্ব হেতু তাহার অসীমত্ব রক্ষা করিতে পারা যায় না। সুতরাং যখন সেই পদার্থকে অসীম বলিয়া প্রথমে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তখন তারপর তৎনিরপেক্ষত্বও স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ক্রমশঃ এই বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে।

অসীম সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, অসীম কদাপি সংযোগান্ত বা বিয়োগান্ত পদার্থ হইতে পারে না, অর্থাৎ অসংখ্য সসীম একটির পর একটি বিন্যস্ত করিয়া অথবা অসংখ্য সসীম একটি হইতে একটি বিযুক্ত করিয়া চিরকাল চলিলেও অসীম পদার্থে উপস্থিত হইতে পারা যায় না। যাহা সসীম তাহা চিরকালই সসীম থাকিবে; ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ বৃহত্তর বৃহত্তম অথবা বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম হইতে হইতে অনন্তকাল চলিবে, তথাপি শেষে তৎ সংযোগ বা বিয়োগফল সসীম ভিন্ন কখন অসীম হইবে না। চিত্ত যখন এবম্প্রকার উপায়াবলম্বন পূর্ব্বক অসীমানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, সসীমন্তর সমূহ সংযোগ বা বিয়োগ করিয়া অভিপ্রেত ফল লাভের প্রত্যাশী হয়—তখন তাহার ফল এই হয় যে, কিয়দ্দূর গিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়ে, আর উঠিতে বা নামিতে চাহে না। তখন সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া যত দূর মনশ্চক্ষুর পক্ষে দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর হয়, বিহ্বল-নেত্র ততদূর পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া বিস্ময়ান্বিত ভাবে বলিয়া উঠে "আশ্চর্য্য! ইহা অসীম!"

সাধারণে এই ভাবেই অসীম শব্দার্থ হৃদয়ঙ্গম করেন। পরন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রম ভিন্ন আর কিছু নহে। "ইহা (অর্থাৎ এই অসংখ্য সসীমন্তর) অসীম" এই বাক্যের ভিতর "ইহা" এই পদটি সসীমকেই নির্দ্দেশ করিতেছে; সুতরাং "সসীমই অসীম" ইহাই উক্ত বাক্যের পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। এস্থলে

অসীমকে সসীমের বিশেষণ করা হইল মাত্র, অতএব এভাবে বিশেষণরূপে অসীম জ্ঞান জন্মিল বটে, কিন্তু বিশেষ্য পদ বাচ্য অসীম পদার্থ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যতটুকু অজ্ঞ ছিলাম, এখনও ততটুকু অজ্ঞ রহিলাম। যে অসীম সসীম সম্বন্ধজনিত তাহা আপেক্ষিক; অসীম কখন আপেক্ষিক নহে; সুতরাং এ অসীম, অসীম নহে। তবে নিরপেক্ষ অসীম কোথায়?

এস্থলে কতকগুলি বিরোধ-প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, সেগুলির উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথম আপত্তি এই যে, যখন লোহিত গোলাপ বলা যায়, তখন যেমন লোহিত বিশেষণ পদবাচ্য হইলেও লোহিত বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি যদি অসীমকে সসীমের বিশেষণ রূপে রাখা যায়, তাহাতেই বা আমাদের তৎজ্ঞান লাভ পক্ষে ক্ষতি কি? গোলাপ জ্ঞান ও লোহিত জ্ঞান ইহারা যেমন সংযুক্ত থাকিয়াও প্রত্যেকে পৃথক, তদ্রূপ অসীম জ্ঞান ও সসীম জ্ঞান পরস্পর সংযুক্ত থাকে থাকুক, আমরা তাহা হইতে অনায়াসে অসীম জ্ঞানকে পৃথক ভাবে মনে ধারণা করিয়া লইতে পারি। মোট কথা এই, আপেক্ষিক জ্ঞান যখন স্বতন্ত্ররূপে হৃদয়ে ধারণা করা গেল, তখন তাহাকে নিরপেক্ষ কেন না বলিব? (যাহার প্রকাশ অন্যান্য পদার্থের সাহায্য সাপেক্ষ, তাহাই বিশেষণ বা আপেক্ষিক পদ বাচ্য) এবম্প্রকার আপত্তি খণ্ডনার্থ আমাদের বক্তব্য এই যে, লোহিতের দৃষ্টান্তানুসরণে যখন অসীম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মীমাংসা উপস্থিত হইয়াছে, তখন দেখা কর্ত্তব্য যে, উক্ত দৃষ্টান্ত অসীম সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে কি না। লোহিতকে আমরা বিশেষ্য বা নিরপেক্ষ ভাবে মনে ধারণা করিতে পারি কি না, ইহার সংমীমাংসা হইলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। যখন লোহিত বর্ণকে সর্ব্ব পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া মন মধ্যে তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে ধারণা করা যায়, তখনও তাহার বিশেষণত্ব দূর হয় না। চিত্ত নিহিত ক্ষেত্রপট লোহিতবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত হওয়াতে স্থূল দৃষ্টিতে তৎনিরপেক্ষ ভাব প্রতীয়মান হয় মাত্র। এরূপ অবস্থায় যদি তাদৃশ লোহিত বর্ণকে নিরপেক্ষ বলি, তবে রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডের লোহিত বর্ণকেই বা কেন না নিরপেক্ষ বলিব? সুতরাং যখন লোহিতের আপেক্ষিকত্ব ভাব কিছুতেই অপগত হইবার নহে, তখন অসীম সম্বন্ধে এবম্বিধ দৃষ্টান্ত যে একেবারেই অপ্রযুজ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি এই—যেমন আপেক্ষিক লোহিত ভিন্ন নিরপেক্ষ লোহিতের অস্তিত্ব অসম্ভব, তদ্রূপ আপেক্ষিক অসীম ব্যতীত নিরপেক্ষ অসীমের

অস্তিত্ব খ-পুষ্পবৎ বলিতে হইবে। তৃতীয় আপত্তি এই যে, নিরপেক্ষ লোহিতের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য বটে, নহিলে আপেক্ষিক লোহিত দাঁড়াইবার ভিত্তি পায় না; কিন্তু সে অস্তিত্ব স্বীকার্য্য মাত্রই সার, কেন না তাহা কদাপি জ্ঞেয় হইতে পারে না; আমাদের জ্ঞান-যন্ত্র মন এমনি ভাবে গঠিত যে, তাহাতে সেজ্ঞান প্রকাশিত হইবার উপায় নাই।

প্রথম আপত্তিকারীরা অসার অনন্তের উপাসনা করিয়া থাকেন; দ্বিতীয় আপত্তিকারীরা নাস্তিক, তাঁহারা আপেক্ষিক অনন্ত ভিন্ন নিরপেক্ষ অনন্তের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আর তৃতীয় আপত্তিকারীরা অজ্ঞেয়বাদী, তাঁহাদের মতে নিরপেক্ষ অনন্ত অজ্ঞেয়।

অজ্ঞেয়বাদীগণের আপত্তি খণ্ডন সাধারণে যত সহজ মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে ততটা নয়। তাঁহাদের বিচার-দুর্গে শীঘ্র কোন শত্রুর কিছু করিবার যো নাই, সে দুর্গ অধিকার করিতে হইলে অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রের প্রয়োজন। মানুষের মন বাস্তবিকই এরূপ ভাবে গঠিত যে, তাহাতে আপেক্ষিক অসীম ব্যতীত নিরপেক্ষ অসীম জ্ঞান স্ফূর্তি পাইতে পারে না। আপেক্ষিক সত্যই চিন্তার একমাত্র ধারণীয়; সুতরাং যখনই অসীম পদার্থ আমাদের চিন্তাগত হয়, তখনই তৎনিরপেক্ষ ভাব দূর হইয়া গিয়া আপেক্ষিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। চিত্তনিহিত ক্ষেত্র-মধ্যগত লোহিত বর্ণ দৃষ্টে যেরূপ আমাদের এই ভ্রম উপস্থিত হয় যে, তাহা নিরপেক্ষ স্বাধীন স্বতন্ত্র পদার্থ, সেইরূপ বাহ্য অসংখ্য সসীমস্তর হইতে তৎবিশেষণমাত্রা বিশিষ্ট অসংখ্য ভাবটিকে লইয়া যখন আমরা উক্ত ভাব চিত্ত নিহিত সসীমস্তর সমূহে প্রয়োগ করি, তখন তাহা স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ অসীম জ্ঞান বলিয়া আমাদের ভ্রম জন্মিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। এবম্বিধ যুক্তি অনুসারে অজ্ঞেয়বাদীদিগের মত দৃঢ় হয় ভিন্ন কদাপি শিথিল হয় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, হার্ব্বার্ট স্পেন্সর নিরপেক্ষ অসীম পদার্থ অজ্ঞেয় বলিয়া মৌখিক স্বীকার করেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ অন্যত্র জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কেন না তিনি যে স্থলে বলিয়াছেন যে, "একটি অসীম নিত্যকাল স্থায়িনী শক্তি যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কার্য্য করিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত" সেই স্থলে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি নিরপেক্ষ অসীম পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণেও জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। নহিলে অসীমকে শক্তি স্বরূপে নির্দ্দেশ করিবার কারণ

কি? যাঁহারা দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ স্পেন্সরের উপর এই রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই এক কথায় তাঁহার সমস্ত দুরূহ বিচার খণ্ডন করিয়া দেন, তাঁহারা যে সেই সকল বিচারের ভিতর ভালরূপে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। প্রথমতঃ তিনি "অসীম" এই শব্দ শক্তির বিশেষণ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি যে শক্তি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও কার্য্য শব্দের অপেক্ষা করিতেছে। শক্তি স্বয়ং আপেক্ষিক, কারণ কার্য্যকে আশ্রয় না করিলে শক্তি কদাপি জ্ঞেয় হইতে পারেন না। সুতরাং যে অসীম এবম্বিধ আপেক্ষিক শক্তির আশ্রয়ে আমাদিগের চিত্তে প্রকাশিত হয়, তাহাকে নিরপেক্ষ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্তই ভ্রম। উপরুক্ত বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আপেক্ষিক অসীম সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারি। পরন্তু নিরপেক্ষ অসীম (Absolute) সম্বন্ধে যে আমাদের কোন প্রকারে জ্ঞান জন্মিতে পারে, সে বিষয়ে উল্লিখিত বাক্য দ্বারা আমরা কোন প্রমাণ পাইতে পারি না। যেরূপ বিশেষণ লোহিত জ্ঞান ও বিশেষ্য লোহিত জ্ঞান উভয়ে সম্পূর্ণ পৃথক, একটি জ্ঞেয় অপরটি অজ্ঞেয়, সেইরূপ স্বাবলম্ব অসীম জ্ঞান ও নিরবলম্ব অসীম জ্ঞান কদাপি এক নহে, একটির সহিত অন্যটির তুলনা সম্ভবপর নহে। নিরবলম্ব অসীম পদার্থ জড়জগতে পতিত হইয়া স্বাবলম্ব ভাব ধারণ করিলে পর তবে তৎশক্তির স্বরূপত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে—ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম। সেই আপেক্ষিক অসীমকেই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ চির স্থায়ীনী শক্তি রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিরবলম্ব অসীম পদার্থ উক্ত বাক্য দ্বারা লক্ষিত হয়েন নাই।

আসল কথা এই যে, যাবতীয় সংস্কারের মধ্যে কোনটীই নিরপেক্ষ নহে। সুখ দুঃখ ভালবাসা প্রীতি শক্তি—ইহাদিগকে যদি কেহ নিরাকার বলিতে ইচ্ছা করেন বলুন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ইহারা চিত্তের সংস্কার বিশেষ বই আর কিছুই নহে। সংস্কারে ইহাদের জন্ম, সংস্কারবিনাশে ইহাদের মৃত্যু। সুতরাং এ প্রকার অনিত্য গুণমায়া বিশিষ্ট আপেক্ষিক নিরাকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরপেক্ষ নিত্যানিত্য-ভাববর্জ্জিত অসীম পদার্থের তুলনা করিতে যাওয়া এক রকম উপহাসের কথা।

চিত্তক্ষেত্রে বাহ্য বিষয়ের সংঘাত উপস্থিত হইলে তদুপরে যে অদৃশ্য দাগ পড়ে, তাহারই নাম সংস্কার। উপরে দয়া মায়া সুখ দুঃখ ইত্যাদিকেও সংস্কার শ্রেণীভুক্ত করা গিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দয়া মায়া ইত্যাদি

আন্তরিক প্রবৃত্তিগুলিও কি বাহ্য বিষয়ের সংঘাতোৎপন্ন ? দয়ার পাত্র, মায়ার পাত্র, সুখের প্রাচুর্য্য, দুঃখের অভাব যদি জগতে না থাকিত, তাহা হইলে কি মানব অন্তঃকরণ হইতে দয়া, মায়া, সুখ দুঃখাদি ভাব সমূহ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত ? চিত্ত মধ্যে তাহাদের তত্তৎবিষয় জনিত সংস্কার সমূহের অভাব যদি বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ভাব সমূহ তত্তৎ বিষয়াভাবে যে বাস্তবিকই বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। জন্মান্ধের দর্শন সংস্কার না থাকিলেও দর্শন শক্তি বীজরূপে যেমন তৎচিত্তে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ দয়ামায়াদির পাত্রাভাবে দয়া মায়াদি সংস্কার গুলিও চিত্তমধ্যে তৎ বীজশক্তিরূপে থাকিয়া যায় মাত্র ; কিন্তু জন্মান্ধের চিত্তনিহিত দর্শনশক্তি থাকিলেও যেমন সে শক্তি দর্শন সংজ্ঞা পাইতে পারে না, সেইরূপে দয়া মায়াদি চিত্তক্ষেত্রে যাবৎ শক্তি মাত্রায় অবস্থিত থাকে, তাবৎ সেই গুলির প্রতি দয়া মায়াদি সংজ্ঞা আরোপ করিতে পারা যায় না। যখন সেই শক্তি সংস্কার-পরিণামী হয়, তখনই তাহা জ্ঞেয় ; নতুবা সংস্কার ছাড়িয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা অজ্ঞেয়। অন্তর্নিহিত সেই অজ্ঞেয় শক্তি গুলির উপর যখন বাহ্যবিষয় সংঘাত হয়, তখন তাহাদের যে রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, তাহাই প্রকৃতি ভেদে দর্শন, শ্রবণ, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদাদি সংস্কার বলিয়া বোধগম্য হয়। ইহারা সকলেই সংস্কার ; বাহ্য বিষয় ইহাদের উদ্বোধক, সুতরাং বাহ্য বিষয়ানুরূপ ইহাদিগের অস্তিত্ব-পরম্পরাস্তিত্বের সহিত গ্রথিত। অতএব যাহা কিছু সংস্কার পদবাচ্য, তাহা কদাপি নিরপেক্ষ নহে। তা যদি হইল, তবে অসীম সম্বন্ধে আমাদের কোন সংস্কার জন্মিতে পারে না, কেন না তাহা নিরপেক্ষ। সংস্কার ভিন্ন জ্ঞান কোথায় ? তবে আর নিরপেক্ষ অসীমকে অজ্ঞেয় কেন না বলিব ?

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা শেষে এই মীমাংসা দাঁড়াইতেছে যে, মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন সসীমের ভিতর দিয়া অসীম সম্বন্ধে কোন জ্ঞান পাইতে পারে না। সসীমের সম্বন্ধে অসীম শূন্য মাত্র। সসীমের ভিতর এমন কিছুই নাই, যদ্দৃষ্টে অসীমকে আমারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। জড়-রাজ্যই বল আর মানবান্তঃকরণস্থিত চিত্তরাজ্যই বল ইহাদের ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া চিরজীবন অনুসন্ধান করিয়া মরিলেও অসীমের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। যদি সসীমকে সৎ ধরা যায়, তবে অসীম অসৎ হইয়া যায়। আর যদি অসীমকে সৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তবে, সসীমকে অসৎ

বলিয়া অবশ্যই নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই কারণে এক পক্ষে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রকাশ করেন যে, আত্মা অসৎ শূন্য, পক্ষান্তরে হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে আত্মাই একমাত্র সৎপদার্থ। ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে, এই দুইটি বিরুদ্ধ মত যে একই সত্য প্রকাশ করিতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। অর্জ্জুনকে উপদেশ কালীন শ্রীকৃষ্ণ নিম্নোক্ত দুইটি শ্লোক দ্বারা উল্লিখিত ধর্ম্ম শাস্ত্রদ্বয় নির্দ্দিষ্ট এবম্বিধ বিরুদ্ধ মীমাংসা অতি সুন্দররূপে সমন্বয় করিয়াছেন। প্রথমে বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন, সে আত্মা কি প্রকার? না,—

ঊর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্য শূন্যং যদাত্মকং
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং

এইস্থলে বৌদ্ধমত সম্পূর্ণ রূপেই সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু আবার পরেই বলিতেছেন যে—

ঊর্দ্ধপূর্ণমধপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং।

যদি অসদর্থে শূন্যশব্দ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, শূন্যের আবার পূর্ণতা কি? যখনই শূন্যের পদার্থত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তখনি তৎনিরস্তিত্ব বিষয়ে আর আশঙ্কা করিতে পারা যায় না। তবে সেই পদার্থকে শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার হেতু এই যে, তাহা এমন একটা কিছু, যাহা স্থান কাল বিশিষ্ট জগতের পক্ষে শূন্য না বলিলে বুঝান যায় না। শ্যামা-রহস্য-তন্ত্রে শূন্য এবং পূর্ণ শব্দার্থ লইয়া একস্থলে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে "মহাশূন্য ইতি সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তে" অর্থাৎ যাহা সর্ব্ব প্রকার উপাধি বর্জ্জিত তাহাই শূন্য, আর পূর্ণ কি না "সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মোক্ষাৎ বিভাগবিরহাৎ পূর্ণমেব।" অর্থাৎ সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিত হেতু বিভাগ বিরহিত অখণ্ড যে পদার্থ, তাহাই পূর্ণ। শূন্য এবং পূর্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থই এই। এ ভাবে দেখিলে বুঝা যায়, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্বরে সেই নিরপেক্ষ পদার্থকে নির্দ্দেশ করিয়া তৎ স্বতন্ত্রতা ও নিরপেক্ষতা বিষয়ে স্পষ্টরূপে উপদেশ দিতেছে। তাহাকে নিরপেক্ষ অসীম পদার্থ ই বল, আত্মাই বল বা শূন্যই বল, তাহা যে ভাবনার অগম্য ও মনোবাক্যের সম্পূর্ণ অগোচর সে বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র পদে পদে সাক্ষ্য দিয়া থাকে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে নিরবলম্ব অসীম তত্ত্ব যে মানুষের সহজজ্ঞানসাধ্য, তাই বা বুদ্ধি থাকিতে কেমন করিয়া বলিতে পারি।

জনৈক হিন্দুদার্শনিক পণ্ডিত।

ভক্তি ও ভাবুকতা।

ভক্তি কাহাকে বলি?—হৃদয়নিহিত অনুরাগ বা প্রেমের বিকাশই ভক্তি। জল যেমন বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, আবার কখনও শীলা হইয়া নিম্নে পতিত হয়, অনুরাগও সেইরূপ উচ্চদিকে ভক্তি ও নিম্ন গামী হইলে স্নেহ রূপ ধারণ করে। অবস্থা বিশেষে অনুরাগের বিকাশ বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। তাই কবি কহিয়াছেন ;—

"একই প্রেম হইয়ে শত ধা
বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে
করয়ে বসতি" ইত্যাদি।

শিশির বিন্দুতে পতঙ্গপক্ষের উজ্জ্বলতা প্রতিভাত হয়, দীপালোকও প্রতি ফলিত হয়, আবার মধ্যাহ্ন সূর্য্যের অসীম কিরণ জালও প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু এই তিন অবস্থাতেই শিশির বিন্দুর মধ্যে ভিন্নরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। সেইরূপ ইতর প্রাণীতে, পিতা মাতা পুত্র কলত্রে ও সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বরে হৃদয়ের একই অনুরাগের কার্য্য হয়। পাত্র ভেদে কার্য্য করিবার সময়ে হৃদয়ে ভিন্নরূপ প্রক্রিয়া ও হৃদয়ের ভিন্নরূপ অবস্থা হয়। উহার এক এক অবস্থাকে স্নেহ, প্রণয়, বা ভক্তি বলে।

জড় জগতে যেমন আকর্ষণ, অন্তর রাজ্যে সেইরূপ অনুরাগ। আকর্ষণ গুণে যেমন জড়পদার্থ অপরকে টানিতেছে, মানব হৃদয়ও সেইরূপ অনুরাগের পদার্থ দিগকে টানিতেছে। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব পবিত্রতা প্রভৃতির সঙ্গেও সেই রূপ মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক টান আছে। জড় জগতে আকর্ষণের ফল এই যে, বৃহৎ ক্ষুদ্রতরের দিকে ধাবিত হয়। প্রেম রাজ্যেরও বিধি সেইরূপ যে দিকে টান বেশী, সেই দিকে গতি। এই জন্য আমার প্রাণের টানে আমার শিশু সন্তান আমার বশ হয়; আর ভগবানের অনন্ত প্রেমের টানে আমার অন্তর প্রণত ও বশীভূত হয়। কেননা আমি বড়, শিশু ছোট; ভগবান মহান্ অনন্ত, আমি ক্ষুদ্রস্ত ক্ষুদ্র। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার এইরূপ সম্পর্ক। প্রভেদ এই, ভৌতিক জগতে যত বড় পদার্থ হউক না কেন, অতি ক্ষুদ্র বস্তুদ্বারাও কিছু না কিছু পরিমাণে আয়ত্ত (Influenced) হয়। আর সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম চিরকাল

অস্পর্শই থাকিবেন। তিনিই কেবল অযাচিত ও অপরাজিত ভাবে আমাকে প্রেম করিবেন; আমার অনুরাগ বা বিরাগে তাঁহার স্বরূপে বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারিবেনা। আমার সঙ্গে আমার স্রষ্টার এই সম্পর্ক। যখন আমি এই সম্পর্ক অনুভব করি, তখনই আমার হৃদয়পুষ্প বিকশিত হয়, আমার মোহ বন্ধন ছিন্ন হইতে থাকে। এই অনুভূতির নাম ভক্তি। এই ভক্তিই মুক্তির হেতু। তদ্ভিন্ন ঈশ্বরজ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র। শাস্ত্রের ঈশ্বর সমাজ স্থিতির জন্য ফলাফলবাদিদিগের কল্পিত ঈশ্বর কষ্ট-কল্পনা মাত্র। উহা মানব হৃদয়ের মানব জীবনের ঈশ্বর নহে। এজন্যই বিদেশীয় ভক্ত বলিয়াছেন,—"He that loveth God, knoweth Him, for God is Love." আবার স্বদেশীয় সাধকও বলিয়াছেন, "সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

ইহাই যদি ভক্তি, তবে কেন বল ভক্তির আধিক্যে অপকার হয়, কেন বলনা যে মনুসত্বের আধিক্যে বা মুক্তি লাভে অপকার হয়? প্রকৃত ধর্ম্ম কি যাহারা জানেনা, জানিতে চাহেনা, যাহারা শিক্ষা ও চরিত্র দোষে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মসাধন হইতে দূরে রহিয়াছে, তাহারাই বলে ভক্তিতে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে। রোগ বশতঃ দুগ্ধে যাহার রুচি নাই, স্বীয় রোগ গোপন করিবার জন্য সে যেমন অপরকে বলিয়া থাকে, দুগ্ধপান করিলেই অপকার হইবে, ঐ সকল লোকও ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিয়া ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি স্বর্গীয় সামগ্রীর বিরুদ্ধে কথা বলিয়া থাকে এবং নানা রূপ জল্পনা প্রচার করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মহীন জীবনের পোষকতা করিবার যত্ন করে। অল্পবুদ্ধি লোকেরা উহাদিগের অপ্রকৃত কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে, কিন্তু পণ্ডিতেরা ঐ সকল কথার অসারতা ও উহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঐ সকল লোকের প্রতি অধিকতর অশ্রদ্ধা বর্ষণ করিয়া থাকেন।

ভক্তি যদি প্রেম হয়, প্রেমের উচ্চ শাখা হয়, তবে ভক্তির উপদেশ কি? ভক্তির উপদেশ আত্মোৎসর্গ। ভগবানে আত্ম নির্ভর ও পরার্থে আত্ম বিস্মৃতি, ইহাই ভক্তি শাস্ত্রের উপদেশের সার। বিশুদ্ধ তত্বজ্ঞান এই জন্ত নির্ভর ও আত্মত্যাগের মূলে অবস্থিতি করে। যাহার বিষয়ে কিছুই জানি না, তাহার উপরে কি প্রকৃত নির্ভর করিতে পারি? আর যাহাদিগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক অনুভব করিনা, তাহাদিগের জন্ত কি আত্মবিস্মৃত হইতে

পারি? যখন কোন দেশের লোক ভক্ত হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বরে প্রকৃত নির্ভরশীল ও পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও ক্ষমাশীল হয়, তখন কি সে দেশের পতন হয়? ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য জল্পনা আর কি হইতে পারে!

ভারতের পতন হইয়াছে—স্বার্থপরতায় আর মূর্খতায়; অথবা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে—ভক্তিহীনতায়। ভারতের বধ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভারতের বলক্ষয়কারী মহা সংগ্রাম ঘটিয়াছিল ধর্ম্মহীনতায়, পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রে বিবাদ ঘটিয়াছিল অহঙ্কার ও স্বার্থপরতায়, লাক্ষ্মণেয় সেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছিল ঘোর মূর্খতায়! ঈশ্বরের পিতৃ মাতৃ সম্বন্ধ, স্বদেশের মাতৃসম্বন্ধ বিস্মৃত হইলেই মানুষ অহংকারী ও নীচ হইয়া কলহপ্রিয় ও আত্মীয়দ্রোহী হয়, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি বিহীন হইলেই মানুষ কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকে।

ভক্তিতেই ভগবানে নির্ভর, অর্থাৎ দৈববল প্রদান করে। ভক্তিতেই আত্মত্যাগ অর্থাৎ পরে মঙ্গল বা স্বদেশানুরাগের মূলমন্ত্র শিক্ষা দেয়। আজিও এদেশে পিতা মাতা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কেবল সন্তান বা সমাজের মঙ্গলের জন্য সন্তান পালন করিতে শিক্ষা করেন নাই। কেবল সংসারবন্ধন ও অর্থোপার্জ্জন শিখাইবার জন্যই যে কিছু যত্ন করিয়া থাকেন, এজন্যই এদেশের যুবকগণ এমন কাপুরুষ, নতুবা পতিত ভারতের পুনরুদ্ধারের কথঞ্চিত আশা হইত, সন্দেহ নাই। এদেশে যখন প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল, প্রকৃত ভক্তি ছিল, তখন ভারতবর্ষ জগতের পথপ্রদর্শক ছিল। বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বিলুপ্ত হইয়া ক্রমে যখন এদেশে অপকৃষ্ট কল্পনাপ্রসূত পৌরাণিক ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের ভেংচান প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনই এদেশ অধঃপাতে গেল। অধঃপাতে গেল—ভক্তিতে নহে, ভণ্ডামি ও ভাবুকতায়। ভক্তি আর ভাবুকতা এক পদার্থ নহে। খদ্যোতকে নক্ষত্র ব্যাখ্যা করিয়া নক্ষত্রালোকের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নয়। ভণ্ডামি কি, সকলেই বুঝিতে পারে। ভাবুকতা কি, তাহাই বুঝাইয়া বলি।

যাহারা ঈশ্বর, পরকাল ও পরমার্থে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে ধর্ম্মার্থী বলে। ধর্ম্মপথে চলিতে ধর্ম্মার্থীদিগের মনে নিরন্তর নানা ভাবের উদ্রেক হয়। সেই সকল ভাব অশেষ। তবে আশা, বিস্ময়, সৌন্দর্য্যানুরাগ ও ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি স্থূল স্থূল কয়েকটীর নাম করিয়া লোককে বুঝান

যাইতে পারে। অন্তঃকরণের ঐ সকল ভাবের মধ্যে ভক্তি লুক্কায়িত থাকে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে কথাটী পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। ভাবকে যদি খর্জ্জুর রস বলি, ভক্তিকে সর্করা ও ভাবুকতাকে মাদকতা বলিতে পারি। খর্জ্জুর রস সিদ্ধ করিয়া ও শোধন করিয়া যেমন সর্করা বাহির করিতে হয়, জ্ঞানানুশীলন অর্থাৎ চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা সেইরূপ ভাব হইতে ভক্তি উদ্ধার করিতে হয়। খর্জ্জুর রস সর্করাতে পরিণত হইলেই উহা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল অবিশুদ্ধ থাকিলে উহা বিকৃত হইয়া মাদকে পরিণত হয়। মাদকের গন্ধে বিহ্বলতা জন্মায় বটে, কিন্তু পান করিলে বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে। ভাবুকতাও সেইরূপ আপাত মধুর, কিন্তু একবার ঐ রোগে ধরিলে মানবাত্মার ভয়ানক অধঃপতন হয়। সুরাপায়ী যেমন বাহ্য লক্ষণে খুব সুখী, কিন্তু গন্তব্য পথে চলিতে পারে না; ভাবুক লোকেরাও অজ্ঞ লোকদিগের নিকটে সেইরূপ পরম ধাম্মিক, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যে জীবনের পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলি। ধর্ম্মার্থীর অন্তরে ভাব বলিল—"আত্ম-ত্যাগ কর।" অমনি জ্ঞান আসিয়া বলিল—"যেরূপে ত্যাগ স্বীকার করিলে আত্ম পর সকলের মঙ্গল সাধন হয়, তাহাই কর।" যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে ভাব বিকৃত হইয়া ভাবুকতায় পরিণত হইয়া যে হস্ত দ্বারা আত্মহিত ও পরের পরিচর্য্যা করা যায়, সে হস্ত নষ্ট করিয়া লোক ঊর্দ্ধ-বাহু হইল। ভাবুকতা যেখানে আরও কিছু বিকৃত, সেখানে মানুষ বিবাহিতা পত্নীর মুখাবলোকন ধর্ম্মবিরুদ্ধ জ্ঞান করিয়া পরকীয়াতে প্রেম (!!) সাধন করিয়া থাকে।

ভাব বলিল—"ঈশ্বর পিতা মাতা বন্ধু, অতএব ঈশ্বর সাক্ষাৎ ব্যক্তি।" জ্ঞান আসিয়া তখনই বলিল—"অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ভাব ও অনন্ত ইচ্ছাকে ব্যক্তি বলিয়া জান; এই তিনের সহযোগে যে বিশ্ব পরিচালক মহাশক্তির কার্য্য হইতেছে, সেই মহাশক্তিকে সাক্ষাৎ ব্যক্তি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম কর।" যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে ভাব ভাবুকতায় পরিণত হইয়া ভগবানকে সুখ দুঃখ ও অদৃষ্টের অধীন মনুষ্যরূপে কল্পনা করিল। সূর্য্য কি না জানিয়া বালকেরা যেমন সূর্য্যের কল্পনার সঙ্গে খেলা করে, মানুষ ভগবানের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। জ্ঞানহীন ভক্ত ও ভাবুকের কি

বিড়ম্বনা! কৃপাপাত্র ভাবুক পূর্ণ প্রেম ও পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে "রাধাধর সুধা পানশালী" বলিয়া অভিবাদন করিয়াছে!!

কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দ্বারা ভক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। হৃদয়ের অনুরাগই ভক্তের ধর্ম্মসাধনের উপকরণ; কিন্তু ভাবুক অনুষ্ঠানপ্রিয়, অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব। অনুষ্ঠানবিহীন হইলে মানুষের চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল অর্থাৎ নিষ্ঠাবিহীন হইয়া পড়ে। এজন্য ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষতঃ জনসমাজে অনুষ্ঠানের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন জ্ঞানে অনুষ্ঠান পালন করা আর অনুষ্ঠান না হইলেই ধর্ম্মতৃষ্ণা চরিতার্থ না হওয়া, এক কথা নহে। প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে যাহারা বিচ্যুত, তাহারাই জপ, তপ, যজ্ঞ, উপবাস ও অভিষেকাদি লইয়া ব্যস্ত থাকে। তাহারা ধর্ম্ম চাহে বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মপথ,—হৃদয়, মন ও বিবেকের ধর্ম্ম হইতে দূরে রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে তত্বজ্ঞ ও ভক্ত বলিয়া যাঁহারা পূজিত, তাঁহারাও এ কথার সাক্ষী। ঋষি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

"ন কায় ক্লেশ বৈধূর্য্যং ন তীর্থায়তনাশ্রয়ঃ
কেবলম্ তন্মনোমাত্র জয়েন সাদ্যতে পদম্।" (যোগবাশিষ্ঠ)॥

অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশ, কাতরতা বা তীর্থবাস দ্বারা ঈশ্বর লাভ হইতে পারে না, কেবল মনকে জয় করিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

উপবাস ও বার পালন সম্বন্ধে ভক্তশ্রেষ্ঠ যীশু বলিয়াছেন,—

"Can the children of the bride-chamber fast, while the bride is with them?"

"The Sabbath was made for man, and not man for Sabbath."

"কনে উপস্থিত থাকিলে কি আর বাসর গৃহের শিশুগণ অভুক্ত থাকিতে পারে?"

"মানুষের জন্যই বিশ্রাম বার, বিশ্রাম বারের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই।"

ভক্ত কবি তুলসীদাস কহিয়াছেন,—

"পাথর পূজনেছে হরি মিলে তো,
মৈঁ পূজোঁ পাহাড়;
মালা ফিরাণে মে হরি মিলে তো,
মৈঁ ফিরাঁও ঝাড়।"

আর ধর্ম্মপথের প্রবেশার্থী আমরা, আমরাও বলি,—

"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা ;
বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ,
তোমারে কি যায় জানা ?"

মহাভারতে একটী গল্প আছে, তদ্দ্বারা ভক্তি ও ভাবুকতার তারতম্য বিলক্ষণ বুঝা যায়। গল্পটী এই—একদা দেবর্ষি নারদ গোলোকে যাইয়া ভগবান্ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভগবন্, সর্ব্বাপেক্ষা কে আপনার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ?" তদুত্তরে ভগবান্ পৃথিবীর এক জন কৃষকের নাম করিলে, নারদ মুনি ভক্তশ্রেষ্ঠকে দেখিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া সেই কৃষকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কৃষক ক্ষেত্রকর্ষণ বীজবপনাদি করিয়া, প্রতিদিন সংসার কার্য্য ও পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতেছে, একদিনও দুই দণ্ড বসিয়া ভগবানের নাম জপ বা গুণ কীর্ত্তন করে না। নারদমুনি গোলোকে ফিরিয়া গিয়া কৃষ্ণকে গুরুতর অনুযোগ করিয়া কহিলেন,—"ভগবন্, তোমার বিচার বুঝা ভার। যাহারা দিবানিশি তোমার নাম গান করে, তাহারা তোমার নিকৃষ্ট ভক্ত, আর যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একবারও তোমার নাম করে না, সে তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।" কৃষ্ণ এ কথার উত্তর না করিয়া অত্যুষ্ণ দগ্ধপূর্ণ একটী কটাহ স্থানান্তরে রাখিতে নারদকে আদেশ করিলেন। নারদ আদেশ পালন করিলে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই কার্য্য-ব্যপদেশে তুমি কত বার আমার নাম স্মরণ করিয়াছ ?" নারদ কহিলেন "একবারও নহে।" তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া নারদকে বলিলেন,—"তুমি এই সামান্য উত্তপ্ত দুগ্ধ কটাহ স্থানান্তরিত করিতে যাইয়াই আত্ম চিন্তায় আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ ; আর ঐ যে কৃষক সে সংসারের দুঃখ দরিদ্রতা ও পরিশ্রমের মধ্যে আমাকে নিয়ত হৃদয়ে রাখিয়াছে। দেখ দেখি এখন কে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ?"

এই কল্পিত উপন্যাসে একটী সত্য লুক্কায়িত আছে। প্রকৃত ভক্তি ব্যতীত সহস্র ধর্ম্মানুষ্ঠানেও সদ্গতি লাভ হইতে পারে না। অনুষ্ঠানের গৌণ ও সামান্য উপকারিতা, এবং অনুষ্ঠান সর্ব্বদা অবশ্য প্রতিপাল্য নহে। কিন্তু অনুষ্ঠানই যাহাদিগের জীবনের অলঙ্কার, এবং অনুষ্ঠান না করিলে যাহাদিগের ধর্ম্মভাব কোনরূপ তৃপ্ত ও চরিতার্থ হয় না, তাহারা নিম্ন স্তরে অবস্থিতি করিতেছে। প্রকৃত ভক্তিমার্গ হইতেও তাহারা বহু দূরে রহিয়াছে।

ভাবুকতার দ্বিতীয় লক্ষণ, ভাব অপেক্ষা ভাষাতে অধিক আস্থা। যে পরিমাণে মানুষ মৃত্যুকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ মানুষ জ্ঞানহীন হয়; সুতরাং মানুষের ভক্তি ম্রিয়মাণ হয়, সেই পরিমাণে মানুষ উপদেশ বা শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম হইয়া উহার ভাষাগত অর্থ পালন করিতে যত্ন করে। তাহাতেই সাধক বলেন,—"The letter killeth, but spirit giveth life." অর্থাৎ ভাব মানুষকে জীবন দান করে, কিন্তু ভাষা আশ্রয় করিলেই মৃত্যু সংঘটিত হয়। সরল বিশ্বাস ও ভক্তিবিহীন হইয়া যখন মানুষ শাস্ত্র বাক্যাদি পালন করিতে অধিক যত্ন করে, তখনই জানিবে, তাহার ধর্ম্মভাব হীন ও বিকৃত হইয়াছে, তাহাকে ভাবুকতারূপ রোগে ধরিয়াছে, তাহার অধ্যাত্ম মৃত্যু মস্তকোপরে।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই খানি গ্রন্থের তুলনা করিলে আমরা ভক্তি ও ভাবুকতার প্রভেদ সুন্দররূপে বুঝিতে পারি। রামায়ণে সর্ব্বত্রই সরল বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয়। মহাভারতে কথার আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি; কিন্তু প্রকৃত ভক্তি, ধর্ম্মের প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই। যে দুই সময়ে ভারতবর্ষে এই দুই মহাকাব্য রচিত হয়, সেই দুই সময়ে ভারতের সামাজিক অবস্থার দুই ভিন্নমূর্ত্তি ছিল। রামায়ণের রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি কঠোর তপস্যা করিয়া প্রকৃত ভক্ত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার চিত্র গুলিতেও প্রকৃত ভক্তি আছে। জারজ ব্যাস চিরকাল চরিত্রহীন ছিলেন, ভক্তি কাহাকে বলে জানিতেন না, কিন্তু বুদ্ধিমান্ কল্পনাপটু ও নানা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, এজন্য তাঁহার চিত্রগুলি ভাবুকতাতে গঠিত। ব্যাস ধর্ম্ম-নীতির কত কথাই কহিয়াছেন, কত কথাই কহাইয়াছেন; কিন্তু একটীও ধার্ম্মিকের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বাল্মীকির রাম আর ব্যাসের যুধিষ্ঠিরে কত প্রভেদ! রামচন্দ্র ভাব ও ভক্তির প্রতিকৃতি স্বরূপ, আর যুধিষ্ঠির ভাষার পুতুল, ভাষার দাস। ভক্ত রাম বনে গেলেন পিতৃ সত্য পালন জন্য, আর যুধিষ্ঠিরেরা পঞ্চ ভ্রাতায় এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন —মাতৃ আজ্ঞা পালন জন্য! একজন দেখিলেন ভাব, আর একজন দেখিলেন ভাষা। না দেখিবেন কেন? যে যুধিষ্ঠির কৃত্রিম ধার্ম্মিকতার অবতার, স্থির-যৌবনা ছিলেন বলিয়া জননীর প্রতিও যে হতভাগ্যের পাপলিপ্সা ধাবিত হইত, সে যুধিষ্ঠির ভাব ছাড়িয়া ভাষা দেখিবে না কেন? ভাবুকের কি শোচনীয় অবস্থা! ভাষাই ভাবুকের সর্ব্বস্ব। "বিল্ব পত্র"

"বলিদান" প্রভৃতি শব্দ মুখে আনিতেও ভাবুকের সংকোচ। কিন্তু ভক্ত বলেন,—

"কি স্বদেশে কি বিদেশে
যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে
তোমারে দেখিয়ে ডাকি।"

ভাবুকতার তৃতীয় লক্ষণ কথায় ও কার্য্যে প্রভেদ। জীবনের সমস্ত ঘটনায় ভক্ত উপাস্যে তদ্গত। ভক্তের নিয়ত প্রার্থনা—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" ভাবুক ঈশ্বরকে মনগড়া করিয়া লয়। ভাবুকের প্রার্থনা, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।"

ভক্তি (Devotion) বলিতেছে,—

"এমন দিন কি আমার হবে,
তোমার তরে সকল সবে,
সকলি সম্ভবে হলে করুণা তোমার;
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্ জানিয়াছি সার।"

ভাবুকতা (Sentimentalism) বলিতেছে,—

"হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন,
ফল মূল বৃন্দাবনে,
খাব দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন।"

ভক্ত সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপরায়ণ; প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন যুগপৎ ভক্তের অন্তরে কার্য্য করে। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ" ভক্তের জীবন। প্রকৃত ভক্ত হনুমান, হৃদয়বিদীর্ণ করিয়াও তন্মধ্যে উপাস্যের নাম অঙ্কিত দেখাইতে পারেন, আবার উপাস্যের জন্য আজ্ঞামাত্রে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারেন। ভাবুক তাহা পারে না। ভাবুকের ভাব চর্ম্মতলে অবস্থিতি করে। ভগবানের নাম করিতেই ভাবুকের চক্ষে জল আইসে, হরিধ্বনি শ্রবণ মাত্র কণ্ঠ হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়; কিন্তু ধর্ম্মার্থে ত্যাগ স্বীকার করিতে ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য সাধনে তাহার মস্তক হেট হয়। এরূপ ত হইবেই। জ্ঞান হীন ভাব রক্ত-মাংসে ক্রীড়া করে, জীবের ইচ্ছাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান-বিশুদ্ধ ভাব

ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া আত্মার মর্ম্মে মর্ম্মে অর্থাৎ জীবনের মূলদেশে গিয়া কার্য্য করে। ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম সাধন বা প্রচার জন্য রাক্ষসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। আর মস্তক মুণ্ডন বা স্বপাক ভক্ষণ করিয়া ভাবুকের ভাবুকতা তৃপ্ত হইতেছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও রূপতৃষ্ণা বা যশস্পৃহায় না হইলেও ধর্ম্মাভিমানে তাহার অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে। ত্রিসন্ধ্যা জপ করিতে ভাবুকের কষ্ট নাই, সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেই হয়তো তাহার দশা উপস্থিত হইবে; কিন্তু এক রাত্রি জাগরণ করিয়া বিসূচিকা রোগীর শুশ্রূষা করিতে বলিলে, তাহার মাতায় বাজ পড়িবে! প্রকৃত সাধুদিগের জীবনই ধর্ম্ম।

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তীবাদ।

প্রায়শ্চিত্ত (Atonement.)

করুণা বিধান বিশ্ব পালকের নিকট স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক পবিত্র জীবন যাপন করিতে বাচ্ঞা করাই ঈশ্বরোপাসনা। এই ঈশ্বরোপাসনা মানবের মুক্তির সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। কোন সাধু বলিয়াছেন, "প্রার্থনা মানবের নিশ্বাস প্রশ্বাস"। মনুষ্যের শরীর যেরূপ নিশ্বাস ভিন্ন জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মাও প্রার্থনা ভিন্ন জীবিত থাকিতে পারে না। শরীরের পুষ্টি ও বল ধারণের জন্য যেরূপ আহারের প্রয়োজন, তদ্রূপ আত্মার বলের জন্যও প্রার্থনা আবশ্যক। ঈশ্বরোপাসনা মানবের এক স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের মধ্যে পরিণত। এই উপাসনা যুগযুগান্তর হইতে প্রচলিত। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, মুসলমান, নানক পন্থী প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম-মত জগতে প্রচলিত আছে, সকল মতাবলম্বীরাই এক অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তি এক ব্রহ্মের উপাসনাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মেও একেশ্বর-বাদই প্রচলিত আছে; কিন্তু আধুনিক খৃষ্ট মণ্ডলী ইহাকে আবর্জ্জনা পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণের ঈশ্বরোপাসনার পদ্ধতি দর্শন বিজ্ঞান এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব দ্বারা বুঝিবার যো নাই। যদি বুঝিবার নিমিত্ত খ্রীষ্টের ভক্তগণের নিকট যাওয়া যায়, তবে তাঁহারা "নিগূঢ় তত্ত্বের" দোহাই দিয়া আমার ন্যায় হতভাগ্যদিগকে বিদায় করিয়া থাকেন। বিশপ হইতে

আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পাদ্রি সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ দুর্বোধ বলিয়া ধর্ম্মপিপাসু তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তিদিগকে দূর করিয়া থাকেন! তাঁহারা "পিতার" নিকট প্রার্থনা করিতে সর্ব্বক্ষণই এক ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া থাকেন। চার্চ্চ-অব-ইংলণ্ড-মণ্ডলীর সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকে পাপ স্বীকারে লিখিত আছে,—"হে পিতঃ, অনুতাপিত যাহারা, তাহাদিগকে পুনঃ স্থাপন কর, যথা (যেরূপ) মনুষ্য জাতির প্রতি তুমি আমাদের প্রভু যীশুতে অঙ্গীকার প্রকাশ করিয়াছ। এবং হে পরম দয়াময় পিতঃ, তাঁহার অনুরোধে ইহা প্রদান কর"। "সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের প্রভু-যীশু খ্রীষ্টের পিতা ইত্যাদি বলিয়া তাঁহারা প্রার্থনা আরম্ভ করেন; এবং প্রত্যেক প্রার্থনাতে "খ্রীষ্টের অনুরোধে" "খ্রীষ্টের দ্বারায়" "খ্রীষ্টের নিমিত্তে" বলিয়া তাহা শেষ করিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণ খ্রীষ্টকে ঈশ্বর ভাবে গ্রহণ না করিয়া জনৈক মধ্যবর্ত্তী রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যখন খ্রীষ্টকে ঈশ্বর ভাবে স্বীকার করা হয়, তখন আবার মধ্যবর্ত্তী করা কোন্ যুক্তির অনুমোদিত, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বোধগম্য নহে। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে, ইহাতে খ্রীষ্ট সম্মানিত না হইয়া বরং অসম্মানিত হইতেছেন; কারণ তিনি কহিয়াছেন যে, "যে জন আমাকে দেখিয়াছে, সে আমার পিতাকে দেখিয়াছ" "he that hath seen me hath seen the Father." "Believe me that I am in the Father and the Father in me" St. John. XIV. 9, IIV. আমি পিতাতে এবং পিতা আমাতে বর্ত্তমান"। "if you ask me anything in my name I will do. 14 V. (পাঠকগণ নূতন অনুবাদ দেখুন, যোহন ১৪ পদ) "আমার নিকট যাহা যাচ্ঞা করিবে তাহা পাইবে"।

এক্ষণে খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্ম-পুস্তকের (Bible) কোন্ অংশে লিখিত আছে যে, এক ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া প্রার্থনা কর? বরং খৃষ্ট এক ব্রহ্মের উপাসনাই পুনঃপুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন, যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন কেবল এই বলিয়া করিও—" হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্রীকৃত হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন তেমনি পৃথিবীতে পালিত হউক। আমাদের দিবসিক রুটী অদ্য আমাদিগকে দাও। আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও নিজ অপরাধীদিগকে ক্ষমা

করিতেছি। আর আমাদিগকে পরীক্ষায় আনিও না; কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর। যে হেতুক তোমারই রাজ্য পরাক্রম মহিমা নিরন্তর হউক।"

" Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power, and the glory, for ever. Amen. St. M. VI. from 9—13 V.

যেমন রাজা কি বিচারকের নিকট যাইতে হইলে রাজকর্ম্মচারী কি উকীল মোক্তার রূপ মধ্যবর্ত্তীদিগের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইলেও তদ্রূপ যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; নতুবা ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারা যায় না—এই বলিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু-দিগকে প্রবোধ ও উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু সৃষ্ট জীবের সহিত স্রষ্টা পাতার যে সম্বন্ধ তাহা রাজা প্রজার সম্বন্ধ নয়, অথবা বিচারপতির সহিত অপরাধীর যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধও নয়। তাঁহার সহিত অতি গূঢ় সম্বন্ধে সংবদ্ধিত করিয়া তিনি আমাদিগকে এ জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি জগৎ পিতা, আমরা তাঁহার প্রিয় সন্তান; অতএব সন্তান পিতার সমীপে আসিতে ভয় কি মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন কি? এ বিষয়টী খ্রীষ্ট অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন " I will rise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee, and am no more worthy to be called thy son. St. Luke XV. 18—19 V.* কিন্তু খৃষ্টীয় সমাজ ইহা বুঝিবে না, তবে কে বুঝাইবে? হা ভারত মাতঃ, তুমি আবার ইহাদের দ্বারাই পৌত্তলিক নানা দেব দেবীর উপাসক বলিয়া ঘৃণিত হও!

এখন খ্রীষ্ট ভ্রাতৃগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে নিম্ন লিখিত পদ সমূহের নিগূঢ় অর্থ কি?

১। " আমাকে ভিন্ন পিতার নিকট কেহ আসিতে পারে না " No one can cometh unto the Father but by me."—John XIV, 6 V.

* পাঠক লুক ১৫ শ অঃ পাঠ করুন।

২। "আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সিদ্ধ করিব "whatsoever ye ask in my name I will do" John XIV. 13V.

৩। "পিতার দক্ষিণ হস্তে বসিয়া আছেন" "sitteth on the right hand of God."

ধর্ম্ম-পুস্তকের (Bible) প্রত্যেক শব্দেরই কোন না কোন নিগূঢ় অর্থ আছে, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব যাহাতে সমগ্র ভূমণ্ডলের নর নারী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সেই কারণেই খ্রীষ্ট এ জগতে আগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান আদি যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন যিনি খ্রীষ্টের গূঢ় তত্ত্ব যে পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে চলিতেছেন, তিনিই সেই পরিমাণে খৃষ্টিয়ান।

এক্ষণে দেখা যাউক উপরিউক্ত পদ সমূহের নিগূঢ় অর্থ কি? ১ম ও ২য় পদের অর্থ একই ভাব প্রকাশ করিতেছে। কারণ, "খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরত্ব বর্ত্তমান" উভয় পদেই এই ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। (God in Christ)। বাইবেলের অন্যত্র আছে- "And the Word became flesh and dwelt among us."—John I Ch. 14 V (See New Version) "ঐ বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।" খ্রীষ্টের এই সকল উক্তিতে তাঁহাকে বরং ঈশ্বর বলিতে পার; কিন্তু তাঁহাকে কোন রূপেই মধ্যবর্ত্তী বলিতে পার না।

যখন খ্রীষ্ট মনুষ্যরূপে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন তাঁহার আচার ব্যবহার কথোপকথন সকলই মানব সদৃশ ছিল, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। যেরূপ জগতের নর নারী স্বীয় আত্মার বিষয় কথোপকথন করিয়া থাকে, খ্রীষ্টও আপনাতে পরমাত্মার বিদ্যমানতা মানবের সহিত তদ্রূপ ভাবে কথোপকথন করিতেন। পাঠক, আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যখন আমি আপনাদের সহিত আমার আত্মার সম্বন্ধ কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, তখন কি আমার শরীর সেই প্রসঙ্গ করে না আমার আত্মা? সকলেই বোধ হয় আত্মাই তাহার কার্য্য করে বলিয়া উত্তর প্রদান করিবেন। যদিও আমিই সেই আত্মা, তথাপি আত্মাকে তৃতীয় ব্যক্তির স্থলে স্থাপন করিয়া কথোপকথন করিয়া থাকি। তদ্রূপ পিতা পুত্রেতে বিরাজমান সত্ত্বেও পিতাকে তৃতীয় ব্যক্তি উল্লেখ করিয়া

পুত্র উপদেশ দিতেন। তাহার নিগূঢ় অর্থ এই, যে জন পুত্রের উপদেশানুসারে আজীবন চলিবে, সেই মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইবে।

৩য়ঃ। "Sitting on the right hand &c. (পিতার দক্ষিণ হস্তে বসিয়া আছেন) signifies the power of God as it is said in I. Pitter 22 Ch. VIII. And again right hand means the Omnepotent power of God. Matt. XXVIII. Ch. 18 V. দক্ষিণ হস্তের নিগূঢ় অর্থ "সর্ব্ব শক্তিমান"। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে খ্রীষ্ট তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া প্রার্থনাদি করিতে উপদেশ করেন নি; ইহাই বলিয়াছেন যে, যিনি তাঁহার জীবনকে আদর্শ করিয়া একেশ্বরের উপাসনা করিবেন, তিনিই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইবেন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে (Atonement) প্রায়শ্চিত্তের অর্থ কি? তবে এখন তাহার বিচারেই প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

Atonement শব্দটি at, one এবং ment এই তিনটী শব্দের সমবায়ে সংগঠিত। লাটিন শব্দ ment এর অর্থ (mind) মন এবং এই তিনটী শব্দের একত্রীকৃত অর্থ "এক মন করা"। অর্থাৎ যে মন ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীর ভোগ বাসনাতে লিপ্ত, সেই মনকে পুনর্ব্বার তাঁহাতে আনয়ন (সংযুক্ত) করা। আমাদের ভারতের মহর্ষিগণও পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধনের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

যদি (Atonement) প্রায়শ্চিত্তের এরূপ অর্থ হইল, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া উপাসনা প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নাই অথবা ধর্ম্মপুস্তকের কোথাও খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক এরূপ উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। ঈশ্বরোপাসনাতে এক ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী করা যুক্তি এবং খৃষ্ট ধর্ম্মপুস্তকের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ইহা কেবল যাজকদিগের স্বকোপল কল্পিত। দাউদ যখন প্রার্থনা করিতেন, তখন "Do this for thy tender mercy's sake" তুমি তোমার দয়া-পরবশ হইয়া— "for thy goodness' sake" তুমি তোমার প্রীতি-পরবশ হইয়া—"for thy loving kindness' sake তোমার অপার করুণা দ্বারা—এইরূপ বলিয়া উপাসনা শেষ করিতেন; কিন্তু কদাচ অন্য কোন ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া প্রার্থনা করিতেন না। পরন্তু ষ্টিফেনের (Stiphen) পরলোক গমন কালীন উপাসনাতে ইহার আর বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি এই বলিয়া

প্রার্থনা করিয়া ছিলেন যে—"Lord Jesus recieve my spirit"—"Lord lay not this sin to their charge" acts VII. V 59, 60 "হে প্রভু যীশু আমার আত্মাকে গ্রহণ কর, প্রভু হে তাঁহাদিগকে (আমার প্রতি অত্যাচার-কারীদিগকে) পাপের কারণ প্রতিশোধ করিও না" প্রেরিত ৭ অ ৫৯ ও ৬০।

খ্রীষ্টের শিষ্যগণ যখন প্রার্থনা করিতেন, তখন একমাত্র যীশুর নিকটেই প্রার্থনা করিতেন। প্রেরিতদিগের সময়েও কদাচ কাহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া প্রার্থনা করা হইত না। প্রার্থনাতে জনৈক মধ্যবর্ত্তীর আবশ্যকতা কেবল এথেনেসিয়ানদিগের সময় হইতে অর্থাৎ ৫ম শতাব্দীর পর হইতে খৃষ্টীয় মণ্ডলী স্বীকার করিতেছেন।

হে দেশীয় খ্রীষ্ট ভ্রাতৃগণ, পরবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারকদিগের স্বকপোল কল্পিত মতের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্ম এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চল আমরা প্রার্থনা করি যে—হে সত্য স্বরূপ, আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও।

শ্রী অ, চ, শর্ম্মা।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। ভ্রমের সংশোধন আছে। রোগের ঔষধ আছে। আঁধারের পর আলোক আছে। অধীনতার মধ্যেও স্বাধীনতা আছে। আমি পুণ্যকে পাপে পরিণত করিতে পারি, পাপকেও পুণ্যে উন্নত করিতে পারি। স্বর্গে নরক আর নরকে স্বর্গ স্থাপন করিবার ক্ষমতা উভয়ই আমাতে আছে। আমি কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম কাটিতে পারি, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তিনিই সংসাধন ও সংঘটন করিতে সক্ষম। আমি যে কেবল কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম কাটিতে পারি তাহা নয়, আমি ইচ্ছা দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম পণ্ড করিতে পারি। আমি কর্ম্ম ফল বটে, কিন্তু কর্ম্ম আমারই কৃত। কর্ম্ম-বৃক্ষের একবার আমি বীজ, আর একবার ফল। বীজ ভিন্ন বৃক্ষ সম্ভবে না, বৃক্ষ ভিন্ন ফল সম্ভবে না; ফলই আবার বীজ। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল,—ফলই পুনরূপ বীজ। আমি কর্ম্মফল, কর্ম্মফলও আমি। সে ফল পাকাইবার বা কাঁচাইবার অধিকার আমার আছে। আমি কর্ম্মের কৃত, কর্ম্মও আমার কৃত বটে। অতএব আমার

আমিত্বের সংগঠন কর্ত্তা—আমি নিজে। আমি নিজে নিজকে সংগঠন করি। আমি আমারই সৃষ্ট। আমি পশু-নর হইতে দেব-নর বা দেবনর হইতে বানর করিয়া আমার আমিত্ব গড়িতে পারি। তাই আমাতে, আর আমার হাতের এই লেখনীতে আপাততঃ এত পার্থক্য। যখন জীব ছিলনা, আমি তখন অজীবে ছিলাম। নিজ শক্তিতেই জীব হইয়াছি, আবার ক্রমে অজীবে পৌঁছিবারও ক্ষমতা রাখি। এ ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল, কে দিল তাহা জানি আর না জানি ক্ষমতা আমার আছে, ইহা নিঃসন্দেহ। নিঃসন্দেহ বলিয়াই আমার এই অস্তিত্ব :—নিঃসন্দেহ বলিয়াই আমি এই কলমে কালী তুলিয়া কাগজের গায়ে লাগাইতেছি ;—চিন্তাকে শব্দে পরিণত করিয়া শব্দকে অক্ষরে ফুটাইয়া চিন্তার বাহ্যরূপ প্রদান করিতেছি।

আমার বাসনাতেই আমার বিবর্ত্তন-বিকাশ ;—আমার ইচ্ছা-শক্তি আমার অস্তিত্ব মাত্রেই সম্প্রকাশ। আমিই কর্ত্তা, আমিই কর্ম্ম ;—আমিই করণ, আমিই অধিকরণ। আমি একবার কর্ত্তা, একবার কর্ম্ম, একবার করণ আর একবার অধিকরণ। আবার একাধারে সব। আমি স্বাধীনতা মূর্ত্তিমন্ত। আমি স্বাধীন ইহা যেমন সত্য, আমি অধীন ইহাও তেমনি সত্য। আমি স্বাধীন বলিয়াই আমি অধীন। আর স্বাধীনতা অধীনতাই বা কি? দুইটা সম্বন্ধ জ্ঞাপক শব্দ মাত্র। আমি আপাততঃ সাপেক্ষ ও সসীম বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ ও অসীম (absolute and infinitive) আমার 'জড়'। আমি সত্য মিথ্যা দুইই। প্রকৃত অপ্রকৃত উভয়ই। সত্য মিথ্যা, প্রকৃত অপ্রকৃত (real, unreal) আমার অস্তিত্বের আপেক্ষিক ভাব মাত্র। আমার আত্মার অবস্থিতি তারতম্য মাত্র। স্থান কাল পাত্র উহাও ঐরূপ ; আমার অবস্থার বিশেষণ বই আর কিছু নয়। তখনই তাহা আমার নিকট প্রকৃত, যখন যাহা আমি অনুভব করি—আস্বাদ লই—আর আদায় লিখি। Real is that which I realize. আমার জ্ঞান যদি প্রকৃত হয়, আমার অজ্ঞানতাও অপ্রকৃত নয়। আঁধার আলোক উভয়ই প্রকৃত—আমার আত্মার অবস্থিতি অনুসারে। যখন আমি সত্য অনুভব করিতে অক্ষম থাকি, তখন সত্য আমার নিকট মিথ্যা আর মিথ্যাই সত্য।

সূর্য্যকে এক খানা রূপার থালের মত দেখিতেছি। আর নক্ষত্র গুলা টগর ফুলের মত আকাশের গায় ফুটিয়া রহিয়াছে। কেহ কি ধর্ম্মতঃ বলিতে পারেন, আমার এই কথা দুইটা অপ্রকৃত? সত্য সত্যই আপনি

প্রতি নিয়ত দেখিতেছেন, সূর্য্য খুব একটা ছোট জিনিস, আর তারা গুলা অপেক্ষাও ছোট। অতএব আমার কথা মিথ্যা বলিবার যো নাই। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র সূর্য্য আর ঐ ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রটীর মধ্যে লক্ষ লক্ষ ডজন পৃথিবী প্রবেশ করাইয়া দিলেও আর বিস্তর স্থান থাকে! কে বলিবেন বলুন দেখি, এ কথা প্রকৃত নয়? এক হিসাবে সূর্য্য থালা খানির মত ক্ষুদ্র আর এক হিসাবে পৃথিবী অপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণ বড়;--দর্শকের অবস্থানুসারে দুই হিসাবই সত্য। দুই হিসাবই প্রকৃত। কেবল দেখিবার "মার প্যাঁচ" বশতঃ দর্শনেন্দ্রিয়ের সাপেক্ষ নিরপেক্ষতা এবং অবস্থা অবস্থিতির তারতম্য ও আপেক্ষিক সম্বন্ধ অনুসারে প্রকৃত—অপ্রকৃত, আর অপ্রকৃত—প্রকৃত। পৃথিবী তীর-বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে, এই বৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত সত্য আজ কালকার একজন পাঁচ বছরের বালকেও জানে; কিন্তু তথাচ এই দ্রুততনবেগশীল সতত অবিশ্রান্ত বিঘূর্ণিতা মেদিনীকে স্থির অপেক্ষা স্থির, দৃঢ়তর অপেক্ষা দৃঢ় বুঝিয়া পূর্ণ বয়স্ক বিজ্ঞলোকে তাহার উপর নিশ্চিন্তমনে উচ্চাদপি উচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করে। এখন পৃথিবী শূন্যের উপর ভাঁটার মত অষ্টপ্রহর ঘুরিতেছে বলিয়া কি তাহা স্থির ও দৃঢ় নয়?—অথবা স্থির ও দৃঢ় বোধ হয় বলিয়া কি সত্য সত্য ঘুরিতেছি না? যে আমি আমার দুই দিন পূর্ব্বের জ্ঞানে যাহা প্রকৃত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, আমার অদ্যকার জ্ঞান দ্বারা তাহা অপ্রকৃত বলিয়া বুঝিতেছি; এবং দুই দিন পরে হয় ত অদ্যকার জ্ঞানও অজ্ঞানতায় পরিণত হইবে। জ্ঞান বিজ্ঞান মাত্রেরই এই ভাব। আত্মা, মন, ইন্দ্রিয়, জ্ঞানের যখন যে স্তরে থাকে, তখনই তাহা প্রকৃত বলিয়া বুঝে। আজ আমার নিকট যাহা "মহাযুগ," কাল তাহা আমারই নিকট "মুহূর্ত্তে" বিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইতে পারে না, কে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারেন? জ্ঞানের স্তর ভেদে উন্নতি বা অবনতি আর সে উভয়ই আমার ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে। আমি বিবর্ত্তনের অধীন, কিন্তু বিবর্ত্তন বাসনারই অনুগামী। অতএব আমি ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পূর্ব্বে অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের মধ্যে থাকিয়া যে ভ্রম করিয়াছিলাম, সে ভ্রম নিয়ে চতুর্দ্দশ পুরুষ নামিতে নামিতে অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্রে পৌঁছিয়াও আমি কিয়ৎপরিমাণে সংশোধন করিতে পারিনা, কে বলিল? আমি ইচ্ছা করিলে আমার অষ্টাদশ পুরুষের সঞ্চিত পুণ্য ক্রমশঃ অধঃপাতে পাঠাইতে পারি না, তাহাই বা কে বলিতে পারেন? আমি যে এই খর্ব্ব-

কার খঞ্জ-প্রাণ, বাকাসিঁতি—বালখিল্য বাঙ্গালী বাবু—তবলায় চাটি দিয়া নাকিসুরে নিধুর টপ্পা ধরিয়াছি, আর আ:মেজটায় আমার অঙ্গ ঢলিয়া পড়িতেছে,—আমি কি সেই মধ্যাহ্ন সূর্য্য সদৃশ তেজ-সম্পন্ন আর্য্য প্রপিতামহগণের যাবতীয় কীর্ত্তি-কলাপ—পুণ্য-প্রতিষ্ঠা শারীরিক ও মানসিক অধঃপাতের সর্ব্বান্তস্তলে প্রেরণ করিতে সমর্থ হই নাই? মহাশয় বোধ হয় বলিবেন না যে, আমি সমর্থ হই নাই? এখন দেখুন দেখি, আমার কত বড় বাহাদুরী। আমি ধ্বংসের কেমন পূর্ণাবতার, ব্যভিচারের কেমন সারাদপি সার! কিন্তু আমি এত বড় বাহাদুরী যে করিয়াছি, ইহা কাহার প্রভাবে? আমার স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবে। আমার স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবে এই পতন, আর উত্থানও হইবে সেই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা। ইচ্ছাশক্তির সহিত আর আর প্রাকৃতিক শক্তির সংযোগ সাহচর্য্য আছে বটে; কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা, এস্থলে বিচার্য্য নয়।

পরন্তু ঐ যে নাস্তিকতা আর অবাধ-চিন্তা-প্রচারী, চিম্‌টা-কাঁট-চাম্‌চে-চসমা ব্যবহারী, ব্রাণ্ডি-বিষকুট-বিফাহারী ঘোর কৃষ্ণ আনকোরা সাহেব, ইহার হঠাৎ এ evolution কোথা হইতে হইল—কিরূপে হইল? ইনি কোন্ থিওরীর অন্তর্গত? ইনি যে স্বয়ংসিদ্ধ স্বকৃত-ভঙ্গ নেহাত এক পুরুষে কুলীন। ইহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সপ্ত দশ পুরুষের সংবাদ আমি জানি। কে না জানেন? সম্বাদ জানি, আর সে সংবাদ সুনিশ্চিত। ইহার অতি বৃদ্ধতম প্রপিতামহ হইতে পিতামহ আর প্রমাতামহের সর্ব্বাদি পুরুষ হইতে মাতামহ, তারপর অধিক দিনের কথা নয় ইহার পিতা মাতা কি ছিলেন? মাতা ছিলেন সতী লক্ষ্মী সদাচারিণী ব্রতধারিণী ব্রাহ্মণী। আর পিতা সন্ধ্যাহ্নিক-পূত, স্বধর্ম্ম-নিরত, হবিষ্যান্ন-ভোজী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ত্রিসন্ধ্যা তর্পণ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। নিত্য ভগবতী পূজা করিতেন। কিন্তু পুত্র—পুণ্যশ্লোক পুণ্যধাম পুত্র—শিখাধারী ব্রাহ্মণ পুত্র কিরূপে এক রাত্রের মধ্যে লাঙ্গুল প্রিয় ম্লেচ্ছে বিবর্ত্তিত হইলেন? কোন্ মন্ত্র বলে শরীরের শোণিত স্রোতের এত কালের নিরামিষত্ব ঘুচাইলেন? ইচ্ছা—ইচ্ছা, স্বাধীনা—প্রখরা—সর্ব্ব গ্রাসিনী ইচ্ছা দ্বারাই এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে চারি পাশে থাকিয়া আর আর বহুবিধ শক্তি কাজ করিয়াছে বটে; কিন্তু সে কথা আপাততঃ বিবেচ্য নয়, আগেই বলিয়াছি।

কোটী কোটী জীবন্ত জীব কোষের সমষ্টি আমি। কোটী কোটী জীবন্ত

তাঁর আমার পূর্ব্বে ও পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছে, আমি তবুও খুব এক জন। আমি "সাধারণ তন্ত্র দরবারের" মেম্বর বটে, কিন্তু গোলাম নহি। সাধারণ তন্ত্রের অর্থই স্বাধীনতা। তাহা—তাহা স্বাধীনতা। তথায় সকলেরই স্বাধীনতা আছে, আমারও আছে। কিন্তু আমি কি, আমি কে? আমি কর্ম্মফল, আমি অধীনতা, আমি আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছাশক্তি স্বাধীনতা, পাপ পুণ্য, প্রকৃতি পুরুষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকল জিনিষের একটা প্রকাণ্ড "হজ-পজ"—সংক্ষেপতঃ যা-বল-তাই আমি। কিন্তু তবুও কুলায় না, আমি কি ঠিক হয় না। আমি যে ছাই কি, এ বড়ই শক্ত কথা। শক্তই হো'ক আর নরমই হো'ক,—আমি আমার জন্য নহি। আমি তোমার জন্য, আর তুমি আমার জন্য। আমি আছি বলিয়া তুমি আছ, তুমি আছ বলিয়া আমি আছি; আর তিনি আছেন বলিয়া দুই জনেই আছি। তোমার কাঁদাও ভুল, আর তোমার মার কাঁদাও ভুল। যমদণ্ডটা নেহাত ফাঁকি জুকি।

তারপর "বর বড় কি কনে বড়"—তা আমি জানি না! প্রকৃতি পুরুষের বিচ্ছেদ কখনও দেখি নাই। যদি কখনও দেখিয়া থাকি, সে কথা এখন মনে নাই। প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া এক দণ্ড নন। পুরুষের সোহাগেই প্রকৃতি। পুরুষের আদরেই তিনি প্রবলা। পুরুষের (কৌতুকের?) জন্যই তাঁর এত বাড়াবাড়ি। প্রকৃতি পুরুষকে উঠাইতে বসাইতে পারে, সেটা পুরুষেরই সোহাগ। পুরুষ কি প্রকৃতিতে ভুলিবার পাত্র? প্রকৃতি পুরুষের। পুরুষ কার? পুরুষ সকলেরই, অথচ কাহারই নন। তুমি আমার আমি তোমার, অথচ তুমি আমি কেহই নই; সকলই তিনি। সকলই তিনি, তাই শঙ্করের "সোঽহং," যীশুর 'I and father one.' কিন্তু রাম প্রসাদের চিনি বড়ই মিষ্ট, বড়ই সুস্বাদু, বড়ই তৃপ্তিকর। গরিব রাম প্রসাদ চিনি হবে না, চিনি খাবে। মরি মরি কি অনুপম রতি।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে বলিয়াই পাপ করিব না, পাপ কমাইব। পাপের প্রায়শ্চিত্ত না থাকিলে পাপ হইতে ক্ষান্ত হইতে পারিতাম না। কে কবে পারিয়াছে? পারা অসম্ভব।

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এই জন্যই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরও অধিক আছে। সেই হৃষিকেশের জন্যই রোগের খুব পাকা মহৌষধ আছে। অতএব আইস, শীঘ্র সেই হৃদয়েশের অনুসরণ করি।

"জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি, জানম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি।" এই "জানামি" আর "প্রবৃত্তির নিবৃত্তির" অভ্যন্তরে মানুষের স্বাধীনতা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত জীবন্তভাবে বিদ্যমান্। যদি ভক্তি না থাকে, বুদ্ধির দ্বারাও বুঝিতে পারিবে। কিন্তু বুদ্ধি বড়ই বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই মানুষের এত দুর্দ্দশা।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়,—দ্বারভাঙ্গা।

ব্রততী।

নিদাঘ নিদারুণে, সুতপত অরুণে
শিলা বাত বৃষ্টি করকাগণে।
সব ব্যথা বহি লয়, কিছুরে না করে ভয়
দুলে দুলে সব সয় প্রফুল্ল মনে।
ফুল হাসে হাসি হাসি ব্রততী বনে॥

নিশির আগমনে, উঠি যবে গগনে
তোষে তারে চন্দ্র কৌমুদী ধনে।
না তায় গরবী হয় না গন্ধে কৃপণ রয়
সদা মাথানুয়ে রয় নতভা সনে।
ফুল হাসে হাসি হাসি ব্রততী বনে॥

আহা! যবে সবলে, শরীর সুকোমলে
কৃমী কীট শত্রু কাটে দশনে,
না তাদের নিরাশ্রয়, করি সুধা সঞ্চয়
বুক পাতি সব লয় সে ঘা যতনে।
ফুল হাসে হাসি হাসি ব্রততী বনে॥

অথবা বিটপিবর যবে ভুরদিন ঝড়
সহে ছিঁড়ি মিড়ি সে নিবিড় গহনে,
দেখি পতনীয় তায় না ছাড়ে তাহার কায়
ধরে আরো আঁটি গায় দৃঢ় বাঁধনে।
ফুল হাসে হাসি হাসি ব্রততী বনে॥

আছে কি এ ভবনে নরনারী কাননে
বিটপি কি বল্লী. সুতৃপ্ত মনে,
সুখ দুঃখে আবরণ টলে না কারুও মন
রয় বেড়িয়েছে প্রেমে ফল কুসুমে,
ফুল হাসে হাসি যথা ব্রততী বনে ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়,—আগ্রা

সংস্কৃত হিন্দু ধর্ম্ম।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

ঈশ্বরোপাসনাতত্ত্ব।

ঈশ্বরোপাসনা কি, তাহার ফল কি, তাহার প্রয়োজন কি, কি প্রকার মনের অবস্থা উপাসনার পক্ষে আবশ্যক, তজ্জন্য কি কি উপকরণ আবশ্যক ?

ঈশ্বরোপাসনা কি তাহা বলিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরোপাসনা কি নয়,তাহা বলা আবশ্যক। ঈশ্বরতত্ত্ব অনুসন্ধান করা উপাসনা নহে, তাহা সাধনা বলা যাইতে পারে; উপাসনার পূর্ব্বে তাহা প্রয়োজন। ঈশ্বর কি তাহা না জানিলে কি প্রকারে উপাসনা করিব, কাহার উপাসনা করিব ? যিনি ঈশ্বরকে যে প্রকার ভাবেন, তিনি সেই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করেন। যিনি মনে করেন পরমেশ্বরের রূপ আছে—তিনি আমাদের ন্যায় আহার করেন, নিদ্রা যান, বস্ত্র পরিধান করেন—তিনি তাঁহাকে খাদ্য দেন, পানীয় দেন, বস্ত্র দেন, নিদ্রার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেন। যিনি ভাবেন পরমেশ্বর রুদ্রমূর্ত্তি, পাপের জন্য মানবকে বিনাশ করেন, তিনি তাঁহার নিকট বলি উপহার দেন। যিনি পরমেশ্বরকে নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া জানেন, তিনি মানস পূজা করেন। ইহার মধ্যে কে যথার্থ ঈশ্বরের উপসনা করিলেন ? ঈশ্বর যদি ক্ষুৎপিপাসা বিশিষ্ট, মানবীয় শক্তিধারী জীব হইতেন তাহা হইলে প্রথমোক্ত প্রকার উপাসকেরা তদ্রূপোপাসনা করেন বলা যাইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বর মানবীয় গুণ বিশিষ্ট জীব নহেন, সুতরাং তাঁহার পূজার সামগ্রী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব যিনি বাহ্যিক উপকরণ লইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি প্রকৃত উপাসনা করেন না। তবে তাঁহার সকল কার্য্যই নিষ্ফল ও ব্যর্থ, তাহা নহে। তাঁহার উপাসনার

কতটুকু সার্থকতা, তাহা আমি পরে বলিব। দ্বিতীয়তঃ যিনি ঈশ্বরের কোপ নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট বলি আহরণ করেন, প্রার্থনা করেন, তাঁহার উপাসনাও প্রকৃত নহে। তিনি কেবল ঈশ্বরের একটীভাব দেখেন—তিনি পাপীর দণ্ডদাতা—কিন্তু তাঁহার অপরাপর স্বরূপ বিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাহার প্রার্থনা ও পূজা একদেশদর্শী। এপ্রকার উপাসনাও প্রকৃত উপাসনা নহে। পরমেশ্বরের মনস্তুষ্টি করা তাঁহার পূজা নহে। তিনি "অমর," আমাদের ন্যায় তাঁহার মন নয় যে তিনি তুষ্ট রুষ্ট হইবেন।

কোন কোন উপাসক অসম্ভূত অর্থাৎ প্রকৃতিতত্ত্বের উপাসনা করেন, আর কেহ বা কেবল সম্ভূতি অর্থাৎ কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসনা করেন। আধুনিক দার্শনিকগণ অসম্ভূতি উপাসক, তাঁহারা কেবল শক্তির আরাধনা করেন। উপনিষদের সময়েও এই প্রকার উপাসক ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালেও এরূপ উপাসক ছিলেন যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের শক্তি মানিতেন, এবং অন্যরূপ উপাসকও ছিলেন যাঁহারা কার্য্য-ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করিতেন। উপাসনা তত্ত্ব সম্বন্ধে চিরকালই বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা মনে করেন আর্য্য ঋষিরা কেবল ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, তাঁহাদের সে অনুমান অমূলক। ঋষিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনা প্রচলিত ছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যখন যেরূপ মত প্রবল ছিল, তখন সেইরূপ উপাসনা প্রণালী প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণ আদিম অবস্থায় প্রকৃতি ও কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, তখন তাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বরের সত্ত্বা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন না, কেবল কতকগুলি শক্তি ও তাহার কার্য্য মানিতেন; সুতরাং তাহাদেরই উপাসনা করিতেন। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে যজ্ঞাদি কর্ম্মেরও প্রাচুর্য্য ছিল। ক্রমে যখন তাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিলেন, তখন ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বের প্রার্থনা ও তখনকার প্রার্থনায় কত প্রভেদ!

কিন্তু পুরাতন কালের আলোচনা না করিয়া আমাদের সময়ের অবস্থা দেখা যাউক। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়েও ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় আছে। কেহ সাকার উপাসক, কেহ নিরাকার উপাসক; সাকার উপাসকদিগের মধ্যে আবার জড়োপাসক, নরোপাসক, প্রাণী উপাসক প্রভৃতি। সকল উপাসকের অভিপ্রায় এক, কিন্তু প্রণালীগত বিভিন্নতা। এই বিভিন্নতার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যিনি ঈশ্বরকে যে প্রকার

ভাবেন এবং যে অভিপ্রায়ে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহার উপাসনার প্রণালী সেইরূপ হইয়া থাকে। এই বিশুদ্ধতত্ত্ব ও বিশুদ্ধপ্রণালী লইয়াই যত আন্দোলন। উপাসকদিগের অভিপ্রায় বিশুদ্ধ হইলেই যে প্রণালীর বিচার অনাবশ্যক তাহা নহে। ঈশ্বরকে আমাদের স্রষ্টা, পিতা ও পাতা বলিয়া বন্দনা, তাঁহার করুণার জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাঁহার গুণ মহিমা কীর্ত্তন, এই রূপেই সকলে উপাসনা করেন; কিন্তু এই কার্য্য-গুলি বিশুদ্ধভাবে হইতেছে কি না তাহা দেখা আবশ্যক। যদি সূর্য্যকে পরব্রহ্ম বলিলে দোষ না হইত, তবে শাস্ত্রকারদিগের পরিশ্রম নিরর্থক। ঈশ্বরকে পুষ্পচন্দন দেওয়া আর ভক্তি কৃতজ্ঞতা উপহার দেওয়া যদি এক হইত, তবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় হইত না। সাধকগণ বহু সাধনা ও তপস্যা দ্বারা আমাদের নিকট বিশুদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব প্রকাশ করি-য়াছেন। সকল বিষয়ে যেমন তত্ত্ব সম্বন্ধে উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্মবিষয়েও সেই নিয়ম। আমাদের দেশে সকল বিশুদ্ধ তত্ত্বেরই অনাদর। আমরা সেই পুরাতন জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, প্রাকৃতিকতত্ত্ব এখনও বিশ্বাস করি! বাসুকি এখনো আমাদের পৃথিবীকে ধারণ করেন, সূর্য্য এখনো হরিদশ্বদ্বারা বাহিত হন! কিন্তু জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন এই সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস তিরো-হিত হইতেছে, ধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রমও সেইরূপ নিশ্চয়ই যাইবে। কোন জাতি এক অবস্থায় চিরকাল থাকিতে পারে না। এই উন্নতি কার্য্যে সকলেরই সাহায্য করা আবশ্যক। শিক্ষার গুণে যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহারাও সমাজের ভয়ে বিশুদ্ধ উপাসনার পথ অবলম্বন করিতেছেন না। প্রবন্ধ লিখিবার সময় তাঁহারা যেরূপ উদার মত প্রকাশ করেন, কার্য্যকালে তাহা দেখা যায় না। তাঁহারা যখন বুঝিয়াছেন যে কেহ অপৌরুষেয় নহে, অভ্রান্ত নহে, তদন্তর্গত উপাসনা পদ্ধতি অতিশয় নিন্দনীয়, তখন সেই সকল ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করা আবশ্যক। তাঁহারা যদি দৃষ্টান্ত না দেখান, তবে সাধারণ লোকে কি করিবে? তাঁহাদের গৃহেও যদি সেই বেদের অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতির পূজা হয়, তবে "উন্নতি-কর তত্ত্ব" কে অবলম্বন করিবে?

অনেকে বলেন যে, সাধারণ লোকের পক্ষে প্রতিমা নিতান্ত আবশ্যক, তাহারা চিন্ময় ঈশ্বর বুঝিতে পারে না, নিরাকারকে ধরিতে পারে না, অতএব কি প্রকারে প্রতিমূর্ত্তির সাহায্য ব্যতীত ঈশ্বরোপাসনা করিবে?

যদি প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত সাধারণ লোক ঈশ্বরকে পূজা করিতে না পারিত, তাহা হইলে মুসলমান ধর্ম্ম এত দিন বিলুপ্ত হইত। বিশ্বাস অতিশয় আশ্চর্য্য বস্তু; মনুষ্যকে একবার বিশ্বাস করাইয়া দেও যে এই গাছটীতে একবার পরমেশ্বর আবির্ভূত হইয়াছিলেন অথবা তিনি পাষাণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অমনি সেই বৃক্ষ ও পাষাণ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইল, তাহা আর সামান্য পদার্থ রহিল না; অপরাপর বৃক্ষকে সে যে চক্ষে দেখে ঐ বৃক্ষকে আর সে চক্ষে দেখিবে না এবং ঐ প্রস্তরখণ্ডকে আর এক চক্ষুতে দেখিবে! কিন্তু কত বিশ্বাস অথবা কল্পনা শক্তি থাকিলে যে এইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। যাহা তত্ত্ববিদ্দিগের নিকট সামান্য জড়পদার্থ, একজন অশিক্ষিত লোক তাহাকে জগৎ কারণ পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে! সেইজন্য প্রতিমূর্ত্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান করা অপেক্ষা, নিরাকার অদৃশ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা সহজ। নিরাকার অদৃশ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, সুতরাং সহজ। যদি নিজে নাও বুঝিতে পারি, একজন বলিয়া দিলে তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু প্রতিমূর্ত্তি বা সৃষ্ট পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করা সহজ নহে। আমি যাহাকে স্বহস্তে গড়িলাম তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে কল্পনা ও বিশ্বাসের প্রভূত বলের প্রয়োজন। নির্জীব পদার্থে মন্ত্র পাঠ দ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যায়, একি সহজে বিশ্বাস হইতে পারে? ইহাতে আর নিরাকার জ্ঞানে প্রভেদ কি? যে এ বিশ্বাস করিতে পারে, সে নিরাকার চিন্ময় ঈশ্বরেও বিশ্বাস করিতে পারে।

ঈশ্বরের যে সকল রূপ তন্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সাধারণ লোকের বুদ্ধিগম্য নহে। দুর্গার দশহস্ত দশদিক রক্ষা করিতেছে, মহাদেবের তিন নেত্র ত্রিকালজ্ঞতার নিদর্শন এ সমস্ত তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, ইহার স্থূলভাগ পরিত্যাগ করতঃ আধ্যাত্মিক মর্ম্মটুকু লইয়া কি সাধারণ লোকে নিরাকার ধ্যান করিয়া থাকে? যদি প্রতিমূর্ত্তির উদ্দেশ্য ইহা হয়, তবে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে দুরূহ; — সুবিচক্ষণ, সুশিক্ষিত, সুকবি ভিন্ন কেহ এরূপে প্রতিমূর্ত্তিকে দেখিতে পারে না। স্থূলদর্শী সাধারণ লোকে বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ভাবভঙ্গী দেখে এবং তাহার সহিত স্থূল ঘটনাদির বিবরণ সংযুক্ত থাকিলে তাহাই বিশ্বাস করে; কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় তাহাদের নিকট দুরবগাহ, বরং তাহাদিগকে যদি বলা যায় যে

স্বর্গে পরমেশ্বর আছেন এবং সেখান হইতে তিনি সকল দেখিতেছেন, তাহা তাহারা সহজে বিশ্বাস করিতে পারে।

কিন্তু যাঁহারা সাকার উপাসনা এইরূপে সমর্থন করেন, তাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরকেই রূপ দিয়া পূজা করিতে বলেন; নিরাকার উপাসকেরা রূপ কল্পনা করেন না। উভয়ের অভিপ্রায় এক। আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহাতে দেখা গেল যে, নিরাকার ধ্যান ও পূজা সাকার অবলম্বনে ধ্যান ও পূজা অপেক্ষা সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ এবং কার্য্যতঃও সহজ। তবে সাকার অবলম্বনের প্রয়োজন কি? ধর্ম্ম কিছু কবিত্ব নয় যে, মনের কল্পনা গুলিকে সুন্দর বেশে সাজাইয়া চিত্তকে প্রফুল্ল করিলেই ধর্ম্মসাধন হইবে, পূজা সুসিদ্ধ হইবে। ধর্ম্ম সত্য বস্তু, প্রত্যক্ষ বস্তু, উপাসনা আত্মার একটী গভীর অভাব প্রণোদিত কার্য্য, তাহা দ্বারা আত্মার পবিত্রতা, মঙ্গল ভাব প্রভৃতি উৎকর্ষিত হয়; সুতরাং কল্পনা ও কবিত্ব এ রাজ্যে স্থান পাইতে পারে না। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা চাই ও হৃদগত গভীর প্রার্থনা-স্তুতি-বন্দনা সংকৃত পূজা চাই, তবে হৃদয়ের আশা চরিতার্থ হইবে। ঈশ্বরকে স্মরণ করিবা মাত্র আত্মাতে পবিত্রতা মঙ্গলভাব আবির্ভূত হইবে, তবেত পূজা হইল; নতুবা তোমার "পীনোন্নত পয়োধরাং" ভাবিয়া আমার হৃদয়ে কি সাধুভাব সঞ্চারিত হইবে? রূপের বর্ণনা শুনিয়া বা রূপ দেখিয়া রূপহীনের কি ভাব শিখিব? না হয় পৃথিবীর সকল রূপের আদর্শ রূপই দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার আত্মার কোন আশা চরিতার্থ হইল না।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গে পৌত্তলিকতা প্রচার।

বঙ্গদেশে সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব ব্যাপারের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে—ইহা বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রকার মার্জ্জিত পৌত্তলিকতার প্রচার। পৌত্তলিকতা যে কেবল দোষ শূন্য তাহা নহে, পৌত্তলিকা অতি যুক্তি সঙ্গত, পৌত্তলিকতা ঈশ্বর-ভক্তি-সাধনের সর্ব্বোত্তম উপায়, পৌত্তলিক ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আজ বঙ্গদেশে কয়েক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত-সমাজে এই অতি নিকৃষ্ট মত প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে! "নবজীবন" নামক

নূতন সাময়িক পত্রিকায় "তেত্রিশ কোটী দেবতা" ও "প্রতিমা" শিরস্ক যে দুইটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ নিকৃষ্ট মতই তাহার সার মর্ম্ম। এই মত প্রচার করিয়া এই নব প্রচারকগণ পতিত বঙ্গদেশে নবজীবনের সঞ্চার করিবেন অভিলাষী হইয়াছেন!

পৌত্তলিকতার অসারবত্তা ও নিকৃষ্টতা দেখাইয়াই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুদয়, পৌত্তলিকতার ভগ্নাবশেষের উপরই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের হর্ম্ম্য সংস্থাপিত; অতএব এই পঞ্চাশাধিক কাল পরে আমরা পুনরায় পৌত্তলিতার অসারতা ও নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইব না। ইহার জন্য ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট। এই নব পৌত্তলিক-ধর্ম্ম প্রচারকগণ যে দুইটী মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাই আজ আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ ইহারা এই মহাভ্রমে পড়িয়াছেন যে, পৌত্তলিক ধর্ম্মই পরম হিন্দু ধর্ম্ম, এবং হিন্দু হইতে গেলে—হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে গেলে পৌত্তলিক হওয়া আবশ্যক! ইহাই যে ইহাদিগের বিশ্বাস তাহা ইহাদিগের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে;—"আইস, জগদীশ্বরের সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিষ্ঠুর, ভীষণ, শান্ত, সুন্দর, প্রেমময়—তেত্রিশ কোটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তেত্রিশ কোটী দেবতাতে অনন্তের পূজা পূর্ণ করি। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা হিন্দু বই আর কেহ কখনও করে নাই। অনন্তের অনন্তত্ব হিন্দু বই আর কেহ কখনও প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করে নাই। অনন্তের অনন্ত পূজার পত্তন হিন্দু বই আর কাহারও কর্ত্তৃক কোথাও স্থাপিত হয় নাই।" (নবজীবন, ২৩৮পৃষ্ঠা)। পুনরায়;—"প্রকৃত পৌত্তলিকতায় অনন্ত পুরুষের এক মূর্ত্তি নয়, দুই মূর্ত্তি নয়, দশ মূর্ত্তি নয়, কোটি কোটি মূর্ত্তি, তেত্রিশ কোটি মূর্ত্তি গড়িতে হয়। অতএব আইস তেত্রিশ কোটি দেবমূর্ত্তি গড়িয়া অনন্তের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়া আবার সেই অপূর্ব্ব হিন্দু নামের অধিকারী হই।" (নবজীবন, ২৩৬ পৃষ্ঠা)। আর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে;—"হিন্দুর প্রতিমার কারণ—হিন্দুর প্রশস্ত হৃদয় এবং অলৌকিক সামাজিক ভাব; হিন্দুর প্রতিমার আকারের কারণ হিন্দুর জগদ্ব্যাপী দৃষ্টি এবং জগৎগ্রাহী মন। এমন হৃদয়, এমন সামাজিক ভাব, এমন দৃষ্টি, এমন মন পৃথিবীতে আর কাহারো নাই। সেই হৃদয়, সেই সামাজিক ভাব, সেই দৃষ্টি, সেই মনের স্ফোট—হিন্দুর দেব দেবীর প্রতিমা। সে প্রতিমা ভাল করিয়া গড়, ইচ্ছা হয় আবশ্যক হয়, নূতন করিয়া গড়,

শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই উপযোগী কর, কিন্তু সে প্রতিমা ভাঙ্গিও না। প্রতিমা ভাঙ্গিলে জানিব যে হিন্দু সমাজ ভাঙ্গিল। (নবজীবন, ৩০৯ পৃষ্ঠা)।

নব পৌত্তলিক-ধর্ম্ম প্রচারকগণ বলিতেছেন যে, "তেত্রিশ কোটি দেব মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিলে আমরা আবার হিন্দু নামের অধিকারী হইব।" অবেই দেখা যাইতেছে যে, ইঁহাদিগের মতে দেব মূর্ত্তি পূজা ভিন্ন অন্য কোন পূজা দ্বারা হিন্দু নামের অধিকারী হইবার উপায় নাই! ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কি হইতে পারে? হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অনন্ত স্বরূপ নিরাকার পর-ব্রহ্মে ভক্তি এবং তাঁহার ধ্যান, ধারণা, ও উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; আর পুত্ত-লিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনা করা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। হিন্দু শাস্ত্র যাহাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিতেছে, তাহা অবলম্বন করিলে আমরা প্রকৃতরূপে হিন্দু নামের অধিকারী হইব, না হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যাহা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম—তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর পূজা—তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমরা হিন্দু নামের অধিকারী হইব? হিন্দু শাস্ত্র যে ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠাধিকার বলিতেছে তাহা,—না যাহাকে নিকৃষ্টা-ধিকার বলিতেছে তাহা অধিকতর রূপে নিকটতর হিন্দু ধর্ম্ম? যিনি শ্রেষ্ঠা-ধিকারী তিনিই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দু আর যিনি কনিষ্ঠাধিকারী তিনিই নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু, নব পৌত্তলিক-ধর্ম্ম প্রচারকগণ কি তাহা অস্বীকার করিবেন? আবার ইঁহারা বলিতেছেন "প্রতিমা ভাঙ্গিলে জানিব হিন্দু সমাজ ভাঙ্গিল!" তবে কি ইঁহারা বলিতে চাহেন যে, ভারতে সকলে যদি শ্রেষ্ঠাধিকারী হিন্দু হয় তাহা হইলে হিন্দু সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে? প্রতিমা পূজা বা পৌত্তলিক ধর্ম্মমত হিন্দু সমাজ রক্ষার একমাত্র উপায়—এই ভ্রমাত্মক মত যাঁহারা প্রচার করেন, এই বিশ্বাস যাঁহারা লোকের মনে উদ্রেক করিয়া দিতে চান, তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মোন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করেন। চিরকাল প্রতিমা পূজা লইয়া থাক, চিরকাল নিকৃষ্টাধিকারী হইয়া থাক, প্রতিমা ফেলিয়া দিয়া ঈশ্বর প্রকৃতরূপে যাহা সে ভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিতে—পূজা করিতে যাইও না, কোন কালে শ্রেষ্ঠাধিকারী হইবার চেষ্টা পাইও না, তাহা হইলেই হিন্দু সমাজ রক্ষা হইবে; নচেৎ উহা ছারখার হইয়া যাইবে, ইহা অপেক্ষা ভ্রমাত্মক—দেশের অবনয়নকারী ভয়ানক উপ-দেশ আর কি হইতে পারে? যাঁহারা এইরূপ উপদেশ দিতেছেন, তাঁহারা

যে ইহার অমঙ্গলকারী শক্তি ও ভয়ানকত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, ইহাতে আমরা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি।

নব পৌত্তলিক-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ আর একটী এই মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের শক্তি প্রতিমাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব উপলব্ধি পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করার উচ্চে কখনই উঠে না, আর ঈশ্বরকে অনন্ত ও নিরাকার ভাবে প্রকৃতরূপে উপাসনা করার শক্তি অতি অল্প লোকেই লাভ করিতে পারে! এই মত প্রচার করা এবং সাধারণ মানবমণ্ডলীর ধর্ম্মভাব উন্নত হইবার পথ ঈশ্বর বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, ইহা বলা—একই কথা। ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন, তিনি কেবলমাত্র কতকগুলি লোককে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন আর জন সাধারণকে সে শক্তি দেন নাই, ইহা অতি ভ্রমাত্মক কথা। সকলেরই ঐ শক্তি আছে, তবে যাঁহারা তাহার অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহাদেরই উহা তেজীয়ান্ হইয়াছে এবং তাহা যাঁহারা করেন নাই তাঁহাদিগের ঐ শক্তি নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছে। এই সত্য উপলব্ধি না করিয়া নব পৌত্তলিক-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ শিক্ষা দিতেছেন যে, সাধারণ লোকের ঈশ্বরকে প্রতিমার সাহায্য বিনা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই! এই অসত্য মত প্রচারিত হইলে ইহাই হইবে যে, লোকের ধর্ম্মোন্নতির আর সম্ভাবনা থাকিবে না। মানুষ সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিবে, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেই অনুন্নত অবস্থায়, সেই প্রতিমার সাহায্যে ঈশ্বরকে ধারণা ও উপাসনা করার অবস্থায় কি চিরকাল পতিত থাকিবে?

ঈশ্বর যথার্থতঃ যেমন তদনুরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি ও উপাসনা করা যত্ন সাধ্য, চেষ্টা সাধ্য, আয়াস সাধ্য বলিয়া কি তাঁহাকে চিরকালই অপ্রকৃতরূপে উপলব্ধি ও উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া বুদ্ধিমান, সত্যপ্রিয়, ও উন্নতি প্রিয় ব্যক্তির কর্ত্তব্য? সত্যের দিকে লইয়া যাওয়াই সংস্কারকের কার্য্য। কিন্তু বঙ্গের এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারকগণ সত্যের দিকে না লইয়া গিয়া লোক গুলাকে মিথ্যাতেই আবদ্ধ রাখিতে চান; ঈশ্বর সত্য সত্যই যাহা, কোন কালে তাঁহাকে তদনুরূপে না দেখিতে দিয়া চিরকালই তাঁহাকে প্রতিমা বদ্ধ করিয়া রাখিতে চান। এই সত্য বিরোধী, ধর্ম্মোন্নতি বিরোধী মত দেশের পক্ষে বিশেষতঃ বঙ্গের ন্যায় পতিত দেশের পক্ষে যে কতদূর অমঙ্গলকর তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না।

আমরা দেখিতেছি এই নব পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীগণের হিন্দু শাস্ত্রের ও হিন্দু নামের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। তাহা যদি থাকে, তাহা হইলে, হিন্দু-শাস্ত্র হিন্দুধর্ম্ম যাহাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে, তাহা প্রচার না করিয়া যাহাকে নিকৃষ্ট ধর্ম্ম বলে তাহাই ইহারা কেন প্রচার করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহা প্রচার করিলে, তাহা যাহাতে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়, সাধারণ লোক গ্রহণ করিতে পারে তদনুরূপ চেষ্টা করিলেই ত প্রকৃত হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করা হইল, প্রকৃত হিন্দু নামের উপযুক্ত হওয়া হইল। হিন্দু শাস্ত্রমতে যাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা সমস্ত দেশের লোককে গ্রহণ করাইতে পারিলেই ত প্রকৃত হিন্দু-সমাজ গঠন করা হইল, দেশকে প্রকৃত হিন্দু করা হইল। হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি যদি ইহাদিগের অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, হিন্দু নামের প্রতি যদি ইহাদিগের হৃদয়-গত অনুরাগ থাকে তাহা হইলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যাহা নিকৃষ্টাধিকারীর ধর্ম্ম তাহার নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিয়া, হিন্দু শাস্ত্র মতে যাহা শ্রেষ্ঠাধিকারীর ধর্ম্ম তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই ইহাদিগের মহান্ কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্র যাহাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে তাহা প্রচার না করিলে হিন্দু নামের অধিকারী হওয়া যাইবে না, প্রকৃত হিন্দুত্ব রক্ষা হইবে না, হিন্দু সমাজ গঠিত হইবে না; হিন্দু জাতিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রদর্শিত সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমতে তুলিতে চেষ্টা না করিয়া নিকৃষ্ট ধর্ম্ম-মতে আবদ্ধ রাখিলে দেশের ধর্ম্মোন্নতির আশা থাকিবে না, এবং ধর্ম্মে উন্নত না হইলে এই দেশ কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। আমরা আশা করি এই সমস্ত বুঝিয়া বঙ্গের এই নব ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রকৃত পথ অবলম্বন করিবেন।

শ্রী যোগীন্দ্রনাথ বসু,—দেওঘর।

জীবন সমস্যা
ও
প্রকৃতিতে উচ্ছ্বাস।

(১)

"কোথা হতে আসিলাম
কোথা এসে পড়িলাম
কোথা আমি করিব প্রয়াণ ?"
এ অনন্ত বিশ্ব-সৃষ্টি
এ অপার শোভা দৃষ্টি
কে রচিল এ হেন বয়ান ?

(২)
বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম জ্ঞান
দর্শনের শান্ত ধ্যান
না পারে এ তত্ত্ব সমাধিতে,
এই প্রশ্ন সমাধানে
মানব রয়েছে ধ্যানে
কত কিছু ভাবিতেছে চিতে ;

(৩)
জগতের আদি হ'তে
জ্ঞানীগণ মগ্ন এতে
তবুও এ চিন্তা-স্রোত বয়,
যত কিছু উদ্ভাবনা
যত কিছু বিগণনা
কিছুতেই কিছু নাহি হয়,

(৪)
জড় হ'তে হইয়াছি
জড় নিয়ে ব্যস্ত আছি
জড়েতেই মিশাইব কায় ;
তবে কেন ভাল বাসা
অবিনাশী সুখ-আশা
সর্ব্বদাই অনন্তেতে ধায় ?

(৫)
যদিই বুদ্বুদ প্রায়,
প্রাণ শূন্যে মিশে যায়,
তবে কেন এত বিড়ম্বনা ?
কেন এই ধূলো-খেলা
কেন এই ভব মেলা
কেন এই সংসার-বাসনা ?

(৬)
তবে কেন বৌদ্ধগণ
সমর্পিছে এ জীবন
আকাঙ্ক্ষিত নির্ব্বাণ কারণ ?
মরণেই সুনির্ব্বাণ
ধ্বংস হবে এই প্রাণ
তবে কেন এতই তাড়ন ?

(৭)
কেন হে মলয়ানিল
সৌরভেতে অনাবিল
দিগ্দিগন্ত মাতিয়ে তুলিছ,
কেন হে কুসুম চয়
কাননে সৌন্দর্য্যময়
সমুজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশিছ ?

(৮)
কেন এ প্রকৃতি ছবি
কেন এ জ্বলন্ত রবি
প্রেমিকের প্রেমাগুন জ্বালে,
কেন জ্যোছনার হাসি
প্রাণে এত ভাল বাসি
কেন নাচি প্রকৃতির তালে ?

(৯)
কেন বাজে প্রাণ-তন্ত্রী,
কোন্ জন এই যন্ত্রী
যেই করে হৃদয় বাদন,
প্রকৃতির মহাগান
কেন ব্যাকুলয়ে প্রাণ
কেন বা বাজিছে এই তান ?

(১০)
যদি শুধু জড় হই
তবে কি পুতুল নই,
পুতুলের বিয়ে নিয়ে আছি ;—
কেন পতি পত্নী প্রেম

কেনই বা বিশ্ব-প্রেম
মানব মনেতে দেখিতেছি ?

(১১)

কেন তবে যোগী জন
ছাড়ি সুরম্য ভবন
পর্ব্বত কন্দরে নিবসিছে,
কেনই বা বৈজ্ঞানিক
নিয়ে তত্ত্ব আণবিক
যত কিছু বুদ্ধি প্রয়োজিছে ?

(১২)

"জানিনা" "জানিনা" ধ্বনি
সর্ব্ব যুগ-যুগে শুনি
এই ধ্বনি জগৎ পূরিছে,
যার কাছে প্রশ্ন করি
সেই ঐ রব ক'রি
কোলাহলে মিশিয়ে পড়িছে।

(১৩)

দুর্জ্ঞেয় সমস্যা ত্রয়
সমস্যাই হয়ে রয়
সমাধান কভু না সম্ভবে,
নৈশাকাশে এই ধ্বনি—
"মোরা কিছু নাহি জানি"
ছাইছে এ বিশ্ব ঐ রবে।

(১৪)

তবু এই তত্ত্ব ধ্যানে
চাহিয়ে অনন্ত পানে
সততই নিয়োজিত রব,
মিটিবেনা জ্ঞান-আশ
না পূরিবে এ পিয়াস
তবুও এ তৃষা বাড়াইব।

(১৫)

এ অতি অপূর্ব্ব তৃষা
নিবৃত্তিতে নাহি আশা
এ তৃষ্ণাই সুখের নিদান;
যদিও বুঝিতে নারি
প্রাণ মন মুগ্ধকারী
এ সুন্দর বিশ্বের বিধান।

(১৬)

দেখিব ও দেখাইব,
দেখিয়েই মুগ্ধ হব,
এ মোহই মোক্ষের কারণ;
জাগিছে অনন্ত আশা
প্রকৃতিতে ভালবাসা
কে করিবে ইহার বারণ ?

(১৭)

প্রকৃতি ডাকিছে "আয়"
বুঝিবিনা তবু আয়
আমাতেই মিটাইবি আশ,
যদিও দুর্জ্ঞেয় হই
তবু প্রেম শূন্য নই
প্রেমেতেই আমার প্রকাশ।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস।

সমালোচনা।

আমরা এক সময় ভাবিয়াছিলাম "আলোচনার" কলেবর যেরূপ ক্ষুদ্র, তাহাতে পুস্তক ও পত্রিকাদির সমালোচনা করিতে গেলে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের আলোচনা করিতে স্থানাভাব পড়িবে। এবং বাস্তবিক ঘটনাও তাই। কিন্তু আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় দিন দিন যেরূপ কুরুচিপূর্ণ পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—বঙ্গের খ্যাতনামা লেখকগণ পর্য্যন্ত যেরূপ বিকৃত রুচির পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে একেবারে নির্ব্বাক থাকা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। যে সকল কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গ্রন্থাদি আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইতেছে, যদি একটী পাঠককেও তাহা পাঠ হইতে বিরত রাখিতে পারি, তবেই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র যত্ন ও প্রয়াস সার্থক মনে করিব।

আমরা এক দিন কার্য্যোপলক্ষে এই সহরের কোন প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত ছিলাম। বসিয়া থাকিতে থাকিতে কতকগুলি চটি পুস্তিকার অসাধারণ কাটতি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম—তাহাদের কোন কোন খানার নাকি আবার ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ পর্যান্ত হইয়া গিয়াছে! ইহা দেখিয়া তাহাদের গুণাগুণ দেখিতে বড়ই কৌতূহল জন্মিল। সেই দোকানে বসিয়াই দু' একখানা পড়িতে লাগিলাম—পত্রোদ্ঘাটন করিয়া দেখি, তাহা ভদ্র লোকের অপাঠ্য, বটতলার দুষ্টা সরস্বতীও এরূপ গ্রন্থ উদ্গীরণ করিতে পারেন কি না সন্দেহ! অথচ দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা তাহা পাঠে নিরত! দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে " রায় গুণাকর " ঠাকুর দেশ হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাণ সভ্যতার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া "নারীদেহ তত্ত্ব" "বিবাহ বিভ্রাট" প্রভৃতি অসংখ্য কুরুচিপূর্ণ দুর্নীতি-প্রচারিণী অশ্লীল জঘন্য ভাষার চটি-পুস্তিকা সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, অর্দ্ধশিক্ষিতা পুরনারীদিগের হস্তে পড়িয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। পথে ঘাটে ও পুস্তক-বিক্রেতাদের দোকানে সময় সময় যে সকল বইএর বিজ্ঞাপনাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, সম্মানিত ব্যক্তি কেহ সঙ্গে থাকিলে তাহার দিকে তাকাইতেও লজ্জা হয়—সংবাদ পত্রিকাদিতে যেরূপ ভাষায় তাহাদের বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ

করিতে আপনা-আপনি লজ্জা ঘৃণায় চক্ষু ফিরিয়া আইসে। তখন মনে হয় লর্ড লিটন রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ চাপা দিবার জন্য "ন-আইনের" সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট কি এ সকল কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থকারদিগের শাস্তির জন্য কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারেন না?—সমাজের পরিচালকগণ,—বঙ্গসাহিত্যের অধিনায়কগণ কি এ দুর্নীতি নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন না? পারেন বই কি? কিন্তু তা হলে যে বঙ্গসাহিত্যের ধুরন্ধরদিগের অনেককেও "নারীদেহতত্ত্ব" ও "বিবাহবিভ্রাট" লেখকদিগের যূথে পড়িতে হয়। সে-দিন বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সঞ্জীবনীতে" যে ছু-চুরি ধরিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হয় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বিস্মিত ও অবাক্ হইয়াছেন!

বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া—বঙ্গীয় লেখক বা কুলেখকদিগের রুচি বিকার দেখিয়া আমাদের মনে হয়, ভারতীতে "বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনী" সভা সংস্থাপনের জন্য এক সময়ে যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, তাহা এখন কার্য্যে পরিণত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের বিশ্বাস, যদি সময় থাকিতে এই কুরুচি নিবারণের কোন উপায় অবলম্বিত না হয়, তবে কালে বঙ্গভাষা এত আবর্জ্জনা পূর্ণ হইয়া উঠিবে যে, তাহা ভদ্র লোকের অপাঠ্য হইয়া দাঁড়াইবে—দেশের আব্‌হাওয়া এত দূর দূষিত করিয়া তুলিবে যে সমাজ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িবে, বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। তাই আমারা ভারতীর পরিচালকদিগকে পুনরায় এ বিষয়ের জন্য আন্দোলন ও চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আত্মা।

বেদে আছে "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ সঈক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজতেতি।"—সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক আত্মাই ছিলেন। অন্য পদার্থ মাত্র ছিল না, তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব, পরে তিনি এই লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। "স বিশ্বকৃদ্বিশ্ব বিদাত্ম যোনিঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষ স্থিতি বন্ধহেতুঃ"—তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, জীবাত্মার জন্ম স্থান, কালের কর্ত্তা, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের স্রষ্টা এবং সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জীবাত্মা ও প্রকৃতির পতি এবং প্রাকৃতিক গুণ সমূহের ঈশ্বর। তিনি এই সংসারের, ইহা হইতেই উদ্ধারের,—ইহার স্থিতির এবং বন্ধনের একমাত্র কারণ। যথা "সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবা পিযন্তি।"—যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে স্ব সদৃশ সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ক্ষয় রহিত সেই আত্মা হইতে বিবিধ জীবাত্মা উৎপন্ন হয় এবং অন্তে তাঁহাকেই লাভ করে। আচার্য্যেরা এই শ্রুতির ভাষ্য ও টীকাতে লেখেন যে, জীব সকল পরমাত্মার সত্তা হইতে কারণ ও সূক্ষ্ম দেহাদি উপাধির সহিত উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের অনাদি কর্ম্মফল ও বাসনা তাদৃশ উপাধির হেতু। কর্ম্মফল ও বাসনা ক্ষয়ই জীবত্ব-ব্যবহারের অন্ত। সেই অন্তকালে জীবাত্মা উপাধি শূন্য হইয়া তাঁহাকেই মোক্ষরূপে লাভ করেন, ইহাই এ শ্রুতির অভিপ্রায়। মনুর স্মৃতিতেও ঐ শ্রুতির তুল্যার্থ বচন আছে—"অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।" সেই পরমাত্মার স্বরূপ হইতে বিবিধ উপাধি ভেদে অসংখ্য জীবাত্মা নিঃসৃত হয়। জীবাত্মা সকল প্রকৃতির বিকার রূপ জড় পদার্থ নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের উদ্ভব স্থান স্বরূপ আত্মারই ন্যায় চেতন পদার্থ। কিন্তু তাঁহাদের উপাধি সমস্ত জড় বিকার।

(শ্রুতি) "সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ। অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ। জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।" পরমাত্মা আর জীবাত্মা সংযুক্ত হইয়াই আছেন। পরমাত্মা এই ব্যক্ত ও

অব্যক্ত বিশ্বকে পালন করিতেছেন। জীবাত্মা সেই পরীক্ষা ক্ষেত্রে ভোগে বদ্ধ হইয়া আছেন। তাঁহাকে জানিলেই বন্ধন মোচন হয়। পরমাত্মার সৃষ্টিশক্তি-সম্ভূত জীবের অনাদি কর্ম্মানুযায়ী প্রাকৃতিক সংসার, প্রকৃতি বিরচিত স্বর্গাদি, প্রকৃতির রূপান্তর স্বরূপ মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি, এ সমস্ত ক্ষেত্র জীবাত্মার বহু জন্ম ব্যাপী পরীক্ষার ও বৈরাগ্য শিক্ষার স্থল। পরমাত্মাকে দর্শন মাত্র সেই মায়া রাজ্য মিথ্যা হইয়া যায়, শিক্ষা সাঙ্গ হয়, জন্ম সফল হয়। তখন জীবাত্মা স্বীয় পরমাত্মরূপ মোক্ষ রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নব জীবন লাভ করেন। সে জীবন পরিবর্ত্তনের জীবন নহে; তাহা অমৃত, আত্মীয়, এবং স্বাধীন। তাহা হইতে আর পরীক্ষা-ক্ষেত্রে আসিতে হয় না। তাহাই আত্যন্তিক প্রলয় বলিয়া অভিহিত হয়। কপিল কহিয়াছেন "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিবিবেকাৎ"—ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত তাবৎ সৃষ্টি জীবাত্মার উপকারার্থে, ফলে তাহা কেবল অজ্ঞানতা বশতঃ। যখন সেই সকল প্রাকৃতিক ভোগকে মিথ্যা জানিয়া জীবাত্মা স্বতন্ত্র হন, তখনই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয়। তাঁহার পক্ষে সৃষ্টির আত্যন্তিক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। সাংখ্যেরা যত্ন ও অভ্যাস দ্বারা প্রকৃতি ত্যাগে জীবাত্মার বন্ধন মোচন দৃষ্টি করেন; ব্রহ্ম জ্ঞানীরা পরমাত্ম দর্শন মাত্রে সেই মায়াবন্ধন ছিন্ন হয় কহেন।

সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, জীবাত্মা মায়া বা প্রকৃতির অতীত পদার্থ। সেই জন্য বাসনার সহিত সর্ব্ব সংসারকে প্রলয় করিয়া অন্তে স্বধামে চিরবাস লাভ করেন। জীবাত্মা যে স্বয়ং পরমাত্মাই অনেক স্থলে শাস্ত্রের তাহাই যথাশ্রুত অর্থ। অনেক স্থলে তাহাই আচার্য্য দিগের মত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অভিপ্রায় তাহা নহে। পরমাত্মাই যে সকলের আত্মা এ বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি নাই। তিনি সকলের আত্মা, জীবাত্মারও আত্মা। যদি কেহ সেই ভাবে তাঁহাকেই এক মাত্র আত্মা বলে, সে তো উত্তম কল্প। বিশেষতঃ "শারীরকে" (১।৪।২০) আছে—"প্রতিজ্ঞা সিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ" এক মাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্ব জ্ঞান হয়, ছান্দোগ্যের এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির নিমিত্তে জ্ঞানীরা জীবাত্মাকে পরমাত্মা রূপে দর্শন করিয়াছেন মাত্র, একথা আশ্মরথ্য কহিয়াছেন।

বেদান্ত শাস্ত্রে অনেক স্থলে আছে জীবাত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, "কল্পাদৌ জীবোনোৎপদ্যতে" (শাঃ২।৩।১১অধিঃ)।

জীবাত্মা প্রাকৃতিক সৃষ্টির অন্তর্গত নহেন, এজন্য কল্পের আদিতে তাঁহার উৎপত্তি হয় না। তিনি নিত্যকাল ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। কল্পের আদিতে সূক্ষ্ম স্থূল দেহের জন্মানুসারে তাঁহার জন্ম পরিকল্পিত হয়। ফলে সৃষ্টির আদিতে যে তিনি একেবারে ব্রহ্ম হইয়া থাকেন বা কল্পকালে ব্রহ্মই আসিয়া ব্যবহারিক জীবাত্মা হন, এমন অভিপ্রায়ও নহে। কেন না তখন জীবাত্মা সকল অনাদি অবিদ্যাতে বদ্ধ হইয়া থাকেন। সেই অবিদ্যা জন্যই তাঁহাদের উপাধির যোগে জন্ম হয়। বহু জন্মের পরীক্ষার পর জীবের মোক্ষ হয়। সে সময়ে ঐ অনাদি অবিদ্যাকৃত উপাধি থাকে না। তখন জীব নিরুপাধিক আত্মারূপে ব্রহ্মাত্মাকে অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত অমৃতানন্দ ভোগ করেন। অতএব ভাবার্থ এই যে নিরুপাধিক জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র। তিনি সোপাধিক রূপে সৃষ্ট, নিরুপাধিকরূপে মুক্ত। কিন্তু সহস্র নিরুপাধিক হইলেও এমন একটু বিশেষ আছে, যাহা বাক্যদ্বারা শাস্ত্রেও বুঝান নাই, আমরাও বুঝাইতে পারি না। কেবল উত্তমরূপে বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিলেই তাহা সঙ্গতরূপে অনুভূত হইবেক। সংসার বৈরাগ্যরূপ আত্যন্তিক প্রলয় কালে সেই নিরুপাধিক জীবাত্মা স্বীয় পুরাতন সম্পদরূপে স্বরূপানন্দের ভাগী হন, এবং প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিকাদি প্রলয়ে তিনি পরমাত্মাতে নিদ্রিত থাকেন। তখন তাঁহার উপাধি সমস্ত পরমাত্মশক্তিস্বরূপিণী অনাদি মায়াতে অভিভূত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত দুই প্রকার প্রলয়ে যে জীবের কোন কষ্ট হয় এমত উক্ত হয় নাই। বরং তদ্বিপরীত উক্তি আছে—"সংহারস্তচ সুষুপ্তিবৎ দুঃখাজনকত্বাৎ প্রত্যুত সর্ব্বক্লেশ নিবর্ত্তকত্বাৎ" (শাঃ ২।১।৩৪। অধিঃ ভাষ্য)—যেমন সুষুপ্তির, সেইরূপ প্রলয় কালেরও দুঃখজনকত্ব নাহি, প্রত্যুত সর্ব্ব ক্লেশ নিবর্ত্তকত্ব আছে। ফলে তৎকালে জীবাত্মা জাগ্রত থাকেন না; সুতরাং মোক্ষ বা আত্যন্তিক প্রলয়াবস্থার মহাজাগ্রত আনন্দ ভোগের তুলনায় তাহা হীন।

উপরিউক্ত দ্বিবিধ প্রলয় ভেদে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধি হয়। একভাবে পরমাত্মা মোক্ষ নিকেতনে তারকব্রহ্ম, অন্যভাবে জগৎকারণ ও সর্ব্বেশ্বর। প্রথমোক্ত ভাবে জীবাত্মা তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া চির-শান্তি লাভ করেন। সে অবস্থায় জীবের সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক উপাধির উপরম হয়। তাঁহার মন—প্রধান ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রাকৃতিক বাসনা সহ অদৃষ্ট, প্রকৃতি, কর্ম্মফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই ইন্দ্রজালবৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আর কখনই সংঘটিত হয় না। তখন তিনি যেন মোক্ষ স্বরূপ পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যান। [illegible] বোধে তখন যেন এক আত্মামাত্র থাকেন। সেই আত্মা নিষ্ক্রিয়, [illegible] ধর্ম্ম হইতে অন্য, অধর্ম্ম হইতে অন্য এবং প্রাকৃতিক সংসারের [illegible]। সেই পরমাত্মীয় রাজ্যই ধ্রুব সত্য, ধ্রুব অমৃত এবং ধ্রুব আনন্দের রাজ্য। অতঃপর পরমাত্মার দ্বিতীয় ভাব উক্ত হইতেছে। যে ভাবে সৃষ্টির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। তিনি অক্ষয় জগদ্বীজ এবং জগদীশ্বর। প্রাকৃতিক প্রলয়ে (অর্থাৎ যে প্রলয়ে প্রকৃতির গুণ সকল সাম্যভাব লাভ করে) জীবাত্মা সকল তাঁহাতে দীর্ঘ সুষুপ্তি লাভ করে। জীবাত্মাদিগের মনাদি উপাধি তাঁহার তদবস্থাপন্ন প্রকৃতিরূপ শক্তিতে অভিভূত হইয়া একীভূত হয়। তাঁহাদের সুকৃতি দুষ্কৃতিরূপ অদৃষ্ট, জ্ঞান বিদ্যা, বাসনা সমস্তই তখন ঐ প্রকৃতিতে গিয়া সাম্যভাব লাভ করে। কাল, দিক, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী স্ব স্ব কারণে ক্রম লয় প্রাপ্ত হইয়া অন্তে ঈশ্বরের সেই শক্তি-সাগরে বিলীন হয়। বেদান্ত তাদৃশ প্রলয়ের অবস্থায় তাঁহাকে একমাত্র জগৎ কারণ ও সর্ব্বজ্ঞ আত্মা বলেন। তাঁহার অনন্ত শক্তি স্বীকার করেন। সেই শক্তির যোগে তাঁহা হইতে ঐ সমস্ত পদার্থের সহিত জীবের পুনঃ সৃষ্টি অঙ্গীকার করেন। বেদান্ত স্পষ্ট বাক্যে উপদেশ দেন বটে যে, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সেই অনাদি মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব সৃষ্টির সমস্ত উপাধি সাম্যাবস্থায় ছিল, এবং জীবাত্মা সকলও তাঁহার স্বরূপে একীভূত হইয়া সুষুপ্ত ছিলেন। এইরূপ বার বার হইয়া আসিয়াছে; "নাদ্যোনচাদি ইত্যাদি শাস্ত্রাৎ"—কেননা এই সৃষ্টির আদি অন্ত নাই। তাঁহার সেই মায়াশক্তি এই ভাবে সর্ব্ব জগতের বীজ এবং তাঁহাতে প্রলীন জীবাত্মাগণ কর্ম্মসূত্রে সেই অনাদি মায়ার চির বদ্ধ। সেই মায়ার যোগে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। "ঈক্ষণাচ্চেতনং ব্রহ্ম ক্রিয়াজ্ঞানেতু মায়য়া" (শাঃ ১।১।৫ অঃ)—সেই চৈতন্যময় ব্রহ্ম জ্ঞান-ক্রিয়া ও মায়ারূপিণী শক্তি-ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি করেন। এই তাৎপর্য্যে সৃষ্টির আদিতে তিনি একমাত্র থাকেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। সমগ্র তাৎপর্য্য এই যে, "মোক্ষ স্বরূপ" ও "জগৎ কারণ" এ উভয় ভাবে তিনি একমাত্র 'সৎ'। 'সৎ' শব্দে সত্য অথবা সর্ব্ব জগতের ও সর্ব্বজীবের সদ্ভাব। অথবা ইহাই বল যে, তিনি সকল সত্য ও সদ্ভাবের একাধার। তাঁহার সে ভাব শাস্ত্রে

সহস্র প্রকারে বুঝাইয়াছেন; কিন্তু তাহা এই সংসারাবস্থায় আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

শারীরক দর্শনে বিক্ষিপ্তরূপে ঐ কথার ভূরি বিচার আছে। তাহার যাহা মর্ম্ম তাহা উপরিভাগে সংক্ষেপে উক্ত হইল। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে তাহা বিশদরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে কহেন—প্রধান-পুরুষ-ব্যক্ত-কালাস্তু-প্রবিভাগশঃ। রূপাণি স্থিতি সর্গান্ত ব্যক্তি-সদ্ভাব-হেতবঃ।” ঈশ্বর মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি, জীবাত্মা, মহত্তত্ত্বাদি এবং কাল এই রূপ বিভাগ ক্রমে তাহাদের একাধার হইয়া সংরূপে স্থিতি করেন। এইরূপ ভাবই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং ব্যক্তি সদ্ভাবের হেতু। এই ভাবটী উপলক্ষে ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলা যায়। কিন্তু “প্রধান পুরুষ ব্যক্ত কালানাং পরমং হি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।” যে ভাবটি ঐ সমুদায় হইতে পরম শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সৃষ্টি ক্রিয়ার অতীত মোক্ষপদ, জ্ঞানীরা তাহাই দেখেন। বেদান্ত শাস্ত্রের বিশিষ্টাদ্বৈত প্রস্থানের প্রবর্ত্তক রামানুজ স্বামী আদিতে ঈশ্বরকে “চিদচিদ্বিশিষ্ট” অর্থাৎ জীবত্মা ও জড় প্রকৃতি বিশিষ্ট এক অদ্বৈত পরম সত্যাধার বলিয়া প্রকারান্তরে ঐ তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতাতেও “ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ” প্রভৃতি শ্লোকত্রয়ে পরমেশ্বরের জগৎ কারণত্বকে প্রথমতঃ দুই ভাগে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “জড় প্রকৃত্যাত্মক” এবং জীবভূতা প্রকৃত্যাত্মক।” জড় প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূত এবং মনোবুদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তি আর জীবভূতা প্রকৃতি হইতে ভোক্তা রূপ জীবাত্মার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সমাহার করিয়াছেন যে, ঐ উভয় প্রকৃতি স্বরূপে তিনিই এক মাত্র এই জগতের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। এ স্থলে শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে কহিয়াছেন—“প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণমিত্যর্থঃ।” প্রকৃতিদ্বয় দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই একাকী জগৎ কারণ। অতএব আর্য্য শাস্ত্রের এই অভিপ্রায় স্থির হইল যে, প্রলয়াবস্থায় জীবাত্মা, তাঁহার দেহ মনাদি ও জড় জগৎ ঈশ্বরের সেই অনির্ব্বচনীয় জীবাত্মক ও প্রকৃত্যাত্মক বিদ্যমানতাতে একীভূত হয় এবং সৃষ্টি কালে তাঁহা হইতেই বিভাগ ক্রমে নাম রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রলয়াবস্থায় এই সমস্ত পদার্থ বিভাগ ক্রমে নানা রূপে ভেদ সহকারে থাকে না বলিয়া “নানাং কিঞ্চনমিদং” এই বেদ বাণীটী উক্ত হইয়াছে। আর তদবস্থায় সে সমস্ত সংরূপে সৎ স্বরূপ ব্রহ্মেতে একীভূত

হইয়া থাকে বলিয়া "সদেব সৌম্য" প্রভৃতি শ্রুতির অবতারণা হইয়াছে। অর্থাৎ হে সৌম্য সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র "সৎ" ছিলেন। তাঁহা হইতে সমস্ত পদার্থ নাম রূপেতে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু, খড়্গাপুর।

পরমাত্মা সকলের প্রতিষ্ঠা।

এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহার যাহা কিছু শক্তি আছে, তাহা সেই মহান্ ঈশ্বরের শক্তিকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। যে শক্তিতে এই যুগ যুগান্তর ব্যাপী বহুবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যে অভ্রভেদী হিমালয় অদ্য পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সে শক্তি সেই মহেশ্বরের অসীম শক্তির প্রভাবে। মহাসমুদ্র ভীম গর্জ্জনে মুহুর্মুহুঃ আস্ফালন করিতেছে, সে কেবল তাঁহারই বলে। তাঁহার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাণ্ড সূর্য্য চন্দ্র এবং উর্দ্ধপুচ্ছ ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহমণ্ডল শূন্যমার্গে অবাধে পরিভ্রণ করিতে পারিতেছে। অদ্য যদি ঈশ্বরের শক্তি এই বিশ্ব-রাজ্য হইতে প্রত্যাহৃত হয়, তাহা হইলে পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হউক, এক বিন্দু তুলাকেও দগ্ধ করিতে পারিবে না। বায়ু মহাঝটিকা উত্থিত করুক, একটি তৃণকেও উড়াইতে পারিবে না। তাঁহার শক্তিতে হস্তীর বল, তাঁহার শক্তিতে পিপীলিকার গতি। এই বিশ্বরাজ্যে ক্ষুদ্র হইতে মহত্তর যে কোন শক্তি-কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহা সকলি সেই অনন্ত শক্তি ঈশ্বরের শক্তিকে অবলম্বন করিয়া।

প্রাণীরা তাঁহারি প্রাণকে অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিয়াছে। "প্রাণো-হোষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।" এই যে সর্ব্বভূতে বিরাজিত রহিয়াছেন ঈশ্বর, তিনি প্রাণ স্বরূপ। তাঁহার জীবন্ত সত্তা সমস্ত জগতের যাবৎ পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভূমা, তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা। তাঁহার সত্তাতেই জগতের জীবন পরিলক্ষিত হয়। নহিলে সকলি মৃত—সকলি শূন্য। উদ্ভিদ শরীরে, পশু শরীরে এবং মনুষ্য-শরীরে যে প্রাণ-ক্রিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহার প্রস্রবণ সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর।

তিনি যেমন সর্ব্বশক্তিমান ও প্রাণস্বরূপ, তেমনি তিনি "চেতনং চেতনানাং" চেতনের চেতন। এই যে পশু পক্ষী প্রভৃতি জন্তুরা চৈতন্য

লাভ করিয়া বিষয় ভোগে প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারিতেছে এবং মনুষ্যেরা বিবেকের পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে, তাহাও সেই তাঁহার চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া।

সমস্ত চরাচরের সকল ভূতপ্রাণী পশু পক্ষী তাঁহার শক্তিতে শক্তিমন্ত, তাঁহার প্রাণে প্রাণবন্ত এবং তাঁহার চেতনে সচেতন হইয়াছে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" কিন্তু জীবাত্মা সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া উন্নত জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম লাভ করিয়াছে। ঈশ্বর নিরালম্ব স্বতন্ত্র-স্বভাব। তিনি জীবাত্মার অবলম্বন ও শাস্তা। তিনি জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমের অনন্ত উৎস। জীবাত্মা তাঁহার সেই জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমে সিক্ত হইয়া আপনার জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রেম অন্তরে লাভ করিতেছে। ঈশ্বর ধ্রুব মঙ্গল এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ। এই ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্র আর তিনি তাহার যন্ত্রী। জীবাত্মাকে তিনি এই শরীর রূপ যন্ত্র দিয়া তাহাকে এই পরিমিত ক্ষেত্রের কর্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া দিয়াছেন। পিতা যেমন স্বয়ং আদর্শ হইয়া আপন পুত্রকে পিতৃত্ব প্রাপ্তির দিকে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় নিজের সমস্ত যত্ন প্রয়োগ করেন, এবং পুত্র যেমন সেই পিতৃত্বের দিকে যাইবার জন্য প্রকৃতির অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, সেইরূপ সেই পরমপিতা পরমেশ্বর স্বয়ং মঙ্গলের আদর্শ হইয়া জীবাত্মাকে প্রেম-সূত্রে গ্রথিত করিয়া আপনার দিকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা যেমন ধ্রুব, জীবাত্মা যে তাঁহার দিকে যাইবে ইহা তেমনি নিশ্চয়। কোন সংশয় ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না। কোন জ্ঞান তর্কের স্রোতে ইহাকে পথান্তর করিতে পারে না। ঈশ্বর অনন্ত, জীবাত্মা অনন্তকাল সেই মঙ্গল আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবে। অনন্ত যতই নিকটতর হইতে থাকিবে, জীবাত্মা ততই জ্ঞান প্রেম ও ধর্ম্ম মঙ্গলে অধিকতর সুশোভিত হইতে থাকিবে। ততই অধিকতর আনন্দভোগ, অধিকতর সুখভোগ করিতে থাকিবে। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং"; সুতরাং এই ক্ষুদ্র সংসারকে অতিক্রম করিয়া যতই ভূমার দিকে অধিকতর গমন করিবে, ততই অধিকতর সুখানন্দ লাভ হইবে না তো কি হইবে? মঙ্গলের প্রতি যাঁহার বিশ্বাস স্থির, জীবাত্মা কখনও যে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে পারে, এ কল্পনা তাঁহার নিকট দিয়াও যাইতে পারে না।

ইহা হইতে আরো ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ জীবত্মা পরমাত্মাতে রহিয়াছে। সে সম্বন্ধ পাষাণ হইতে দৃঢ় এবং আকাশ হইতে উচ্চ। "পরমাত্মা জীবাত্মার প্রতিষ্ঠা।" পরমাত্মাতে জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম লাভ করিতেছে এবং নিত্যকাল তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জীবত্মা পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মনুষ্য শরীর গ্রহণ করিয়া এখানে ভূমিষ্ঠ হয়। এবং মৃত্যুকালে পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শরীরকে পরিত্যাগ করে। যেমন পৃথিবীর সহিত শরীরের আকর্ষণ, পরামাত্মার সহিত জীবাত্মার সেই প্রকার আকর্ষণ। শরীর যেমন মৃত্যু হইলে পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে, আত্মা তেমনি পরমাত্মাতেই অবস্থিতি করে। আত্মা জীবনে মরণে, ইহলোকে পরলোকে, কোথাও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। জীবাত্মার প্রতিষ্ঠা পরমাত্মা, তাহার ঘর শরীর এবং তাহার কর্ম্মক্ষেত্র সংসার। জীবাত্মা যে শরীরে, যে ক্ষেত্রে, যেরূপ জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম লাভ করিবে, সে শরীর, সে ক্ষেত্র পরিত্যাগের পর সেই লব্ধ জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রেমের অনুসারে আবার অন্য উন্নত শরীর ও উন্নত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবে। যেমন কালস্রোতের বেগে শিশু যৌবনে, যুবা বার্দ্ধক্যে ধারাবাহিকরূপে উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ আত্মার ঐহিক জীবন পারত্রিক জীবনে উত্তীর্ণ হইবে। আত্মা যখন যে লোকে যে জীবন প্রাপ্ত হয়, সেই জীবন তাহার সেই লোকের ঐহিক জীবন। যেমন গর্ভাশয় হইতে পৃথিবীতে আগমন, সেইরূপ পৃথিবী হইতে পরলোকে গমন, এই দুইটি স্বাভাবিক কার্য্যের একটি জন্ম আর একটি মৃত্যু শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। জন্ম যেমন গর্ভস্থ শিশুর জীবন নাশ করিয়া তাহাকে আর এক নূতন জীবন দেয় না, বরং জন্ম দ্বারা সেই জীবনই এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া আরো বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ মৃত্যু আত্মার পৃথিবীস্থ জীবন বিনাশ করিয়া নূতন জীবন উৎপন্ন করে না; কিন্তু সেই ঘটনাতে সেই জীবনই লোকান্তরে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
এবং শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

"মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেই রূপ আত্মা জীর্ণ শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করে।"

পরমাত্মা জীবাত্মার গতি, পরমাত্মা জীবাত্মার অবলম্ব এবং পরমাত্মা জীবাত্মার প্রতিষ্ঠা। অতএব সংসারের সমস্ত লাভালাভের উপরে মনুষ্য অগ্রে পরমাত্ম-জ্ঞানলাভ করিয়া আপনার জীবনের মঙ্গল সাধন করিবেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

বেদ সত্য।

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। যদিও জ্ঞান মাত্র সত্য, অজ্ঞানই অসত্য; তথাপি এ প্রবন্ধে বেদ শব্দ জ্ঞান বিশেষে প্রযুক্ত হওয়াতে, ভরসা করি, ইহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা অনাবশ্যক বোধ হইবেক না। আত্মার মধ্যে যে নূতন সত্য কখনও কখনও অকস্মাৎ উদিত হয়, তাহাই এ স্থলে বেদ শব্দ বাচ্য। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধীয় সত্য বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের আত্মাতে সময়ে সময়ে উদিত হইয়া সংসারের যে কত উপকার সাধন করিয়াছে, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্যও যে বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের আত্মাতে সময়ে সময়ে উদিত হইয়া থাকে, ইহা অজ্ঞানতাবশতঃ সকলে স্বীকার করেন না। নূতন আবিষ্কার মনুষ্য বিশেষের দ্বারাই হইয়া থাকে, সকলের দ্বারা হয় না; কিন্তু আবিষ্কৃত সত্যকে সকলেই গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ কথা যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে সত্য, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্মের নিয়ম সম্বন্ধেও সত্য। আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্য কখনও কখনও তদ্বিষয়ক চিন্তা দ্বারা, সঙ্গ-নিয়ম (Law of Association) হেতুক, আবিষ্কৃত হয়; কখন কখন সমাধি অবস্থায়, কখনও ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে জাগ্রত অবস্থায় অকস্মাৎ প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম বেদ।

উক্ত প্রকার লব্ধবেদ পুস্তকে লিখিত হইলে সেই পুস্তকও বেদ শব্দ বাচ্য হয়, কিন্তু তাহা বেদের প্রতিরূপ মাত্র; বাস্তবিক বেদের আবির্ভাব আত্মাতেই হয়। যেমন ভাগবতে কথিত হইয়াছে "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে" "যিনি আদি কবিতে হৃদয়ের দ্বারা বেদের বিস্তার করিলেন।" আত্মলব্ধ বেদ যখন বাক্যে বা লিপি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহার সহিত কিঞ্চিৎ

কল্পনার যোগ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে, সেই জন্য বেদ নামক পুস্তকের মধ্যে অনেক কল্পিতকল্পনাও দেখা যায়। অতএব বেদকেও পরীক্ষা দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে; কেবল আপ্ত বাক্য বলিয়াই যে স্বীকার্য্য, তাহা নহে।

বেদ যে কেবল আর্য্যদিগের চারিটি বেদ সংহিতাতে বদ্ধ, অথবা উক্ত সংহিতা চতুষ্টয়ে বেদ ছাড়া যে আর কিছুই নাই, তাহা নহে। সকল দেশে সকল জাতিতে যেমন লব্ধ-বেদ-মহাত্মারা থাকিতে পারেন, সেইরূপ সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম গ্রন্থে এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রে ন্যূনাধিক বেদ থাকিতে পারে।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে বেদের এ অর্থ নূতন, বেদ শব্দ পুস্তক চতুষ্টয় বিশেষেতেই বদ্ধ। তাঁহাদিগের এ ভ্রম নিরাকরণের নিমিত্ত কিছু শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, যদ্দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যাইবে যে প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরাও পারমার্থিক বা বাস্তবিক বেদকে লৌকিক বেদ চতুষ্টয় হইতে পৃথক বলিয়া জানিতেন।

অনন্তা বৈ বেদাঃ

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ৩।১০।১১।৩)

"বেদ নিশ্চয় অনন্ত"। বেদ যদি অনন্ত হইল, তবে চারি খানা পুস্তকের মধ্যে কি প্রকারে বদ্ধ হইতে পারে?

"মনো বৈ সমুদ্রঃ মনসো বৈ সমুদ্রাৎ
বাচাহভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্"

(শতপথ ব্রাহ্মণে ৭। ৫। ২। ৫২)

"মন সমুদ্র; মন-সমুদ্র হইতে বাক্য রূপ কোদালী দ্বারা দেবতারা ত্রয়ী (বেদ) বিদ্যা খুঁড়িয়াছিলেন"।

এই রূপক বাক্যের স্পষ্ট তাৎপর্য্য এই যে মনের চিন্তা হইতেই বেদ, অর্থাৎ নূতন সত্য সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

"শ্রুতি ধর্ম্ম ইতি হেকে নেত্যাহুরপরে জনাঃ,
ন চ তৎ প্রত্যসূয়ামো নহি সর্ব্বং বিধীয়তে।"

(মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মে
১০৯ অং ১৪ শ্লোঃ ভীষ্মবচনং)

"শ্রুতিকে কেহ ধর্ম্ম বলেন, কেহ বলেন না। আমরা তাহার নিন্দা করি না; কিন্তু ইহাও (স্বীকার করি) না যে, সকল শ্রুতিই ধর্ম্মবিহিত।

ভীষ্মের এই মত যে সকল শ্রুতি ধর্ম্মবিহিত নহে, আশ্চর্য্যরূপে ব্রাহ্ম মতের সহিত ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে!

"শ্রুতি র্বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না
নৈকো মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

(মহাভারতে)

"শ্রুতি বিভিন্ন, স্মৃতিও বিভিন্ন। এমন একটি মুনি নাই যাঁর মত (অন্য মুনির মতের সহিত) ভিন্ন নহে। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে (অন্তরে) নিহিত; শ্রেষ্ঠ লোকেরা যে পথে গিয়াছেন তাহাই পথ।" ধর্ম্মের তত্ত্ব অন্তরে, উহা শ্রুতিতে, স্মৃতিতে, কিম্বা মুনিদিগের মতে বদ্ধ নহে, কারণ উঁহাদিগের পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে; যদি এ সকলই সত্য হইত, তবে ইঁহাদিগের পরস্পর মতভেদ হইত না। তবে এক একটি যে ধর্ম্ম পথ (religion), ইহা মহাজনদিগের পথ মাত্র। এক একটি মহাত্মা বা কতকগুলি মহাত্মা মিলিত হইয়া, এক একটি ধর্ম্মপথের বিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন ঋষিগণ বা ঋষভ, বুদ্ধ, জরদ্দস্ত, মূসা, ঈশা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মারা এক একটি ধর্ম্মমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনই অধুনাতন কালে মহাত্মা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রামসিংহ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এক একটি ধর্ম্ম-পথ দেখাইয়াছেন। এ সকল পথ মাত্র। কিন্তু যে ধর্ম্মতত্ত্ব বা বেদ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এই সকল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে তত্ত্ব অন্তঃকরণের গুহাতে নিহিত। সেখান হইতেই বাক্যরূপ অভ্রীর দ্বারা গদ্য পদ্য সঙ্গীতময়ী ত্রয়ী বিদ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই কি যথার্থ বেদের তত্ত্ব নহে?

প্রাচীনকালে যেমন বেদ শাস্ত্র প্রভৃতি ভূরি ভূরি ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল, এখনও তেমনই ভূরি ভূরি ধর্ম্মগ্রন্থ বিরচিত হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইবে; কিন্তু এ সকল বাস্তবিক বেদের প্রতিরূপ (Representative) মাত্র। এ তত্ত্ব প্রাচীনেরাও যে বেশ বুঝিতেন, নিম্নোদ্ধৃত বাক্যরাশিতে তাহার বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যাইতেছে।

"বিজ্ঞেয়োঽক্ষরঃ সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলং
বিহায় শব্দ শাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্যতাম্"
(উত্তর গীতায়াং)

"সন্মাত্র অক্ষর (অক্ষয়) বস্তুই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য, জীবনও চঞ্চল; সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহা সত্য তাহাই অবলম্বন কর।"

ইহার দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে সত্যই যে একমাত্র অবলম্বনীয়, ইহা উনবিংশ শতাব্দীর আবিস্ক্রিয়া নহে, ইহার অনেক পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

"যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্
এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনম্।"
(উত্তর গীতায়াং)

"যে অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছে তার জলে কি প্রয়োজন? এইরূপ সেই পরম বস্তুকে জানিলে বেদে প্রয়োজন নাই।"

এস্থলে বেদ শব্দে লৌকিক বেদ অভিহিত হইয়াছে। পুরাকালে বেদ শব্দে যেমন জ্ঞান বুঝাইত, তেমনি বেদ নামক গ্রন্থ বিশেষও বুঝাইত; ইহা নিম্নলিখিত শ্রুতিদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হস্ম যদ্
ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরাচৈবাপরা চ। ৪।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃসামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো
ব্যাকরণংনিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে। ৫।
(মুণ্ডকোপনিষদি ১)

"দুইটি বিদ্যা জানিবার যোগ্য, যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞেরা পরা (শ্রেষ্ঠ) বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা বলিয়া থাকেন।"

"ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ, এ সকল অপরা বিদ্যা। আর পরা বিদ্যা তাহাই যদ্দ্বারা সেই অক্ষর বস্তুকে জানা যায়।" অতএব লৌকিক বেদ-গ্রন্থ অপরা বিদ্যার মধ্যে

গণ্য। আর পরা বিদ্যাই বাস্তবিক বেদ, যেহেতু তদ্দ্বারাই নিত্য বস্তুকে আমরা জানিতে পারি। এই বেদই অনন্ত।

লৌকিক বেদকে পুরাকালে "শব্দ ব্রহ্ম" এবং বাস্তবিক বেদকে "পরং-ব্রহ্ম" বলিত। যথা—

"আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্।"

(কুলার্ণব তন্ত্রে)

"জ্ঞান দুই প্রকার, শাস্ত্র-জন্য এবং বিবেক-জন্য। শাস্ত্র জন্য জ্ঞানকে "শব্দ ব্রহ্ম" বলে এবং বিবেক জন্য জ্ঞানকে "পরং ব্রহ্ম" বলে। তাঁহাদিগের নিকটই বেদের ঋচা বা ছন্দের এত সম্মান যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান রহিত। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে:—

ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
যইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ৪।৮)

"পরম আকাশের ন্যায় যে অবিনাশী পরমাত্মা, যাহাতে সকল দেবতারা বাস করেন, তাঁহাকে যে না জানে তাহার জন্য বেদের ঋচা কি করিতে পারে? যাঁহারা সেই পরমাত্মাকে জানেন, তাঁহারাই ভাল থাকেন।"

"তাবত্তপো ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকং
বেদ শাস্ত্রাগম কথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।
যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্
তত্ত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্।"

(কুলার্ণব তন্ত্রে)

"তপ, ব্রত, তীর্থ, জপ, হোম, পূজা প্রভৃতি এবং বেদ শাস্ত্র আগম কথা সেই পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়। যে ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, তার যেমন (অন্য) আহারে প্রয়োজন নাই, হে মহেশানি! সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞের শাস্ত্রে প্রয়োজন নাই।"

যে সকল ভগবদ্ভক্ত যথার্থ বেদ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শব্দরূপ বেদকে উপেক্ষা করিতেন, ইহা নিম্নলিখিত বাক্য সমূহের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে—

"শব্দস্যহি ব্রহ্মণ এষ পন্থা
যন্নামভি র্ধ্যায়তি ধীর পার্থৈঃ
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেহর্থান্
মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ"

(ভাগবতে ২ স্কঃ ২ অঃ ২)

"শব্দবেদের এই পথ যে নিরর্থক নামাদি দ্বারা বুদ্ধি চিন্তা করিতে থাকে; সেই সকল বিষয়কে পরিভ্রমণ করিয়া যথার্থ বস্তু লাভ করে না, যেহেতু মায়ামর বা কল্পিত বাসনাতে (মনুষ্যের মন) শয়ান থাকে।"

শ্রুতি বিপ্রতিপন্নাতে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা
সমাধাবচলা বুদ্ধি স্তদা যোগমবাপ্স্যসি।

(ভগবদ্গীতা ২। ৫৩)

"শ্রুতি দ্বারা বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চল হইয়া থাকিবে এবং সমাধিতে অচল হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে।"

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সম্প্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

(তথা ২। ৪৬)

"সর্ব্বত্র জলে পূর্ণ হইলে, (বা সমুদ্রাদি নিকটে থাকিলে) কূপাদির যেমন অল্প প্রয়োজন, সেই রূপ বিজ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির জন্য সমস্ত বেদে অল্প প্রয়োজন।"

"নবেদং বেদমিত্যাহুর্বেদ ব্রহ্ম সনাতনম্"

"(শব্দ) বেদকে (জ্ঞানীরা) বেদ বলেন না, যাহা নিত্যবেদ তাহাই (যথার্থ) বেদ।"

ঋচামাদি স্তথা সাম্নাং
যজুষামাদি রুচ্যতে।

অন্তশ্চাদিমতাং দৃষ্টো
নত্বাদি ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥
(মহাভারতে)

"ঋক্, সাম এবং যজু প্রভৃতি বেদের আদি আছে। যার আদি আছে তার অন্তও দেখা যায়, কিন্তু (নিত্য) বেদের আদি নাই।"

উক্ত বচনগুলি দ্বারা শব্দ বেদ এবং পরং বেদের পার্থক্য প্রতিভাসিত হইতেছে। বাস্তবিক বেদ যে আধ্যাত্মিক বস্তু, পুস্তক বিশেষ নহে, ইহা নিম্ন লিখিত শ্রুতি দ্বারাও জ্ঞাপিত হইতেছে।

"ত্রয়ো বেদা এতএব। বাগেবার্গ বেদো,
মনো যজুর্বেদঃ, প্রাণঃ সামবেদঃ"
(শতপথব্রাহ্মণে ১৪। ৪। ৩। ১২)

"তিন বেদ ইহাই—বাণী ঋগ্বেদ, মন যজুর্ব্বেদ এবং প্রাণ সামবেদ।"

মন, বাণী ও প্রাণ যদি বেদত্রয় হয়, তবে এতিনটি প্রত্যেক মনুষ্যেতেই আছে, সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যই বেদের আধার হইতে পারে। কিন্তু পারে বলিয়াই যে সকলেই হইবে তাহা নহে, যাঁহারা বেদ প্রাপ্তির যোগ্যতা উপার্জ্জন করেন তাঁহাদিগের মন, বাণী ও প্রাণই বেদ প্রকাশ করে।

অতএব প্রতিপন্ন হইল বেদ আধ্যাত্মিক সত্যজ্ঞান বিশেষ, মনুষ্য দেব-কৃপায় ইহা লাভ করিয়া প্রচার করিয়া থাকে।

শ্রীনবীনচন্দ্র রায়, লাহোর।

অসীম ও সসীম।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

প্রথম প্রস্তাবে মীমাংসা করা গিয়াছে যে সসীম রাজ্যে অসীম তত্ত্বের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই, জড়রাজ্য ও চিত্তরাজ্য ইহারা উভয়েই সসীম বিধায় মানবকে কোন মতেই অসীম রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে না, সেই চিত্তবৃত্তির অপ্রাপ্য অসীম পদার্থ সসীম পক্ষে অসৎ। এরূপ অবস্থায় স্বতঃই এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে, অসীম ও সসীম যদি একপ্রকার বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে অসীম হইতে সসীম সৃষ্টি অসম্ভব। সসীমের ভিতর দিয়া যদি অসীম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারা

না যায়, তাহা হইলে অসীম হইতে সসীমে যে কস্মিন্‌কালেও আসিতে পারা যাইবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এবম্বিধ বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন দুইটি পদার্থের সামঞ্জস্য সম্ভবপর কি না, উভয়ের মধ্য রেখা প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় আছে কি না—মীমাংসা করিবার জন্য এই অদ্বিতীয় প্রস্তাবের অবতারণা করা গেল।

অসীমে সসীমের সৃষ্টি বলাও যা, অসতে সতের উৎপত্তি অথবা সতে অসতের উৎপত্তি বলাও তাই। বৌদ্ধেরা বলেন অসতে সতের উৎপত্তি, হিন্দুরা বলেন সতে অসতের উৎপত্তি; পরন্তু এই দুইটি মত যে একই সত্য প্রকাশ করিতেছে সে বিষয়ে যাঁহারা অসীম ও সসীমের প্রথম প্রস্তাব দেখিয়াছেন তাঁহাদের বোধ করি কোন সন্দেহ থাকিবে না; কিন্তু এই উভয় মত এক হইলেও শুনিলে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। এও কি কখন হয়? অন্ধকারে আলোক, আলোকে অন্ধকার সৃষ্টি! যে শাস্ত্রের এবম্প্রকার শিক্ষা, সেই সকল শাস্ত্রকারগণ যে চক্ষু মুদিয়া মুদিয়া কেবলমাত্র প্রলাপ বকিয়া গিয়াছেন, ইহাই আপাততঃ সকলের বোধ হইতে পারে। কিন্তু সত্যের অপলাপ কোন কালেও সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের উপদেশে কি পরিমাণ সত্যরত্ন নিহিত আছে মীমাংসা স্থলে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

ক্ষেত্র (Space) কখন অসীম হইতে পারে না। যেখানে কিছুই নাই সেখানে ক্ষেত্রও নাই, তাহার কারণ এই যে চিন্তায় ইহার জন্ম, অতএব কোন ক্রমে ইহার আপেক্ষিক ভাব অপগত হইবার নহে। আপেক্ষিক ভাব বিনাশের সহিত ইহার প্রলয় অবশ্যম্ভাবী। যা কিছু আপেক্ষিক সে সমস্তই সসীম; সুতরাং যাঁহারা ক্ষেত্রের অসীমত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। সসীমত্ব বলিলে প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রতত্ত্বকেই বুঝাইয়া থাকে। যিনি ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম, তিনিই একমাত্র সৃষ্টির গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারেন। পণ্ডিত প্রবর ইউক্লিড সামান্য মস্তিষ্ক পরিচালনাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া যে ক্ষেত্রতত্ত্ব উদ্ভাবনা করিতে গিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; কোটি কোটি বিশ্ব বালুকাকণাবৎ যে বিশাল ক্ষেত্রাঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে, সেই সুবিশাল ক্ষেত্রের রহস্য উদ্ভাবন চেষ্টা মানসেই ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রণয়ন হইয়াছে।

ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম সূত্র বিন্দু লইয়া; বিন্দু ব্যতীত রেখার সৃষ্টি হইতে পারে না; এবং রেখা ব্যতীত ক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রথমেই বিন্দুর সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে যে, যাহার অংশ নাই, যাহার বিস্তার নাই, তাহাকে বিন্দু কহা যায়। বিস্তার সত্ত্বে অংশ ঘুচিতে পারে না, সুতরাং এক কথায় ইহাই বলা উচিত যে অংশ-বিরহিত অর্থাৎ অখণ্ড যে পদার্থ তাহার নাম বিন্দু। অংশ-বিরহিত বলাতে এমন একটি পদার্থ বুঝাইতেছে যে, তাহাতে দৈর্ঘ্য কিম্বা বিস্তার, ক্ষুদ্রত্ব কিম্বা বৃহত্ত্ব ইত্যাদি সসীম সম্বন্ধীয় কোন গুণই দৃষ্ট হয় না। যখন বিন্দুকে অখণ্ড আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তখন তাহার দ্বিত্বভাবাভাবে আপেক্ষিক হওয়াও কদাচ সম্ভবপর নহে; সুতরাং বলিতে হইবে বিন্দু নিরপেক্ষ। উপরোক্ত বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বিন্দু অসীম তত্ত্বের নামান্তর মাত্র অতএব দেখা গেল যে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম সূত্রে অসীম সংজ্ঞাই নিরূপিত হইয়াছে।

মুখে আমরা সকলেই ক্ষেত্রতত্ত্বের মতে সায় দিয়া যাই বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে বিন্দু সম্বন্ধে আমাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই। মুখে বলি বিন্দু অখণ্ড পদার্থ, কিন্তু বাস্তবিক মনে ভাবি কি? না, বিন্দু খুব ক্ষুদ্র অণুবিশেষ; ইহা দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহার অংশ নাই অর্থাৎ অখণ্ড, যাহার বিস্তারাদি কোন গুণ নাই, যাহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ফলতঃ যাহা অসীম, তাহার ভাবনা কোথায়? সসীম চিত্তে তাহা অননুভবনীয়, সুতরাং সে বিষয়ে যাহা হউক একটা কিছু ধারণা করিতে গেলেই যে ঘোর ভ্রান্তির হস্তে পড়িতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য। সেই বিন্দুতত্ত্বকে আত্মা আখ্যা প্রদান করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাহা কি প্রকার বলিয়া গিয়াছেন;—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহিয়ান্"—কেবল যে অণুর অণু তাহা নয়, সেই পদার্থই আবার মহতের মহৎ। তাৎপর্য্য এই যে বিন্দু এমন একটি পদার্থ যে তাহাতে অণুত্ব ও মহত্ত্ব একাধারে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ তাহা অণুও নহে, তাহা মহৎও নহে। কারণ সসীম জগতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অণু কখন মহৎ হইতে পারে না, মহৎও কখন অণু হইতে পারে না; সুতরাং এবম্প্রকার উক্তিতে যে সেই সসীম জগতের অতীত পদার্থই উল্লিখিত হইয়াছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। প্রকৃত পক্ষে

বিন্দুরাজ্যে যে ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্বের সাম্যাবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহা ক্ষেত্রতত্ত্বের রীতি অনুযায়িক প্রমাণ করিতে পারা যায়। মনে কর কখগ বৃত্তের অভ্যন্তরে ঘচছ বৃত্তটি আঁকা গিয়াছে; জ বিন্দু উভয় বৃত্তেরই কেন্দ্র। প্রমাণ করিতে হইবে যে কখগ ও ঘচছ রেখা উভয়ে পরস্পর সমান অর্থাৎ কখগ রেখায় যতগুলি বিন্দু আছে ঘচছ রেখাতেও ঠিক ততগুলি বিন্দু পাওয়া যায়। এখন জ বিন্দু হইতে

খ বিন্দু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানা যাউক, এই রেখা ঘচছ বৃত্তকে চ বিন্দুতে ছেদ করিয়া যাইবে। তাহার পর জ বিন্দু হইতে খর ঠিক পরবর্ত্তী বিন্দু ট পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানিলে তাহা ঘচছ বৃত্তকে ঝ বিন্দুতে কাটিবে। এইরূপে টর পরবর্ত্তী বিন্দু সমূহের সহিত জ বিন্দুকে সংযুক্ত করিলে খট ইত্যাদি করিয়া যতগুলি বিন্দু কখগ বৃত্তের মধ্যে পাওয়া যাইবে চঝ ইত্যাদি করিয়া ঠিক সেই পরিমাণে বিন্দু ঘচছ বৃত্তের মধ্যেও যে পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুইটিতেই যখন সমান সংখ্যক বিন্দু মিলিতেছে তখন বিন্দুরাজ্যে এতদুভয়ের সাম্যভাব প্রমাণীকৃত হইল। এ কথা উত্থাপিত হইতে পারে না যে, খ ও ট বিন্দু চ ও ঝ বিন্দু অপেক্ষা দৈর্ঘ্যবিস্তারে বড়; কেন না তাহা বিন্দু সংজ্ঞানুসারে অসম্ভব (বিন্দুতে সংখ্যাভাবও অসম্ভব); কিন্তু তাহা হইলে তৎসহ রেখার উৎপত্তিও অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং প্রথমে রেখা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল বলিয়া ব্যবহারিক ভাবে তাহাতে সংখ্যা ভাব ধরিয়া লওয়া গিয়াছে। পরন্তু বিন্দুতে সংখ্যা ভাব আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা রেখার উৎপত্তি করা যে নিতান্ত ভ্রমের ক্রিয়া, তাহা নিম্নোক্ত বিচারে প্রকাশ পাইবে।
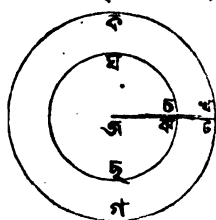
বিন্দুতে বহুত্ব ভাব আনিতে পারা যায় না. কেন না তাহা করিলে তৎ অখণ্ডত্ব ও তৎ নিরপেক্ষত্ব আর থাকিতে পারেনা। তবে কি বিন্দু এক? তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ এক বলিতেই দুয়ের ভাব মনে উপস্থিত হয়, তবে যদি বলা যায় যে বিন্দু দ্বিত্ব ভাব বর্জ্জিত এক, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি থাকে না; কিন্তু এরূপ বলিবার অর্থই এই যে বিন্দুর কোন সংখ্যা নাই। বিন্দু গণন ক্রিয়ার অতীত, কেন না একমাত্র সসীম রাজ্যে গণন-ক্রিয়া সম্ভবপর। সসীম রাজ্যেই গণনার আরম্ভ; অসীম রাজ্যে একও নাই, দুইও নাই; ফলতঃ সেখানে কিছুই নাই। এক মাত্র এই বলা যায় যে,

তাহা অংশ বিরহিত, ছেদ বর্জ্জিত; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে গণনার অতীত। যেখানে অংশ আছে, ছেদ আছে, সেই খানেই গণনা। যাহা অখণ্ড, সুতরাং পূর্ণ; পূর্ণ স্বরূপ সেই অসীমতত্ত্বে যে গণনা ক্রিয়া হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

বিন্দু সংজ্ঞা নিরূপণান্তে ক্ষেত্রতত্ত্বে কথিত হইতেছে যে, বিন্দু সমষ্টিতে রেখার উৎপত্তি হয়; কিন্তু কথা এই বিন্দু সমষ্টিতে রেখার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব পর কি না? বিন্দু সমষ্টির যোগফল বিন্দু ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না, তবে রেখা হয় কোথা হইতে? অংশবর্জ্জিত পদার্থের সমষ্টি একত্রিত করিলে যে পদার্থ উৎপন্ন হইবে, তাহা চিরকাল অংশ বর্জ্জিতই থাকিবে। অগণ্য শূন্য একত্রে যোগ করিলে শূন্য বই কিছু এক যোগফল দাঁড়াইবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টিতেই রেখার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু প্রমাণ করা গিয়াছে যে বিন্দুকে অণুরূপে দর্শন করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; সুতরাং যখন তাহা ক্ষুদ্রও নহে বৃহৎও নহে, যখন তাহার তুলনা একমাত্র শূন্যের সহিতই সম্ভবপর, তখন তৎসমষ্টিতে রেখা জন্মিবে কিরূপে? ইহাই প্রথম আপত্তি।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, বিন্দুতে রেখার উৎপত্তি দূরে থাকুক, বিন্দুর সমষ্টিই বা কর কিপ্রকারে? বিন্দুর সমষ্টি! ইহা সম্পূর্ণ বাতুলের কথা। বিন্দুকে ছেদ-ভাব বর্জ্জিত বলিয়া যখন সংজ্ঞা প্রকরণে নিরূপণ করিয়া গেলে, সংজ্ঞানুসারে যাহার পূর্ণ স্বরূপত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তখন আবার সেই দ্বিত্বভাব বর্জ্জিত পদার্থে বহুত্ব আন কি হিসাবে? যাহার বহুত্ব নাই, তাহাকে বহু করিয়া ধরিয়া তাহার সমষ্টি স্থাপন কোন মতে করিতে পার না। গণনার অতীত পদার্থে গণনা আরম্ভ কর কি বলিয়া? যাহা পূর্ণ, তাহার কি কখন দুই হওয়া সম্ভবপর?

বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ ভাবে যে মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যখন বিকারী চিত্তের প্রলাপ বাক্য বলিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট প্রতীয়মান হয়, তখন তাঁহারা উপরোক্ত ক্ষেত্রতত্ত্বের মত কি হিসাবে গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, বুঝিতে পারা যায় না। উভয় মত কি সমান প্রলাপ বাক্য নহে? কিন্তু প্রলাপ বলিয়া গণিতশাস্ত্রের মত কেহ উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। তাই যদি হয়, তবে বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কি দোষ করিয়াছেন? তাঁহাদেরও মত প্রামাণ্য

বলিয়া কেন না শতকণ্ঠে স্বীকার করিব? নিরপেক্ষ অসীমতত্ত্ব ভিন্ন আপেক্ষিক অসীম জগতের দাঁড়াইবার ভিত্তি নাই, অথচ সেই মনোবাক্যের অগোচর তত্ত্বের উপর কিরূপে এই অসীম সংসার প্রকাশ পাইল, তাহাই প্রকৃত অতি নিগূঢ় রহস্য।

সেই ছেদ-বর্জ্জিত বিন্দু পদার্থে ছেদ দর্শনেই রেখার উৎপত্তি হয়। তাহাতে প্রকৃত পক্ষে ছেদ না থাকিলেও যখনি আমরা সেই পদার্থকে মনশ্চক্ষুতে দর্শন করিতে যাই, তখনি তাহা ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্তের সসীম স্বভাবানুসারে ছেদ ভিন্ন অন্য কিছুই ধারণা করিতে পারি না; সুতরাং আমরা স্বভাবতঃই সেই অখণ্ড পদার্থের ছেদ ভাব আনয়ন করিয়া থাকি। পল-ওয়ালা কাচের ভিতর দিয়া যখন সূর্য্য কিরণ দেখা যায়, তখন সেই সূর্য্য কিরণ আর পূর্ব্বের মত থাকে না; তাহার কারণ কি? না, উক্ত পল-ওয়ালা কাচ। তার ফল কি? না, অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রমদর্শন। সুতরাং ইহাই বলা উচিত যে, বিন্দু অধ্যাস প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ ছেদ ভাব জনিত বহুত্বে পরিণত হইলে রেখার উৎপত্তি হয়। ছিল দ্বিত্ব ভাব বর্জ্জিত অখণ্ড পদার্থ, হইল কি না বহুত্বভাব যুক্ত খণ্ড সসীম পদার্থ। কিসে? অধ্যাসে।

এই অধ্যাস প্রকরণ হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে একটি মহাবিচারের স্থল বলিয়া পরিগণিত। তাঁহাদের মতে এ জগত অধ্যাসেই সমদ্ভূত। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকলি অধ্যাস বলে সংঘটিত হইয়া থাকে। বেদান্তে যাহাকে অধ্যাস কহিয়া গিয়াছেন, পাতঞ্জল তৎপ্রণীত যোগশাস্ত্রে তাহাকে চিত্তের বিপর্য্যয় বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই বিপর্য্যয় জ্ঞান কি প্রকার? না "মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপ প্রতিষ্ঠম্" অর্থাৎ স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে সে বিষয়ে চিত্তে যে মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হয়, তাহারই নাম বিপর্য্যয় জ্ঞান। বেদান্তাদি সকল শাস্ত্রের মতে সেই পুরুষ অর্থাৎ সেই নিরপেক্ষ অসীম তত্ত্ব চিত্তে বিপর্য্যয় বা অধ্যাস প্রাপ্ত হইলে সসীম আপেক্ষিক জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ফলতঃ তাহা ভ্রমবশতঃই ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে সেই অসীমতত্ত্বই চিত্ত ইন্দ্রিয়াদির ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পতিত হইয়া সসীমবৎ প্রতীয়মান হয়। এই জগৎ ইন্দ্রজাল; মরুর মরীচিকাবৎ; ইহার সারত্ব কিছু মাত্র নাই, এ সমস্তই অসৎ।

তাহা হইলে ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, আমরা যা কিছু দেখিতেছি, যা কিছু শুনিতেছি, যা কিছু ভাবিতেছি, সে সকলই তবে ভ্রম! আমার শব্দ

স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ জ্ঞান ; আমার অহংজ্ঞান, চিত্তে বিশ্বাস স্থাপনা, তবে এ সকলি ভ্রম ! যদি সেই অসীমতত্ত্বকে সৎ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়,তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে যে এ সকলই অসৎ,তাহা বলা বাহুল্য। এই যে,একজন ব্যক্তি হস্তে কলম্ ধরিয়া সেই নিরপেক্ষ অসীম সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়াছে, তদন্তঃকরণস্থিত সংস্কারও সেই অসীম তত্ত্বের সম্বন্ধে অসৎ। আপেক্ষিক জগতে এ বিচার সত্য হইতে পারে, কিন্তু সেই নিরপেক্ষ জগতে কোন বিচার নাই। সেখানে সকল বিচার, সকল সংস্কার, সকল বিশ্বাস শেষ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এ সমস্ত কথা যাউক। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি যে আমাদিগকে পদে পদে ভ্রমে পাতিত করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট হইতে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান লাভ যে অসম্ভব, ফলতঃ জ্ঞানের কারণ হওয়া দূরে থাকুক, তাহারাই যে আমাদিগের অজ্ঞানের কারণ; তাহাই এ স্থলে বিচার্য্য। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, এই দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের জ্ঞানবারি অনবরত ক্ষরিত হইতেছে। যোগ শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন যে, চিত্ত বৃত্তি নিরোধ ভিন্ন স্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব। হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় এই উপদেশ পাওয়া যায়।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে মানবান্তঃকরণের ত্রিবিধ অবস্থা দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই মানুষ তদন্তঃগত অনুভূত পদার্থ সমূহে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারে না। স্বপ্ন যদি তেমন জীবন্ত হয়, তাহা হইলে জাগ্রত অবস্থারও অধিক তৎকালে তাহাতে আস্থা প্রদান করিয়া থাকি। সুষুপ্তির অজ্ঞানাবস্থায় যখন মানুষ শায়িত থাকে, তখনও নিজ অবস্থার প্রতি কদাচ অসত্য জ্ঞান উপলব্ধি হয় না। এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া গিয়াছে যেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ স্বপ্নদৃষ্ট অনুভব সমূহের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনা করিয়া বিবিধ রহস্য জনক কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অতি দরিদ্র, স্বপ্নে সেই ব্যক্তি আপনাকে নরপতি জ্ঞানে প্রতিরাত্রি কাল্পনিক রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। এইরূপ ধরণের শত শত ঘটনা প্রত্যহ শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু কথা এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও ঘটনা সমূহকে যদি আমরা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিই, তাহা হইলে জাগ্রতাবস্থায় যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, তাহার উপর বিশ্বাসইবা কি হিসাবে করিতে পারি ? স্বপ্নাবস্থায় যদি আন্তরিক

বিশ্বাস আমাদিগকে প্রতারিত করে, তবে জাগ্রতাবস্থাতেই বা যে তাহা না করে, এ কথা কে বলিবে? ফলতঃ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার ভিতর কোন্‌টি ঠিক কোন্‌টি অঠিক তাহা বাছিয়া লইতে পারা যায় না, তাহারি কারণ এই যে এই তিনই মিথ্যা, কোনটিই ঠিক নহে। নিম্নোক্ত বিচারে তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

যে কোন অবস্থাতেই হউক চিত্তে বাহ্য বা আন্তরিক বিষয় তাড়িত হইয়া যে সকল অনুভব প্রতিফলিত হয়, সেই অনুভব সমষ্টির উপর আমরা স্বভাবতঃই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকি। স্বপ্নাবস্থায় কোন বাহ্য পদার্থ সম্মুখে বিদ্যমান না রহিলেও তৎগুণ সমষ্টির সংস্কার চিত্তে পুনরুদিত হয়; সুতরাং আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি। জাগ্রতাবস্থাতেও এইরূপে বিদ্যমান পদার্থ সম্বন্ধীয় গুণসমষ্টির সংস্কার চিত্তে উদয় হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস না জন্মিবার কারণ এই যে, তৎকালে বাহ্য পদার্থের দ্বারা উত্তেজিত অনুভব সমষ্টির ন্যায় সেই সংস্কার চিত্তে অনুভব ক্রিয়ার তীব্রতা সংসাধিত করিতে পারে না; সুতরাং উভয়ের তুলনায় উভয়ের তারতম্য বোধে বিশ্বাসেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যদি উক্ত সংস্কার উপযুক্ত পরিমাণে অনুভবের তীব্রতা সংসাধন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে জাগ্রতাবস্থাতেও আমরা তাহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিব না। এইরূপ ঘটনাও সদা সর্ব্বদা যেখানে সেখানে ঘটিতেছে, ইংরাজীতে ইহাকেই Hallucination কহে। এই অবস্থায় কিম্বা স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট পদার্থ সমূহে যে কাল্পনিক অর্থাৎ নিজেরই চিত্তের বিকার বিশেষ, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। পরন্তু জাগ্রতাবস্থাতেও যে অবিকল তাহাই প্রকারান্তরে ঘটিয়া থাকে, এ কথা বোধ করি কেহ স্বীকার করিবেন না। এইখানেই গোল। মনে কর জাগ্রতাবস্থায় কোন পদার্থ বিশেষ সম্বন্ধে আমার দর্শন জ্ঞান উপলব্ধি হইতেছে, দেখিতেছি যে সেই বস্তু আমার বাহিরে। আন্তরিক বিশ্বাস দ্বারা আমার এইরূপ প্রতীতি হইলেও বক্তব্য এই যে, বাস্তবিকই কি আমি সেই বাহিরের বস্তু দর্শন করিতেছি, না আমার স্নায়ুগোলকে প্রতিবিম্বিত সেই বাহিরের বস্তুটির ক্ষুদ্র ছবিখানি মাত্র দেখিতেছি? প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, দর্শনকালে আমরা সকলেই নিজ নিজ মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত ছবিখানিকে উপলব্ধি করিয়া থাকি; কিন্তু তথাচও সে অবস্থায় নিজ অন্তরস্থ অনুভব বিশেষকে ও স্নায়ুগোলক-

স্থিত সেই ছবিখানিকে আমরা বাহিরে প্রতিফলিত দেখিয়া তদনুযায়ী বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। আনুমাণিক বাহ্য পদার্থ দ্বারা প্রতিহত হইয়া ইন্দ্রিয়-গোলকে যে বিকার বিশেষ ঘটিয়াছিল, সেই বিকারকেই আমরা তৎপদার্থের রূপ আকারাদিরূপে বিবেচনা করি; ফলতঃ সেইরূপ ও আকার যে স্বরূপতঃ ঠিক. এমত কদাপি হইতে পারে না। অদ্য ইন্দ্রিয় গোলকস্থ স্নায়ুর যে অবস্থা আছে কাল যদি তাহার কিছু ইতর বিশেষ ঘটে, তবে সেই ইতর বিশেষের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বাহ্য পদার্থের রূপ ও আকার ইত্যাদি উপাধি সমূহেরও ইতর বিশেষ হওন অবশ্যম্ভাবী। আমি আমার ইন্দ্রিয়-গোলকের ভিতর দিয়া যেমত উক্ত পদার্থের আকারাদি অনুভব করিলাম, সেই মত যে তুমিও অনুভব করিবে তাহার স্থিরতা কিছুমাত্র নাই ও থাকিতে পারে না। তোমার ইন্দ্রিয়-গোলকের সহিত আমার ইন্দ্রিয়-গোলকের, তোমার চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্মের সহিত আমার চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্মের যতটুকু সৌসাদৃশ্য আছে,ততটুকুই তোমার অনুভবের সহিত আমার অনুভব মিলিবে। কিন্তু সর্ব্বাংশে সৌসাদৃশ্য কোন ক্রমেই কোন জীবমণ্ডলীর মধ্যে সম্ভবপর নহে; সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হই-তেছে যে, জগতের প্রত্যেক জীব নিজ নিজ চিত্ত-বুদ্ধ্যহঙ্কারাদির স্বাভাবিক ধর্ম্ম অনুসারে সেই একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ উপাধি কল্পনা মতে তদনুযায়ী বিশ্বাস করিবে। আমার নিকটে এ জগৎ যেমন দেখায়, তোমার নিকট এ জগৎ তেমন নয় ও হইতে পারে না। আমি পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব, আমার কাছে এ জগৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধময়; তুমি জন্মান্ধ, আবার তার উপর যদি তুমি চিরবধির হও, তাহা হইলে তোমার নিকট এ জগত কেবল স্পর্শ রস গন্ধময়। কোন ছয় বা ততোধিক ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবে আবার (যদি এরূপ জীব থাকা সম্ভবপর হয়) যে ভাবে এ জগৎকে অনুভব করিবে, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। জগতের এইরূপ বহুবিধ রূপান্তর ও বৈচিত্রতাতে তৎ স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশিত হইবার উপায় থাকে না; কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে উপ-রোক্ত পরিণাম সমূহ ইন্দ্রিয় চিত্তাদির বিকার বিশেষ ও অধ্যাস বশতঃই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব প্রমাণ হইল যে, ইন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান লাভের কখন কারণ হইতে পারে না; বরং তৎ লাভের পথে মহা প্রতি-বন্ধক স্বরূপ। ইন্দ্রিয় ঘোর আবরণের কারণ।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে বাহ্য পদার্থের অনুভব কালে তৎগুণ সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছুই আমাদের উপলব্ধি হয় না, অথচ আমরা আন্তরিক বিশ্বাস বলে সেই অনুভূত গুণ সমষ্টির আধার পদার্থে "অস্তীতি" ভাব আরোপ করিয়া থাকি। সেই আন্তরিক বিশ্বাসের সত্যতার উপর আমরা নির্ভর করিতে পারি কি না? যে স্থলে বাস্তবিক কোন বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান নাই, অথচ তদনুভব সমষ্টি বিদ্যমান আছে, সে স্থলেও এই আন্তরিক বিশ্বাস আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না; যথা স্বপ্নকালে বাহ্য পদার্থাভাবেও চিত্তে তৎগুণ সমষ্টির সংস্কার উদিত হইলে, তখনও আমরা আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতে "অস্তীতি" ভাব আরোপ না করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব এই আন্তরিক বিশ্বাসের উপর অবিশ্বাস করা একবারেই অযুক্তি সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু সহস্র বুঝিলেও উপরোক্ত ত্রিবিধ অবস্থার কোন অবস্থাতেই এই আন্তরিক বিশ্বাস আমাদিগের অন্তঃকরণ হইতে উপনীত হইতে চাহে না। এবম্বিধ আন্তরিক বিশ্বাসের মূল কোথায়? এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই জগৎ সত্য, স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ইহারই উত্থান পতনের সহিত জগতের উত্থান ও পতন।

এবম্বিধ আন্তরিক বিশ্বাসের কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়-বিকার-জনিত অন্তরস্থ অনুভব সমষ্টিকে যেমন অভ্যাস বশতঃ বাহ্যে প্রতিফলিত হয় দেখি ও তদনুযায়ী বিশ্বাস করি, সেই রূপ নিজেরই অস্তিত্বের ভাব সেই অনুভব সমষ্টির উপর আরোপিত হইলে তাহাও তৎসহ বাহ্যে প্রতিফলিত হয়; সুতরাং তাহাই "ইদমস্তি" ভাবে অন্তরে প্রতীয়মান হয়। মনে কর একটি গোলাপ দেখিতেছি অর্থাৎ নিজের আন্তরিক বিকার বিশেষ বাহ্যে প্রতিফলিত হইতেছে। যদি বল যে, উক্ত গোলাপের পদার্থত্ব সম্বন্ধে অনুভব আসিতেছে কোথা হইতে? তাহার উত্তর এই যে, সেই আন্তরিক বিকার বিশেষের সহিত আমার নিজের অস্তিত্বের ভাব জড়িত রহিয়াছে, এবং না রহিয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং অভ্যাস বশতঃ সেই ভাব বাহিরে দেখিয়া গোলাপ নামে একটি পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতেছি। এই কারণ স্বপ্নকালীন অনুভূত আন্তরিক ছবিগুলিতেও নিজ অস্তিত্বের ভাব প্রতিফলিত হওয়াতে তাহারা আমাদিগের নিকট স্বতন্ত্র পদার্থবৎ প্রতীয়মান না হইয়া থাকিতে পারে না। উদ্ভ্রান্ত মস্তিষ্কে যে সকল বিকৃত ছবি

উদয় হয়, ঘোর পাগল ব্যক্তি কি কখন তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে?

সুতরাং শেষে এই মীমাংসা দাঁড়াইতেছে যে, যখন আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের বিকার বিশেষকেই অধ্যাস বশতঃ জগতের রূপ আকারাদি উপাধি বলিয়া কল্পনা করিতেছি, যখন নিজেরই অস্তিত্বের ভাব সেই উপাধি সমূহের উপর প্রতিফলিত করিয়া "ইদমস্তি" রূপে জগৎকে দেখিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন জগতের সত্যতার ভাণ দূরে চলিয়া যায়। আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি যে, অবশ্যই আমার সম্মুখে কোন পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারাই আমার ইন্দ্রিয় সমষ্টির বিকার উদ্ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু যখন বিচারান্তে দেখা যাইতেছে যে, এবম্বিধ 'অস্তীতি' ভাব আমার নিজ অস্তিত্বেরই প্রতিবিম্ব মাত্র ও অধ্যাস বশতঃ সেই প্রতিবিম্বকে—সেই ছায়াকেই আমরা সকলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি—তখন এ জগতের দাঁড়াইবার আর কোন স্থল রহিল না, তখন জগতের পরিবর্ত্তে এমন একটা কিছু তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়, যাহা জগতের পক্ষে অসৎ অথবা ভাবান্তরে তাহাকে যদি সৎ ধরা যায় তাহাহইলে এ জগৎ তৎসম্বন্ধে অসৎ। আমারই সত্তার প্রতিবিম্বে এই জগৎ সৎ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা যে পদার্থ তাহা কভু উক্ত সৎ পদে বাচ্য হইতে পারে না অর্থাৎ তাহা যে ভাবের সৎ তাহা আমাদিগের সৎভাবের অতীত; ফলতঃ তাহার স্বরূপ কি প্রকার তাহা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই। তাহাকে যেরূপ করিয়া ভাবিব, তাহা সেরূপ নহে; কারণ যা কিছু কেন ভাবি না, সকল ভাবনাই আমার চিত্তের সংস্কার বা বিকার বিশেষ। তবে চিন্তা এখানে পরাস্ত, বুদ্ধি এখানে মূক। তবে আইস বসিয়া বসিয়া সেই নামরূপ বিহীন অচিন্ত্য অগম্য নিরপেক্ষ অসীমতত্ত্বের উপর ইন্দ্রিয় চিত্তাদির বিচিত্র অধ্যাস অবলোকন করি—

"স্বপ্নো জাগ্রত্যসদ্রূপঃ স্বপ্নে জাগ্রদসদ্বপুঃ।
মৃতির্জ্জন্মন্যসদ্রূপা মৃতৌ জন্মাপ্যসন্ময়ম্ ॥
জগন্ময়ো ভ্রান্তিরিতি ন কদাপি ন বিদ্যতে।
বিদ্যতে ন কদাচিচ্চ জলবুদ্বুদবৎ স্থিতম্ ॥

আত্মৈবাস্তি পরং সত্যং নান্যাঃ সংসার দৃষ্টয়ঃ।
শুক্তিকারজতং যদ্বদ্ যথা মরুমরীচিকা॥
যো হ্যশুদ্ধমতির্ম্মূঢ়ো রূঢ়ো ন বিততে পদে।
বজ্রসারমিদং তস্য জগদস্ত্যসদেব সৎ॥”

জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নকে অসত্য বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নে জাগ্রতাবস্থাকে অসৎ বোধ হয়, এইরূপ জন্মাবস্থাতে মৃত্যু ও মরণাবস্থাতে জন্ম অসৎ বোধ হয়। ভ্রান্তিতেই জগৎ পরিপূর্ণ, এই জগৎ কোন কালে কোন স্থানে বিদ্যমান নাই, জল বুদ্‌বুদ্‌বৎ ইহার স্থিতি। একমাত্র সেই আত্মাই সৎ, সংসারে অন্য কিছুই সৎ নহে; শুক্তিকাতে রজত ভ্রমের ন্যায় মরুতে মরীচিকা দর্শনের ন্যায় আমাদিগের অসত্যে সৎ বোধ জন্মিয়া থাকে। মূঢ় অবিবেকী ব্যক্তিগণই অসত্যে সত্য জ্ঞান বশতঃ এই জগৎকে বজ্রসারের ন্যায় দৃঢ় জ্ঞান করে।

কিন্তু এখনো কথা ফুরায় নাই। বুঝিলাম যেন যে এ সকলই আমার নিজের চিত্ত ইন্দ্রিয়াদির বিকার বিশেষ, বুঝিলাম যেন যেরূপ আমার অন্তরস্থ অনুভবের অধ্যাসে বাহ্য অনুভব ক্রিয়া সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে সেইরূপ “অহমস্মি” এই ভাবের অধ্যাসে “ইদমস্তি” ভাব সঙ্ঘটিত হইয়া ইন্দ্রজালবৎ সসীম জগতের আবির্ভাব হয়; কিন্তু এততেও সসীম রহস্য কিছুমাত্র ভেদ হইল না। উপরোক্ত বিচার সমূহ দ্বারা সসীম উৎপত্তির প্রকৃত কারণ কিছুই স্থির হইল না; তদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, আমাদের ইন্দ্রিয় চিত্তাদির সসীমত্ব বিধায়, তদধ্যাস বশতঃ সেই নিরপেক্ষ অসীম তত্ত্বে জগৎ ভ্রম উদ্ভূত হয়। সুতরাং শেষে ইহাই প্রমেয় হইতেছে যে, আমাদের ইন্দ্রিয় ও চিত্তাদির যে সসীমত্ব তাহার মূল কোথায়? তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে সসীম তত্ত্বের মূল রহস্য স্থিরীকৃত হইবে।

বাস্তবিক সেইখানেই সসীম তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য; কিন্তু এই প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রশ্নের মীমাংসাও অত্যন্ত দুরূহ বিধায় দুই এক কথায় হওয়া সম্ভবপর নহে, সুতরাং পাঠক বর্গের ধৈর্য্য চ্যুতির আশঙ্কায় এবারে এইখানেই নিরস্ত হইতে হইল।

শ্রীবিপিনবিহারী সেন। *

---

* যখন এই লেখকের প্রথম প্রস্তাবটী আমাদের হস্তগত হয়, তখন আমরা ইঁহার

কেন গাঁথিলাম ?

(কুমারীর চিন্তা)

কেন গাঁথিলাম হার আশার কুহকে ?
হৃদয়-উদ্যান ভরি
যে কুসুম শোভা করি
ফুটেছিল প্রীতি-রাগে জীবন-প্রভাতে,
সুখে দুঃখে অনিবার
বরষি লোচন-ধার
এত দিন যেই ফুল রাখিনু সজীব,

২

কেন তুলিলাম তাহা, গাঁথিলাম হার,
কার কণ্ঠে দিব মালা
জুড়াইয়া হৃদি জ্বালা ?
এত ভক্তি ভালবাসা—এত প্রেম দান
কেবা আছে লইবারে ?
এ হার পরা'ব কারে ?
প্রণয়-কুসুম-মালা পবিত্র রতন।

৩

অসময়ে প্রেম হার গাঁথিয়াছি হায় !
জনমিয়া আর্য্য-কুলে
বংশের গৌরব ভুলে
ভারত সন্তান আজি অনার্য্য, পতিত,
কেমনে তাদের গলে
পরাইব কুতূহলে
পরিণয়-ফুল হার অমর-বাঞ্ছিত ?

বিষাদের অশ্রুবারি আসিছে নয়নে,
শৈশবের সুখ আশা
যৌবনের ভাল বাসা
করুণ-বিলাপে হৃদি আকুল করিয়া
দেখাইছে ভবিষ্যত
নৈরাশ্যের চিত্র কত
হেরিয়া আমারে প্রাণ হয়েছে মগন।

৫

সাধের কুসুম মালা শুকাইবে যবে,
দিবনা নয়ন-ধার
বাঁচাইতে পুনর্ব্বার,
ঝরিবে সৌরভ কণা দিবসে দিবসে,
শত বর্ষ যাবে বয়ে
প্রণয়ে নিরাশ হয়ে,
রহিব ব্যথিত চিত্তে এমনি করিয়া।

গৌরবের স্মৃতি মম ভারত শ্মশানে
বিবাহ উৎসব হেন
আজিরে শোভিবে কেন ?
চির কুমারীর ব্রত পালিব আদরে
তথাপি দিবনা হার
পর কণ্ঠে একবার
যতনের গাঁথা মালা ফেলিব ছিঁড়িয়া।

নাম জানিতে পারি নাই। কিন্তু লেখা দৃষ্টে ইঁহাকে একজন হিন্দু দার্শনিক বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে আমরা "জনৈক হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিত" নাম দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এবার তাঁহার প্রকৃত নাম প্রকাশিত হইল।

৭

সাজেনা সাজেনা হায়! বাসর-কৌতুক
ভারত-ভবনে আর,
কার গলে প্রেম হার,
পরাইছ আর্য্য নারী মোহিত অন্তরে?
ছায়া সহ পরিণয়ে
কেমনে হৃদয় লয়ে
হাসিছ আনন্দে সদা ভুলিয়া সকল?

৮

যুগান্তর মরিয়াছে আর্য্য সুত গণ,
তোমরা বিধবা এবে,
সধবার বেশ তবে
কেন নাহি পরিহার কর গো ভগিনি?
শব সনে সহবাসে,
শুধু পবিত্রতা নাশে,
বাঁচিয়া এমন করি কি হবে জীবনে?

৯

সহমরণের চিতা জ্বালাও পুলকে
যমুনা জাহ্নবী তীরে,
করি স্নান পূত নীরে,
মৃত পতি কোলে লয়ে পবিত্র অনলে
প্রবেশিয়া একে একে,
পাপ দেহ ছাড়ি সবে,
নূতন জীবনে যাও শান্তি নিকেতনে।

১০

আমিও প্রসন্ন-মনে তোমাদের সহ
পুষ্প মালা লয়ে করে,
আবার জীবন তরে
চিতায় সোঁপিব প্রাণ দিবনা কখন
সুখ পরিণয় হার
মৃত আর্য্য গলে আর—
কাঁদিবনা শুষ্ক মালা হৃদয়ে লইয়া।

শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী।

প্রাচীন ভারতে ছাত্র-শক্তি।

বঙ্গভাষায় দুইটী শব্দাংশ লইয়া ইতিহাস শব্দ গঠিত।—ইতি এবং হাস। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে যাইলে, হয় আরম্ভেই ইতি করিতে হয়, না হয় ভারতের পূর্ব্ব-গৌরব বিরোধী মহাশয়গণের নিকট শেষাংশ প্রাপ্ত হইতে সদা প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। হৃদয়ের আবেগ বশাৎ আরম্ভেই ইতি করা সম্ভব হইল না। উপসর্গ-প্রমুখ অপরাংশ উপসর্গ হইলেও প্রকৃত প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি?

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—যাহাদের সঙ্গে প্রাচীন মিশাইয়াছে, প্রাচীনত্ব মিশাইয়াছে, ইতিহাস মিশাইয়াছে, উপহাস মিশাইয়াছে, তাহাদিগকে একবার সুধাইব প্রাচীন ভারতে ছাত্র-শক্তি কি প্রকার ছিল?

ধ্রুব-প্রহ্লাদের প্রস্তর মূর্ত্তি, অযোধ্যায় সরযূকূলে লবকুশের শেষ চিহ্ন, কুরু-ক্ষেত্রের মহাশ্মশানে অভিমন্যুর দেহরেণু, সুধন্বার অস্থি-কণা, বাদলের বীরকীর্ত্তি, গোয়ালিয়রে তানসেনের সমাধি, স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করিতেছে, বাল্যে ধর্ম্মে বীরত্ব, সঙ্গীতে প্রতিভা, সমরে পরাক্রম প্রদর্শন করিতে ভারত সন্তান পরাঙ্মুখ ছিল না। ভারতে বালক বিশেষের অতুল শক্তির অক্ষয় দৃষ্টান্ত অপ্রতুল হইবে না। কিন্তু আমরা বালক বিশেষের শক্তি আলোচনা করিতে প্রয়াসী হই নাই। ছাত্র-শক্তি বলিয়া কোন শক্তি ছিল কি না, আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

ত্রিংশ বর্ষ বয়সে আলেক্জেণ্ডার বীর, নেপোলিয়ান সেনাপতি এবং সম্রাট, ওয়াসিংটন বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি; বাল্যে বেকন, মিল, হিউম, পেস্কেল, নবীনে প্রবীণ; সপ্তদশ বর্ষে ডিমস্থেনিস বাগ্মী; ষড়বিংশে কাইকেরো বক্তা; ষষ্ঠে মোজারেট সঙ্গীতে জারমেন সম্রাটকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন! ডেণ্টী, শেলী, কীটস্, পোপ, মুর বাল্যে কবি; ঈশা, বুদ্ধ রামমোহন, কেশব কৈশরে ধর্ম্মবীর! প্রতি দেশে বালক বিশেষ বা বিশেষ-বালক প্রতিভা প্রদর্শনে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ছাত্র-শক্তির মিলন-মন্ত্র উদ্বোধন উদ্দীপনার পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র দেশে ছাত্র-শক্তির তেমন অক্ষুণ্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে ইহার উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছে। ইটোনিয়ান দল তাহার অগ্রণী। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশক্তির বিরাট মূর্ত্তির জন্য তৃণ সংগ্রহ করিতেছে। কালেইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে। ষোড়শোপচারে পূজা চলিবে। রুষিয়ার ছাত্র-শক্তি রুধির-বাহিনী-দানব নদীর তীর-শোভী মহাবৃক্ষ। ইংলণ্ড ফ্রান্স পশ্চাৎপদ নহে। জারমেন রাজ-পতাকা ছিন্নে কোন পৌরুষ আছে, আমরা তাহা বলিতেছি না। ইউরোপে ছাত্র-শক্তি উপহাসের বিষয় নয়, আমরা তাহাই বলিতেছি। প্রসিদ্ধ রাজনীতি-বেত্তা লর্ড বীকনস্ফিল্ড এক দিন বলিয়াছিলেন "The history of heroes is the history of youths." তাহার এক বর্ণও অসত্য নহে। প্রাচীন স্পার্টাতে ছাত্রশক্তির সম্মান হইত, প্লুটার্ক তাহারা জীবন্ত বর্ণনা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। স্পার্টার একটী প্রথা ছিল—উৎসবাদিতে দেশের বালক বৃদ্ধ যুবকদের তিন শ্রেণী অগ্র পশ্চাৎ তিন পংক্তিতে সৈন্যের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ করা হইত। প্রথমতঃ পক্বশ্মশ্রু বৃদ্ধেরা ভগ্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করিতেন:—

Once in battle bold we shone. একদা সমরে মোরা ছিলাম সাহসী।

তৎপর সেই ক্ষীণ অথচ গম্ভীর ধ্বনি অনুসরণ করিয়া অপর দল বীর-দর্পে বলিয়া উঠিতেন:—

Try us our vigour is not gone. নিভেনি মোদের তেজ দেখহ পরশি।

সেই ধ্বনি আকাশে মিশাইতে না মিশাইতে বালকগণ নববলে দৃপ্ত হইয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া নিনাদিত করিত:—

The palm remains for us alone. কেবল মোদের তরে আছে যশোরাশি।

বালকদের প্রতি এ প্রকার সম্মানই স্পার্টার গৌরবের অন্যতর কারণ। বৃদ্ধের অভিজ্ঞান, মধ্যবয়স্কের বিক্রম স্পার্টাতে উপহাসের বিষয় ছিল না, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

স্পার্টার উক্ত প্রকার শক্তি ছাত্র-শক্তি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি কি না, সে মীমাংসায় উপস্থিত হইবার আবশ্যকতা নাই। বর্ত্তমানে ছাত্র-শক্তি বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী মাত্রেই ছাত্র। ক-এ কমলা, খ-এ খড়্গ বর্ণমালা-হস্তে শিশু হইতে রেংলার উপাধি প্রার্থী পর্য্যন্ত ছাত্র। এই পাঁচ এবং পঁচিশে মিশাইয়া এই কমলা এবং খড়্গো মিশাইয়া, এই শিশুর সরলতা এবং যুবকের প্রথম উদ্যম মিশাইয়া, ছাত্রগণের ধর্ম্মানুরাগ এবং সাধু জীবনের প্রভাব মিশাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা সম্বলিত যে সমবেত শক্তি, তাহাকে ছাত্র-শক্তি বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। এখানে বিন্দু হইতে বারি-ধারার সমন্বয়। একের সঙ্গে একশতের বিরোধ নাই। একটী একটী করিয়া এক শত। এক বিমুগ হইলে কেবল যুগ্ম শূন্য অবশিষ্ট থাকে, এখানে এই গণিতের শিক্ষা হয়। এখানে বহুবচনের জন্য ব্যস্ততা নাই, ছাত্রশক্তির সংস্কৃত ব্যাকরণ বহুর একবচনের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করে। পুরুষ এক, প্রকৃতি এক, প্রত্যয় এক—তদ্ধিত এখানে অবশ্যম্ভাবী। ঝিনাই হইতে ব্রহ্মপুত্র, মধুমতী হইতে কুমার, দামোদর হইতে ভাগীরথী, সমস্ত স্রোত রেখার সমবেত ধ্বনি যে স্থানে সমাগত, সে স্থান কোলাহলময় সাগর সঙ্গম—

শব্দ রাজ্যে সে স্থান শক্তি। যুঁই হইতে গন্ধরাজ, পলাস হইতে নাগেশ্বর, কেতকী হইতে কাঞ্চন, বিগোনিয়া হইতে জিনিয়া এল্‌গিন; গোলাপ হইতে স্থলপদ্ম, কুমুদ হইতে ভিক্‌টোরিয়া লিলী সমন্বিত যে স্থান তাহা বাগান—রূপ এবং গন্ধ রাজ্যে তাহা শক্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল বিন্দুবৎ অগণ্য নক্ষত্র-মণ্ডিত সুবিস্তীর্ণ আকাশ সৌন্দর্য্য-পুরে শক্তি। নয়নবিম্বানুকারী সুবিশাল শুভ্রাকাশ-কোলে কজ্জল রেখাবৎ অমরবাঞ্ছিত গিরিশ্রেণী শোভাবাজারে অতুল শক্তি। নলিন সুরেনের সমবেত চক্ষু চাহনি, রজনী প্রভাতের আনন্দ উৎসাহ, গুণেন্দ্র গণপতির জ্ঞানানুরাগ, অতুল অমৃতের ধর্ম্মতৃষ্ণা, কৃতান্ত জিতেনের নির্ভীকতা, প্রফুল্ল প্রিয়লালের উদার অটল ভালবাসায় একাকার—ইহাই ছাত্র শক্তি। এ শক্তি যখন হুঙ্কার করে, তখন স্বয়ং শূলপাণিও উন্নতির দ্বার অবরোধ করিতে সমর্থ নহেন। এ শক্তির প্রভাবে অত্যাচারের দুর্ভেদ্য দুর্গ নিমেষ মধ্যে ধূলি ধূলি হইয়া যায়, দেখিতে দেখিতে মহাশ্মশানে মরকতকুঞ্জ আবির্ভূত হয়। ছাত্র বিশেষে নহে কিন্তু ছাত্র সমাজ ভরিয়া, বিদ্যালয় বিশেষে নহে কিন্তু বিশ্ববিদালয় ভরিয়া, গ্রাম ভরিয়া নহে, সমগ্র দেশ ভরিয়া ছাত্রমণ্ডলীর যে বৈদ্যুতিক সমবেত ভাব, ভাব-জনিত কোলাহল, কোলাহল জনিত ক্রিয়া, তাহাই ছাত্র শক্তির ফল। বঙ্গের ছাত্র-ধমনীতে "ঠিক্" "ঠিক্" "অঠিক্" "অঠিক্" করিয়া আঘাত করিলে বোম্বাইর ছাত্র-ধমনীতে "ঠিক্" "ঠিক্" "অঠিক্" "অঠিক" করিয়া যে বৈদ্যুতিক ধ্বনি হয়, তাহা ছাত্র-শক্তির প্রমাণ। এ শক্তি সম্ভূত প্রমাদ অপ্রমাদ গণনায় আনিতেছি না। নদ নদী গড়ে বলিয়া শক্তি, ভাঙ্গে বলিয়া গুরুতরশক্তি—নমস্য দেবতা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আভাস প্রদান করিয়াছি, প্রাচীন ইউরোপে ছাত্র-শক্তি বলিয়া কোন আরাধ্য শক্তি ছিল না। তথায় ছাত্র-শক্তি অল্পদিন হইল সাধারণ্যে শক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কালে উহা পঞ্চম শক্তিরূপে পরিণত হইবে। আমরা অতঃপর দেখাইতে চাই, ভারতে প্রাচীনকালে ছাত্র-শক্তি পূজিতা ছিল এবং ছাত্র-শক্তির প্রতি উপহাসে মহা বিপ্লব সংঘটিত হইত।

প্রাচীন ভারতে সূর্য্যবংশ ছিল, চন্দ্রবংশ ছিল। সূর্য্যবংশে রাম, লক্ষ্মণ ভরত, শত্রুঘ্ন চারি ভাই। চারি ভাই বাল্যে চতুষ্টয়ে-গঠিত ছাত্র-শক্তি। যৌবনে দুই ভাইয়ে শক্তি—লক্ষ্মণের মত ভাই ভিন্ন কি সীতার উদ্ধার হইত?

শক্তি বটে—কিন্তু এক পরিবারে মাত্র দুই জন। তখন দূরস্থ অন্য পরিবারের বালকে বালকে বাটুলক্রীড়া ভিন্ন অন্য কোন বন্ধন ছিল কিনা, তাহা আমরা জানি না। তখন সর্ব্ব শ্রেণীতে শিক্ষার বহুবিস্তৃতি ছিল না, তাড়িতবর্ত্ম বাষ্পীয় শকট ছিল না বলিয়া এক দেশের নিশ্বাস-বায়ু বিশ্বাসের বল অন্য দেশে পৌঁছিত না। কেবল পরিবারে পরিবারে বালকে বালকে ভাই ছিল। চন্দ্র বংশে পঞ্চ পাণ্ডব দুর্দ্ধর্ষ ছাত্র-শক্তি। অলাবু-খণ্ড ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণও ছাত্র-শক্তি—এতদুভয়ই ক্ষত্রিয়ের ছাত্র-শক্তি। শিক্ষায় ছাত্র-শক্তি ব্রাহ্মণকুলে। ব্রাহ্মণ-কুলেই ছাত্র-শক্তি অর্থ-যুক্ত হইয়াছে। এক এক ঋষির অসংখ্য শিষ্য ছিল, গুরুর প্রকৃতি ভেদে শিষ্যের প্রকৃতির ভিন্নতা জন্মিত। সে ভিন্নতায় ছাত্র-শক্তির ব্যাঘাত করিত কিনা তাহা আলোচনার আবশ্যকতা নাই। পুরাণকার বলিতেছেন—বালিখিল্য বলিয়া এক তাপস সম্প্রদায় ছিল। ইহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ—ন্যেংটে ইঁদুর—প্রকৃতিতে মহাপুরুষ। দলন অথবা ছলনা করিতে চাও, যদু বংশের ধ্বংস বিবরণ পাঠ কর। ইহাদের খর্ব্বাকৃতিতে বিশাল বিক্রম দর্শাইয়া পুরাণকার ছাত্র-শক্তির এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বালিখিল্য সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব কর্ম্মই প্রাচীন ভারতে ছাত্র শক্তির অক্ষয় স্তম্ভ। তাহাদের তেজঃ প্রভাব সুর-রাজেরও ভয়প্রদ ছিল।

পুরাণগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হয়, এক একটী শক্তি মূর্ত্ত্য-আকারে উপস্থিত করা হইয়াছে। বালিখিল্য সম্প্রদায় ছাত্র-শক্তির মূর্ত্ত্য-পরিণতি। গড়া ভাঙ্গা—সৃষ্টি এবং প্রলয় উভয় কার্য্যই ইহাদের শক্ত্যাধীন ছিল। স্থিতির সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ছাত্র-শক্তির সঙ্গে স্থিতির কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। উহা নবীন উৎসাহের কার্য্য নহে, প্রবীণ জ্ঞানের কার্য্য। আপনার উৎসাহে আপনি মত্ত এমন খরস্রোত গড়াভাঙ্গা ভিন্ন, স্থিতি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে না। পদ্মা চড় ভাঙ্গে, চড় গড়ে। ইহাই ইহার নিত্য ক্রিয়া এবং এইজন্য লোকে ইহাকে শক্তি বলিয়া স্বীকার করে। রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশে—কীর্ত্তিনাশা,—চড়মুকুন্দ চড়ভুবনেশ্বর ইহারই গড়া। দিয়ারা-সরভে ইহারই প্রসাদে। ভাঙ্গিলেই কাজ ফুরাইল, গড়িলেই কাজ ফুরাইল। ছাত্র-শক্তি, ভাঙ্গিবার বেলা শতহস্তে সাবলাঘাতে অট্টালিকা কম্পিত করিয়া তুলিল, যাই অট্টালিকা ভূমিশায়ী হইল আর একটী হস্তও দেখিতে পাইবে না। গড়িবার বেলা সেই মহাশক্তি

যেন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র-প্রভাবে সহস্র করণী-কোণ-যোগে ইষ্টকে ইষ্টকে অট্টালিকা করিয়া তুলিল, যাই অট্টালিকা আকাশ ভেদ করিয়া শিরোত্তলন করিল, অমনি তোমার করণী-কোণ স্তূপে স্তূপে পড়িয়া রহিল, তখন হয়ত উহা অন্য গড়া ভাঙ্গা কার্য্যে ব্যাপৃত। বালিখিল্য সম্প্রদায় বিনাশ এবং সৃষ্টির কর্ত্তা ছিলেন। যখন যাদবগণ লৌহ কটাহে গর্ভ ভাণে বালিখিল্যদিগকে উপহাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের শক্তি প্রভাবে যদু বংশের ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। যখন স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়াছিলেন, তখন দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টির আয়োজন হইয়াছিল। আমরা নিম্নে ইন্দ্র সৃষ্টির বিবরণী মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

* "পূর্ব্ব কালে প্রজাপতি কশ্যপ, পুত্র লাভের বাসনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব সকল তাঁহার সহা-

সৌতিরুবাচ——

যজতঃ পুত্রকামস্য কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
সাহায্যমৃষয়ো দেবা গন্ধর্ব্বাশ্চ দদুঃ কিল॥
তত্রেধ্মানয়নে শক্রো নিযুক্তঃ কশ্যপেন হ।
মুনয়ো বালিখিল্যাশ্চ যে চান্যে দেবতাগণাঃ।
শক্রস্তু বীর্য্যসদৃশমিধ্মভারং গিরিপ্রভম্।
সমুদ্যম্যানয়ামাস নাতিকৃচ্ছ্রাদিব প্রভুঃ॥
অথাপশ্যদৃষীন্ হ্রস্বান্ অঙ্গুষ্ঠোদরবর্ষ্মণঃ।
পলাশবৃন্তিকামেকাং বহতঃ সংহতান্ পথি॥
প্রলীনান্ স্বেষিবাঙ্গেষু নিরাহারাংস্তপোধনান্।
ক্লিশ্যমানান্মন্দবলান্ গোষ্পদে সংপ্লুতোদকে॥
তান্ সর্ব্বান্ বিস্ময়াবিষ্টো বীর্য্যোন্মত্তঃ পুরন্দরঃ।
অবহস্যাভ্যগাচ্ছীঘ্রং লঙ্ঘয়িত্বাবমন্য চ॥
তেঽথ রোষসমাবিষ্টাঃ ভৃশং জাতমন্যবঃ।
আরেভিরে মহৎ কর্ম্ম তদা শক্রভয়ঙ্করম্॥
জুহুবুস্তে সুতপসো বিধিবজ্জাতবেদসম্।
মন্ত্রৈরুচ্চাবচৈর্বিপ্রা যেন কামেন তচ্ছৃণু॥
কামবীর্য্যঃ কামগমো দেবরাজভয়প্রদঃ।
ইন্দ্রোঽন্যঃ সর্ব্বদেবানাং ভবেদিতি যতব্রতাঃ॥
ইন্দ্রাচ্ছতগুণঃ শৌর্য্যে বীর্য্যে চৈব মনোজবঃ।
তপসাং নঃ ফলেনাদ্য দারুণঃ সম্ভবত্বিতি॥

যত্ন করেন। যজ্ঞের কাষ্ঠ আনিবার জন্য কশ্যপ বালিখিল্য ঋষি এবং ইন্দ্র-প্রমুখ দেব গণকে আদেশ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের বল অলৌকিক, তিনি অচল পরিমিত কাষ্ঠভার বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন। আগমন কালীন দেখিলেন অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত খর্ব্বাকার বালিখিল্যগণ সকলে মিলিয়া একটী মাত্র পলাশ বৃন্ত বহন করতঃ অতি কষ্টে আসিতেছেন। নিরাহারে তপস্যা করিয়া তাঁহাদের শরীর এত শীর্ণ হইয়াছিল যে আসিতে গোষ্পদস্থিত সলিলে মগ্ন হইয়া অশেষ ক্লেশ পাইতেছিলেন। ইন্দ্র সেই সকল ঋষিদিগকে দেখিয়া বীর্য্য গর্ব্বে উপহাস করতঃ লঙ্ঘন করিয়াই চলিয়া গেলেন। তখন অমিত তপোবল-সম্পন্ন বালিখিল্য দুঃখিত ও কুপিত হইয়া এক ভয়ানক ব্যাপার আরম্ভ করিলেন।

শ্রুত্বা তু তত্তথা তেভ্যো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
জগাম শরণং তত্র কশ্যপং সংশিতব্রতম্॥
তচ্ছ্রুত্বা দেবরাজস্য কশ্যপোঽথ প্রজাপতিঃ।
বালিখিল্যানুপাগম্য কর্ম্মসিদ্ধিমপৃচ্ছত॥
এবমস্ত্বিতি তঞ্চাপি প্রত্যূচুঃ সত্যবাদিনঃ।
তান্ কশ্যপ উবাচেদং সান্ত্বপূর্ব্বং প্রজাপতিঃ।
অয়মিন্দ্রস্ত্রিভুবনে নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণঃ কৃতঃ।
ইন্দ্রার্থে চ ভবন্তোঽপি যত্নবন্তস্তপোধনাঃ॥
নমিথ্যা ব্রহ্মণো বাক্যং কর্ত্তুমর্হথ সত্তমাঃ।
ভবতাং হি ন মিথ্যায়ং সঙ্কল্পো বৈ চিকীর্ষিতঃ॥
ভবত্ত্বেষঃ পতত্রিণামিন্দ্রোঽতিবলসত্ত্ববান্।
প্রসাদঃক্রিয়তামস্য দেবরাজস্য যাচতঃ॥
এবমুক্তাঃ কশ্যপেন বালিখিল্যাস্তপোধনাঃ।
প্রত্যূচুরভি সম্পূজ্য মুনিশ্রেষ্ঠং প্রজাপতিম্॥

বালিখিল্যা উচুঃ—

ইন্দ্রার্থোঽয়ং সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং নঃ প্রজাপতে।
অপত্যার্থং সমারম্ভো ভবতশ্চায়মীপ্সিতঃ॥
তদিদং সফলং কর্ম্ম ত্বয়ৈব প্রতিগৃহ্যতাম্।
তথাচৈবং বিধৎস্বাত্র যথা শ্রেয়োঽনুপশ্যসি॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব
১ম খণ্ড ৩১ অধ্যায়।

ইন্দ্রের অবমাননায় দুঃখিত ও কুপিত হইয়া মহাতপ বালিখিল্যগণ মনে করিলেন আমরা তপোবলে কামবীর্য্য কামচারী ইন্দ্রেরও ভয়প্রদ এবং বলে তাহা হইতেও শতগুণ শ্রেষ্ঠ, মনের ন্যায় বেগবান চণ্ড প্রকৃতি অন্য এক ইন্দ্র উৎপাদন করিব। এবং সেই হেতুক অগ্নি স্থাপন করিয়া—উচ্চাবচ মন্ত্র দ্বারা—নিয়মানুসারে আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া পুরন্দর কশ্যপের নিকট শরণ লইলেন। ঋষিপ্রবর প্রজাপতি কশ্যপ, দেব-রাজকে ভীত দেখিয়া বালিখিল্যদিগের নিকট গমন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—ঋষিগণ, আপনাদের ইষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে ত? তাঁহারা কহিলেন হাঁ। তখন প্রজাপতি তাঁহাদের ক্রোধ শান্তি করিয়া কহিলেন—তাপস-বৃন্দ! ইন্দ্র বিধাতার আজ্ঞাক্রমে ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে আপনারা তপোবলে অন্য এক ইন্দ্র উৎপন্ন করিয়া বিধিবাক্য অন্যথা করিতে বসিয়াছেন, সেটী উচিত নহে। কিন্তু আপনাদের উদ্যোগ বিফল হউক আমার এ অভিপ্রায় নহে। তবে এরূপ আজ্ঞা করুন যাহাতে আপনাদের ইন্দ্র পক্ষী-কুলের ইন্দ্র হয়। শচীপতি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে-ছেন, অনুগ্রহ করিয়া দয়া প্রকাশ করুন। তাঁহার বাক্য শুনিয়া যত-ব্রত বালিখিল্য উত্তর করিলেন আপনার সন্তান এবং অপর এক ইন্দ্রের উৎপা-দন কামনায় আমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সুতরাং এখন তজ্জন্য ফল আপনিই গ্রহণ করুন।"

উল্লিখিত বিবরণীতে দেখা যাইতেছে, ছাত্র-শক্তির প্রতি রাজার তাচ্ছি-ল্যই দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টির কারণ। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে রাজায় আর ছাত্র-শক্তিতে এইরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। উদ্ধৃত শ্লোকের ১৬শ শক্তিতে দেখা যাইতেছে, উচ্চাবচ মন্ত্রই বালিখিল্য-দের এক মাত্র সম্বল। বস্তুতঃও এই উচ্চাবচ মন্ত্র ছাত্রদের অমোঘ অস্ত্র। বালিখিল্যদিগের নিকট উচ্চাবচ মন্ত্র যে প্রকার, বর্ত্তমান সময়ের (Agita-tion) দিগন্তব্যাপী কোলাহল সেই প্রকার ফলপ্রদ। বালিখিল্যের সৃষ্টি—যথা সময়ে প্রসূত খগেন্দ্র—গজকচ্ছপের দর্প সংহারক—সদা সর্পভুক্। ছাত্র সম্ভূত শক্তি—ধর্ম্ম এবং রাজনীতির মীমাংসক,- সর্প স্বভাব রাজনীতির সংহারক। আমরা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দকে অমোঘ অস্ত্র বলিতেছি না, মন্ত্র উচ্চাবচ মন্ত্রকে অমোঘ অস্ত্র বলিতেছি,—উচ্চাবচ মন্ত্রের উচ্চারণ যন্ত্র সত্য-বাদী রসনা—পরদুঃখ কাতর হৃদয়। যজ্ঞে আহুতি দাতা সৎকর্ম্মশীল হও।

মন্ত্রের প্রাণ দাতা বিশুদ্ধ আত্মা, পবিত্রমন, পবিত্র প্রীতি। যাঁহারা কেবল হৈ হৈ রৈ রৈকে সর্ব্বার্থপ্রদ মনে করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সহানুভূতি নাই। যাঁহারা ছাত্রশক্তির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কেবল কোলাহলে প্রবৃত্ত, তাঁহারা তাঁহাদের যশোলিপ্সার যক্ষারোগে কুষ্মাণ্ড খণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহেন। আমরা এখানে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি, মনুষ্য সমাজ সর্ব্বদা বীণ বাঁশরী লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না, প্রকৃতি যখন উচ্ছৃঙ্খল মূর্ত্তি ধারণ করেন তখন সময় সময় ঢক্কা নিনাদ, দুন্দুভিধ্বনি, সংহার-শৃঙ্গের ভৈরব আরাবও একান্ত প্রয়োজনীয়। সৃষ্টিকার্য্যে উচ্চাবচ মন্ত্রোচ্চারণের পূর্ব্বে দুন্দুভিধ্বনি যে প্রকার প্রমত্তকারী, বিনাশ কার্য্যের পূর্ব্বে সংহার-শৃঙ্গধ্বনি সেই প্রকার অত্যন্ত শ্রুতি মধুর। তখন ক্ষুদ্র হইল ক্ষতি কি, তখন মানবের শূলপাণি হইয়া ত্রিশূল হস্তে ভৈরব রাগিণী উচ্চারণ করিতে করিতে রুদ্রতালে নৃত্য করিতে ইচ্ছা করে। তখন ছাত্র-শক্তির সে মূর্ত্তি দেখিয়া ধর্ম্ম এবং সমাজের পৈশাচিক প্রাণ, লীলা সংবরণ করে। অনন্ত-ফণা রাজনীতি বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুররাজ ইন্দ্র তখন কশ্যপ শরণাগত, Apology-হস্তে ক্ষমার ভিখারী। চাহিয়া দেখ, সেই উচ্চাবচ মন্ত্রের অন্তরালে বালিখিল্যগণের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ক্ষুদ্র দেহ শ্রেণী তপস্তেজে কেমন প্রজ্বলিত হইতেছে। গোষ্পদে পতিত হইয়া—তাঁহারা ক্লিষ্ট হইতেছেন না, কিন্তু যজ্ঞের জন্য আনীত পলাশবৃন্ত তখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। তাঁহাদের উৎসাহ উপহাসের বিষয় নহে। ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাদিগকে কেমন প্রভাবিত করিয়া তুলিতেছে। কাহার সাধ্য সেই সমবেত শক্তি বিন্দু কক্ষচ্যুত করিতে পারে? উপহাস লইয়া উপস্থিত হও, সূর্য্যালোকে অগ্নিপ্রস্তরের কেন্দ্রোদ্গত আগ্নেয় বিন্দুমুখে কার্পাস-তন্তুবৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।—উচ্চাবচ মন্ত্র তাঁহাদের পাশুপত অস্ত্র, ধর্ম্ম তাঁহাদের বর্ম্ম, ন্যায় তাঁহাদের বাণাধার—পৃষ্ঠশোভী দিব্য তূণ। প্রাচীন ভারতের বালিখিল্য সম্প্রদায় ত্রিকালের জন্য ছাত্রশক্তির আদর্শ। বর্ত্তমান ভারতে ছাত্রদের যদি কেহ অনুকরণীয় থাকেন তবে তাঁহারাই, তাঁহারাই তবে অনুকরণীয়।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে ছাত্র শক্তির বিকাশ দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। এখানেও আবার বলিতেছি—অন্যায় আস্ফালনের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক শত্রুতা। এক দিন এই ছাত্রশক্তি ভারতে পঞ্চম শক্তি রূপে

ধর্ম্ম এবং সমাজ দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য, সর্প স্বভাব রাজনীতির বিনাশের জন্য, ন্যায়ের স্থাপনার জন্য, অন্যায়ের ধ্বংস জন্য, অসুর দলন করিয়া দেবতার পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য সিংহবাহনে ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, বল বিজ্ঞান, শিব শক্তি পরিবেষ্টিত হইয়া ভারতের শারদীয় শুভ্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা হইবেন। যাঁহারা এই শক্তির উপাসনা না করিয়া উপহাসে প্রবৃত্ত, তাঁহারা কশ্যপ-শরণাগত ইন্দ্রের এবং প্রভাসে যদুবংশের দশা দর্শন করুন। করতালি-সর্ব্বস্ব, ফাঁকা আওয়াজ-সম্বল, কাষ্ঠাসনোচ্চকারী ছাত্র মণ্ডলীর প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি নাই। বালিখিল্য সম্প্রদায়ের তপঃপ্রভাব অনুসারিণী ছাত্রশক্তি, যাঁহারা প্রতিদিন হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। আমাদের একান্ত বাসনা, প্রাচীন ভারতের বালিখিল্য-প্রকৃতি ছাত্রশক্তি বর্ত্তমান ভারতের বিকাশোন্মুখী ছাত্রশক্তিকে বল প্রদান করুক। ছাত্রগণ বিশ্বাস করিতে থাকুন, নাই বা রহিল অস্ত্র শস্ত্র, সত্যের অমোঘ অস্ত্রের নিকট কে তিষ্ঠিতে পারে? নাই বা রহিল দেউল দুর্গ, কাহার সাধ্য ধর্ম্মের অজেয় দুর্গ ভেদ করে,—সদুৎসাহে উপহাস করিয়া পরিত্রাণ পায়? উচ্চাবচ মন্ত্র অতীতে যেমন হইয়াছিল, ভবিষ্যতেও ছাত্র জীবনে তেমনি অর্থযুক্ত হউক।

শ্রী ———

বীরভূমে অন্নকষ্ট।

বীরভূম জিলা প্রাচীন রাঢ় দেশান্তর্গত। যেমন নাম, তেমনি স্থান; "রাঢ়" শব্দটী যেরূপ রূঢ়, স্থানটীও তেমনি। এপ্রদেশের নাম যে কেন "বীরভূম" হইল, বলিতে পারি না। জানি না, হিন্দুরাজত্ব কালে ইহা কেমন বীর স্থান ছিল। তবে বোধ হয়, এখানে হিন্দু মুসলমানে, মুগল পাঠানে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া থাকিবে; তাই ইহার নাম "বীর-ভূম" হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে মনে হয়, বঙ্গদেশে এত দুর্ব্বল, এত অসাড়, এত অসভ্য জাতি আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এ প্রদেশের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসী ইতর মুসলমান, ভদ্র শ্রেণীর মুসলমান অতি অল্প। হিন্দুর মধ্যে অধিকাংশই অসভ্য বর্ব্বর

জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন মাল, লেট, কনাই প্রভৃতি। আমরা এপর্য্যন্ত বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট সব্‌ডিভিসনের দুইশতাধিক গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছি, তাহাতে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্র শ্রেণীর লোক সংখ্যা তুলনায় অতি অল্প। অধিকাংশ গ্রামেই অসভ্য নিম্ন শ্রেণীর লোকের বাস।

এই সব্‌ডিভিসনের অধিকাংশ স্থানই বঙ্গইতিহাসের কলঙ্ক দুর্দান্ত দেবী-সিংহের বংশধরদিগের রাজস্বাধীন ছিল। সেই বংশে নসিপুরে কুমার রণজিৎ সিংহ এখন রাজা। তিনি এখনও নাবালক, শীঘ্রই সাবালকত্বে পৌঁছিবেন। সম্প্রতি কোর্টস্-অব্-ওয়ার্ডের অধীনে রাখা হইয়াছে। ভবানী-পুরের সেই নন্দবংশধর জগদানন্দের ভ্রাতা বিমলানন্দ তাহার ম্যানেজার। ভূত পূর্ব্ব রাজার দেওয়ানই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন—("ছিলেন" বলিতেছি এই জন্য কুমার রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে সম্প্রতি বরতরফ করিয়াছেন, সে কাহিনী অতি বিস্তৃত, তা দু এক কথায় বলিবার নয়)—বৃদ্ধারাণীর বিশ্বস্ত ভৃত্য। রাজস্বের আয় প্রায় দশ লক্ষ ছিল, তাঁহার প্রসাদে নাকি তিন লক্ষে পরিণত হইয়াছে! রাজস্বের অধিকাংশ স্থান পত্তনি, দরপত্তনি দেওয়াতে রাজস্বের আয় এত হ্রাস পাইয়াছে।

এ প্রদেশে খাল, বীল, নদী, ঝিল কিছুই নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বা বিহারের মত এখানে কূপাদিরও প্রাচুর্য্য নাই। নলহাটি ষ্টেসনের এক মাইল দক্ষিণে একটী নদী দেখিলাম, তাহার নাম ব্রহ্মাণী। তাহাতে এক ঝিনুকও জল নাই, কেবলই বালিরাশি। গয়ার ফল্গুনদী কোন দিন দেখি নি; কিন্তু ব্রহ্মাণী দেখিয়া তাহার কথকটা আভাস পাইয়াছি। বারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু ও আমরা আর কয়েক জন সেখানে আজিমগঞ্জের বণিক-জমিদার বাবু বুদ্ধসিং ও বিষণচাঁদ সিং ভ্রাতাদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত অন্নছত্র দেখিতে গিয়াছিলাম। অন্নছত্রটী নদীর উপরেই একটী সুরম্য আম্রবাগানের ভিতর। সেই নদীর জলেই অন্নছত্রের কার্য্য চলে এবং তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোকের জীবন বাঁচে। দুই কি আড়াই ফিট বালী খুঁড়িলেই স্নিগ্ধ নির্ম্মল জল আসিয়া গর্ত্তে জড় হয়; সে জল অতি মিষ্ট ও ঠাণ্ডা। আর একটী নদী দেখিয়াছি "অজের"। তাহারও এই অবস্থা। পাঠক "আনন্দমঠে" যে "অজেরের" তীরে সৈন্যাসী কর্ত্তৃক "কল্যাণীর" জীবনদানের কথা পাঠ করিয়াছ, ইহা সেই "অজের"।

চির দিন কাহারও সমানে যায় না। আজ ইহাদের এই দুর্দ্দশা দেখিতেছ —শৃগাল কুকুরে ইহাদের গর্ভস্থ বালিরাশির উপর চড়িয়া ফিরিতেছে; কিন্তু বর্ষা কাল আসিতে দাও, কাহার সাধ্য স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়ায়? এতদ্ভিন্ন নলহাটীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ১৫। ২০ মাইলের মধ্যে একটী খাল বীল বা নদী ঝিল দেখিতে পাইলাম না। প্রায় গ্রামেই ২। ৪ টি পুকুর আছে বটে; কিন্তু তাহা এত প্রাচীন যে, এই চৈত্র বৈশাখ মাসের রৌদ্রে তাহার তলা পর্য্যন্ত ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। লোকে অন্নকষ্ট অপেক্ষা জলকষ্টে অধিকতর ক্লেশ পাইতেছে। কয় দিন অন্ন না খাইয়াও বরং লোকে বাঁচিতে পারে, কিন্তু জলাভাবে ত এক দিনও বাঁচিতে পারে না।

এখানকার প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। সকলেই স্বস্ব জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া হাল চাষ করিয়া থাকে। কামার, কুমার, তাঁতি, সুতার ব্যবসা করিবে কিরূপে? তাহাদের প্রস্তুতি দ্রব্য বিকাইলে ত? ইংরেজের প্রসাদে দেশীয় সকল ব্যবসায়ীর ব্যবসা বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কাজে কাজেই সকলে লাঙ্গলের খুঁটি ধরিয়াছে। কিন্তু এ প্রদেশের লোকের এমনি দুর্ভাগ্য যে, ইন্দ্রদেবের করুণার উপর ইহাদের সকল আশা ভরসা নির্ভর করে। তিনি বাম হইলেন ত, বৃষ্টি বন্ধ হইল ত, ইহাদের জীবন সংশয়। এক দিকে শস্য নাশ, অপর দিকে পানীয় বিনাশ। শস্যের মধ্যে এক অগ্রহায়ণী, অন্য কোন শস্যের চাষ হয় না। মাটি আবার এমনি অনুর্ব্বর, প্রতি বৎসর জমিতে সার না দিলে বৃষ্টি হইলেও শস্য জন্মানের আশা থাকে না। বৃষ্টির জলে পুরাতন পুকুর গুলিতে যে জল জমে, তাহাই সারা বছর লোকে পান করিয়া থাকে ও কিছু কিছু জমিতে সিঁচিয়া দেয়। এপ্রদেশের জমিদার জোতদার, পত্তনিদারগুলি এমনি নির্দ্দয় নির্ব্বোধ যে, একটী গ্রামে একটী পুকুর খনন করিয়া দেয় না। খনন করিয়া দেওয়া দূরে থাক্, কেহ খনন করিতে চাহিলে একটুকু যায়গা পর্য্যন্ত দেয় না। এই দুর্দ্দিনের দিনে এদের নৃশংস ব্যবহার দেখিলে শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠে। অন্নাভাবে লোক জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; তথাপি জমিদারের অত্যাচর থামিতেছে না। গ্রামে গ্রামে জমিদারের পাইক যমদূতের ন্যায় খাজানার জন্য তাড়না করিয়া ফিরিতেছে। তাই বলি, এরা

যদি মানুষ হয়, এরা যদি দেশের রক্ষক হয়; তবে আর রাক্ষস কারা,—ভক্ষক কারা? যত শীঘ্র এই নৃশংস শ্রেণীর লোপ হয়, ততই যেন দেশের মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়।

আজ দুই বৎসরেরও অধিক হইতে চলিল এপ্রদেশে বৃষ্টি নাই। বৃষ্টি নাই, আর শস্যও নাই—পানীয় জল পর্য্যন্ত নাই। গ্রামে বাহির হইলে, পিপাসায় শ্রান্ত হইলে পানীয় জল পাওয়া দূরে থাক্, হাত মুখ ভিজানের জল পর্য্যন্ত পাওয়া ভার। এই দুই বৎসরকাল অবধি লোকে অন্নকষ্ট ও জল কষ্টের যন্ত্রণা ভুগিতেছে। যত দিন সম্ভব এ কষ্ট যন্ত্রণা বহিয়াছিল, এখন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। লোকে এতদিন একাহার, অর্দ্ধাহার করিয়া, অনাহারে থাকিয়া অখাদ্য খাইয়া নামে মাত্র বাঁচিয়া আছে—বাঁচিয়া আছে বলিলে ঠিক বলা হয় না—জীয়ন্তে মরিয়া আছে; এখন আর পারে না। কেহ কেহ অনাহারে কালকবলে পতিত হইয়া ভবযন্ত্রণা এড়াইয়াছে। কত লোক, স্ত্রী পুত্র মাতা পিতাকে ফালাইয়া পেটের জ্বালায় দেশত্যাগী হইয়াছে, তাহাদের কোন খোঁজ খবর নাই—তাহাদের পরিবারস্থ লোকগুলি অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত। শত শত অস্থিচর্ম্মময় কঙ্কালসার প্রেতাকার লোকের দেহ দেখিলে প্রাণে আতঙ্ক জন্মে, ভীতির সঞ্চার হয়। পেটের জ্বালায় লোকে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে—সুবিধা পাইলে পথে ঘাটে মাঠে লোকের দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লইতেছে। খাঁটুনির জন্য লোকের ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতেছে, গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়া ছাই হইতেছে।

তার পর আবার খোলা ভাঁটি।—নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই সুরাদেবীর সেবক। অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা পর্য্যন্ত সকলেই "তাড়ি" ও "পঁচাইর" উপাসক। তাড়ি পঁচাই তাহাদের একরূপ নিয়মিত খাদ্য পানীয়ের মধ্যে গণ্য। এই যে অন্নকষ্ট, ইহার মধ্যেও বাড়ীর তাল গাছে তাড়ির হাঁড়ি ঝুলিতেছে; আর দুপুর-বেলা সকলে তাহা পান করিয়া গড়াগড়ি দিতেছে! প্রতি তাল গাছের উপর বার্ষিক গবর্ণমেণ্টকে আট আনা জমা দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ২। ১টী গ্রাম পর পরই এক একটী পঁচাই ও তাড়ির দোকান। "পঁচাই", পচান ভাতের এক প্রকার মাদক দ্রব্য বিশেষ। একেই বলে "মরার উপর খাড়ার ঘা।" একেত লোক-গুলি অন্নাভাবে মারা পড়িতেছে, তার পর আবার গবর্ণমেণ্ট মুখের উপর

বিষপাত্র ধরিয়া দিতেছেন। এই যে দুর্দ্দিন, ইহাতেও খোলা-ভাঁটির "ডাক" বন্ধ হইতেছে না, অধিকতর নজরে দোকানদার দোকানের পাট্টা লইতেছে! রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, রাজা যদি প্রাণঘাতক হন, তবে আর রক্ষা করিবে কে? একসাইস্-কমিসন বসিল, স্তূপাকারে রিপোর্ট প্রকাশিত হইল, কত আড়ম্বর, কত ঘনঘটা;—কিন্তু ফল পর্ব্বতের মূষিক প্রসববৎ। ইহাদের মাদক-প্রিয়তা এই দুর্ভিক্ষের অন্যতর কারণ। মুসলমানদিগের নেশা করা নাকি পাপ, তাই হিন্দুদের হইতে মুসলমানেরা এই দুর্দ্দিনে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্লেশ ভোগ করিতেছে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত হিন্দুর সংখ্যা যত; মুসলমানের সংখ্যা আজও তত নহে। অনাবৃষ্টি ও মাদক প্রিয়তা, এই উভয়ই বীরভূম দুর্ভিক্ষের মুখ্য ও গৌণ কারণ বলিয়া মনে হয়।

লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া, ভারত সভার কথা শুনিয়া, বিগত বৎসর গবর্ণমেণ্ট এঅঞ্চলে কয়েক মাসের জন্য সাহায্য কার্য্য (Relief work) খুলিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৯। ১০ টী পুষ্করিণী খনন এবং ৩।৪ টী সড়ক বাঁধান হইয়াছিল। তাহাতে নাকি প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু ইহার প্রায় ¾ তিন চতুর্থাংশ পাইয়াছে "সাতে ভূতে", আর এক চতুর্থাংশ পাইয়াছে রায়তে। ক্লেশ হরণ নামে জনৈক শ্বেতাঙ্গের উপর এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার পড়িয়াছিল। যেমন ছিল তার বিদ্যা বুদ্ধি, তেমনি ছিল সে সত্যবাদী। ইংরেজ নাকি এদেশে উড়ে এসে, যুড়ে বসেছে; তাই তাদের উদর পূর্ত্তি হইলেই হয়, এদেশের লোক মরিলে বাঁচিলে তাদের কি আসিয়া যায়। এদেশটা যদি আমেরিকার মত শীত প্রধান হইত, তাহলে এত দিনে বোধ হয় আমাদিগকেও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের দশা প্রাপ্ত হইতে হইত। আমাদের বড় ভাগ্য দেশটা গ্রীষ্ম প্রধান। কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান হইলে কি হয়, ভারত যে রত্নপ্রসূ, কামধুগা; যা চাও, তাই মিলে। তাদের না হউক, তাদের কুপ্রবৃত্তিপ্রসূত ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের বাসোপযোগী হইবে ত। আর তাদেরইবা না হইবে কেন?—দীর্ঘকাল বাস করিতে করিতে বংশপরম্পরা ক্রমে তাদেরও সহিয়া উঠিবে। নতুবা তিনটী ক্ষুদ্রদ্বীপে এই রক্ত বীজের বংশের স্থান আর কত দিন কুলাইবে? আর নিতান্তই যদি না সয়, তবে হিমালয়-পর্ব্বত শ্রেণীটা আর উতকমন্দের পাহাড়টা কিসের জন্য,—কাহাদের নিমিত্ত? আর যে এই প্রকাণ্ড কাশ্মীর রাজ্যটা, এইটা কি চিরকালই

দৈত্যদিগের ভোগে থাকিবে? দেবতারা কি চিরকালই স্বর্গচ্যুত থাকিবেন? বৃত্র কি বধ হইবে না? ইন্দ্রের বিদ্যাধরীগণ কি চিরকালই গড়েরমাঠে মর্ত্ত্যভূমে চড়িয়া বেড়াইবেন? তাও কি কখন সম্ভবে? একবার ত্র্যম্বকের ধ্যান ভঙ্গ হইলে হয়, একবার স্বর্গধামের প্রতি তাঁহার চক্ষু ফিরিলে হয়। তবে কি আর তিনি দেবতাদের আর্ত্তনাদ, দুঃখ যন্ত্রণার কথা না শুনিয়া পারিবেন! বৃত্ররূপী কাশ্মীররাজ রাবলপিণ্ডীর দরবারে না আসিয়া এবার যে বে-আদবী করিয়াছেন, ইহাতেই বা বোধ হয় মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়! শীতকালটা বরং কোনরূপে মর্ত্ত্যে বাস করিয়া গ্রীষ্মকালটা দেব লোকে কাটাইলেই হইবে। ভারতে না আছে কি?—স্বর্গ মর্ত্ত্য দুই ই আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত বড় প্রকাণ্ড দেশটার এতগুলি নরনারী লইয়া ইংরেজ তবে কি করিবে? কেন, দেব সেবায় লাগিবে। এই দেখ না, ইংরেজ আফ্রিকা দেশটা লইয়া কি তুমুলকাণ্ডই না আরম্ভ করিয়াছে! স্বার্থের জন্য ইংরেজ কি না করিতে পারে? কাগজে কলমে বলা কওয়ায় ইংরেজ স্বাধীনতার চিরবন্ধু, কিন্তু কাজে কি দেখিতে পাই? ইংরেজ কাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন?—যাহারা স্বদেশের উদ্ধারের জন্য, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেছে, ইংরেজ আফ্রিকায় তাহাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিতেছেন!

কি বলিতে কি বলিতেছি! বলিতেছিলাম, ক্লেশহরণ সাহেবের হাতে কার্য্যভার পড়িয়া, হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের অর্থ নষ্ট আর বাড়িয়াছে প্রজার অন্ন কষ্ট। পুকুর কাটাইতে কাটাইতে, সড়ক বাঁধাইতে বাঁধাইতে অগ্রহায়ণী শস্যের সময় উপস্থিত হইল। এ সময়ে অশুভক্ষণে বঙ্গেশ্বরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রদেশের অবস্থা পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। রাজ পুরুষেরা নাকি আপন চক্ষে কিছুই দেখেন না, তাঁহারা পারিষদ্‌দিগের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সঙ্গে কমিসনর, মাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তাঁহারা নির্ব্বাক্; আর সেই বাক্‌পটু কুবমতি ক্লেশহরণ যে কয়েকটী গ্রামের নিম্নভূমিতে যৎকিঞ্চিৎ শস্য জন্মিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া ফিরাইতে লাগিল; লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে বুঝাইতে লাগিল যে, সে নিজে কৃষকের সন্তান, এ সকল ক্ষেত্রে প্রায় বার আনা শস্য জন্মিয়াছে; অথচ তাহাতে দুই আনা শস্যও জন্মিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সঙ্গে দেশীয় উপযুক্ত শিক্ষিত লোক কেহ ছিলেন না; সুতরাং ক্লেশহরণ যাহা বলিতে লাগিল, বুঝাইতে

চেষ্টা করিল বঙ্গেশ্বর তাহাই কর্ণ পাতিয়া শুনিয়া গেলেন, শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। কমিসনর, ম্যাজিষ্ট্রেট, ক্লেগহরণের বাক্‌চাতুর্য্যে,—দেশীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ তাহার ধূর্ত্ততাতে অবাক্ হইয়া গেলেন। কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর তাহা কাণে তুলিলেন না, ক্লেগহরণের প্রদর্শিত ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য দিকে চক্ষুও ফিরাইলেন না। এখানে বিশ্বাসঘাতক জমিদার সম্প্রদায়ের কথা আর কি বলিব?* সেই দুষ্টমতি ক্লেগহরণ তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী দেওয়াইবে বলিয়া হস্তগত করিয়াছিল। একমাত্র আবদুল শোভান নামক জনৈক মুসলমান জমিদার ব্যতীত অপরাপর প্রায় সকল জমিদার তালুকদার গুলি ই তাহার কথিত মতে স্ব স্ব বাধ্য লোকদ্বারা বঙ্গেশ্বরের নিকট সাক্ষ্য দেওয়াইতে লাগিল যে, প্রায় সকল গ্রামেই বার আনা শস্য জন্মিয়াছে!! তিনি মফস্বল পরিদর্শন করিয়া বেল্‌ভেডিয়াতে ফিরিয়া আসিয়া সাহায্য-কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। আর এ দিকে এক মাস যাইতে না যাইতেই প্রজার আবার দারুণ অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল।

ফাল্গুন মাসে সাধারণ ব্রহ্মসমাজের দৃষ্টি এ প্রদেশের দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত লোকদিগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত রাম কুমার বিদ্যারত্ন নলহাটীতে আগমন করেন। তিনি এখানে আসিয়া ইহার নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামের লোকদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখেন, এমনকি তখন কাহার কাহার অনাহারে প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা নংসামান্য। তিনি তাহা লইয়াই ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সং যার উদ্দেশ্য, ভগবান তার সহায়। লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি আজিমগঞ্জ, বহরমপুর, মুরসিদাবাদ অঞ্চলে ভিক্ষা করিতে বাহির হন। ঐসকল স্থান হইতে তিনি আশাতিরিক্ত সাহায্য পাইয়াছেন এবং আরও পাওয়ার আশা আছে। এদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও কলিকাতাতে চতুর্দ্দিক হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন। সে দিন সংবাদপত্রে দেখিতে পাইলাম, আদি ব্রাহ্মসমাজও দুর্ভিক্ষের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শুভক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ এ প্রদেশে সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন, নতুবা এত দিনে লোকে দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। রামকুমার বাবুর

অব্যবহিত পরেই বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতসভা হইতে এ অঞ্চলে প্রেরিত হন। ব্রাহ্মসমাজ এতদিন একাকীই নলহাটী থানার এলাকাধীন গ্রামসমূহের সহস্রাধিক লোকের অন্ন যোগাইতে ছিলেন। বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে ভারতসভাও সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারত সভা হইতে আজিমগঞ্জ রেলওয়ের নোয়াদা ষ্টেসনে একটী ও সদ্ভাবউদ্দীপনী সভার তত্ত্বাবধানে রামপুর হাটে একটী কার্য্যক্ষেত্র খোলা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-স্থান নলহাটীতে সংস্থিত। ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতসভা পরস্পরের সাহায্যে কার্য্য করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের ৫।৬ জন কর্ম্মচারী দিবা রাত্রি, চৈত্র বৈশাখ মাসের খরতর রৌদ্রের উত্তাপে, অগ্নিময় প্রবল ঝটিকা-প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করিয়া বিনা ছাতায় উন্মুক্ত মস্তকে গ্রামে গ্রামে দুঃখী কাঙ্গালি অস্থিচর্ম্মসার অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ লোকের অন্নবস্ত্র যোগাইয়া ফিরিতেছেন। এরূপ অনেক দিন হইয়াছে, যদি আর দুই এক ঘণ্টা পরে সেই গ্রামে উপস্থিত হওয়া হইত, তবে হয়ত কয়টী লোক বহু দিনের অন্নাভাবে মারা পড়িত। বাউটি নামক একটী গ্রামে বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁহার জনৈক সহচরের উপস্থিতি সত্ত্বেও সময়মতে সংবাদ না পাওয়াতে একটী স্ত্রীলোক মারা পড়িয়াছে; আর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে খবর পাইলে হয়ত তাহাকে বাঁচাইতে পারা যাইত। সে দিন জগধারী নামক গ্রামে ব্রহ্মাণী নদীর তীরবর্ত্তী আজিমগঞ্জের বাবু বুদ্ধসিং ও বিষণচাদ সিং দুধুরিয়াদিগের অন্নছত্রে খাইতে আসিয়া একটী শিশু মাতৃক্রোড়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিল। মূর্চ্ছা গিয়াছিল, মাতৃস্তনে দুগ্ধ নাই বলিয়া। মাতা না খাইতে পাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত, অস্থিচর্ম্মসার, প্রেতাকার; স্তনে দুগ্ধ আসিবে কোথা হইতে? এইরূপ কত শিশু যে কত মাতার কোলে দুগ্ধ অভাবে প্রাণ হারাইতেছে, কে বলিতে পারে? আমরা অনেক যত্নে সেই শিশুটীর প্রাণ বাঁচাইয়াছিলাম;—সে দৃশ্য দেখিয়া চক্ষুর জল রাখিতে পারে এমন পাষাণ হৃদয় কে আছে? সে দিন বাবু আনন্দমোহন বসুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই শিশুর মা ৪ মাইল পথ হাঁটিয়া শিশুটীকে কোলে করিয়া এই অন্নছত্রে খাইতে আসে। আবার আর এক দিন নলহাটীর পার্ব্বতীতলার আম্র বাগানে বুদ্ধ সিং বিষণচাদ সিং যে তিন সহস্রাধিক লোক খাওয়াইয়াছিলেন, তাহাতে খাইতে আসিয়া আর তিনটী লোক ক্ষুধায় মূর্চ্ছা যায়। সেই

অসংখ্য লোকের প্রেতাকৃতি দেখিয়া ভ্রাতাদ্বয় চক্ষুর জল না ফেলিয়া পারেননি—কেহই পারেনি। এই সেদিন চাট্রা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী রুদ্র-নগর গ্রামে কামিনী হাঁড়িনী নাম্নী বিংশতি বর্ষবয়স্কা এক রমণী সাত দিনের উপবাসে জীবন হারাইয়াছে। পাঠকগণ হয়ত এ সকল কথা অতি রঞ্জিত মনে করিবেন; কিন্তু ইহার এক চুলও অতি রঞ্জিত নহে। আমরাও এখানে আসিবার পূর্ব্বে এরূপ মনে করিতাম, কিন্তু ঘটনাস্থলে আসিয়া সে সংস্কার ঘুচিয়াছে।

এখানে একটী সুখের কথা বলি,—ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বোক্তরূপ অনেকগুলি শিশুর দুগ্ধের পয়সা যোগাইতেছেন; কিন্তু গাভীর দুগ্ধও দুষ্প্রাপ্য। গৃহস্থগণ গরু বাছুর যা ছিল, সব বিকাইয়া খাইয়াছে; যার দু একটী আছে, তারাও ঘাষ অভাবে খড় খৈল না পাইয়া জীর্ণ শীর্ণ। ঘাষ জন্মান দূরের কথা, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছে; প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে। মাঠগুলি দিনের বেলা মরু-ভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, গ্রামগুলিতে গেলে গোল্ডস্মিথ সাহেবের পরিত্যক্ত পল্লীর (Deserted village) কথা মনে পড়ে। এই দারুণ অন্নকষ্টের সময়েও নিকটবর্ত্তী বন্দর সমূহে চাউলের অভাব নাই। ইংরেজ রাজের কল্যাণে—রেলওয়ের প্রসাদে দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে চাউলের রপ্তানি হইতেছে; এখনও টাকায় কাঁচি ওজনে কুড়ি সের চাউল পাওয়া যায়। কিন্তু লোকের ঘরে অর্থ নাই, এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা চাউল কিনিতে পারে। এ দুর্ভিক্ষ খাদ্য সামগ্রীর দুর্ভিক্ষ নহে, অর্থের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। অর্থের অভাবেই এই লোকগুলি মারা পড়িতেছে, তাহাদের এরূপ সংস্থানও নাই যে, এক খণ্ড কানি কিনিয়া লজ্জা নিবারণ করে। অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক-গুলি যখন অৰ্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া সাহায্যার্থ আইসে, তখন তাহাদের দিকে লজ্জায় চক্ষু তোলা যায় না। গ্রামে বাহির হইয়া বস্ত্রাভাবে লজ্জাকর এমন দৃশ্য দেখা গিয়াছে, যাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে লেখনী বিরতি নেয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত "বে-আবরু" স্ত্রীপুরুষদিগকে বহুতর নূতন ও পুরাতন বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন।

এখানে সত্যের অনুরোধে একটী অপ্রাসঙ্গিক কথা না বলিয়া পারি-তেছি না। ভারতসভার কমিটীর এবং সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে অনেককে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি যে, ব্রাহ্মেরা সভাটাকে একচেটিয়া

করিয়া লইল ; তাঁহাদিগকে বিধিমতে চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি, যাহাতে ব্রাহ্মেরা কমিটীতে ঢুকিতে না পারেন। কিন্তু কৈ, এই বেলাত তাঁহাদের কাহাকেও চৈত্র বৈশাখের ভীষণতম রৌদ্রে খোলা মাথায় ভারত-সভার পক্ষ হইতে গ্রামে.গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতে পাইতেছি না! সভার কার্য্য করিতে যে তিন জন এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই যে সেই "উনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্ত ভ্রাতা"! কৈ, সেই "আলোক প্রাপ্ত ভ্রাতাদের" কেহইত সাধারণের টাকা দিয়া পাল্কী চড়িয়া, বাবু সাজিয়া, গোঁকে তা দিয়া গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হয় না। তাহাদের বোগলে ছাতি, হাতে লাঠি আর পায় জুতি। বাবুগিরির মধ্যে পিছনে জলের "সুরাই"-হাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনৈক চাকর বা পথ প্রদর্শক। অতি প্রত্যুষে "ভ্রাতা" আলু আর চাউল ধুতির খোঁটে বাঁধিয়া গৃহের বাহির হন, আর রাত্রি ৯।১০টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

একদিন রাত্রি ১০টার পর একটা প্রকাণ্ড মাঠ পার হইয়া আসিতেছি। সঙ্গে একটী সহকারী বন্ধু—চাকরাদি কেহ নাই। জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। ওলাউঠার ভয়ে দূরবর্ত্তী গ্রামে লোকে ক্ষীণকণ্ঠে হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, আর তাহার স্বরলহরি অল্প অল্প কাণে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হঠাৎ বঙ্কিম বাবুর "আনন্দ মঠের" কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, এই বীরভূম প্রদেশেই তাহার দৃশ্য স্থান (Scene)। বঙ্কিম বাবু কল্পনায় মন্বন্তরের যে ছবি আঁকিয়াছেন, আজ আমরা প্রকৃত ঘটনায় তাহা দেখিতেছি। কেবল দেখিতেছি না, ইংরেজ মুসলমানের ফৌজ, আর "বন্দে মাতরং" গীতধারী "সন্তানশ্রেণী"। আর নাই সেই "শান্তি" এবং "কল্যাণী"। কিন্তু ভগবানের মূর্ত্তিমতী "শান্তি" জন সাধারণের ভিতর দিয়া দয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়া মুমূর্ষু জনগণের প্রাণে শান্তি বিধান করিতেছে ; ব্রাহ্মপরিব্রাজকগণ "সন্তান শ্রেণীর" সেবার ভার গ্রহণ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জীর্ণ শীর্ণ লোকদিগের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ কি "সন্তান শ্রেণীর" স্থানীয় হইতে পারিবেন?—ব্রাহ্মিকাগণ কি "শান্তি" "কল্যাণীর" স্থান অধিকার করিতে পারিবেন? দুর্গতি নাশন পরমেশ্বর এই দুর্ভাগ্য পতিত দেশে কি সে দিন আনয়ন করিবেন না?

এখানে একটী গুরুতর কথা উঠিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ, ভারত সভা, রামপুর হাটের সদ্ভাব উদ্দীপনী সভা, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার

বিদ্যারত্নের উদ্দীপনায় ও বাবু নিমচাঁদ দত্তের চেষ্টায় আজিমগঞ্জের বণিক-জমিদার সম্প্রদায়দিগের কেহ কেহ এবং সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টও অন্ধ আতুর খোঁড়া বুড়ো, উপায়হীন দীনদরিদ্র, কর্ম্মাক্ষম স্ত্রী পুরুষদিগকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই সাহায্য কতদিন চলিবে? দু মাস চার মাস সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু কাহার সাধ্য একটা প্রদেশকে বৎসর দুই বৎসর কাল ব্যাপিয়া সাহায্য করিতে পারে? জন সাধারণের সাধ্য নাই, কোন সভাসমিতির শক্তি নাই। কেবল পারেন এক গবর্ণমেণ্ট। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন? দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য লাইসেন্স টাক্স স্থাপিত হইল, কিন্তু আজ তাহা রুষ যুদ্ধে ব্যথিত হইতে চলিয়াছে। যাহাদের রক্ত মাংসে এই অসংখ্য অর্থ উপার্জ্জিত হইয়াছে, আজ তাহাদের জন্য তাহার এক কপর্দ্দক ব্যয়ও অপব্যয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে! স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট লোকের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াও শুনিতেছেন না, লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়াও দেখিতেছেন না! প্রদেশীয় কমিসনর এপ্রিল ও মে মাস তদন্ত ও প্রতীক্ষণ (watch) করিতে বলিয়াছেন। এই দুই মাসে কেহ বাঁচিয়া থাকিলে ত গবর্ণমেণ্ট তৎপর সাহায্য করিবেন? গবর্ণমেণ্ট নিজকোষ হইতে ত কিছু দিতে সম্প্রতি প্রস্তুতই নহেন, আবার সাধারণের নিকট হইতে এজন্য যে সাহায্য আসিতেছে, তাহাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত! মেদিনীপুর হইতে রামপুর হাটের সদ্ভাব-উদ্দীপনী-সভাকে দেওয়ার জন্য দু-হাজার টাকা কালেক্টরের নিকট আসিয়াছিল, সেই টাকা গুলি পর্য্যন্ত এপর্য্যন্ত সভার হস্তগত হইল না। তাঁহারা উপযুক্ত রূপ অর্থাভাবে আশানুরূপ কাজ করিতে পারিতেছেন না। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিনই বাড়িতেছে; যতই দিন যাইতেছে, ততই লোকের অবস্থাও শোচনীয়তর হইতেছে।

যদি এ বৎসরও বিগত দুই বৎসরের ন্যায় বৃষ্টি না হয়, তবে নিশ্চয় রাঢ়ভূমি শ্মশানে পরিণত হইবে। আমরা এ অঞ্চলের লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই উপলব্ধি হইয়াছে যে, তাহারা বরং নিজ গৃহে পড়িয়া অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি এস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইবে না। কাসীম বাজারের মহারাণী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী তথায় গেলে দুই হাজার লোককে প্রতিদিন আহার দিতে প্রস্তুত আছেন, আমরা পাথেয় দিয়া এপর্য্যন্ত একটী লোককেও সেখানে পাঠাইতে পারিলাম না। যাহারা এত নিকটবর্ত্তী

স্থানেই যাইতে প্রস্তুত নয়, তাহারা কোন দূরবর্ত্তী উর্ব্বর স্থানে যাইয়া বাস করিবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিরাশা।

তার পর বৃষ্টি হইলেও ভাদ্র আশ্বিনের পূর্ব্বে এই অন্নকষ্ট উপশমিত হইবার নয়, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস না আসিলে একেবারে নিবারিত হইবার কথা নয়। এই সকল সভা সমিতি কিংবা গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের অধিকাংশই অ-কেজো লোক। যাহারা দেশের প্রকৃত বল, যাহারা দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা, তাহারা কিন্তু কাহারও নিকট হইতেই এপর্য্যন্ত কোন সাহায্য পাইতেছে না। দেশের প্রকৃত কৃষক-শ্রেণী মুসলমান-সম্প্রদায় ভিক্ষা বৃত্তিকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করে। যদি এদেশের কাহার মধ্যে কিছু মনুষ্যত্ব থাকিয়া থাকে, তবে তাহা কেবল এই মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। তাহারা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে কত কষ্টে দিন কাটাইতেছে, অথচ পারতপক্ষে আমাদের কাহার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে না। যদি আমরা গ্রামে গেলে কাহার নিকট কিছু আতিথ্য সৎকার পাই, তবে তাহা এই মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট। দুই এক জন হিন্দুর নিকটও না পাইয়াছি এরূপ নহে। ইহাদের ঘরে যা কিছু ছিল, তদ্দ্বারা এতদিন তাহারা দিন কাটাইয়াছে, এখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। দিন দিন দুর্ভিক্ষের আকার ভীষণতর হইতেছে। একে অন্নকষ্ট, তাতে আবার দারুণ জলকষ্ট। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোক সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। আমার অনেক সময় মনে হয়, গবর্ণমেণ্ট কিংবা এই সকল দুর্ভিক্ষ-নিবারণী-সভা সমিতি অন্ধ আতুর, খোঁড়া বুড়ো কিংবা অ-কেজো লোকদের সাহায্য না করিয়া এই সকল কৃষকদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হউন। ইহারা অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে অখাদ্য খাইয়া যেরূপ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, অবশেষে হয়ত দুশ্চিকিৎস্য রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, কে আর চাষ বাস করিবে? ইহাদের সন্তান সন্ততি এই অল্প বয়সে রোগাক্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, ইহাদের দ্বারা ভবিষ্যতের কি আশা ভরসা? দেশের ভবিষ্যৎ-আশাস্থল বালক সম্প্রদায় যদি সবল ও সুস্থকায় না হয়, তবে কতকগুলি ক্ষীণজীবী অসাড় দুর্ব্বল-প্রাণ চটক সম্প্রদায় যেখানে সেখানে যার তার লাথি গোঁত খাইয়া মরিবে না ত কি? ভারতসভা এবং ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টি অন্ততঃ এ দিকে আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। ভিক্ষা করিয়াই হউক আর সর্ব্বস্বান্ত হইয়াই হউক, যাহারা

কোন রূপে প্রাণে মাত্র বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা ভবিষ্যতে কি করিয়া খাইবে? বৃষ্টি হইলে ভবিষ্যতের জন্য হাল চাষ করিতে হইবে, ক্ষেত্রে ধান বপন করিতে হইবে। কিন্তু হালের গোরু, বীজের ধান কিছুই যে নাই; চাষ বাস করিবে কি খাইয়া, কি দিয়া? ইহাদের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধসাচ্ছন্ন। যাঁহারা এখন ইহাদিগের জীবন বাঁচাইতেছেন, তাঁহারা কি ইহাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করিবেন না? নতুবা যে এদের চির দুর্ভিক্ষ ঘুচিবে না; জীবন মরণ দুইই সমান। ইহাদের এই চির দারিদ্র্য না ঘুচিলে, এরূপ দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী।

তার পর এদের নীতিশিক্ষা। যাঁহারা হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরীন্ অবস্থা জানেন না, যাঁহারা জনসাধারণের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অবগত নহেন, তাঁহারাই উচ্চকণ্ঠে হিন্দুসমাজের,—ভারতবর্ষের সামাজিক ও নৈতিক গুণপনার দুন্দুভি বাজাইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ, শূদ্র লইয়াই হিন্দুসমাজ গঠিত; তাঁহাদের আমাদের কয়জনকে লইয়াই এ দেশের জনসংখ্যা!—এই ২৫ কোটী ভারতবাসীর সকলেই হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর ন্যায় নৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় উন্নত! জনসংখ্যার তুলনায় তুমি আমি কয় জন?—অনন্ত সমাজ-সমুদ্রে সামান্য জলবুদ্‌বুদ্। যাঁহাদের দেশের প্রকৃত অবস্থার জ্ঞান নাই, তাঁহারা যে অন্য দেশের নিম্ন শ্রেণীর দুর্নীতির কথা শুনিয়া কাণে হাত দিবেন, শত মুখে দেশশুদ্ধ উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকদিগের সামাজিক ও নৈতিক রীতি নীতির দোষ কীর্ত্তন করিবেন, তার আর বিচিত্র? তুমি তোমার সংবাদপত্রে, মাসিক পাক্ষিক কাগজে ইংলণ্ডের ছোট লোকদের নৈতিক অবনতির কথা লইয়া মজা মারিতেছ, আর তোমার ঘরের দ্বারে, চক্ষের সমক্ষে তোমার প্রতিবাসীর গৃহে কি ঘটিতেছে এক বার চাহিয়া দেখিতেছ না? এই বীরভূমে, সভ্য রাঢ়দেশে আসিয়া দেখ, লোকের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কি শোচনীয়। সত্যপ্রিয়তা, ধর্ম্মপরায়ণতার কথা ছাড়িয়া দাও। এখানকার নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনের পর্য্যন্ত একটা পবিত্রতা নাই; পরদার একটা পাপের মধ্যেই গণ্য নহে। স্বামী স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া অনায়াসে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতেছে, স্ত্রী স্বামী ও সন্তান ফেলিয়া অন্য পতি গ্রহণ করিতেছে! পুত্র মাতাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেছে! সমাজ তাহা সমর্থন করিতেছে ভিন্ন দোষাবহ মনে করিতেছে না! কেবল কি

এ প্রদেশেরই এ অবস্থা? অন্যত্র পতি-পত্নীর সম্বন্ধ এরূপ বিশৃঙ্খল না হইলেও, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পরদার যে কত বহুল পরিমাণে প্রচলিত, যাঁহারা মফস্বলের অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই কি সুধু এরূপ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়, উচ্চশ্রেণীতে কি পায় না? এ কথাই বা কিরূপে বলিব? কত বড় বড় ঘরে কত কত ঘটনা রাত দিন ঘটিতেছে, রেণল্ডস্‌এর মত লোক থাকিলে, তাহা লইয়াও মিষ্টেরিস্-অব-লণ্ডনের ন্যায় কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থ এ দেশে রচিত হইত। তা ই কি নাই? "হরিদাসের গুপ্ত কথা" কোন্ অংশে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? আজ কাল বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ দুর্দ্দশা, এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা যে আর বৃদ্ধি পায় নাই, কিরূপে বলিব?

এ অঞ্চলের লোকের অন্নকষ্টের পরই নৈতিক দুর্গতির কথা মনে পড়ে। এ দেশের শিক্ষিত সমাজের, ধর্ম্মসমাজ সকলের কি ইহাদের সম্বন্ধে কিছু কর্ত্তব্য নাই, ইহাদের নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে কি তাঁহাদের কোন দায়িত্ব নাই? যাহাদের লইয়া সমাজ, যাহাদের লইয়া দেশ, তাহাদের ছাড়িয়া কেবল তোমার আমার সামাজিক অবস্থা উন্নত হইলে, তোমার আমার রীতি নীতি বিশুদ্ধ হইলে কি হইবে? নতুবা দলাদলি করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, ধর্ম্ম বিরোধ বাড়াইয়া কি হইবে? যদি দেশটার কিছু করিতে হয়, তবে গলাবাজি ছাড়িয়া প্রকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া পরার্থে ভগবানের নামে জীবনটাকে উৎসর্গ করিতে হইবে।

শ্রী——

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার।

প্রথমে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সম্প্রদায় ছিল না; সকলেই আদি ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ কতকগুলি ব্রাহ্ম সেই বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন, আর অমনি ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল। একণে ব্রাহ্মেরা অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে চলিলেন। এই সকল দলের ব্রাহ্মেরা নিজ নিজ প্রণালী অনুসারে উপাসনা কার্য্য অথবা গার্হস্থ্য ও সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদন করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা সকলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কালে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক ভাব

রক্ষা করেন ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক ভাব রক্ষা করা যাইতে পারে যদি আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ মত প্রচার না করিয়া কেবল সার ধর্ম্ম প্রচার করি এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের ট্রষ্ট-ডিডে যাহা লিখিত আছে "Strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds" অর্থাৎ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঐক্য বন্ধন দৃঢ়ীকরণ কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোযোগী হই।

পৃথিবীতে অনেক ধর্ম্মমত আছে, কিন্তু ধর্ম্ম একমাত্র। তাহা ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। যেমন একই সমুদ্র ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা একই সমুদ্র; তেমনি ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা এক। যেমন মনুষ্যের মুখশ্রী ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। কতকগুলি লোক অধিক পরিমাণে এক মতাবলম্বী হইলে (সম্যক্ পরিমাণে হইবার জো নাই) তাহারা স্বভাবতঃ সম্প্রদায় বদ্ধ হয়। এই রূপ পৃথিবীতে চিরকাল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে ও চিরকালই হইবেক। এইরূপ সম্প্রদায় হউক, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি চিরকাল পৃথিবীতে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য থাকিবে। দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যা ক্রমে এক্ষণে সহজ ও সরল আকার ধারণ করিয়া এক কিম্বা অতি অল্প সংখ্যক নিদান-সূত্রে গিয়া দাঁড়াইতেছে। ধর্ম্মও তেমনি সহজ ও সরল আকার ধারণ করিতেছে। এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, পরিশেষে "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ" এই মহাবাক্য যে একমাত্র ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করে সেই ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে। "নামে রুচি ও জীবে দয়া" সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। ইহাই সারধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকালে কোন বিশেষ মত প্রচার না করিয়া যত আমরা এই সারধর্ম্ম প্রচার করিব, ততই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হইব। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন প্রচার করিতে গেলে অবশ্য তাহার সঙ্গে একটু মত প্রচার আইসে, অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন ও তিনি প্রীতি যোগ্য এবং পরকাল আছে, তাহা না হইলে মনুষ্যের প্রতি তাঁহার প্রেমের সার্থকতা হয় না; এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে গেলে নীতির নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজে যতটুকু মত আছে মতের মধ্যে সেইটুকু প্রচার আইসে ও তাহাই প্রচার করা কর্ত্তব্য। অধিক আমরা জানিতে পারি না ও জানিবার আবশ্যকও নাই এবং প্রচার করিবারও আবশ্যক নাই। কতকগুলা মত, মত সূচক কতকগুলা বড় বড় শব্দ, কতকগুলা ক্রিয়া কলাপ এবং দেবতার ন্যায় পূজার পাত্র স্বরূপ করা কতকগুলি ব্যক্তির নামের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম জড়াইলে তাহাকে বিপদগ্রস্ত করা হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই সকল ধর্ম্মের ঐক্যস্থল। কেবল উহা প্রচার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক ভাব যেমন রক্ষিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। আমাদিগের বিশ্বাস যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন বিষয়ে প্রকৃষ্ট বাক্য আমাদিগের প্রাচীন ঋষিদিগের গ্রন্থে যেমন পাওয়া যায়, এমন আর অন্য কোন খানে পাওয়া যায় না এবং সকল জাতির ঐ সম্বন্ধীয় প্রকৃষ্ট বাক্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাক্য সকল একস্থানে যেমন আমাদিগের অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদিগের জীবন-নায়ক ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায়, এমন আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা আমাদিগের নিজের বিশ্বাস, এ বিশ্বাস যে পৃথিবীস্থ সমস্ত ব্রাহ্মের হইবে এমত প্রত্যাশা আমরা কখনই করিতে পারি না। আমরা হিন্দু; ব্রহ্ম নাম আমাদিগের যেমন মধুর লাগে এবং মনে যত ভাবের উদ্রেক করে, তেমন ঈশ্বরের অন্য কোন নাম করে না। কিন্তু আমরা এমন প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, ঐ নাম ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মের মনে ঐরূপ ভাবের উদ্রেক করিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য যে প্রচার কালে তাঁহারা সারধর্ম্মের শরীরশাঁসের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, ধর্ম্মের খোলা অপেক্ষা তাহার শাঁসের প্রতি লোকের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁহারা লোককে সর্ব্বদা বুঝাইয়া দেন যে সহস্র ক্রিয়া কলাপ অপেক্ষা, ধর্ম্ম বিষয়ে সহস্র তর্ক অপেক্ষা, ধর্ম্ম বিষয়ে সহস্র প্রকার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন অপেক্ষা, সহস্র ধর্ম্মামোদ অপেক্ষা, বিষয় কর্ম্মের সময় ঈশ্বরকে একবার প্রীতি পূর্ব্বক স্মরণ, রিপু দমন জন্য একবার সকল বলের সহিত আন্তরিক চেষ্টা ও একটী মাত্র পরোপকার জনক কার্য্য সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষার জন্য সারধর্ম্ম প্রচার এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন আবশ্যক। উপরে

যাহা লিখিত হইল তাহা সারধর্ম্ম প্রচার বিষয়ক। এখন সকল ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন বিষয়ে বলা যাইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকালে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা পাইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক ভাব বিশেষরূপে রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু এজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের একটী বিশেষ গুণ সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। সে গুণ এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক সাম্প্রদায়িক হইয়াও অসাম্প্রদায়িক হই-বেন। গুটিপোকা যেমন গুটি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনাকে জড়ায়, কেবল এক পর্দ্দা সূতা দিয়া আপনাকে জড়ায় না, অনেক পর্দ্দা সূতা দিয়া জড়ায়, তেমনি সম্প্রদায়ের ভিতর সম্প্রদায় করিতে মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; কেহ সম্প্রদায় ভুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও অন্তরে অসাম্প্রদায়িক। অন্তরে তিনি কোন বিশেষ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী নহেন। তিনি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী। তিনি পৃথিবীস্থ কোন ধর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করেন না। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য, সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিয়াছি; কিন্তু তাহা বলিয়া অন্য ধর্ম্মকে ঘৃণা করিবার আমাদিগের অধিকার নাই, যেহেতু কোন ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্মের পর নহে, সকল ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য আছে। যখন সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ, কেবল ঋজু কুটিল এই মাত্র প্রভেদ, যখন সকল ধর্ম্মে সত্য আছে এবং সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের উপদেশ আছে, (এরূপ উপদেশ না থাকিলে অথবা সাধারণতঃ দুর্নীতি পোষক উপদেশ থাকিলে কোন ধর্ম্মই ধর্ম্ম শব্দের বাচ্য হইতে পারে না) তখন কোন ধর্ম্মকে বিদ্বেষ করিবার কারণ নাই। প্রকৃত ব্রাহ্ম সকল ধর্ম্মের প্রতি ঔদার্য্য ভাব প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি একান্ত কামনা করিয়াও কোন ধর্ম্মকে বিদ্বেষ নয়নে দেখেন না। তিনি সকল ধর্ম্মা-বলম্বীর উপাসনাতে বিভিন্ন প্রকারে সেই একমাত্র প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের উপা-সনা দেখিয়া সুখী হয়েন। "The first right of private judgment is to draw nearer to God in its own way" "ব্যক্তিগত বিবেকের প্রধান অধিকার এই যে, সে আপনার প্রণালী অনুসারেই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবে" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া তিনি উদারভাবে সকল ধর্ম্মকে দৃষ্টি করেন। তিনি মহাত্মা নিউম্যানের প্রার্থনায় সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত যোগ দেন:—"Lord! enable us to discern thy servants, under whatever strange name

or false creed they may be hidden" "প্রভো! অদ্ভুত নামের অথবা মিথ্যা ধর্ম্মমতের ছদ্মবেশে লুক্কায়িত তোমার প্রকৃত সেবককে চিনিতে আমাদিগকে সমর্থ কর।" তিনি এই প্রার্থনায় সমস্ত হৃদয়ের সহিত যোগ দেন, কিন্তু নিউম্যানের ন্যায় কোন ধর্ম্মমতকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলেন না, যেহেতু সকল ধর্ম্মমতেই কিছু না কিছু সত্য আছে। নিকৃষ্ট ধর্ম্মকে বিদ্বেষ করিবার যেমন আমাদিগের অধিকার আছে, দেবতাদিগের অর্থাৎ আমাদিগের অপেক্ষা উন্নত জীবদিগের,—যাঁহাদিগের ধর্ম্মমত আমাদিগের ধর্ম্মমত অপেক্ষা উন্নত,—আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করিবার তেমনি অধিকার আছে। প্রকৃত ব্রাহ্ম অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ভক্তি ও প্রেমভাবপূর্ণ ধর্ম্ম সঙ্গীত অথবা বাক্য সেই একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে নিয়োগপূর্ব্বক তাহা গাইয়া অথবা উদ্ধৃত করিয়া আনন্দানুভব করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। তিনি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নামকরণ বিবাহাদি গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে যোগ না দিয়া কেবলমাত্র উপস্থিত থাকিতে কোন আপত্তি করেন না। এইরূপ উপস্থিত থাকিলে অন্যের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তিনি এইরূপ জ্ঞান করেন। প্রকৃত ব্রাহ্ম অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ক্রিয়াতে উপস্থিত থাকেন; কিন্তু নিজে যখন কোন ক্রিয়া করেন, তখন অবশ্য ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে করেন। প্রকৃত ব্রাহ্ম এমনরূপে আচরণ করেন যেন কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ না পায়। যেমন কোন বিশেষ মনুষ্য অথবা মনুষ্য জাতিকে আয়ত্ত করিতে গেলে তাহার অথবা তাহাদিগের সহিত বন্ধুতা করিয়া যেমন করা যায় তেমন শত্রুতাচরণ করিয়া করা যায় না, তেমনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে বন্ধুভাবে সেই ধর্ম্মের প্রতি আচরণ করিলে যেমন তাহা করা যাইতে পারে তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া তেমন করা যাইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মম্ভরী ধর্ম্ম নহে। উহা এরূপ বিশ্বাস করে না যে আর সকল ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, কেবল উহাই পৃথিবীতে একমাত্র অভ্রান্ত অনন্যতব্য ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মে যে বিশ্বাস করিবে সে অনন্ত নরকে পতিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ধর্ম্মে আছে। সেই সকল ধর্ম্মকে আত্মীয় ভাবিয়া সেই সকল সত্যকে পত্তনভূমি করিয়া উহা সকল ধর্ম্মকে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করিবে। যেমন কোন সুন্দর মনোহর-স্বভাব-সম্পন্ন জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক যুবা আপনার প্রিয় বৃদ্ধ

বন্ধুকে কোমল উপায়ে ভ্রম হইতে বিমুক্ত করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তেমনি প্রাচীন ধর্ম্মদিগকে ভ্রম হইতে বিমুক্ত করিবেন।*

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মনুষ্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হ্রাস করিতে বিশেষ যত্নবান্ হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীকে অন্য ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐক্য ও শেষোক্ত ধর্ম্মের কি বিশেষ গুণ তাহা দেখাইয়া দেন। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীকে এই গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস না করে কিন্তু একান্ত ঈশ্বরভক্ত ও পরোপকারী হয় তাহা হইলে কি সে নরকে পতিত হইবে? সে প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য বলিবে যে, সে নরকে পতিত হইবে; কিন্তু ক্রমে তাহার মনে এই বিষয়ে বিবেকের উদয় হইলে ঐ প্রশ্নের উত্তরে"না"না বলিয়া থাকিতে পারিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক এইরূপে মনুষ্য সমাজে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিতে যত্নবান্ হয়েন। তিনি হিন্দুদিগের মধ্যে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্য, মুসলমানদিগের মধ্যে কোরাণোক্ত "তোমাদিগের ধর্ম্ম যথার্থতঃ সেই একমাত্র ধর্ম্মই" ইত্যাদি বাক্য ও সুফী কবিদিগের বাক্য এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে "Verily I believe there is no respect of persons with God," ইত্যাদি তাঁহাদিগের শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্য মূলক উপদেশদ্বারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিতে যত্নবান্ হয়েন। তিনি লোকদিগকে সর্ব্বদা সকল ধর্ম্মের ঐক্য বিষয়ে উপদেশ দেন এবং সকল শাস্ত্র হইতে ইহার প্রতি-পোষক বাক্য উদ্ধৃত করেন। এ বিষয়ে বর্ত্তমান ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অধিক মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা এ বিষয়ে প্রতিপোষক বাক্য অন্য গ্রন্থ অপেক্ষা হাফেজ ও অন্যান্য সুফী কবি হইতে অধিক উদ্ধৃত করিতে ভাল বাসিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক জাতি সাধা-রণের উপকারজনক কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে সম্মিলিত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব মনুষ্য সমাজ হইতে দূর করিতে যত্নবান্ হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচা-রক যেমন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হয়েন, তেমনি অধিকতররূপে ব্রাহ্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যেও সদ্ভাব সংস্থাপনে যত্নবান্ হয়েন। শান্তি ও প্রেমের দূতস্বরূপ তিনি, ইহা তাঁহার একটী প্রধান কার্য্য জ্ঞান করেন।

---

* Even if there were no instances in history of a friendly

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক যাহাতে মনুষ্যের মধ্যে অসদ্ভাবের সঞ্চার হয় এমন পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন না। তিনি তর্ক ও বিরোধের পথ অবলম্বন করিয়া লোকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝান না। প্রীতি জ্ঞানে লইয়া যায় এবং যে ব্যক্তি নিতান্ত ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বর তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ করেন, তিনি এই সত্যের প্রতি প্রধানতঃ নির্ভর করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক তর্ক ও মত লইয়া বিবাদকে জ্ঞান সঞ্চারের প্রকৃষ্ট উপায় না মনে করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকেন এবং ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ উপদেশদ্বারা মনুষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বর বিষয়ক যে স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয় আছে, তাহা স্ফুরিত করিতে যত্নবান্ হয়েন। তিনি যদি সত্যের অনুরোধে একান্ত তর্ক করিতে বাধ্য হয়েন তাহা হইলে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া তর্ক করেন। শুষ্ক তর্ক ধর্ম্মের প্রকৃত পত্তনভূমি নহে। যেমন নব মধুমক্ষিকা মধু কি পদার্থ তাহা অবগত না হইয়া মধুর প্রীতিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মধুগর্ভ পুষ্পদিকে ধাবিত হয়, ধাবিত হইয়া পরে বিজ্ঞাত হয় মধুগর্ভ পুষ্প ও মধু কি পদার্থ,ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য সেইরূপ। প্রথম প্রীতি তৎপরে জ্ঞান। প্রীতি জ্ঞানে লইয়া যায়। যে ভক্ত ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া উজ্জ্বলরূপে ভাবে (ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ইহা পৌত্তলিকদিগেরও বিশ্বাস), সে কখনই তাঁহাকে মূর্ত্তি-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারে না। যে ব্যক্তির মনে ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ়* ভক্তির উদয় হইয়াছে সে কখনই তাঁহাকে পুষ্পপত্রতোয় দ্বারা উপাসনা করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না; সে অবশ্য ভক্তি ও প্রীতি পুষ্পের

---

mode of propagation, Brahmoism would be right in adopting it as more consistent with its really meek and benevolent nature, as being more civilized in character. . . . Even, if an antagonistic method of propagation were more successful than a friendly one, Brahmoism would be justified in rejecting the former as inconsistent with its own genius. But that is not however the case. A friendly mode of propagation is more persuasive and therefore more successful than an antagonistic one. . . . "Theism can be better propagated by the positive inculcation of its truths, and shewing clearly its intrinsic beauty to mankind without making direct offensive attacks on the old religion." "The Adi Brahmo Samaj as a Church." pp. 8-9.

দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বদা সহবাস ও আলাপ করেন, তিনি কখন মধ্যস্থে বিশ্বাস করিতে পারেন না। প্রীতি এইরূপে জ্ঞানে লইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত রোমান কেথলিক খ্রীষ্টিয়ান টমাস্-এ-কেম্পিস ও পৌত্তলিক হিন্দু রামপ্রসাদ, টুকারাম ও তুলসীদাস। যাঁহাদিগকে প্রীতি জ্ঞানে লইয়া গিয়াছিল তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধনের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত জ্ঞানোপদেশের মধ্যে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়! টমাস-এ-কেম্পিসের সঙ্গে আমাদিগের উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! যদ্যপি আমাদিগের উক্ত সকল শাস্ত্র টমাস-এ-কেম্পিস অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ তথাপি এই সাদৃশ্য দেখিয়া কি সন্তুষ্ট হওয়া যায়! ধর্ম্মমত ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু রোমান কেথলিক টমাস্-এ-কেম্পিসের গ্রন্থ চিরকাল থাকিবে। প্রীতি যে জ্ঞানে লইয়া যায় সে জ্ঞান অতি সারবান্ ও পরিপক্ক। "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রেমময় ও বিষয়াতীত অমায়িক প্রেম জ্ঞানময়"। কেবল তাহাতে অনেক আধ্যাত্মিক পরীক্ষার ফল উল্লিখিত সারবান্ ও পরিপক্ক প্রীতির কথা আছে বলিয়া আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের এত মর্য্যাদা! নীরস জ্ঞান ও শুষ্ক তর্ক ধর্ম্ম বিষয়ে ফলোপদায়ক হয় না। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে নীরস জ্ঞান ও শুষ্ক তর্কের প্রাচুর্ভাব ছিল। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ ফল প্রসব করে নাই। এক্ষণে আত্মপ্রত্যয় ও প্রীতিমূলক জ্ঞান কি সুন্দর ফল চতুর্দ্দিকে প্রসব করিতেছে! সে ফল দেখিয়া নয়ন মন জুড়াইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রীতিপ্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে প্রীতি-প্রধান প্রণালী আবশ্যক। এখন পৃথিবীস্থ সকল জাতির পরস্পর প্রীতির দিকে গতি হইতেছে। পৃথিবীর কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ কিম্বা অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক বিপদ হইলে অন্যান্য জাতিরা সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। মধ্যে মধ্যে এমনও ঘটিতেছে যে দুই জাতিতে বিবাদ হইলে তাহারা যুদ্ধ না করিয়া জাতি-সাধারণ সালিসী দ্বারা সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া লয়। ইহার দুই তিনটি দৃষ্টান্ত হইয়া গিয়াছে। যখন এরূপ সালিসী একবার আরম্ভ হইয়াছে তখন ভরসা করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে সভ্যতা ও জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমাগত অবলম্বিত হইয়া সংগ্রাম প্রথা পৃথিবী হইতে দূর করিবে। এক সময়ে ক্রীতদাস প্রথা পৃথিবীর সকল

স্থানে প্রচলিত ছিল এক্ষণে সেরূপ নাই, ভরসা করা যাইতে পারে যে সংগ্রাম প্রথা সেইরূপ হইবে। তখন সংগ্রাম অবলম্বন অসভ্যতার কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইবে। যখন পৃথিবীস্থ সকল জাতির পরস্পর প্রীতির দিকে গতি হইতেছে, তখন ধর্ম্ম-যাহার প্রাণ প্রীতি তাহার প্রচার প্রণালী প্রীতি প্রধান হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে তরবারি ও চিতাগ্নি ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান উপায় ছিল, এখন সে কাল গিয়াছে। এখন প্রীতি প্রধান প্রণালী দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি প্রচার করা কর্ত্তব্য। এই মহা ধর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে সকল জাতির ঐক্য সাধন হইতে পারিবে।

বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়েরা উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করেন এবং আপনাদিগের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রচার প্রণালীর সঙ্গে মিলাইয়া যতদূর পারেন কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহারা প্রচার সময়ে যেন দুইটী বাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, (১) ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। (২) অন্যের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান। কবে এই বাক্য-দ্বয় তাহাদিগের সার্থকতা সম্পাদন করিবে? কবে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি এবং অন্যের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কর্ত্ত-ব্যতা জ্ঞান আপনাদিগের সিংহাসন মানবাত্মাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে? কবে সকল মনুষ্য ঈশ্বরকে প্রীতি করিয়া, পরস্পরকে প্রীতি করিয়া এবং অন্যের বিবেককে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া মর্ত্ত্যলোককে সুখ শান্তির আলয়ে পরিণত করিবে? কবে সকল মনুষ্যজাতি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া মত বিভেদ সত্বেও সেই সর্ব্বজাতির পিতা মাতা ঈশ্বরের উপাসনাতে একত্র সম্মিলিত হইতে আপত্তি করিবে না? কবে এইরূপ সম্মিলিত উপাসনা প্রেম ও শান্তির রাজ্য আনয়ন করিবে? যে ব্রাহ্ম যতটুকু রাজ্য আনয়ন কার্য্যে সাহায্য করিবেন, তিনি ততটুকু অক্ষয় পুণ্য লাভ করিবেন।

"Tell us when shall all men gather
In one vast cathedral hall,
Worshipping a common father,
Leading, guiding, loving all?
Worlds the circle, God the centre,

Where nor war nor hate shall enter;
All that severs man unheeding,
All that links and fuses blending;
All from heavenly founts proceeding,
All to heavenly issues tending,
Good supplanting evil; gladness
Scattering every shade of sadness.

"কবে একত্রিত হবে সকল মানব
এক মহা ধর্ম্মালয়ে, বলহে আমারে;
পূজিবে যথায় তাঁকে যিনি সর্ব্বপিতা
চালান সকলে যিনি প্রেম সহকারে।
জগৎ হইবে বৃত্ত, বিভু তার কেন্দ্র,
যথা না যুদ্ধ না দ্বেষ প্রবেশ করিবে;
যাহা কিছু পৃথকয়ে নর হতে নরে
প্রেমেতে গলিয়া সব একত্র মিশিবে।
স্বরগীয় উৎস হইতে সকলি বহিবে,
স্বরগীয় লক্ষ্য সব সকলে সাধিবে,
অমঙ্গল উঠাইয়া মঙ্গল বসিবে,
বিষাদের সূক্ষ্মতম কালিমা অবধি
প্রক্ষালিয়া বিরাজিবে সুখ নিরবধি"

"শান্তি সুধা সর্ব্ব ভুবন বিস্তারো,
ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে!
অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত
পুণ্য সলিল বরিষ বরিষ অমৃত।

*　　*　　*

বিশ্ব নিয়ন্তা বিভু ন্যায়সিন্ধু
ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে।
দিব্য পিতা প্রভু পরম কৃপাময়
বিতর সবে শান্তি সুমতি সতত।"

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

লোকভয়।

ইংরাজ ভারত জয় করিয়াছেন, ভারত বাহুবলে শাসন করিতেছেন; করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। পিতা পুত্রকে প্রতিপালন করিয়া মানুষ করেন, তিনি পুত্রকে শাসনও করিবেন, তাঁহার এ অধিকার আছে। বর্ত্তমান সমাজে স্ত্রী অসহায়া, নিরাশ্রয়া, স্বাবলম্বনে স্বরক্ষণে অসমর্থা,—এজন্য তিনি স্বামীর শাসনাধীনে থাকেন, স্বামীর সে অধিকার আছে। শিক্ষক ছাত্রের কল্যাণের জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন, ছাত্রও নিজের মঙ্গল নিজে চিনিয়া লইয়া তথাবিধ উপায় অবলম্বনে অসমর্থ বলিয়া সে শিক্ষকের নেতৃত্বাধীনে আপনার বাল্য জীবন সংগঠন করিয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক; এই শাসনেও শিক্ষকের অধিকার আছে। কবি নির্জ্জন গিরিকন্দরে বা নিবিড় কাননে বসিয়া প্রকৃতির সুরে নিজের সুর মিলাইয়া গগন কাঁপাইয়া সংগীত ধ্বনি তুলিলেন, বায়ু মণ্ডল সেই সুরে বিকম্পিত, আন্দোলিত, সুললিত হইল; সেই সংগীত শেষে মানবগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ স্পর্শ করিল, মানব মোহিত হইল, আত্মসমর্পণ করিয়া কবির চরণে প্রাণ বাঁধিয়া দিল, কবির দাসত্ব স্বীকার করিল। এ প্রাণশাসনেও কবির অধিকার আছে। সুপ্রাচীন কালের অন্ধকার গহ্বর হইতে যখন মানব প্রকৃতি ইতিহাস-রবে ডাকিয়া আহ্বান করে, মানব মনকে আকর্ষণ করে, মানুষ তখন মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া নিজের প্রাচীন কীর্ত্তি স্মরণ করতঃ অবাক্ হয়, হাসে, কাঁদে, মাতে, কত কি করে, যেন তার প্রাণে ইতিহাস শাসন বিস্তার করিতেছে;—এ শাসনে ইতিহাসের অধিকার আছে। সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে ধীরে গম্ভীরে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সুমধুরের পর সুমধুরে সমীরণকে নাচাইয়া যখন কৃষকবালা প্রাণ-সংগীতের দ্বার খুলিয়া দেয়, তখন অশ্বারোহী ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের প্রাণ তাহাতে হারাইয়া যায়, তিনি শুনিয়া শুনিয়া আরও শুনিয়া প্রাণ ভরিয়া লইয়া শেষে জগৎকে আবার সেই গীত শুনান। তাঁহার মহাপ্রাণের উপরেও দীনা কৃষকবালার গীতলক্ষ্মীর আধিপত্যের অধিকার আছে,—এ সকলই বুঝিতে পারি, বুঝাইতে পারি। কিন্তু লোকভয়! মানবের প্রাণে তোমার শাসন কেন? তথায় তোমার কি অধিকার? বুঝাব কি, বুঝিতেই পারি নাই।

ভগবান্ মানুষকে স্বাধীন করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তবে সে পরাধীন কেন হয়? এ সহজ কথা। ভগবান যখন তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তখন পরাধীন হইবারও তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে মানিলাম। কিন্তু সে কখন?—যখন সে কোন প্রবল বস্তুর সম্মুখে আসে, যখন এমন জিনিষ সম্মুখে দেখে যাহার বলে, যাহার সমধিক শক্তির নিকট বা যাহার সৌন্দর্য্যের আতিশয্যের নিকট, বা যাহার প্রাণমনোহরণ ক্ষমতার নিকট মানুষের কঠোরতা হারি মানে, আর তাহাকে তাড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই তাহার চরণে প্রাণকে বাঁধিয়া দেয়। এই ই ত স্বাভাবিক। ইহাইত মানবের ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা ধনের সদ্ব্যবহার এবং সঙ্গত ব্যবহার। ইংরাজ কি উপায়ে ভারতের মানবসমূহের জীবন নিজ শৃঙ্খলে বাঁধিলেন তাহা বিস্মৃত হই। কেন আজিও তাঁহার চরণে ভারতীর মস্তক বিলুণ্ঠিত তাহাও চিন্তা করিব না। কিন্তু একটা কথা—ইংরাজের রাজত্বে আমাদের উপকার আছে কি না? যদি থাকে তবে সে উপকার প্রার্থনীয় কি না? যদি হয় তবে তাঁহার শাসনাধীনে থাকিতে আমরা ইচ্ছুক, স্বাধীনভাবেই ইচ্ছুক। কাজেই অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ যদি ন্যায়ের সহিত রাজ্য শাসন করেন, তবে তাঁহার শাসনের পূর্ণ অধিকার আছে। আমাদেরও তাহাতে স্বাধীনতা লোপ পাইবে না। আমরা স্বাধীন ভাবেই তাঁহাকে আত্মবিক্রয় করিয়াছি বুঝিব। আর যদি তিনি আমাদের উপর অত্যাচার করেন, ঘোর অবিচার নরহত্যাদি করেন, আমাদের মানবীয় স্বত্বসমূহ ক্রমে লোপ করিবার প্রয়াস পান, তবে আর তাঁহাকে আমরা এ আধিপত্যের অধিকারী বলিব না। তখন সমগ্র ভারতবাসী প্রাণপণে ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্ হইবে। বস্তুতঃই পরাধীনতায় দোষ নাই, যদি সে পরাধীনতা স্বাধীনতা হইতে উৎপন্ন হয়। স্বাধীন ভাবে মানুষ স্বয়ং পরমেশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে এবং ঐ পরাধীনতাই আবার মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার, উন্নততম স্বাধীনতা। কিন্তু যেখানে দেখি ধর্ম্মও মানুষকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বলপূর্ব্বক সংযত রাখিতেছে, যেখানে দেখি ধর্ম্মমতের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ নিজের ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীন ভাবের কিয়ৎ পরিমাণেও সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইতেছে, অমনি চীৎকার ধ্বনি করিয়া বলিব, স্বাধীনতা লোপ! মনুষ্যত্ব লোপ! সর্ব্বনাশ! ত্রাহি ত্রাহি!!

স্বাধীন মানুষের গৌরব ও মহত্ত্ব যে কত, তাহা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বয়ং ধর্ম্মও তাহার স্বাধীনতার গৌরব বিনাশ চেষ্টা পাইবার যোগ্য নহেন। তাহা যদি হইত, তবে আর বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর সহিত মানবের কি প্রভেদ! পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মানুষকে ধরাপৃষ্ঠে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। প্রকৃতির অদম্য শক্তিসমূহও ক্ষুদ্র মানুষকে ভয় দেখাইতে পারিল না। মানুষ সকলকেই লঙ্কাধিপতি দশাননের ন্যায় পাশে বদ্ধ করিয়া দাসত্ব করাইয়া লইতেছেন। আকাশের বজ্রবিদ্যুৎ অবধি মানব সন্তানের ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে ও পরাজিত বন্দীভূত বিদেশীয় রাজার মত হইয়া মানবের আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিতেছে। অপার অতলস্পর্শ জলধিও আপন বক্ষঃ স্ফীত করিয়া অহঙ্কার করিতে পারিল না! মানুষ তাহারও বক্ষঃ বিদারণ করিয়া চলিবে, তাহারও গর্ভে অগণিত সামগ্রী দিয়া কতই উপকার সাধন করিয়া লইল। তাহার তলদেশ দিয়া পর্য্যন্ত আপন বিদ্যুল্লতাধার সংবাদবাহী তার (Cables) চালাইয়া লইল। কি দম্ভ! কি অদমিত তেজ! কি বীরত্ব!

কিন্তু হায়! আবার যখন দেখি বীর-তনয় হইয়া, ভীরু কাপুরুষের ন্যায় নীচ সামান্য গৃহস্থের অন্যায় ভ্রকুটীতে ভীত হইয়া সে মলিনমুখে গৃহে ফিরিতেছে, যখন দেখি সিংহ-শিশু শৃগালের রব শুনিয়া ভয়াকুল মনে কেশর কুঞ্চিত করিয়া ও লাঙ্গুল গুটাইয়া গহ্বরান্বেষণে পলায়ন করিতেছে, যখন দেখি বিশ্বাধিপের স্বাধীন পুত্র হইয়া এই পৃথিবীর ধূলার সমান লোক-মুখনিঃসৃত বায়ু-বিকম্পনে ভীত ত্রস্ত তটস্থ হইয়া আকুল হইতেছে, যখন দেখি দক্ষিণ হস্তে সাগর মন্থন পূর্ব্বক বহুবিধ মহামূল্য রত্ন লাভ করতঃ পরক্ষণেই বামহস্ত তুচ্ছ লোকলাজভয়ে সঙ্কুচিত করিয়া বদন আচ্ছাদন করিতেছে, তখন প্রকৃতই প্রাণে আশঙ্কা হয়।—আশঙ্কা হয় আর সন্দেহ হয়—মানুষ কি এক জীব নয়? মানুষ কি সাধারণ স্বাধীনতা ধনের অধিকারী হইয়াও উহার ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়াছে? কে করিল? স্বয়ং পরমেশ্বর যাহাকে স্বাধীন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামাইয়া দিলেন, কে সেই দস্যু যে তাহাকে এই দুর্লভ মহামূল্য ধনে বঞ্চিত করে? তখন মনে হয় যে, লোকভয়, তোমাকে নমস্কার! তুমিই সয়তান! তোমার সঙ্গে বিশ্বপতির বিবাদ। সাবধান! সয়তান, আমার ছায়া স্পর্শও করিও না। তখন বলি

ধিক্ হে মানবকুল, তোমাদিগকে, যাহারা স্বার্থ হইতে স্বাধীনতার অক্ষয় অমোঘ পরওয়ানা পাইয়াও তাহার এতাদৃশ ঘোর অবমাননা করিতে পারিতেছ! তখন মনে ভয় হয়, ভাবনা হয়, দুঃখ হয়, শোক হয়। বলি এ সংসারে যদি লোকভয় অপরিহার্য্য, তবে উৎসন্ন যাও সংসার, উৎসন্ন যাও জনসমাজ, উৎসন্ন যাও ধর্ম্মসমাজ! মানুষের স্বাধীনতা ধনে আঘাত দিয়া সমাজ, সংসার, ধর্ম্ম! ঘোর অধর্ম্মে ধর্ম্ম! ঘোর অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ!

যদি দেখিতাম, মানুষ অন্যান্য স্থলের মত এখানেও স্বাধীনভাবে পরাধীনতার শৃঙ্খল পড়িল, তবে বুঝিতাম বেশ। তা ত নয়, কদাপি নয়। কোন একটী স্থলেও নয়। যখন দেখি মানুষ চায় একরূপ কাজ করিতে, সমাজ-ভয় লোকভয় তাহাকে করায় বিপরীতি কাজ! মানুষ বাধ্য হইয়া ঘাড়ের বেদনায় অস্থির হইয়া নির্জ্জনে রোদন করিয়া প্রাণের ক্লেশ বিমোচনের চেষ্টা পায়, যখন দেখি আমি স্থির বুঝিয়াছি কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, অথচ লোক-ভয়ে সেই পথ গ্রহণে সমর্থ হইলাম না, কুপথে পড়িয়া আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, রক্তে পদতলের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত অভিষিক্ত হইয়া গেল, মনে মনে শতবার সেই নিষ্ঠুর সামাজিক বা লৌকিক প্রথাকে অভি-সম্পাৎ করিতেছি, অথচ তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে একটী অক্ষর উচ্চারণের ক্ষমতা নাই, সাহস নাই, স্বাধীনতা নাই, তখন ভয়ে বিস্ময়ে ঘৃণায় হৃদয় বিজাতীয় ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠে। "ঘৃণিত মানব! ঘৃণিত সমাজ! ঘৃণিত নরককুণ্ড!" বলিয়া প্রাণ আস্ফালন করিয়া উঠে। যখন দেখি গোপনে শত সহস্র অপরাধ করিতেছি, সামাজিক ও লৌকিক নিয়মের (অথবা অনিয়মের) বিরুদ্ধে আমি কাজ করিতেছি, তুমি করিতেছ, এক এক করিয়া সমাজের পনের আনা লোকই করিতেছে, আবার সজনে বাহ্য সমাজাধিবেশনে বসিয়া অবলীলাক্রমে রুমালে মুখ মুছিয়া "সামাজিক নিয়ম লৌকিক প্রথা" বলিয়া বৃথা গর্দ্দভের মত চীৎকার করিতে কেহই ত্রুটি করি না, তখন মনুষ্যকে বিষ্ঠাধিবাসী কীটেরও অধম মনে হয়। যখন দেখি টাউনহলে আমার উচ্চরবের প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, করতালির সমস্বর সেই প্রতিধ্বনিকে চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিতেছে এবং সেই দেশহিতৈষী বক্তৃতার অন্তস্তলে মূলদেশে লোকানুরঞ্জনস্পৃহা বসিয়া পদাবলি সাজাইতে-ছেন ও বাক্য গ্রহন করিতেছেন, তখন বলি হায়! সরলতা, স্বাধীনতা, মানব-

প্রাণের কোমল স্বর্গীয় সামগ্রী সকল কি মর্ত্তভূমি পরিত্যাগ করিয়া গেল? স্বাধীনভাবে পরাধীনতাই স্বাধীনতা, আর পরাধীনভাবে স্বাধীনতাই পরাধীনতা, ঘৃণিত দাসত্ব। লোকভয়ে কিন্তু স্বাধীনভাব এক তিলও নাই। এজন্য উহা স্বাধীন জনসমাজে এত ঘৃণিত ও হেয়।

মানুষ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীর হাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া মধুর দাসত্ব সম্ভোগ করে। জননী কেমন স্বর্গীয়ভাবে আপন সুখ স্বচ্ছন্দতা সন্তানের হস্তে দিয়া মধুর পরাধীনতা উপভোগ করেন। বন্ধু কেমন বন্ধুর হাতে আপনার প্রাণের সমস্ত বিশ্বাস সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তরূপে পরমানন্দে বন্ধুর দাসত্বে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কৃতার্থ হন! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, অধীনতায় স্বাধীনতা দেখিয়া, মেঘের কাল গর্ভে বিজলীর স্বাধীন ক্রীড়া দেখিয়া, সাগরের গভীর জলরাশির মধ্যে তরঙ্গের স্বাধীন লীলা দেখিয়া, ঘোর অমানিশির গাঢ়তার মধ্যে গ্রহরাজ বৃহস্পতির হাস্য দেখিয়া, তখন আমরা বিমোহিত হই! মানবের দেবত্বের কেমন সুস্পষ্ট আভাস পাইয়া গৌরব অনুভব করি! কিন্তু হায়! শিক্ষিত, জ্ঞানালোকে বিভূষিত, স্বাধীনতার মহত্বগ্রাহী মানব সন্তানের ঘৃণিত পরাধীনতা, নীচ লোকমুখাপেক্ষিতা, পাশব লোক-মত-নির্ভরতা ও কাপুরুষোচিত লোক-ভয়বিহ্বলতা যখন চিন্তা করি, তখন ক্ষোভে যন্ত্রণায় প্রাণ অধীর হয়, ক্ষণকালের জন্য অপর কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছা হয় যে বলপূর্ব্বক ইহাদের নীচতার ঘোর ভাঙ্গিয়া দিই। পরক্ষণে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া ঈশ্বরের চরণে পতিত হই,—প্রার্থনা করি যেন তিনি এই সকল ক্ষুদ্র-চেতা জনগণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেন। এখানে আর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। স্বাধীনতায় বিধাতা স্বয়ং যদি স্বকীয় অনন্ত শক্তি বলে মানবের দাসত্বস্পৃহা বিদূরিত না করেন তবে আর কাহারও সাধ্য নাই, অন্য কোন উপায়ও নাই।

স্বাধীনতা প্রসূত যে পরাধীনতা তাহা বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু স্বাধীনতার উচ্ছেদে যে পরাধীনতার অভ্যুদয়, স্বাধীনতার ভস্মাবশেষ হইতে যাহার জন্ম, স্বাধীনভাবকে বিনাশ করিয়া যে আত্মবিক্রয়, ভয়ের সহিত, অসন্তোষের সহিত যে দাসত্ব, তাহা বুঝিতেই পারি না। এক সময়ে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল বটে, সে কিন্তু এরূপ ভয়ানক নহে, সে মাত্র শারীরিক দাসত্ব। জড় শৃঙ্খলে জড় দেহ আবদ্ধ করা খুব সহজ।

জড় মাত্রই জড় নিয়মের দাস, সেই জড় নিয়মের কিয়দংশ হস্তগত করিতে পারিলেই মানুষের জড়ভাগ দাসত্বের অধীন করা যাইতে পারে। আহার পান বা ভয় প্রদর্শন, প্রহার বা কারাগার—নানাপ্রকারে মানব দেহকে আবদ্ধ করিলেও করিতে পারি, কিন্তু নিরঙ্কুশ মানবাত্মাকে বশীভূত করা ত তত সহজ নয়। সহজ কি,—অসম্ভব মনে করি। সুতরাং বুঝি-তেই পারি না কি উপায়ে মানবাত্মাকে দাস করা যায়, ক্রীতদাসের মত করিয়া অনিচ্ছা সত্বেও, অসন্তোষের প্রজ্বলিত হুতাশনের সম্মুখেই তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যায়। বুঝিতে পারি না এক জন মানুষ কি করিয়া আপ-নার সম্পূর্ণ মতের বিপরীত হইলেও আর এক জনের ইচ্ছানুসারে চলিতে পারে। অবশ্য যাহাদের স্বাধীন চিন্তার সাধ্য নাই, বা বুঝিবার শক্তি প্রস্ফুটিত হয় নাই, এরূপ বালক উন্মাদ বা হতবুদ্ধি লোকদিগের পক্ষে এইরূপ পরাধীনতা সম্ভব এবং সর্ব্বতোভাবে উপকারী। কিন্তু এক জন মানব, যাহাকে অন্যত্র অন্য বিষয়ে পূর্ণ বলিয়া ধরা হয়, যাহার হস্ত পদ অন্য বিষয়ে মুক্ত আছে, এই স্থলেই তাহাকে আবদ্ধ করিয়া তাহারই মত জন কয়েক মনুষ্যের প্রণীত অর্থশূন্য নিয়মের দাস করিয়া রাখা কিরূপে সম্ভব হয়? কোন্ যুক্তি, কোন্ তর্কে, কোন্ নীতি অনুসারে একজনের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রবাহ অপর কয়েকজনের সম্মিলিত প্রবাহের সহিত একীভূত করিয়া দিয়া তাহার জীবনের সকল সুখ, সকল উন্নতি, সকল স্ফূর্ত্তি ও সকল নূতনত্বের সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়?

আর সেই বা কিরূপ লোক যে আপনার স্বাধীন ইচ্ছাঙ্কুরকে বিদলিত করিয়া তাহার গলিত শুষ্ক অবশেষকে অপরের তদ্রূপ শুষ্ক ও জীবনবিহীন ইচ্ছার রাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে? আর যদিই অপরের ইচ্ছা জীবিতই হয়, তাতে আমার কি? আমার হাত, আমারই হাত। আমার ইচ্ছা, আমারই ইচ্ছা। তাহাকে বিনাশ করিয়া অপরের খেলার সামগ্রী করিবার জন্যই কি আমার অপদার্থ হস্তে উহা প্রদত্ত হইয়াছে? না; আমার শরীর মনের সম্পূর্ণ শক্তির সহিত চীৎকার করিয়া গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া রব উঠুক "না"। দুর্ব্বল ভীরু পৃথিবীর যাবতীয় কাপুরুষদিগের বক্ষঃস্থল কম্পিত করিয়া গম্ভীরে উত্তর হউক "না"। আর ঐ উত্তর বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চারে প্রত্যেক ভীরুর হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরিক স্বভাবনিহিত পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা সমূহ

স্বাধীনতা বৃত্তিকে জাগরিত ও উত্তেজিত করিয়া, প্রতি হৃদয়গহ্বরের অভ্যন্তর হইতে এক এক স্থির-প্রতিজ্ঞ উত্তর বাহির করুক—"না"। স্বাধীনতার মহীয়ান্ নামে শিক্ষিত হৃদয় মাতুক, স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের মহত্বে শিক্ষিত হৃদয় দণ্ডায়মান হউক। লোকভয় দিবাগমে অন্ধকারবৎ লজ্জায় মুখ নামাইয়া পলায়ন করুক। পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা মানব-সংসারে ফলবতী হউক। প্রত্যেক স্বাধীন মানব লইয়া আবার নূতন স্বাধীন সংসার ও স্বাধীন সমাজ গঠিত হউক, স্বাধীন ধর্ম্মের আবির্ভাবে জগতের বায়ু পবিত্র হউক, সমগ্র মানবসমাজ এক সাধারণ তন্ত্রে পরিণত হউক। তাহারই মধ্যে যে যাহার উপর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পবিত্র সম্বন্ধে আত্মসমর্পণ করিতে চায় করুক। নিষ্ঠুর পরাধীনতা-দাসত্বের দিন অবসান হউক।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমার এই পূজা।

"I can give not what men call love ;
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not :"

P. B. Shelley.

১

ধীরে, অতি ধীরে যবে জীবন-নির্ঝর
মৃদু, মন্দ, বহি বহি
কত বাধা বিঘ্ন সহি
নীরবে পড়িল আসি তোমার চরণে,
সেই দিন গতি তার
থামিল, কখন আর
ফিরিল না, সংসারের ঘূর্ণিত বাত্যায়।

২

করুণার বারিধারা ঝরিল তখন
তোমার হৃদয় দিয়া,
পাতিয়া কোমল হিয়া
যে আশ্রয় দিলে দেব, শান্তি অনিবার,
সেই প্রীতি-ছায়াতলে
স্নেহের পবিত্র জলে
দীক্ষিত করিলে, দিয়ে নূতন জীবন।

৩

সেই দিন যে জীবন হইল সঞ্চার
প্রতি পরমাণু চয়
নবীভূত সমুদয়,
নূতন জগতে তারে করিলে স্থাপন,
উজল সাহিত্য ভরে
সে রাজ্য শোভিত করে
বিকশিয়া কবিত্বের জীবন্ত কুসুম।

৪

সে মাধুরীময় বিশ্বে আনন্দে বসিয়া
মন্ত্রপূত প্রাণ খুলি
বিমুগ্ধ নয়ন তুলি
দূর শূন্যে, উচ্চে ভাসে কল্পনা-সাগরে
তব উপদেশে হিয়া;
জ্ঞানের আলোক দিয়া
দেখালে যে পুণ্যভূমি, চিরদীপ্তি তার।

৫

জীবনের নব যুগে তোমার শিক্ষায়
যে আলো লভিল চিতে ;
তাঁর প্রতি দান দিতে
কি আছে ধরায়, দেব, তোমায় পূজিতে
এ সংসারে কিছু নাই,
খুঁজিয়া হতাশ তাই,
মানব-জীবন সার ভক্তি, ভালবাসা,

৬

অনন্ত উচ্ছ্বাস ভরে আত্মার ভকতি
ভালবাসা তার সহ
মাখি, পদে অহরহ
ঢালিয়া অতৃপ্ত প্রাণ, কিবা দিব আর,
পারিজাত ফুল হারে
পূজে ভক্ত দেবতারে,
নহে তাহা তব যোগ্য ; নশ্বর কুসুম।

৭

জগতে কিছুই নাই পূজিতে তোমায়,
অসীম প্রাণের আশা
ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা
দিয়া পূজে অনুদিন, আরাধনা করে,
হৃদয় জুড়ায়ে যায়,
আবার আবার তায়—
অপূর্ণ বাসনা চিত্তে পড়ে উথলিয়া।

৮

কল্পনা বিমানে চড়ি শূন্য নীলিমায়
ভ্রমে প্রাণ নিশি দিবা,
তোমায় পূজিতে কিবা
আনিবে স্বরগ হতে ভাবি অবিরত,
বহু দিন চিন্তা করে
ছায়াপথে গিয়া ধীরে
আনিয়াছে অম্বরের নক্ষত্র ভূষণ,

৯

ভকতির দৃঢ় সূত্রে প্রাণের বাসনা
গাঁথিয়াছে তারা হার,
স্নেহ নেত্রে এক বার
হের দেব, পরাইবে তোমার গলায়,
চরণে দিবে না আজি
অমর নক্ষত্র রাজি
বড় সাধ কণ্ঠ দেশে করিতে অর্পণ।

১০

অনুমতি দেও, প্রাণ আনন্দে তোমায়
পূজিবে, চরণতলে
বসি চির কুতূহলে,
দিবে কণ্ঠে তারাহার, তুমি ভক্তি-প্রিয়,
দেব কণ্ঠে দিলে হার
কিবা দৃশ্য হয় তার
দেখিবে ভকত তব ভরিয়া নয়ন।

১১

একটী তারকা যেন, একটী জগৎ,
অযুত জগৎ দিয়া
তোমায় পূজিছে হিয়া,
লও দেব, ভকতের প্রীতি-উপহার,
স্নেহ ছায়া পথ তব
উজলি নক্ষত্র সব
রহিবে অমর ভাবে, পূজিতে তোমায়।

১২

"* * * *"—পূজা এই, ভক্তি নিদর্শন
আরাধ্য চরণতলে
উপাসনা অশ্রুজলে
অর্পিয়া, আত্মার সহ পূজিছে জীবন,
এ পূজা পার্থিব নয়
তুমি দেব, প্রাণময়,
কিঙ্করের ভক্তি চিহ্ন করহে গ্রহণ।

শ্রীমতী "বনলতা" রচয়িত্রী।

চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব, ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

জড়ের পৃথক সত্তা মানিতে গেলেও চিন্ময় আত্মার সত্তাই পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হয়; যে বস্তু কেহ দেখে নাই, যে স্থানে কেহ যায় নাই, সে বস্তু সে স্থানের সত্তা সম্বন্ধেও কেহ বলিতে পারে না। যে অবধি সেই বস্তু, সেই স্থান দর্শন-ব্যাপারের বিষয় হইল, সেই অবধি প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে তাহাদের সত্তা আরম্ভ হইল। যদি মনে করা যায় কলম্বস্ই প্রথম চৈতন্যময় পুরুষ আমে-

রিকা দর্শন করিয়াছিল, এবং যদি তাঁহারই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মাত্র ভিত্তি করিয়া কথা বলিতে হয়, তবে বলিতে হইবে কলম্বসের দর্শন ব্যাপার হইতে আমেরিকার সত্ত্বা। জড় জগৎ আছে কিনা কে বলিবে, যদি কাহারও তৎসম্বন্ধে জ্ঞান না হইত? জড় জ্ঞান কাহার হইবে, যদি তৎ-পূর্ব্বে চিন্ময় জ্ঞাতা না থাকে? প্রথমে আত্মা, পরে জ্ঞান এবং তৎপরে জড় জগৎ। প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে মাত্র আশ্রয় করিয়া কথা বলিতে হইলে, এই ক্রম অলঙ্ঘ্য। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কেবল নিজের জ্ঞানকে মাত্র আশ্রয় করি না, অথবা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মাত্র আশ্রয় করি না। একে অন্যের জ্ঞানের আপেক্ষা করি। অথবা নিজের এক সময়ে প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া অন্য সময় কার্য্য করি। তুমি অদ্য যে হিমালয় দর্শন করিলে, তুমি শুনিতে পাইলে তোমার পূর্ব্বে অনেকে সেই হিমালয় দর্শন করিয়াছে; তাহাতে তুমি অনুমান করিলে হিমালয়ের পরে তুমি অথবা জড়ের পর আত্মা; কিন্তু এ কেবল তোমারই সম্বন্ধে সত্য। যে ব্যক্তি হিমালয় প্রথম দর্শন করিয়াছিল, তাহার পক্ষে হিমালয় তাহার পূর্ব্বে ছিল, একথা ভাবিবার কোন কারণ নাই। তাহার দর্শন ব্যাপারের পর হইতেই হিমালয়ের সত্ত্বা। যাহা কদাপি ইন্দ্রিয় ব্যাপারের বিষয় হয় নাই, তাহা আছে কিনা কে বলিবে? আবার আমরা কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া চলি না। হয় ত নিবিড় অরণ্য মধ্যে আমি একটী বৃক্ষ প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বলিয়া আমার দর্শন ব্যাপারের পূর্ব্বে সে বৃক্ষ ছিল না এরূপ সংশয় করি না—ছিল বলিয়াই মনে ধারণা হয়। অতীত যাহা প্রত্যক্ষের অগোচর, তাহাও প্রত্যক্ষেরই ন্যায় উজ্জ্বল বোধ হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষই সকল প্রমাণের মূল। যাহা এক সময়ে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহাই অন্য সময় অনুমান করা যায়; যাহা এক স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহারই উপমা অন্য স্থানে গ্রহণ করা যায়। প্রত্যক্ষ মূলে আছে বলিয়াই আপ্ত বচন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। যে নিজে দেখিয়াছে অথবা দেখিয়াছে এমন বিশ্বস্ত লোকের কথা শুনিয়াছে, তাহারই কথা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। এজন্যই প্রত্যক্ষকে জ্যেষ্ঠ প্রমাণ বলা যায়। যে পদার্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণে কদাপি পাওয়া যায় নাই, অপর প্রমাণেও তাহা আসিতে পারেনা। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যদি আত্মারই অস্তিত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী হইল, তবে অপর প্রমাণ সম্বন্ধেও তাহাই হইবে, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যদি অন্ত

জ্ঞান আত্মার উপাধি মাত্র হয়, যাহা আমরা পূর্ব্ববারে প্রতিপন্ন করিয়াছি, তবে যাহা কিছু অনুমিত বা উপমিত হয় অথবা শাব্দ প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়, সকলই আত্মার উপাধি মাত্র। যদি বল ভূবিদ্যা দ্বারা জানা যায়, মানুষ জন্মিবার পূর্ব্বেই জড় পদার্থ ছিল, ইহাতে কিছুই অপ্রমাণ হইলনা। মানুষই এক মাত্র চৈতন্যের আধার অথবা মানুষেতেই চৈতন্যের আরম্ভ একথা কেহ বলে না। ভাবিয়া দেখ এ আপত্তি পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে, পিষ্টপেষণ নিষ্প্রয়োজন। ভূবিদ্যাই হউক আর যে বিদ্যাই হউক, প্রত্যক্ষ জ্ঞাত' জড় বস্তু যদি আত্মার উপাধি মাত্র সাব্যস্ত হইল, অথবা জ্ঞাতার পরবর্ত্তী সাব্যস্ত হইল, তবে যে জড় অনুমানের বিষয় সেও আর অন্য কিছু হইতে পারেনা। জড় বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে অনুমানকারী নিজকে, অথবা ঈশ্বর অথবা অন্য কোন চিন্ময় আত্মা তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞাতা রূপে কল্পনা করিতে হয়, নতুবা জড় আছে এই জ্ঞান কাহার হইবে? প্রকৃত পক্ষে ভূবিদ্যা মানুষের পূর্ব্বে জড় বলিয়া যে অনুমান করে, ইহার অর্থ এই, যদি অনুমাতা স্বয়ং অথবা তাহার সদৃশ কোন চিন্ময় আত্মা যে কাল সম্বন্ধে অনুমান করা যায়, সেই কালে বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে বর্ত্তমানে অনুমাতার জড় জগৎ রূপ যে অনুভব হয়, তাহারও সেই রূপ হইত। অর্থাৎ সেই কাল সম্বন্ধেও বর্ত্তমানেরই ন্যায় জড় জগতের পূর্ব্বে জড়ানুভব, অনুভবের পূর্ব্বে অনুভবকারী চিন্ময় আত্মা। জড় পদার্থের অর্থই ইন্দ্রিয় ব্যাপারের বিষয়। ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া ধারণা করা যায় না। যে খানেই জড় পদার্থ কল্পনা কর, সে খানেই তাহার জ্ঞাপক ইন্দ্রিয় ব্যাপার কল্পনা করিতে হইবে। বর্ত্তমান সম্বন্ধে যেমন, অতীত অনাগত সম্বন্ধেও তেমন। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যেমন অনুমানাদি অন্য প্রমাণ সম্বন্ধে তেমন। ভূবিদ্যাবিৎ ছিল বা নাছিল, জড় নামে অভিধেয় পদার্থ তিনি যেখানেই কল্পনা করুন, সেখানেই জড় তাঁহার মত কোন পূর্ব্ববর্ত্তী চৈতন্যময় পুরুষের ইন্দ্রিয় ব্যাপারের বিষয় রূপে কল্পিত হইবে।

আমরা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি জ্ঞানই প্রত্যক্ষ; তদিতর বস্তু অনুমান মাত্র। আমরা দেখাইয়াছি, অপর লোকের অনুভব পূর্ব্বাপর আমাদের অনুভবের মতই হইয়াছে, ইহা হইতেই অনুমান করি আমি এবং অপর লোক সকল হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু আছে, যে বস্তু আমাদের অনু-

ভবের বিষয়। জাগ্রত অবস্থায় বাহ্য বস্তুকে যেরূপ স্বতন্ত্র মনে করি, স্বপ্ন-কালে স্বপ্নগ্রাহ্য বস্তু সকলকেও নিজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করি। স্বপ্নের উপলব্ধিকে আমরা ভ্রম বলিয়া থাকি; কারণ, স্বপ্ন শেষে অথবা আরম্ভে নিজ হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু দেখিতে পাই না। জীবন রূপ মহা স্বপ্ন শেষ হইলে অথবা তাহার পূর্ব্ব কথা জানিতে পারিলে যে, ইহ জীবনের উপলব্ধিকেও ভ্রম বলিব না, জাগ্রত অবস্থার ব্যাপারেও এমন কিছুই নাই। বরং যোগীদিগের অনুভব তাহাই প্রতিপন্ন করে। স্বপ্ন শেষে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে যেমন আমরা বলিয়া থাকি "আহা কি দেখিলাম কোথায় গেল," যোগীও আধ্যাত্মিক রাজ্যে জাগরিত হইয়া বলিয়াছেন—"কগতং কেন বা নীতং কুত্রলীনমিদং জগৎ। অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তিকিং মহদদ্ভুতং॥"

আজ কাল কেহ কেহ স্বপ্নের সহিত জাগ্রত অবস্থার তুলনা সম্বন্ধে এই বলিয়া আপত্তি করিয়া থাকেন যে, যাহা কিছু স্বপ্নে উপলব্ধ হয়, সে সকলই জাগ্রত অবস্থার পূর্ব্বে উপলব্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ এ আপত্তি সিদ্ধ হউক বা অসিদ্ধ হউক, তাহাতে আমাদের মূল যুক্তির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। দ্বিতীয়তঃ ভাবিয়া দেখিলে এ আপত্তিও অমূলক। আমরা এবিষয় লইয়া অধিক দূর যাইবনা, কেবল একটী মাত্র প্রশ্ন করিব—বল দেখি শিশুর মধ্যে চৈতন্য সঞ্চার হয় কখন? জন্মের পর হয় একথা বলিতে পার না। গর্ভে থাকিতেই চৈতন্যের লক্ষণ সকল অনুভূত হয়। বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই চৈতন্য। বাহ্য জগতের জ্ঞানযোগের পূর্ব্বেই জ্ঞাতৃত্ব। সেই জ্ঞাতৃত্ব অথবা চৈতন্য প্রথমে বাহ্য জগতের অপেক্ষা করে না, অতএব স্বপ্নই বলিতে হইবে। সে চৈতন্য সামান্য হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। স্বপ্নই জাগ্রত অবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী হইল। ইহা যদি স্বীকার নাও কর, অন্ততঃ বলিতে হইবে, স্বপ্ন পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা জাগ্রত অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী নিশ্চয় করা অসম্ভব অর্থাৎ তোমার আপত্তির মূল আছে কিনা তুমি জাননা। আমরা যেরূপ প্রমাণ করিয়াছি, তাহাতে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবেই জড়কে চিন্ময়ের জ্ঞান অথবা অবস্থা বিশেষ মাত্র বলিলে দোষ ঘটে না। ভূবিদ্যার অনুমানও ভূস্থিতের প্রত্যক্ষকেই আশ্রয় করে। প্রত্যক্ষ জড় পদার্থের ন্যায় তাহার অনুমিত জড় পদার্থও দেবতির্য্যঙ্নরাদি কোন চৈতন্য-ময়ের জ্ঞান অথবা অবস্থা বিশেষ হইবে। এতদ্ভিন্ন জড় পদার্থ কেহ

কখন দেখে নাই, কখন অনুমানও করিতে পারে না। মোট কথা এই, যাহা কিছু পদার্থের সহিত আমাদের সম্বন্ধ, তাহারা জ্ঞানের বিষয় অথবা জ্ঞেয় রূপেই আছে। জ্ঞানের বিষয় অথবা জ্ঞেয় জ্ঞানেরই অন্তর্গত, জ্ঞানের বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না। আবার জ্ঞান জ্ঞাতারই উপাধি অথবা অবস্থা বিশেষ মাত্র। এই রূপে জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা এই বৈদান্তিক ত্রিপুটি আত্মার উপাধি মাত্র। উপসংহার কালে আরও বলা যায়, দেহ যদি 'আমি' হয়, তবে দেহের অবয়ব সকল পৃথক রূপে 'আমি', না একত্রে 'আমি'? ব্যষ্টিতে আমি কি সমষ্টিতে আমি? যদি প্রত্যেকটী অবয়ব পৃথক রূপে আমি হয়, তবে প্রতিদেহে অসংখ্য আমি হইল। কিন্তু আমরা সকলেই অনুভব করি, আমি এক। অতএব ব্যষ্টিতে আমি হইতে পারে না। আবার অবয়ব সমষ্টি যদি আমি হয়, তবে যখন কুষ্ঠ রোগে আমার একটী অঙ্গুলি খসিয়া পড়ে, তখন আর পূর্ব্বের অবয়ব সমষ্টি থাকে না। অতএব তখন আমিও আর পূর্ব্বের আমি থাকিতে পারি না। কিন্তু কুষ্ঠ রোগী আঙ্গুল খসিয়া পড়িলেও অনুভব করে সে পূর্ব্বের আমিই আছে। অতএব অবয়ব সমষ্টিও আত্মা হইতে পারে না। চার্ব্বাক আজ নাই, চার্ব্বাকের শিষ্য বলিয়া আজকাল কেহ আপনাকে পরিচয় দেয় না, তবে আমরা তাঁহার নাম লইয়া এত কথা কেন বলিলাম? নাম গ্রহণ করুক আর না করুক, অধুনাতন ভৌতিকবাদ বিলাত হইতেই আসুক বা ঘরেই জন্মাক, সেই ধীমান্ মহাত্মা যাহা বলিয়া ইহার সমর্থন করিয়া ছিলেন, আজ বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এসম্বন্ধে ইউরোপেও কোন নূতন যুক্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। আমাদের দেশের ভৌতিকবাদীরা যেন নিজের বাপ্‌কে না চিনিয়া পরের বাপকে বাপ্ বলিতেছেন! তাঁহারা স্বীয় পিতাকে চিনিবেন, পিতা পুত্রে পরিচয় হইবে এই আশা করিয়া আমরা চার্ব্বাকের নাম লইয়া অধুনাতন ভৌতিকবাদের সমালোচনা করিলাম। ত্রুটী প্রকাশ পাইয়া থাকিলে, পাঠক ক্ষমা করিবেন।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

স্বাধীনতা।

আমার স্বাধীনতার সীমা অন্যের স্বাধীনতা। আমি তাহা করিতে পারি যাহাতে অন্যের অপকার না হয়। এ কথাটী অনেকেই স্বীকার করিবেন। স্বাধীনতা এবং যথেচ্ছাচারেরও সীমা এই খানে।

যথেচ্ছাচার নিন্দনীয়, কিন্তু স্বাধীনতার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র। অথচ যদি আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমার পদ লেহন করি, যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমার উদ্গার ভক্ষণ করি, যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দেহ বিক্ষত করি, যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আত্মহত্যা করি, আমাকে অপরাধী বলিয়া তোমরা দণ্ডিত করিবে,—দণ্ড রাজ দরবারেই হউক, আর সমাজেই হউক। আমার বস্ত্র আমি টানিয়া ছিঁড়িব, আমার রোপিত লতা আমি উন্মূল করিব, আমার পোষিত পাখী আমি আকাশে ছাড়িয়া দিব, আমি ঊর্দ্ধপদ হইয়া দুই হস্তে চলিব, সম্মুখ-কেশগুচ্ছে বেণী বিনাইয়া পশ্চাৎ কেশ মুণ্ডন করিব, আমি পায়ে ইয়ারিং কানে চন্দ্রহার পরিব, ব্রাহ্মণীর সাটী পরিয়া গায়ে ওভারকোট দিয়া মস্তকে চীনা টুপি পরিয়া, দিবসে বাতি জ্বালিয়া বৃক্ষ মূলে বা গৃহ প্রাঙ্গণে বসিয়া থাকিব, তুমি আমাকে টিটকারী দিবে কেন? কার্য্য ছাড়িয়া দাও, বলিতে পার যে আমার দেখিয়া দশ জনে শিখিতে পারে, পরোক্ষ ভাবে সমাজের ক্ষতি করিতে পারি বলিয়া দণ্ড দিবার তোমার অধিকার আছে। কিন্তু আমি গোপনে মনে মনে যে চিন্তা পুষিয়া রাখি, কেহ পীড়াপীড়ি না করিলে কাহাকেও যাহা বলি না তাহার জন্য অপদস্থ, অবমানিত, উপেক্ষিত বা উপহসিত হইতে হয় কেন? বুঝিলাম আমার স্বাধীনতা জ্যামিতিক বিন্দু মাত্র,—অবস্থিতি আছে, কোন বিস্তৃতি নাই।

পক্ষান্তরে প্রতিভা সমাজেরই কঠোর হস্তে রুদ্ধশ্বাস বিগতজীবন হইলে সমাজের অস্তিত্ব থাকিত কোথায়? স্বতন্ত্র পাশবপ্রকৃতি বনচারী, আজ সকলে বনে বনেই ফিরিতাম ঘুরিতাম। তোমাদের উপহাস পরিবাদ উপেক্ষা করাতেই আমার কার্য্য-কারিতা। কারা-কুটীরের প্রাচীর মধ্যে গ্যালিলিওর উদ্ভাবনা পর্য্যবসিত হইত, যদি সমাজদণ্ডে বীর পুরুষ ত্রস্ত হইতেন। বিশনতার বিষদন্তকে কুশে সলাকা প্রহারে কত অমৃত বল্লরি অঙ্কুরে, কত জীবন্ত জীবনকোষ অকালে শুষ্ক হইয়াছে, অন্যথা ঘটিলে বুঝিতে পারিতাম। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠাস্থির বিবর্দ্ধনসম্ভূত বলিয়া ধর্ম্মাচার্য্য

যে দিন ঘোষণা করিয়া ছিলেন, ঘাতুকের কুলিশাঘাতে সে দিন গেটের প্রাণান্ত ঘটিলে কি ঘন্ত অন্ধকারের অন্ধতম গুম্ফে গুপ্ত থাকিত, একবার কল্পনা করিয়া দেখ দেখি! ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের কঠোর শাসন উপেক্ষা করিয়া শাক্য সিংহ সমাজ-বক্ষে পদাঘাত না করিলে কোথায় থাকিত হিন্দু সমাজের আবর্তন ও বিবর্তন? সিদ্ধার্থের সিদ্ধার্থতা নিরর্থক হইত। যে সকল মনীষী উপস্থিত অবস্থান বিশৃঙ্খল করিয়া, শত সহস্র জনের আনন্দকানন শ্মশানে পরিবর্তন করিয়া, লক্ষ লক্ষ জনের ঐহিক পারত্রিক অপকার সাধন করিয়া আপনাকে চির পূজনীয় করিয়া গিয়াছেন, কে তাঁহাদের গৌরব গানে না যোগ দেয়? তবে মানব স্বাধীনতার বিস্তৃতির অন্ত কোথায়? যাহাকে বিন্দু বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, তাহা কি মহোদধির ন্যায় বিশাল নহে?

আমি সমাজ শৃঙ্খলের একটী বন্ধনী। আমাকে স্থান দিবার জন্য অন্য সকলকে কষ্ট স্বীকার করিয়া সরিয়া বসিতে হইয়াছে। আমার যাহারা তাহাদিগকেও স্থান দিতে হইবে। আমি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নহি। হাত কাটিলাম, কিন্তু দেহে আঘাত করিলাম না; আত্ম বিকৃত করিলাম, কিন্তু সমাজকে অপকৃত করিলাম না, উভয়ই অসার প্রলাপ। আমার কার্য্যে সমাজ রঞ্জিত কলঙ্কিত; সমাজ আমাকে যেমন প্রভাবিত করে আমার দ্বারা তেমনি প্রভাবিত হয়, কেবল মাত্রার ইতর বিশেষ। আমাকে ছাড়িয়া সমাজ নহে, সমাজ ছাড়া আমি নহি। আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ ভাবে এবং যাহারা আমার তাহাদিগের দ্বারা পরোক্ষ ভাবে সমাজকে অনুপ্রাণিত করি। আমি বিষবিন্দু ঢালিয়া সমস্ত গরলিত, অমৃত ঢালিয়া সমস্ত সঞ্জীবিত করিতে পারি। জগতের অপরিজ্ঞাত গূঢ় চিন্তা আমাকে ও আমাদিগকে, সুতরাং সমাজকে প্রভাবিত করে; সুতরাং অন্যের অপকার আমার স্বাধীনতার সীমা নহে, যাহাতে আমার অপকার তাহাই আমার স্বাধীনতার সীমা, যাহাতে আমার উপকার তাহাতে সমাজের উপকার, যাহাতে সমাজের উপকার তাহাতেই আমারই উপকার।

আমার জীবন অন্যের জন্য এপাটী মহা সত্য, আমার জীবন আমার জন্য এটী বৃহত্তর সত্য। যখন স্বতন্ত্র স্বাবলম্বী জীব উর্দ্ধস্কন্ধ তাল বৃক্ষের ন্যায় কাহারও অপেক্ষা না করিয়া কাহাকেও আশ্রয়চ্ছায়া বিতরণ না করিয়া স্বয়ং-সিদ্ধ স্বার্থপর হইয়া জীব সাম্রাজ্যে বিরাজ করিত, তখন কোনও মহোন্নত ব্যক্তি "Live for others" এই সত্যের আবিষ্কার করিয়া

অনাবৃতবক্ষ নীরস পাষাণ কোমল শৈবালে আবৃত করিয়াছিলেন। যখন লতায় পাতায় আকুল হইয়া সামাজিকতার আওতায় জীবের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহত্তর নীতিবেত্তা বলিয়াছিলেন "Live for yourself." পরের উপকারের জন্য যদি সকলে প্রাণ ধারণ করে, তাহা হইলে সকলেরই আপন আপন কার্য্য চলিয়া যায়। বস্তুতঃ একটু ঘোরাল রকমে একটু আড়ে আড়ে সহজ কথাটা বাঁকাইয়া সুন্দর করা হইয়াছে এই মাত্র। নতুবা "Live for others" এ সত্যের মূল স্বার্থপরতা। প্রাচীন কালের তেজস্বী লোকেরা বাঁকা চুরা বুঝিতেন না, চক্ষু লজ্জার খাতির রাখিতেন না, যাহা মনে আসিত তাহা মুখ দিয়া স্ফুটিত, তাঁহারা পরদার আড়াল বুঝিতেন না, আমখাস দেওয়ানখাস রাখিতেন না। সভ্যতা সত্যকে রঞ্জিত করিতে চাহে, অলঙ্কৃত করিতে চাহে; কুইনাইনের বড়ির উপর চিনির পুট না দিলে কেহ গ্রহণ করিতে চায় না।

আমি আপনার দ্বারা পরের কথা অনুমান করি। আমার মন আছে তাই পরের মন কল্পনা করি, আমার যাহাতে সুখ দুঃখ লাভালাভ পরের তাহাতেই সুখ দুঃখ লাভালাভ অনুমান করি। বস্তুতঃ আপনাকে মানদণ্ড না করিলে পরের ওজন কিছুতেই বুঝিতে পারি না। এমন অবস্থায় যে আপনার জন্য বাঁচিতে না চাহে, সে পরের জন্য বাঁচিতে পারে না। যে আপনার স্বার্থ আপনার লাভালাভ বুঝেনা, সে পরের কিসে উপকার হইবে বুঝিতে পারিবে, অসম্ভব কথা। আমার পরিমাণে আমি আমার দেবতা সৃষ্ট করি, আমার পরিমাণে আমার কর্ত্তব্য সৃষ্ট করি, আমার পরিমাণে আমার ঘর সংসার বাঁধিয়া লই, সকল কার্য্যে আমি প্রধান, আমি একমাত্র, আমি আমাকে কখন অতিক্রম করিতে পারি না। আমাকে অতিক্রম করিয়া, আমাকে উপেক্ষা করিয়া, আমি তোমার জন্য, বিশ্ব সংসারের জন্য খাটিব, বিশ্বের হিতার্থে আপনাকে উৎসর্গ করিব, বলিদান দিব, যাঁহারা আত্মপীড়নের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন আত্মোৎসর্গ শিখেন নাই এ সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদিগের কল্পনা। আমাকে লইয়া সংসার, পৃথিবী, জগত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আমার মানদণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিমিত; আমি এই অনন্ত সংসার বন্ধনী, আমাকে উপেক্ষা করিলে সকলই আদিম অবকাশে পর্য্যবসিত হইবে, সৃষ্টিপূর্ব্ব অব্যক্ততা আসিবে। সহজ কথা বাঁকাইতে গিয়া অদূরদর্শী

নীতিবাদীগণ মনুষ্যদিগকে নীতিশূন্য নাস্তিকতায় অবনত করিয়াছেন। ধনুকের ছিলা কাটিয়া দাও, পৃথিবী সুস্থতা লাভ করিবে।

অন্যকে ছাড়িলে আমার কোন কার্য্যই থাকে না, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যায়। দশ জনকে লইয়াই আমি, সমাজকে লইয়াই আমি, স্বদেশকে লইয়াই আমি। আমার বন্ধনী যত প্রসারিত করিবে, আমার শূন্যতা পূর্ণতায় তত পরিণত হইবে, আমার মহত্ত্ব বাড়িবে। আমার আমিত্ব আমার দেহের অতীত, আমার পরিবারের অতীত, আমার গোত্রের অতীত, আমার সমাজের অতীত, আমার দেশের অতীত, আমার পৃথিবীর অতীত, আমার ইহকালেরও অতীত। এই "আমার" যে স্বার্থ, সে স্বার্থ জগতের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। সকলের স্বার্থ লইয়া আমার স্বার্থ। জিনিসটা আমার, দেখি অন্যের ভিতর দিয়া, ইহাতে সত্যের সরলতার সহিত কল্পনার সৌন্দর্য্য সংমিশ্রিত হইয়া অতি শোভনীয় হইয়া উঠে।

স্বার্থ ও পরার্থপরতার সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা একবার ভারতবর্ষে হইয়াছিল। ভগবদ্গীতায় তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। সে সমন্বয়ের আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ। চেষ্টা সফল হয় নাই।

নশ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে
নকাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিংভোগৈর্জীবিতেনবা
যেষামর্থেকাঙ্ক্ষিতং নোরাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালা সম্বন্ধিনস্তথা
এতান্নহন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতি স্যাজ্জনার্দ্দন

* * * *

স্বজনং হি কথংহত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।

শ্রীকৃষ্ণ রাজ্য ধন যশ গৌরব পুণ্য স্বর্গ অমরত্ব বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কত

সুখের প্রলোভন দেখাইয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের সরল ধর্ম্মভাবের সম্মুখে কূটনীতিক শ্রীকৃষ্ণের তর্কজাল বিস্তার দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না, বরং আচার্য্যের প্রতি একটু ঘৃণার ভাব উদয় হয়। অর্জ্জুন বালক নহেন, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উচ্চ "একব্বরী" ধর্ম্ম ও রাজনীতিজ্ঞও নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন জ্ঞাতি গোত্র শত্রুদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হত্যা করিলে অর্জ্জুন ধরিত্রীর অসপত্ন রাজত্ব ভোগ করিবেন, অর্জ্জুন বুঝিলেন সুখ ভোগত সকলকে লইয়া হয়, সকলকে বধ করিয়া বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া কেহ এক জন সুখী হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন যুদ্ধকার্য্য ক্ষত্রধর্ম্ম, অর্জ্জুন বুঝিলেন সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের বিপরীত স্থান বা কালীয় ধর্ম্ম উপেক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন যশ লোভনীয় নিন্দা উপেক্ষণীয়, অর্জ্জুন বুঝিলেন সার্ব্বভৌম সুকৃতির জন্য কয়েক জনের যশ বা নিন্দা গণনীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণ স্বার্থপরতার গুণগান করিলেন, অর্জ্জুন পরার্থপরতার মাহাত্ম্য বুঝিলেন; শ্রীকৃষ্ণ পরার্থপরতার স্তুতিবাদ করিলেন, অর্জ্জুন স্বার্থপরতার গুণবাদ বুঝিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যু অপরিহার্য্য দেখাইলেন, অর্জ্জুন অমরত্বের আকাঙ্ক্ষণীয়তা উপলব্ধি করিলেন। গত্যন্তর না দেখিয়া দ্বাপরের মাকিয়াভেলী নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রস্তাব করিলেন—নিষ্কাম ধর্ম্মের সংক্ষেপ অর্থ নদীস্রোতে গা ঢালিয়া দাও কোথায় যাইবে কল্পনা করিও না, স্রোতে যেখানে লইয়া যায় সেইখানে চল। কার্য্যফল যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে, তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে কে বড়, কে ছোট তোমার আমার তুলনা করিবার সাধ্য নাই, "রাম রাবণয়োর্যুদ্ধং রাম রাবণয়োরিব।" পরার্থ-পরতা প্রচার করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিনাশ হয়, কর্ম্মের উৎস শুকাইয়া যায়, শূন্যের সমষ্টিতে সংখ্যা গড়িতে হয়। স্বার্থপরতা প্রচার করিলে দুর্ব্বল মনুষ্য জগতকে উপেক্ষা করিয়া অহঙ্কারী হইতে পারে। এ জন্য কাহারও আশ্রয় না লইয়া, ফলাফল গণনা না করিয়া, কাহার ভাল হইবে কাহার মন্দ হইবে না দেখিয়া, যাহাতে নিযুক্ত হইবে তাহাই কর। কর সকলি, যাহা তোমার আত্মীয়তা তোমাকে করিতে বাধ্য করে। তোমার মাত্রায় তুমি কার্য্য কর।

সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ স্বার্থপরতা প্রচার করিয়াছিলেন। তবে স্বার্থপরতার শ্রুতিকটুদোষ পরিহারার্থ তাহাতে নিষ্কামতার অলঙ্কার দিয়াছিলেন। সে অলঙ্কারের গরলে তৎপ্রচারিত সত্য জর্জ্জরিত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম

উন্মাদ ও বাতুলের অবশ্য কর্ত্তব্য,—মনুষ্যের অকর্ত্তব্য অসম্ভবনীয়। নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচারে আর্য্যবংশের কর্ম্মস্রোত বদ্ধ হইয়া জড় আলস্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সন্ন্যাসী ফকির ও দরবেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। যাঁহারা অলঙ্কারের শোভা, বিশেষণের গরিমা, সত্ব স্বরূপে গণনা করিয়া আত্মপ্রতারিত হইতে চক্ষুবুজাইতে চাহেন তাঁহাদের পথ উন্মুক্ত, আমরা বাধা দিব না।

স্বার্থপরতা কর্ম্মের উৎস, ভাবের জননী। স্বার্থপরতা জীবের প্রাণ, মানবের প্রাণতা। মনুষ্য কর্ম্ম ফলের নিমিত্ত, স্বার্থপরতা কার্য্যের নৈমিত্তিক কারণ। আমার যাহাতে অপকার তাহা আমার স্বার্থপরতার, আমার কর্ম্মের সীমা। কিন্তু এ সীমা অস্পষ্ট। স্পষ্টীকৃত করিয়া বলিতে হইবে, যাহাতে আমার উপকার তাহাই আমার স্বাধীনতার সীমা, আমার কর্ত্তব্যের মানদণ্ড। যাহাতে আমার উপকার তাহাতে জগতের উপকার। অধিকাংশ লোকের অধিকতম সুখ কিসে হয় জানিবার একমাত্র উপায় আমার স্বার্থ। আমার স্বার্থের মানদণ্ডে জগতের সুখ পরিমিত। স্বার্থের মান অনিত্য স্বীকার করি। আজ যাহাতে আমার উপকার, কাল তাহাতে উপকার হইবে না জানি; কিন্তু জগতের অধিকাংশ লোকেরও সুখ দুঃখ এইরূপ পরিবর্ত্তনীয়। আজ যাহা সত্য কাল তাহা অসত্য হইবে; বাঙ্গালার যাহা ধর্ম্ম পঞ্জাবে তাহা অধর্ম্ম, নদীর এক পারে যাহা কর্ত্তব্য অপর পারে তাহা অকর্ত্তব্য, এক স্থানে যাহা পাপ স্থানান্তরে তাহা পুণ্য। পাপ পুণ্যের ভৌগলিক সীমা আছে, পর্ব্বত কন্দরে কর্ত্তব্যের সীমা প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করে। এই চির পরিবর্ত্তনশীল সংসারে অন্য কোন দণ্ডে কর্ত্তব্যের পরিমাণ যথাযথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, আমার স্বার্থই এক মাত্র সার্ব্বভৌম মানদণ্ড। আমার স্বার্থের নিরূপক আমার কর্ম্ম ফল। আমার স্বার্থ, আমার উপকার, আমার কর্ত্তব্যের সীমা, ইহা সুযুক্তি ও স্বভাব-সিদ্ধ।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

অক্ষয় বাবু ও বিধবা বিবাহ।*

কখন কখন পুরাতন বিষয়েরও আলোচনা করিতে হয়। যাঁহারা বাহাদুরী নিবার জন্ম লেখনী ধারণ করিয়া সমাসচ্ছটা-পূরিত বাক্য যোজনা দ্বারা আপনাদের জয়ঢক্কা আপনারা বাদন করিতে ইচ্ছুক; লিখিবার কষ্ট স্বীকার করিবার যাহাদের এতদপেক্ষা উন্নততর, নিঃস্বার্থতর বিশুদ্ধতর উদ্দেশ্য নাই, তাহারা নূতন কথা লিখিয়া নিজেদের প্রতিভার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চান, করুন। কিন্তু আমরা এইরূপ লেখাকে বড় ঘৃণা করি। রূপের ব্যবসায় যেমন ঘৃণনীয়; ভালবাসার ব্যবসায় যেরূপ ঘৃণনীয়; সেইরূপ ব্যবসাদারী, পসার জাঁকান, বাগাড়ম্বরপূর্ণ লেখাও অতিশয় ঘৃণনীয়। তাহাতে আবার যখন সুললিত ভাষার আড়ালে অসৎ ভাব বিদ্যমান থাকে; কুৎসিত বিষয়কে যখন ভাষার সাজে সাজাইয়া, নানা অলঙ্কার পরাইয়া, মন ভুলান রূপ করিয়া, সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়, তখন সৎ লোকের ধৈর্য্য রাখা দায় হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় পাঠক সমাজে এইরূপ কুলটাবৃত্ত, লঘুচিত্ত, অসত্যপ্রাণ, আত্মসম্মানবোধহীন লেখকগণেরই আদর ও প্রতিপত্তি বেশী।

বিধবাবিবাহ বিষয়টা পুরাতন; কিন্তু এই সম্বন্ধে আজি কালি একটু নূতন আন্দোলনের বাত্যা উঠিয়াছে। আর তাহা না হইলেও যে এই বিষয়ে কিছু বলিবার বা লিখিবার দিন চলিয়া গিয়াছিল, তাহা নহে। যদি কাহারও মনে এ সন্দেহ থাকিত, অক্ষয় বাবুকে ধন্যবাদ, তিনি সে ভ্রম অপনোদন করিয়াছেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে—শিক্ষিত বাঙ্গালী আর বিধবাবিবাহবিরোধী নন,—এখন কিসে কার্য্যতঃ তাহা সমাজে প্রচলিত হইতে পারে, তাহারই কেবল চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু অক্ষয় বাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ সে-

---

* নবজীবন সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কলিকাতার সাবিত্রী পুস্তকালয়ের বার্ষিক অধিবেশনে, "হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ উচিত কি না?" এ বিষয়ে সম্প্রতি একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন; তাহা অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

দিন আমাদের সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এখন শুনিতেছি বিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ। তবে যাহারা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ, যাহারা উৎকৃষ্টতর নীতির আদেশ পালনে অশক্ত এবং যাহারা উৎকৃষ্টতর শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে অপারগ, সেই সকল নিকৃষ্ট শ্রেণীর পক্ষে অপরাপর অনেক হীন আচার যেরূপ ঘৃণার সহিত অনুমোদনীয় (Permissive), সেই রূপ বিধবার বিবাহও অনুমোদনীয়।

অক্ষয় বাবু সাধারণী-সম্পাদক। শশধর তর্কচূড়ামণি যে দিন এই কলিকাতা মহানগরীর আফিসাঞ্চলের বাবুদিগের সভায় বহুসংখ্যক মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার যুক্তিবিরোধীতা প্রতিপাদন করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দিন সাধারণী লিখিয়াছিলেন, "তর্কচূড়ামণি বাহাতুর লোক!"—সাধারণীর কথায় আমরাও এবার বলি অক্ষয় বাবু "বাহাতুর লোক!" নতুবা দু একটী ক্ষীণ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি পৌনে তিন ফর্ম্মা লম্বা একটা দীর্ঘগন্ধ প্রবন্ধ লিখিয়া, তাহা একটী সম্ভ্রান্ত সমাজে পাঠ করিয়া, তাঁহাদের চক্ষে ধূলো দিয়া এত করতালি লাভ করিতে পারিতেন না। একটী অতি ক্ষুদ্র ভাবকে ফুঁ দিয়া পর্ব্বতাকার করিবার ক্ষমতা অক্ষয় বাবুর যেমন আছে, বাঙ্গলার আর কোনও লেখকের তেমন নাই। পাপর ভাজা দিয়া অন্ন জিনিষে পাঠক ও শ্রোতার মন ভুলাইতে অক্ষয় বাবু যেমন পারেন, আর কেহ তেমনি পারে না। অক্ষয় বাবুর বক্তৃতায় আমরা উপস্থিত ছিলাম; সকল কথা মন দিয়া শুনিয়াছিলাম; তার পর তাঁহার নবজীবনে প্রকাশিত প্রবন্ধটীও রীতিমত পাঠ করিয়াছি; অক্ষয় বাবুকে ধন্যবাদ, সাহিত্য বিষয়ক পাপর ভাজা এমন আর কখনও আমরা খাই নাই।

যে দেশে পাপর ভাজারই বেশী আদর, সে দেশে অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধের অনেক বাহবা পড়িবে সন্দেহ নাই। অক্ষয় বাবুকে আমরা কন্‌গ্রাচুলেট্ করি।

আর একটী বিষয়ে অক্ষয় বাবুকে আমাদের কন্‌গ্রাচুলেট্ করিতে ইচ্ছা হয়। সেটী অক্ষয় বাবুর সূক্ষ্মদর্শিনী, কণিক-ম্যাকিয়াভেলি-পদানুসারিণী বুদ্ধি। সাবিত্রী পুস্তকালয়—নামেই তাহার পরিচয়—এ মহা হিন্দু পুস্তকালয়ের বার্ষিক অধিবেশনে, একটী হিন্দু পরিবারের স্ত্রীপুরুষের মধ্যখানে, হিন্দু সভাপতির আসন সন্নিকটে, হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানকারীদিগের অগ্রণী-

সমাজগণ্য হইয়া, অক্ষয় বাবু কখনই প্রাণ খুলিয়া, মুখ ফুটিয়া একথা বলিতে পারিতেন না—"হিন্দু বিধবার বিবাহ দেওয়া উচিত।" করতালির লোভ সামলাইতে পারিলেও ভ্রূকুটীর ভয় এড়ান সহজ হইত না। সুতরাং প্রবন্ধটীর শিরায় শিরায় বিধবাবিবাহ যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্র সঙ্গত এ ভাব অন্তঃসলিলের মত প্রবাহিত করিয়া, উপরকার ভাষাময় ঘোলা জল দেখাইয়া সভাকে সে দিন বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে; বিধবা বিবাহ অন্যায় কার্য্য। নবজীবনসম্পাদক, বাঙ্গালীর-বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক, আদর্শ নায়কনায়িকা রাধাকৃষ্ণের উপাসক, নবহিন্দুধর্ম্মেরউত্থাপক মহাশয় যে অতি সুচতুর লোক, তাহা না বলিয়া দিলেও চলে। তিনি যে টুকুলি রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, ইহা সু-খবর হইলেও নূতন সংবাদ নহে।

সাবাস অক্ষয় বাবুর চতুরালিকে! তিনি প্রবন্ধের প্রথম বাক্যেই বিধবা বিবাহ উচিত এইটী স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, অথচ সেদিনকার সেই হিন্দুসভার হিন্দু শ্রোতাগণ অক্ষয় বাবুকে সোৎসাহ করতালি ধ্বনিতে ধন্যবাদ দিয়া বুঝিয়া গেলেন, বিধবার বিবাহ না হওয়াই ভাল। অক্ষয় বাবু প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছেন :—

"হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ উচিত কি না, এই প্রবন্ধের মীমাংসা করিতে হইলে, অনেক বিষয় অগ্রে পরিষ্কার করা উচিত।"

অর্থাৎ হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ উচিত কি না, ইহার মীমাংসা করাই তাঁহার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিধবার আবার বিবাহ উচিত কি না, এই প্রশ্ন তুলিলেই বিধবার প্রথম বিবাহ উচিত, এইটী পাকতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। তাহা হইলেই আমাদের এবং অক্ষয় বাবুর উভয়েরই উদ্দেশ্য সাধন হইল। বিধবার একবার বিবাহে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে, পুনর্বিবাহে আপত্তি থাকে থাকুক, তাহা লইয়া আমাদের বাদবিসম্বাদ করিতে সাধ নাই। অক্ষয় বাবুকে ধন্যবাদ, তিনি প্রবন্ধারম্ভেই আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হাস্য পরিহাস পরিহার করিয়া গম্ভীরভাবে অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধটী পর্য্যালোচনা করিলেও তাঁহার কথায় কথায় বিধবা বিবাহের সপক্ষ পোষণই দেখিতে পাই।

হিন্দুবিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না? দুইভাবে এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করিতে পারা যায়। এক শাস্ত্রালোচনা করিয়া, হিন্দু বিধবার

বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কি না, তাহা ঠিক করিয়া, শাস্ত্রোক্তির উপর এই প্রশ্নের মীমাংসার ভিত্তি স্থাপন করিতে পারা যায়। অপর যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া হিন্দু বিধবার বিবাহ যুক্তি সঙ্গত কি অযৌক্তিক, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া, বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে ইহার মীমাংসা করিতে পারা যায়। শাস্ত্রানুযায়ী এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় করিয়াছেন। অক্ষয় বাবুর তাহার উপরে কোনও কথা বলিবার অধিকার নাই; বলিলে লোকে তাহা গ্রাহ্য করিবে না। অক্ষয় বাবু স্বয়ংও এটী বিলক্ষণ জানেন, তাই সেদিক দিয়া বড় ঘেসেন নাই। কেবল টীকা টীপ্পনি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্দ্ধারিত মীমাংসা হইতেই বিধবা বিবাহ হিন্দুধর্ম্ম সঙ্গত নহে, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অক্ষয় বাবু যদি টোলের পণ্ডিতগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কেবল শাস্ত্রমার্গ অবলম্বনে এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইবার প্রয়াস পাইতেন, আমরা তাঁহার কথার আলোচনা করিয়া বহুমূল্য সময় নষ্ট করিতাম না। কেন না তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধ শিক্ষিত সমাজের অপাঠ্য হইয়াই থাকিত। কিন্তু অক্ষয় বাবু শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের হাত ধরিয়া এই বিষয়ের মীমাংসায় পৌছিবার ভাণ করিয়াছেন। তাহাতেই শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ও যুক্তির সারবত্তা উভয়ই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এক মহা খেচরান্ন রন্ধন করিয়া নানা মসলার খোসবো বাহির করিয়া পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকে উপহার দিয়াছেন।

অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধটীকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে এই কয়টী কথা সংগ্রহ করিতে পারা যায়:—

(১) হিন্দুর বিবাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপার—শরীরের যোগ নহে, আত্মার যোগ।

(২) আত্মা চিরজীবী;—আত্মায় আত্মায় যোগ অনন্তকাল স্থায়ী।

(৩) অতএব আত্মার যোগের বিয়োগ নাই; বিধবার বিবাহে ধর্ম্ম নাই। বিধবা বিবাহার্থিনী না হইয়া ব্রহ্মচারিণী হইবেন, ইহাই শাস্ত্র, নীতি ও যুক্তি সঙ্গত।

প্রকৃত বিবাহ-সম্বন্ধ অনন্তকাল স্থায়ী, প্রকৃত বিবাহ যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। অতদূর পর্য্যন্ত অক্ষয় বাবুর সঙ্গে আমাদের কোনও বিবাদ

নাই। কিন্তু হিন্দু সাধারণের বিবাহ কি এইরূপ বিবাহ? অক্ষয় বাবু বলেন 'হাঁ', আমরা বলি 'না'; এবং অক্ষয় বাবুই আমাদের সাক্ষী। অক্ষয় বাবু হিন্দু বিধবার বিবাহের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিতে অগ্রসর হইয়াই তাঁহার যুক্তির মূলভিত্তি কাটিয়া দিয়া আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃত বিবাহে বৈধব্যই নাই—বিধবার বিবাহের কথা আর উঠিবে কেমন করিয়া? যখন এই কথা উঠিয়াছে, বিধবার বিবাহ উচিত কি না, তখনই হিন্দুসমাজে এই বিষয়ে যে মতের ঐক্য নাই, ইহা প্রমাণ হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এরূপ রমণী হিন্দু সমাজে অনেক আছেন, যাঁহারা বিধবা বিবাহের পক্ষপাতিনী। সাবিত্রী পুস্তকালয় এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে দিয়া হিন্দু রমণীগণের যে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলাফল দৃষ্টেই ইহা বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। বিংশতি জন প্রবন্ধলেখিকার মধ্যে চারিজন মাত্র বিধবা বিবাহের বিরোধিনী, অবশিষ্ট ষোল জন কোনও না কোনও আকারে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতিনী। সুতরাং বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা যে হিন্দুসমাজে কেহ অনুভব করে না, তাহা নহে। অক্ষয় বাবু স্বয়ংও তাহা বিলক্ষণ অনুভব করেন,—বিবাহার্থিনী হিন্দু বিধবা যে হিন্দু সমাজে আছেন অক্ষয় বাবু তাহা জানেন; জানেন বলিয়াই লিখিয়াছেন:—

"প্রবৃত্তিরেষা নারীণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

অর্থাৎ হিন্দু বিধবার বিবাহে প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু মহা ফল লাভের আশায় তাঁহার নিবৃত্তা ব্রহ্মচর্য্যচারিণী হওয়া উচিত।

এইখানেই অক্ষয় বাবু তাঁহার আপনার হাতে আপনার পায়ের নীচের মাটি কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন। যে রমণীর প্রকৃত বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার পতির মৃত্যুতে অন্য পতি গ্রহণে প্রবৃত্তিই নাই। যাঁহার প্রবৃত্তি আছে, তাঁহার বিবাহ অক্ষয় বাবুর আধ্যাত্মিকযোগের বিবাহ নহে; সুতরাং অক্ষয় বাবু যে লিখিয়াছেন;—

"হিন্দু বিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে; সকল ব্যাপারেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রখরা। হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জলরূপে প্রতিভাত।" আর একস্থলে:—"একটী পুরুষের সহিত একটী স্ত্রীর একী করণের নাম বিবাহ।" আবার:—"বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের

অনুষ্ঠান। হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মার আত্মার মিল।"

—এই সকলের অস্তিত্ব হিন্দু সমাজে সচরাচর নাই। এসকল শাস্ত্রোপদেশে উচ্চ আদর্শ, অথবা বক্তৃতা-ব্যপদেশে কল্পনার চিত্র মাত্র।

বিবাহ আধ্যাত্মিক যোগ; এই যোগের বন্ধন-দড়ি প্রেম। এখন জিজ্ঞাস্য এই, হিন্দু বিবাহের মধ্যে কি প্রেম আছে, না প্রেম থাকা সম্ভব? হিন্দু দম্পতির মধ্যে যে প্রেম নাই, তাহা বলিনা; কিন্তু বর্ত্তমান হীন সমাজের রীতিনীতি অনুসারে সে প্রেম বিবাহ বন্ধনের পরে সঞ্চারিত হয়, পূর্ব্বে নহে। সুতরাং প্রেম হিন্দু বিবাহের বন্ধন-দড়ি নহে—হাতে সুতাই তাহার প্রধান বন্ধন।

ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মানবের প্রাণে প্রেম উদ্রিক্ত হয় না। হৃদয় মনের ক্রম-বিকাশে প্রেমের সঞ্চার ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন পাঁচ বৎসরের বালক নেবিউলার থিওরি কি গ্র্যাভিটেসনের মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ—তাহার বুদ্ধির সে শক্তি-বিকাশ হয় নাই বলিয়া, সেইরূপ দশ বা দ্বাদশ বর্ষের বালিকা কিম্বা পঞ্চদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসরের বালকও প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম—তাহার হৃদয়ের সে শক্তি-বিকাশ হয় নাই বলিয়া। কিন্তু এদেশে বালক বালিকারই বিবাহ হইয়া থাকে। এদেশে অষ্টম বর্ষে বালিকার বিবাহ শ্রেষ্ঠতম বিবাহ, দশম বর্ষে হইলেও চলে, অতঃপর মহাপাতক। অষ্টমবর্ষের বালিকার মুখে—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং।
পতিকুলে ভূয়াসম্।

"হে ধ্রুব নক্ষত্র, তুমি যেমন অচল, আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।"—

এই কথার কোনও অর্থই নাই। অক্ষয় বাবুকেই জিজ্ঞাসা করি, কয়জন বর্ষীয়সী এই বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারেন? বালিকার তো কথাই নাই।

হিন্দু বিবাহের সকলই বাল্য বিবাহ; বাল্য বিবাহে যে আধ্যাত্মিকতা অসম্ভব, অক্ষয় বাবু তাহা অস্বীকার করেন না। তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন:—

"টাকী ইঁপুরের শ্রীমতী পাটেশ্বরী অধিকারী অষ্টমবর্ষে বিধবা হন।

তিনি বলেন;—'বাল্য বিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ।' আমরা বলি, একথা ঠিক।"

এই সকল বিবাহকে অক্ষয় বাবুও বিবাহ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাই তিনি বড় বড় অক্ষরে বালবৈধব্যের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন:—

"যাহার বিবাহ হয় নাই, সে বিধবা হইয়াছে, এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না।"

হিন্দুর অধিকাংশ বিবাহই অপোগণ্ড বালকবালিকার বিবাহ, ইহা জানিয়া শুনিয়াও প্রবন্ধ লেখক তবে কি করিয়া "হিন্দু বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক ব্যাপার" এ কথা প্রচার করিলেন?

১. এক পত্নী বর্ত্তমানে দারান্তর পরিগ্রহ অক্ষয় বাবুর বিপক্ষে আর একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজি কালি বহুবিবাহ কুপ্রথা সমাজ হইতে একরূপ উঠিয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে উঠিয়া যায় নাই। স্ত্রীর রোগ হইলে, অথবা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আজিও অনেক হিন্দু দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এমন কি যাহারা ভদ্রলোকদিগকে অবাচ্য কুবাচ্য ভাষায় গালি দিয়া, বিধবা বিবাহের অধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে বসিয়া, হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিক ভাব প্রচারে ব্যগ্র, তাহাদের শিবির অন্বেষণ করিলেও পত্নী বর্ত্তমানে দারান্তর পরিগ্রহের দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও না যাইতে পারে। যে সমাজে বহুল পরিমাণে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সমাজে বিবাহের আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল এ কথা যাহারা বলেন, তাঁহারা হয় দৃষ্টিশক্তিহীন, না হয় জানিয়া শুনিয়া, নির্ব্বোধের নিকট বাহবা নিবার জন্য, সত্যের অপলাপ করেন।

তবে অক্ষয় বাবু বলিতে পারেন, "বর্ত্তমান সমাজের রীতিনীতির আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে; তাহা আমি করি নাই। কি আছে, তাহা আমি অনুসন্ধান করিতে যাই নাই; কি হওয়া উচিত তাহাই আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি "প্র্যাকটিক্যাল" বিষয়ের আলোচনা করি নাই, ধর্ম্মের—থিওরিটিকেল বিষয়ের অবতারণা করিয়া, তাহারই মর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।" যদি তাহাই হয়, তবে আমরা বলি, অক্ষয় বাবু হিন্দু-বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থনই করিয়াছেন। তিনি যে চিত্র সাবিত্রী পুস্তকালয়ের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সমক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আদর্শ চিত্র, কল্পনার রঙ্গে ভাবের তুলিতে অঙ্কিত; কঠোর

বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই। এই চিত্র যে-দিন হিন্দু সমাজের প্রকৃত চিত্র হইবে, সে দিন বিধবা-বিবাহের প্রশ্নই উঠিবে না; সে দিন বিধবা-বিবাহ দাও, বা দিওনা, এ দুয়ের কোনও কথাই বলা নিষ্প্রয়োজন হইবে।

বিধবা শব্দের অর্থ কি? যাহার পতি মরিয়াছে, সেই তো বিধবা? আবার যে পুরুষের সঙ্গে কতিপয় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, একটী বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া, সমাজের দশ জনের সমক্ষে, কোনও রমণীর বিবাহ হয় তিনিই তো তাঁহার পতি? কি সূত্রে এই দুইটী প্রাণী এই সম্বন্ধে বদ্ধ হইলেন, তাহা সমাজ পরীক্ষা করিয়া দেখে না। প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে তাহারা যুক্ত হইয়াছেন কি না, সমাজ কেবল তাহাই দেখে। সুতরাং প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে যিনি যে রমণীর পতি হইয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুতেই সেই রমণী বিধবা হইলেন। কিন্তু এই বিবাহে যখন আধ্যাত্মিক অনাধ্যাত্মিক কথাই উঠে নাই তখন এইরূপ বিধবা রমণীর বিবাহে অনন্তকালস্থায়ী আধ্যাত্মিক বন্ধন ছিন্ন হয় বলিয়া, তাহার প্রতিবাদ করিতে পারা যায় না।

আধ্যাত্মিকতা কথা দ্বারা প্রকাশ পায় না। কাজের দ্বারাই মনের বিশেষণ জানা গিয়া থাকে। কোনও বিশেষ বিবাহ আধ্যাত্মিক যোগ কি, না কেবল শারীরিক যোগ, তাহাতে স্ত্রী পুরুষের একীকরণ হইয়া "প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে, আত্মায় আত্মায় মিল" হইয়াছে কি না, তাহা কেবল বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের কার্য্যকলাপ ও আচার আচরণ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক বিবাহ-যোগের বন্ধন-দড়ি প্রেম। প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ যে স্থলে প্রকাশ পায়, সেই স্থলেই বলিব প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিবাহ হইয়াছে, অন্যত্র হয় নাই।

প্রেম কাহাকে বলে, এখন তাহাই নির্দ্ধারণ করা উচিত। আসঙ্গলিপ্সা প্রেম নহে; রূপ-লালসা প্রেম নহে; সৌন্দর্য্য-জাত শরীরগত আসক্তি প্রেম নহে। অথচ এই সকলগুলিতেই প্রেমের লক্ষণ অল্পাধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইতে পারে; কেন না প্রেমে আসঙ্গলিপ্সা, রূপলালসা, আসক্তি এই সকলই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। "সেই মুখখানি" বলিয়া চীৎকার করা, "সেই মুখখানি" দেখিয়া চাহিয়া থাকা, "সেই মুখখানি" ভাবিয়া কাঁদিয়া উঠা,—এসকল অধিকাংশ স্থলেই প্রেমের

পিপ্টি মাত্র, প্রকৃত প্রেম নহে। একটী লক্ষণ আছে যাহা দ্বারা প্রেমকে স্থির নিশ্চিত রূপে ধরিতে পারা যায়,—সেটী প্রেম অবস্থার অধীন নহে,—প্রেম অনন্তকাল স্থায়ী। আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি প্রাণের উপরে বসিয়া উপর দিয়াই চলিয়া যায়, কিন্তু প্রেম আত্মার অণুতে অণুতে প্রবিষ্ট হইয়া, যতদিন আত্মার অস্তিত্ব, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকে। প্রেম সর্ব্বসহা, কিন্তু বিস্মৃতি সহিতে পারে না। যেখানে বিস্মৃতি, সেখানে প্রেম নাই। প্রেম পৃথিবীর কাল বিভাগ জানে না, মানে না। যে প্রণয় পাত্রের বিদ্যমানে, কেবল বর্ত্তমানেই ডুবিয়া থাকে,—ভূত, ভবিষ্যৎ তখন সে জানে না; আর প্রনয়ী জনের অবর্ত্তমানে তাহার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ নাই,কেবল আছে অতীত। যে অতীত তোমার আমার নিকট প্রদোষের ছায়া অপেক্ষা আরো ক্ষীণ, যে অতীত তোমার আমার নিকট স্বপ্নের অনুরূপ, সেই অতীত প্রেমিকের অবর্ত্তমানে প্রেমের নিকট একমাত্র জলন্ত, জীবন্ত অস্তিত্ব। এক দিন তাহার কালের মধ্যে কেবল ছিল বর্ত্তমান; এখন তাহার কালের মধ্যে কেবল আছে অতীত; ইহাই তো প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ।

এই লক্ষণ যে দাম্পত্য সম্বন্ধে দেখিতে পাই, সেই খানেই জানি তাহাদের বিবাহ-যোগ শরীরের যোগ নহে,—সমাজের যোগ,ধন মানের,বংশমর্য্যাদার যোগ নহে; কিন্তু আত্মার যোগ, ধর্ম্মের যোগ, স্বর্গের যোগ। যে দম্পতি মিলনে বর্ত্তমানে বিভোর, বিচ্ছেদে অতীতে নিমগ্ন, সেই দম্পতিই আদর্শ দম্পতি, তাঁহাদের বিবাহই আদর্শ বিবাহ। এ বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য অবিনশ্বর, অনন্তকালস্থায়ী। এ দম্পতির জীবনে বৈধব্য বা বিপত্নীকতা হয়ের কিছুই নাই। স্বামীর মৃত্যুতেই তো বৈধব্য ঘটে, পত্নীর মৃত্যুতেই তো বিপত্নীকতা হয়; কিন্তু এ দম্পতির একের পক্ষে অন্যের মৃত্যু নাই। স্বামীর পক্ষে স্ত্রী অমরা, স্ত্রীর পক্ষে স্বামী অমর। সংসারের পক্ষে স্বামী মৃত হইবেন; পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে, সংসারে তাঁহার অস্তিত্ব আর থাকিবে না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেমিকা সহধর্ম্মিণীর পক্ষে তিনি চির জীবীরও চিরজীবী—তাঁহার হৃদয়ে তিনি অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকিবেন। তাঁহার গৃহে তাঁহার স্নিগ্ধ সোনা মূর্ত্তি আর প্রকাশিত নাই, সত্য, তাঁহার কর্ম্মস্থলে তাঁহার কর্ম্মরত হস্ত আর বিদ্যমান নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে, প্রাণের রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশিয়া তিনি

অনন্তকাল বাস করেন,—তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে তিনি মৃত নহেন। তাঁহার স্ত্রীর আবার বৈধব্য কি? এইরূপ রমণীর স্বামীর লৌকিক মৃত্যুতে পুনর্ব্বিবাহের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না।

স্থিতি-বিরোধ যে কেবল জড়জগতে আছে, তাহা নহে; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও এ নিয়ম প্রচলিত। এক সময়ে দুই ভাবনা ভাবিতে পারা যায় না। একের স্থান চ্যুতি ভিন্ন, অপরের সে স্থানাধিকার অসাধ্য। যত দিন না স্বামীর লৌকিক মৃত্যুতে তাঁহার মূর্ত্তি স্ত্রীর হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া যায়, যতদিন না সেই যে জীবনতর মৃত্যু—প্রিয়তম জনের হৃদয় হইতে নির্ব্বাসন—ঘটে, ততদিন রমণী সধবা, ততদিন তাঁহার বিবাহে প্রবৃত্তি হইবে না। যদি তাঁহার মৃত স্বামীর সঙ্গে প্রকৃত প্রেম-বন্ধন হইয়া থাকে, তবে তিনি কখনও ত বিধবা হইবেন না। যখনই তিনি প্রকৃত বিধবা হইলেন, যখনই দেখিলাম যেরূপ সংসার হইতে তাঁহার স্বামীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার হৃদয় হইতেও লোপ পাইয়াছে, তখনই বুঝিলাম, তাঁহার বিবাহ-বন্ধন, আধ্যাত্মিক যোগ ছিল না; কেবল শারীরিক যোগ ছিল, তখনই বুঝিলাম লোকে যাঁহাকে তাঁহার স্বামী বলিত, তাঁহাকে তিনি পিতা মাতার আদেশেই হউক, সমাজের নিয়মেই হউক, কিম্বা এতদপেক্ষা কোনও নিকৃষ্টতর স্বার্থপর কারণেই হউক, কেবল তাঁহার শরীর সমর্পণ করিয়াছিলেন, আত্মা সমর্পণ করেন নাই; শরীরের "সম্রাট" করিয়াছিলেন হৃদয়ের "সম্রাট" করেন নাই। অর্থাৎ অক্ষয় বাবু যাহাকে বিবাহ বলিয়াছেন, তাঁহার সে বিবাহই হয় নাই; সুতরাং তাঁহার পক্ষে একথা বলিতে পারা যায় না,—

"হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে তাঁহার আত্মার ধ্বংস হয় না, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতিধর্ম্ম। এখন বলুন দেখি, হিন্দু নারী স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে কি বলিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে যাইবে? তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে স্বামী বিদেশে থাকিলে তো, তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহের দাবি চলিবে।"

মোট কথা এই যে, যে স্থলে আধ্যাত্মিক বিবাহ হইয়াছে, সে স্থলে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর কি স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর পুনর্ব্বিবাহে প্রবৃত্তিই জন্মিবে না। যেখানে প্রবৃত্তি জন্মিবে সেস্থলে ইহাই ঠিক যে তাঁহাদের বিবাহ বলিয়া যে একটা কাজ হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত বিবাহই নহে। সুতরাং তাঁহাদের

বিবাহে কোনও অধর্ম্ম নাই। তাঁহাদের বিবাহ ন্যায়সঙ্গত, যুক্তি সঙ্গত এবং অক্ষয় বাবুরও মত সঙ্গত।

উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা বিশদ হইয়া থাকিলে, এতক্ষণে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে,—

যে পুরুষ বা রমণী বিপত্নিক বা বিধবা হইয়া পুনরায় বিবাহেচ্ছু হন, তাঁহাদের পূর্ব্ব বিবাহ প্রকৃত প্রেমের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের পুনর্বিবাহ অন্যায় নহে।

অক্ষয় বাবু বলিতেছেন;—

"স্বামীর পরলোক গতির পর, যে রমণী বিবাহ করেন, তিনি আপনার জন্যই বিব্রত; তাও আবার কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং তাহার কাম্য, কাম্য মধ্যে ঘোরতর কাম্য। নিকৃষ্ট সমাজে এরূপ প্রথা তখনও ছিল, এখনও আছে।"

এখন জিজ্ঞাস্য এই, অক্ষয় বাবুর এই কথায় কোনও সদ্যুক্তি আছে কি না? বিবাহেচ্ছু বিধবাগণকে এইরূপ নিকৃষ্ট বলিবার কাহারও অধিকার আছে কি না?

উপরে যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইয়াছি, তাহা সত্য হইলে, অক্ষয় বাবুর এ নিন্দাবাদের মূলে যুক্তিহীন কুসংস্কার, অথবা ধর্ম্মহীন বিদ্বেষভাব ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে লঘু ভাষায় বড় একটা খাঁটি কথা প্রচলিত আছে:

"ঘসে মেজে রূপ হয় না,
ধরে বেঁধে প্রেম হয় না।"

মার্কিন কবি বলিয়াছেন:—

"Like Dian's kiss unasked unsought,
Love gives itself but is never bought."

এই কথা গুলি অতি সত্য। কতিপয় আভ্যন্তরীণ অবস্থায় প্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই সকল অবস্থা মানুষের ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হয় না। যে স্থলে এই সকল অবস্থা সংঘটন হয় না, সে স্থলে ধরিয়া বাঁধিয়া প্রেমের সঞ্চার করে কার সাধ্য? তুমি আমার জন্য যাহাকে বাছিয়া আনিলে, তাহার সঙ্গে আমার যে এই সকল আভ্যন্তরীণ অবস্থার মিল হইবে তাহার স্থিরতা

কি? তোমার মনোমত বর কি কন্যাটী যে তোমার কন্যা বা ভগিনী তোমার পুত্র বা ভ্রাতার মনোমত হইবে, তাহা কি তুমি ঠিক করিয়া বলিতে পার? যখন পার না, তখন তাহাদিগকে একত্র বাঁধিয়া দিয়া কি করিয়া আশা কর তাহাদের মধ্যে প্রেম হইবেই হইবে? আর না হইলেই বা কোন্ যুক্তি অবলম্বনে, কোন্ নীতি অনুসারে, তাহাদিগকে যথেচ্ছা নিন্দা করিয়া বেড়াও? তোমার অনুরোধে আমি তোমার বাছা কন্যাটীর প্রতি অসদ্ব্যবহার না করিতে পারি, তাহাকে মল, চুড়ি, চিক, হার, বালা, বাজু দিয়া সাজাইতে পারি, তাহার সেবার জন্য দশজন দাস দাসী রাখিয়া দিতে পারি, আমার ধন জন সকলই তাহার পাদতলে স্থাপন করিতে পারি;—এ স্বার্থ ত্যাগ মানবের সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু আমার হৃদয়টুকে তোমার অনুরোধে আমি কাহাকেও দিতে পরি না। আমার হৃদয়ের নীরব-গানের সঙ্গে যাহার হৃদয়টী তাল দিতে পারিবে, সেই তাহাকে জয় করিয়া লাভ করিতে পারিবে। জোর করিয়া অন্য হৃদয়ের সঙ্গে তাহাকে মিশাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে, Mechanical mixture হইতে পারে, কিন্তু Chemical combination হইবে না;—ঘরকন্নার জন্য যতটুকু একতা ও সহানুভাবুকতা প্রয়োজন তাহা জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রেমযোগের সঞ্চার হইবে না। মুক্তির লোভে বা শাস্তির ভয়ে হিন্দুরমণী পতির অনুগতা হইতে পারেন, কিন্তু ভয়ে বা লোভে তাঁহাকে প্রেমিকা করিতে পারে না।

কেবল ভয়ে বা লোভে যে কেহ প্রেমিক হইতে পারে না, তাহা নহে; উপদেশে এবং সদ্যুক্তির আকর্ষণেও কেহ প্রেমিক হইতে পারে না। প্রেমের অভিধানে যেহেতু অতএব নাই। ভালবাসা স্বস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী। যাহাদের প্রকৃতির মিল হইয়াছে, তাহারাই একে অন্যকে ভাল বাসিতে পারে। যে আপনার প্রাণের অব্যক্ত, অস্পষ্ট আদর্শ অপর যাহার হৃদয়ে পাইয়াছে সে তাহাকেই কেবল ভালবাসিতে পারে। প্রেম যুক্তির অধীন হইলে নব্যহিন্দু সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া নিরাকার পবিত্র স্বরূপের প্রেমে প্রেমিক হন না কেন? অথবা পবিত্র স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসকগণই শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হন না কেন? রুচি ও প্রেম এ উভয়ই জোর করিয়া কোথাও জন্মান যায় না।

এখন অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি আমি যদি তাঁহাকে ভাল বাসিতে

না পারিলাম, তাহাতে আমি কি নিকৃষ্ট হইয়া গেলাম? পিতৃ-নির্ব্বাচিত স্বামীকে যদি কোনও রমণী ভাল বাসিতে না পারিলেন, তিনি কি তাহাতে নিকৃষ্ট হইয়া গেলেন?

বিবাহ ব্যাপারে যদি রমণীর স্বাধীনতা থাকিত, তবেও বা এক-সময়ে, আপনারা বাছিয়া গুছিয়া বিবাহ করিয়া যে সকল রমণী নির্ব্বাচিত স্বামীকে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিতে না পারেন, তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপে ন্যায় সঙ্গত হইত না। মনুষ্যের মন এমনি জিনিষ যে তাহার প্রকৃত ভাব বুঝিয়া ওঠা সকল সময় সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। বস্ত্র নির্ব্বাচনে, আহারীয় নির্ব্বাচনে, কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচনে, কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে, মনুষ্যের যখন ভ্রম ঘটিয়া থাকে, তখন পতি নির্ব্বাচনেও ভ্রম ঘটিতে পারে। কখন বা আসঙ্গলিপ্সাকে, কখনও বা রূপলালসাকে, আর কখন বা মধুর ভাষাকে প্রকৃত ভালবাসা ভ্রম করিয়া পতি নির্ব্বাচনে রমণীগণের ভ্রম হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। তোমার আমাদের সকলেরই রজ্জুতে সর্প ও সর্পেতে রজ্জু ভ্রম প্রতি নিয়তই হইতেছে, তাহার জন্য কি তুমি আমি নিকৃষ্টশ্রেণীভুক্ত হইলাম? তাহা যদি স্বীকার কর, তবে বিবাহার্থিনী বিধবাকেও নিকৃষ্ট বলিতে ইচ্ছা হয় বল, অন্যথা এ অন্যায় কথা মুখে আনিও না।

হিন্দু-বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে অক্ষয় বাবু আর একটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হিন্দু বিবাহের কৌলিকতা। অক্ষয় বাবু বলিতেছেন;—

"কেবল একে আর একে মিলনের নাম বিবাহ নহে, আধ খানিকে পূরা একখানি করিবার জন্য একটি পরিবার মধ্যে একটি নারীর আগমন, মিলন, ও মিশ্রণ বিবাহ * * একটি পরিবারের সহিত একটি হিন্দুকুমারীর বিবাহ হয়; কেবল একটি পুরুষের সহিত নহে।" অতএব প্রবন্ধ লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন,—

"হিন্দু রমণী একবার যে কুলে গৃহীতা, নীতা, ও পরিণীতা হইয়াছে, সে কোন প্রকারেই আর সে কুলত্যাগ করিতে পারে না। কুল-ত্যাগিনী, কুলটাব্যভিচারিণী, আমাদের হিন্দুদের অভিধানে একই পর্য্যায় ভুক্ত।"

একটা যুক্তিহীন বিষয়ের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিতে গেলে লোকের এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। অক্ষয় বাবু কোনও কোনও শ্রেণীর বঙ্গীয় পাঠক সমাজে বড় চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া সমাদৃত; তিনি যে একপ

উক্তরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বুদ্ধি দোষে নহে; কিন্তু ভাগ্য দোষ; তাঁহার মস্তিষ্কের ক্ষীণতা বা জ্ঞানের অল্পতা নিবন্ধন নহে, কিন্তু তিনি যে বিষয়টা প্রমাণ করিতে দাঁড়াইয়াছেন, তাহার দুর্ব্বলতা ও অসারতা নিবন্ধন। অক্ষয় বাবু কি জানেন না তাঁহার হিন্দু বিবাহের কৌলিক ভাবের মূল কোথায়? সমাজ বিজ্ঞানের দুপাত যে পড়িয়াছে, সেও তাহা জানে। কৌলিক বিবাহ পদ্ধতি, ইংরাজিতে Clan-marriage, অসভ্যতম জাতি সমূহের মধ্যে আজিও বিদ্যমান আছে। জগতের সভ্যতার অতি শৈশব অবস্থায় দাম্পত্য বন্ধন যখন নিরতিশয় শিথিল ছিল, বিবাহ সম্বন্ধে আজি কালিকার উন্নত ভাব যখন জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই, তখন একটী রমণীর কেবল একটী পুরুষের সঙ্গে নহে, কিন্তু একটী কুলের সহিত বিবাহ হইত। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র সকলে এক রমণীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিত ও স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিত। সভ্যতার ক্রম বিকাশে কৌলিক বিবাহের পরের সোপানই এক নারীর বহু পতি গ্রহণ (Polyandry) এই প্রথা প্রাচীন হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান ছিল; মহাভারতোক্ত পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজিও এই প্রথা পঞ্জাব অঞ্চলের কোনও কোনও হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ প্রচলিত আছে।*

এই প্রাচীনতম কৌলিক বিবাহ প্রথারই ঈষদ্ আভাস অক্ষয় বাবুর "এক পরিবারের সঙ্গে একটী হিন্দু রমনীর বিবাহ হয়" এই ভাবের মধ্যে পাওয়া যায়। এই ভাবের মূলে কোনও উচ্চ ধর্ম্মভাব বা আধ্যাত্মিকত্ব বিদ্যমান নাই।

অক্ষয় বাবুকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রমনী বিবাহের পূর্ব্বে কোন্ কুলে বাস করেন? পিতৃকুলে। পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া বিবাহ সমাপ্তে তিনি শ্বশুরকুলে গমন করেন, ইহা কি সত্য নয়? যদি তাহা হয়, তবে পিতৃকুল ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, অক্ষয় বাবুর যুক্তি অনুসারে তাঁহাকেও কুলটা শব্দে অভিহিত করিতে পারা যায় কি?

বিধবা-বিবাহ বিরোধীগণের মুখে আর একটী যুক্তি বড়ই ঘন ঘন শুনিতে পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবু স্বয়ংও তাহার একটুকু উল্লেখ করিয়া

* বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "মানব প্রকৃতি"—প্রথম ভাগ, Spencer' Principles of Sociology, এবং Ibetson's Report of the Punjal Census 1881, দেখ।

ছেন। সেটী এই যে, বিধবা বিবাহের বিধান আছে, বিধবার বিবাহ করিবার স্বাধীনতা আছে, বিবাহের আইন আছে, কিন্তু তথাপি যে বহুল পরিমাণে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতেছে না, তাহা সমাজের অত্যাচারের ভয়ে নহে, কিন্তু হিন্দু বিধবার ধর্ম্ম নিষ্ঠার গুণে। অক্ষয় বাবু বলিতেছেন;— "উচ্চতর সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করা, একরূপ অসম্ভবের সম্ভাবনা করা। হিন্দুর আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ত্রিশ বৎসরের আইন খানির দুর্দ্দশা দেখাইয়া, একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে।"

কিন্তু ইহা কি সত্যকথা? ত্রিশ বৎসরের আইন খানির দুর্দ্দশা বিধবার নিষ্ঠাগুণে, না তোমাদের কৃপাগুণে বল দেখি? গবর্ণমেণ্টের যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজ গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষাও বড়। তোমাদের আপনাদের পরিবারের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, বিধবা বিবাহ বিধির দুর্দ্দশা তোমাদের গুণে না বিধবার গুণে হইয়াছে? বিধবার বিবাহেচ্ছা প্রকাশ পাইলে তাহার কি দুর্দ্দশাই তোমরা করিয়া থাক, তাহা জান না কি? তাহাকে যে কারার বন্দিনীরও অধম করিয়া রাখ ইহা জান না কি? কোথাও কোথাও রোগে বিনা চিকিৎসায় তাহার অকাল মৃত্যু ঘটাও তাহা জান না কি? তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দুর্দ্দশার একশেষ ঘটাও তাহা জান কি? তোমরা বিধবাদের পিতা, ভ্রাতা, বা অভিভাবক, তোমরা যখন বিধবা বিবাহের বিরোধী—ধর্ম্মের অনুরোধে নয়,—কেন না তোমরা এই ধর্ম্ম মান না—কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে,—সমাজচ্যুতির ভয়ে,—আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়া—বিধবা বিবাহের বিরোধী তখন পরাধীনা অবলা বিধবা কাহার সাহায্যে বিবাহ করিবে বল দেখি?

আমরা এতক্ষণ বিধবা বিবাহ যে অন্যায় কার্য্য নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। এখন বিধবা বিবাহ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্ম কার্য্য, তাহা প্রমাণ করিব। অক্ষয় বাবুকে ধন্যবাদ, তিনি স্বয়ংই তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের কেবল দুই চারিটী টীকা টীপ্পনী করিলে তাঁহার বক্তৃতা হইতেই এই বিষয় প্রমাণ হইয়া যাইবে।

বিবাহ সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু বলেন:—"হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য মুক্তি।" 'বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী।' 'অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ ব্যক্তি হন।' হিন্দু

বিবাহে পতি পত্নীর যেরূপ একত্ব হয়, 'এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একী করণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই। সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নি শিখাতে মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনই স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী তেমনই পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে। স্বয়ম্ভু নিজেদেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভূ প্রস্তত হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মনুষ্যত্ব সাধক। হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য এই মিশ্রণ এবং একীকরণ।"

হাতে সূতা বাঁধিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যে বিবাহ হয় সে বিবাহে মুক্তি নাই, সে বিবাহ মনুষ্যত্ব সাধক নহে;—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপরে অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা যেটুকু উদ্ধৃত করিলাম, তাহার যদি কোনও অর্থ থাকে সেটা এই যে, বিবাহের দ্বারা মানব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় আরোহণ করিতে থাকে। বিবাহের যে এই মুক্তিদায়িনী শক্তি আছে তাহা কি প্রেমের গুণে নহে? প্রেমে ভক্তি উপজাত হয়; মানুষকে ভালবাসিয়া হৃদয় ঈশ্বরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে। ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে ক্ষুদ্র নদী নিসৃত হইয়া বহুদেশ, বহুজনপদ, বহুনগর নগরী বিধৌত করিয়া, অবশেষে অগাধ জলধিজলে মিশিয়া যায়। প্রেমের গতিও তাহারই মত। প্রথমে প্রেম ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত; কিন্তু ক্রমে এই কেন্দ্র হইতে সমগ্র জগৎকে আলীঙ্গন করিয়া সর্ব্বশেষে প্রেম-সাগর ভগবানে গিয়া লীন হইয়া পড়ে। এই জন্যই বিবাহ মুক্তির উপায়। তবে কেবল হাতে সূতা বাঁধা মুক্তির উপায় বা সহায় নহে। যে বিবাহ প্রেমের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত সেই বিবাহই মুক্তির উপায় তাহাই প্রকৃত বিবাহ। যে রমণী, লোকে যাহাকে বৈধব্যবলে তদবস্থাপন্ন হইয়াও পুনরায় বিবাহেচ্ছু হন, তাঁহার বিবাহ বলিয়া যে একটা অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা বিবাহই নহে। সুতরাং তাঁহার সে বিবাহ দ্বারা হৃদয়ের বিকাশ হয় নাই। তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই। কাজেই পুনরায় প্রকৃত বিবাহ সম্বন্ধ বদ্ধ হইলে তাঁহার মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইবে। মুক্তির জন্য

যাহা কিছু করা যায় তাহাই ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য ; বিবাহার্থিনী বিধবার বিবাহও মুক্তির সহায় বলিয়া প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত।

অক্ষয় বাবু ব্রহ্মচর্য্যব্রতের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত করিয়া, বিধবাগণকে এই মহাব্রত অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বেশ কথা। যে দেশে কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষিত লোকেরা ঈশ্বর মানিত না, ধর্ম্ম মানিত না, সৎকর্ম্মের আদর জানিত না, মহত্ত্বের মহৎভাব গ্রহণ করিতে পারিত না ; যে দেশের লোকেরা এক পাত আধ পাত ইংরাজি পড়িয়া "Damn go to hell" বলিয়া সকল ধর্ম্ম ও সকল নীতিকে বাক্যতঃ ও কার্য্যতঃ একেবারে উড়াইয়া দিত, সে দেশে এখন ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যে দেশে এখনও ব্রহ্মের নাম লোকে লইতেছে, সে দেশে যে পরোপকার ব্রতের মূল্য লোকে বুঝিতেছে, অথবা বুঝিতেছে বলিয়া ভান করিতেছে, ইহা অতি সুখের কথা। ব্রহ্মচর্য্য ! মানব জীবনের উদ্দেশ্যইতো এই। ব্রহ্মচর্য্য মুক্তির একমাত্র সোপান, ভক্তির একমাত্র প্রাণ, নীতির একমাত্র সহায়। অক্ষয় বাবুর মুখে তাহার প্রশংসা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য কেবল বিধবার পালনীয় কেন ? তুমি আমি ব্রহ্মকে ও ব্রহ্মচর্য্যকে মালঘরের এক অন্ধকার কোণে পিতৃপিতামহের কাল হইতে স্তূপীকৃত বালুকারাশির মধ্যে, বহুপুরুষের একত্রিত ভাঙ্গা তামা কাঁশা, ছেপায়ার পা, খাটের খুঁটি, ঝাড়ের কাটি ও উইর মাটির ভিতর ফেলিয়া রাখিব ; আর বিধবারা তাহা কুড়াইয়া আনিয়া সযত্নে রক্ষা করিবে ইহার অর্থ কি ? মুক্তিটা কি কেবল স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ হতভাগিনী বিধবাদিগেরই প্রয়োজনীয় ? তোমার আমার কি তাহা না হইলেও চলে ? তাই যদি মনে না কর, তবে কেবল বিধবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিধান কেন ?

ব্রহ্মচর্য্য অতি ভাল পদার্থ। ব্রহ্মের পরিচর্য্যা, ঈশ্বরের সেবা, ইহা তো মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সকল দেশে, সকল ধর্ম্মে, সকল শাস্ত্রে, ভগবৎসেবার প্রশংসা আছে।

"খাটিতে এসেছি খাটিয়া মরিব"—

সকল ধার্ম্মিকেরই তো এই মর্ম্মান্তিক বাসনা। কি কুমারী, কি সধবা কি বিধবা ; কি যুবক, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ ; সকলেরই তো ব্রহ্মচর্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। তবে বিধবার পক্ষে তাহার বিশেষ বিধি কেন ?

অক্ষয় বাবু তাহা বলেন নাই। আমরা তাহা বলিতে পারি। ব্রহ্ম-

চর্য্যের প্রকৃত অর্থ পরার্থে জীবন উৎসর্গ। আপনার সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া, অপরের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম—ঈশ্বরের পুত্র কন্যাগণের সেবায় জীবনের সমুদায় শক্তি নিয়োজিত করা,—ইহাই তো প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। আর পরার্থে যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, সে আপনাকে ভুলিয়া যায়। এ স্থানেই বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ বিধির প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হইল।

গভীর শোকে মানুষের কখনও উপকার করে, কখনও অপকার করে। কখনও বা মানুষ শোকের তাড়নায় পাপপঙ্কে গিয়া ডুবিয়া, তবলার চটির মধ্যে, টপ্পার সুরের মধ্যে, সুরার কূপের মধ্যে আত্মবিস্মৃতি জন্মাইবার চেষ্টা করে; আর কখনও বা সৎকার্য্যের ব্যস্ততায়, পরোপকারের অক্লান্ত নিবিড় পরিশ্রমের মধ্যে আপনার সুখ দুঃখকে ডুবাইয়া দিয়া শ্মশানে বৈরাগী হইয়া বাস করে। গভীর শোকের এই দুইটী মাত্র ঔষধ; ইহার যেটীতে নরকের দিকে গতি হয়, সেটী সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়; যেটীতে স্বর্গের পথ পরিষ্কার হয় সেটী সর্ব্বজন প্রতিপালনীয়। বিধবার মত এমন শোকার্ত্ত আর কে? যাহার হৃদয়ের অবলম্বন, জীবনের সহচর, প্রাণের আরাম, সংসারের বন্ধন, একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল, তাহার মত এত দুঃখিনী, এত শোকাতুরা আর কে আছে? পুত্রশোককে লোকে সচরাচর তীক্ষ্ণতম শোক বলিয়া মনে করে, কিন্তু স্বামী-শোক পুত্রশোক অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর। বিধবার মত আর কাহার এত আত্ম-বিস্মৃতির প্রয়োজন আছে? তাঁহার মত আর কাহার সংসারে এত ঔদাসীন্য জন্মিবার সম্ভাবনা? তাই গভীর চিন্তাশীল হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বিধি করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিবে।

এই হৃদয়হীন দেশের হৃদয়হীন লোকেরা আজ বিধবার চক্ষু জলের প্রতি উদাসীন। কিন্তু যাঁহারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বিধান করিয়াছিলেন তাঁহাদের হৃদয় ছিল, তাঁহাদের বিধবার দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই বিধবাদের শোক নিবারণের জন্য, তাঁহারা শোকের তাড়নায় অধর্ম্ম পথ অবলম্বন না করেন, তাহার উপায় করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন;—

"মা, তোমার যাহা হারাইয়াছে তাহা তো আর দিতে পারিব না। কিন্তু এ গভীর শোক যাহাতে তোমার কমে, এ মর্ম্ম বিদারক অশ্রুজল যাহাতে তোমার নিবারিত হয়, তাহার উপায় বলিয়া দিতে পারি। আপনাকে ভুলিয়া থাক, আপনার বর্ত্তমান অবস্থাকে ভুলিয়া থাক, আপনার গভীর

শোককে ভুলিয়া থাক, তবেই শান্তি পাইবে। এই শোক ভুলিবার, এই আত্ম বিস্মৃতি জন্মাইবার একটী মাত্র পথ আছে। সৎকার্য্যের ঘূর্ণাতে গিয়া ঝাঁপ দাও; পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ কর; দুঃখীর দুঃখ মোচনে, শোকাতুরের শোক নিবারণে, আশ্রয় হীনের আশ্রয় দানে, দিবা রাত্রি খাটিতে সংকল্প কর; তোমার আত্ম বিস্মৃতি জন্মিবে, তোমার এই গভীর শোক নিবারিত হইবে, তোমার জীবন সার্থক হইবে।"

—তাঁহাদের হৃদয় ছিল, তাঁহারা রুগ্নের রোগ নির্ণয় করিয়া তন্নিবারণার্থ ঔষধ বিধান করিয়াছিলেন, তাহার দুঃখ মোচনোদ্দেশে।—আর আজ আমরা রোগ থাকুক আর নাই থাকুক, ঔষধের প্রয়োজন হউক, আর নাই হউক, বিধবাদিগকে সজোরে রাশীকৃত মহাতিক্ত কুইনাইন গলাধঃ করিয়া লোকহিতৈষণার বাহাদুরী লইতেছি! আহা আমাদের কি কোমল প্রাণ! কি ধর্ম্মজ্ঞান! কি বিদ্যাবুদ্ধি! কি চিত্তশুদ্ধি!

যে রমণী স্বামীর লৌকিক মৃত্যুতে গভীর শোকাতুরা হইয়া আত্ম বিস্মৃত হইবার জন্য ব্যাকুলা হইবেন, যাহার গভীর শোকের উপশমার্থ আপনার অবস্থা ভুলিয়া থাকা প্রয়োজন,—স্বামীর মৃত্যুতে, এত শোক যাহার হয় সেই রমণী প্রকৃত ভালবাসা জানেন, সেই রমণীর প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তোমার আমার দেশে এইরূপ গভীর শোকাতুরা বিধবার সংখ্যা কত বল দেখি?

পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি বাল্যবিবাহের ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা বা প্রেম নহে। বাল-বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যের বিধি নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু বালবিধবা এদেশে কত তাহা জান কি? গত জনসংখ্যা হিসাবে সমগ্র ভারতে দশমবর্ষের ন্যূনবয়স্কা হিন্দু বিধবা সংখ্যা ২১১৪৬; পঞ্চদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা হিন্দু বিধবা সংখ্যা ৮২৬০২; এবং বিংশতি বর্ষের ন্যূনবয়স্কা হিন্দু বিধবা সংখ্যা ১৬৪৭১৯।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অনুসারে ভারতের হিন্দু বিধবার তালিকা এই:—

প্রদেশ	দশমবর্ষের ন্যূন	১০ হইতে ১৪	১৫—১৯	২০—২৪
বাঙ্গালা—	১১৯২৮।	৩৭১০২।	৯১০৯৩।	১৪৭১০০।
বোম্বাই—	৫৩৩০।	১৯০৬৬।	২২৬১২।	৪০২৭১।
উত্তরপশ্চিম—	৪২১৩৭।	২১৫৬৪।	৩৮০৭৪।	৮০২৫৩।
পঞ্জাব—	৬৭৫।	৪০৭০।	১০৯৩৬।	২২৩০৬।

সর্ব্বশুদ্ধ সমগ্র ভারতে হিন্দু নারী সংখ্যা ৪৭৭২৫৩৭৮ অথবা প্রায় পৌনে পাঁচ কোটিরও অধিক। তন্মধ্যে সর্ব্ব বয়সের হিন্দু-বিধবা সংখ্যা ৭৬৫১২০১; অথবা সমগ্র হিন্দুনারীর প্রায় এক ষষ্ঠাংশ বিধবা। এই ৭৬৫১২০১ বিধবা গণের মধ্যে আবার ৮২৬০২ একেবারে বাল বিধবা,—স্বামী কি ধন তাহা জানিবার পূর্ব্বেই তাহা হইতে চির জীবনের মত বঞ্চিতা; এবং ১৬৪৭১৯ যৌবনের প্রারম্ভে পৌছিতে না পৌছিতেই, হৃদয় মনের যে বিকাশে মানব আত্মাতে প্রেমের সঞ্চার হওয়া সম্ভব তদবস্থাপন্ন হইতে না হইতেই বৈধব্য গ্রস্ত হইয়াছেন। এই সকল বালিকাদিগকে কঠোর ধর্ম্মোপদেশের বাহানা করিয়া জীবনের কতিপয় উচ্চতম ও পবিত্রতম সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিতে যত্ন করা ধর্ম্ম কর্ম্ম না সয়তানী আচরণ তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

ব্রহ্মচর্য্য কথাটী বড় ভাল; ইহার মূল ভাবটী আরো ভাল। কিন্তু এদেশে বৈধব্যের যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার প্রকৃত অর্থটী কি প্রবন্ধ-লেখক যদি তাহা একটীবার আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, আমরা কৃতার্থ হইতাম। ব্রহ্মচর্য্য কি একাহারে দিন যাপন করা? ব্রহ্মচর্য্য কি তোষকের পরিবর্ত্তে মাদুরে শয়ন? সিদ্ধ চাউলের পরিবর্ত্তে আতপ চাউল ভক্ষণ? না কেশ বিন্যাশের পরিবর্ত্তে রুক্ষ কেশ রক্ষণ? ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে, ঈশ্বরের সেবার সঙ্গে, পরোপকার ব্রতের সঙ্গে, আতব তণ্ডুল কি সিদ্ধ তণ্ডুলের, আমিষের কি নিরামিষের, একাহারের কি দ্বিআহারের অথবা পাঁড়ধার ধুতির কি সাদা থানের কি সম্পর্ক আছে, তাহা আমরা জানি না। যে রমণী স্বামীর মৃত্যুতে আত্মবিস্মৃতির জন্য ব্রহ্মচারিণী, তাঁহার সুখে থাকিতে কষ্ট হইবে। যে সকল সুখ স্বামীর এক সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করিয়া ছিলেন, সে সুখ এখন একাকিনী ভোগ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে না। জোর করিয়া ভোগ করিতে বাধ্য করিলে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এই বৈরাগ্য, এই শরীরকে কষ্ট দেওয়ার সঙ্গে বৈধব্যের—পতিশোকের সম্পর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের কোনও সম্পর্ক নাই।

ব্রহ্মচর্য্য অতি উচ্চ ব্রত, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। ব্রহ্মচর্য্য —ঈশ্বরের সেবা, যে ধর্ম্মের সার, মুক্তির পথ, নীতির সহায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি। যাহাকে তোমরা আজি কালি ব্রহ্মচর্য্য বল,

তাহাও একটা ভাল জিনিষ, একটা অতি ধর্ম্মকার্য্য ইহাও না হয় তর্কচ্ছলে স্বীকার করিলাম ; কিন্তু জোর করিয়া লগুড়াঘাতের ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখা কি ধর্ম্ম সঙ্গত ? তবে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারকগণের দোষ ছিল কি ? ধর্ম্ম তো আর হাতের একটা কাজ নয়, বা বাহিরের একটা পোষাক নয়, যে জোর করিয়া তাহা সারিয়া নিতে বা পরাইয়া দিতে পারা যায়। ধর্ম্ম মনের উপর, হৃদয়ের ভাবের উপর, নির্ভর করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে ভাব বেশী না ভয় বেশী ? বল দেখি তোমার আমার নিন্দার ভয়ে, শশুর শ্বশ্রূর প্রহারের ভয়ে, সমাজের অত্যাচারের ভয়ে, হিন্দু বিধবা ব্রহ্মচারিণী, না আপনার হৃদয়ের ভাবের আবেগে, আপনার প্রাণের গভীর তৃষ্ণায় তিনি সর্ব্বত্যাগিনী ? সত্য কথা যদি বল তবে এই প্রশ্নের কেবল একটি মাত্র উত্তরই সম্ভব। হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছাদ্বারা নির্ব্বাচিত নহে ; কিন্তু সমাজের লোকের অত্যাচার-ভয়ে অনুষ্ঠিত।

যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে ধর্ম্মকার্য্যে ধর্ম্ম নাই। সত্য কথা বলা বড় ভাল, সত্যবাদীর মুক্তিপথ প্রশস্থ। কিন্তু তাই বলিয়া যদি আমরা কোনও ব্যক্তিকে বলি, "তুমি সত্যবাদী না হইলে, কলিকাতার পথে বেড়াইতে পাইবে না ; ভদ্র সমাজে বসিতে পাইবে না ; তুমি যাহা ভালবাস তাহার কিছুই আমরা তোমাকে দিব না ; এবং এই ব্যক্তি যদি সত্যের প্রতি তাহার প্রাণের প্রীতি আছে বলিয়া নহে, কিন্তু আমাদের দণ্ডের ভয়ে সর্ব্বদা সত্যাচরণ করে, তাহাতে তাহার প্রশংসার কিছুই থাকিবে না,—এই কর্ম্মে তাঁহার ধর্ম্ম হইবে না। ইহা কি অক্ষয় বাবু স্বীকার করেন না ? যদি করেন, তবে লোকভয়ে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যের যে কিছু মূল্য নাই তাহা স্বীকার করেন নাই কেন ?

প্রবন্ধ লেখক লেখনীর বেগে, করতালির লোভে, দিকবিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের একটী অতি সুন্দর কিন্তু ঘোরতর অলীক ও শুদ্ধ কল্পনা-প্রসূত প্রতিকৃতি পাঠকের সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন। এরূপ সৌভাগ্যবান হিন্দুপুরুষ ভারতক্ষেত্রে অতি অল্প যাঁহার গৃহে বিধবার আর্ত্তনাদ উত্থিত হয় নাই। এবং সরল সত্যপ্রিয় হিন্দুদিগকেই জিজ্ঞাসা করি অক্ষয় বাবু যে লিখিয়াছেন ; "হিন্দুনারী জানেন, কেবল একং এবং অদ্বিতীয়ং ; কাজেই তিনি পতি চারিণী হইলেই এক চারিণী ;

সেই শক্তি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন, কাজেই তিনি ব্রহ্মচারিণী। সেই মূর্ত্তি কি ক্ষেমঙ্করী, কেমন শান্তিময়ী; কেমন নিষ্কামে কার্য্যকরী; কেমন কোমলে কঠোর; যেন ইহকালে পরকালের ছায়া; সে সৌন্দর্য্যে বিলাস নাই; সে কোমলতায় আবেশ নাই; সে ললিত ভৈরবে পিট্ কিরি কর্ তপ নাই; সে বেহাগে 'ঢলিয়া পড়ি ধর ধর" নাই। সে মূর্ত্তি আপনাতে নির্ভর করিতে জানে, করিতে পারে; বিনা মূল্যে সংসারের সেবা করে; তাঁহার কাছে ভোগের সহিত সেবার বিনিময় নাই; তাঁহার কর্ম্মই—প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম; তাঁহার ধর্ম্মই প্রকৃত—হিন্দুধর্ম্ম; তাঁহার জীবন—মহাব্রত তিনিই যথার্থ ব্রতধারিণী; ব্রহ্মচারিণী; তিনি নারী হইয়াও দেবী।"

—এই কথা সত্য কি মিথ্যা? ইহা হিন্দু বিধবাসাধারণের প্রকৃত প্রতিকৃতি না জান, ইহা তাঁহারাই বিচার করিয়া বলুন। হিন্দু রমণীর অনেক গুণ আছে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম, তাহার ব্রত নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত একথা যিনি বলেন, তিনি হয় সাধারণহিন্দুসমাজ ও হিন্দুপরিবারের কথা কিছুই জানে না; অথবা জানিয়া শুনিয়া ভাষার চোটে, কল্পনার তরঙ্গে, পসার জাঁকানের লোভে, সত্যের অপলাপ করেন।

হিন্দু বিধবার অনেকগুণ আছে। এমন হিন্দু বিধবা দুই চারি জন খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে, যাঁহাদের জীবন অক্ষয় বাবুর এই চিত্রের অনুরূপ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু বিধবার পক্ষে এ চিত্র খাটে না,—খাটা অসম্ভব। তুমি আমি যে হিন্দু পরিবারের লোক, তুমি আমি যে হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সভ্যগণভুক্ত, সে পরিবারের, সে সমাজের অশিক্ষিতা বিধবাগণ ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া ভূতলে স্বর্গ শোভা প্রকাশ করিতে পারে, এ কল্পনা কোন্ প্রাণে যে কর, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমার আমার শরীরের প্রতি রক্ত বিন্দু দূষিত: তুমি আমি ষড়রিপুর দাসের দাস, কামুকের কামুক, অধার্ম্মিকের অধার্ম্মিক, ইহা কি জান না? আর আমরাই যে রমণীগণের ভ্রাতা, বা পিতা, বা অপর আত্মিয় স্বজন, সে রমণীগণ সর্ব্বপ্রকার পুতিগন্ধ হইতে মুক্ত থাকিয়া, নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম পালন করিতেছে,—এ অসম্ভব কথা প্রচার কর কেমন করিয়া, বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সুখধাম যাত্রী।

সুখধামে তোরা
কে যাবি রে আয়!
বেলা নাহি আর
রবি অস্ত যায়।
চেয়ে দ্যাখ, ভাই,
এক দুই করি
পাড়ি দিল যত
যাত্রীকের তরী।
ঝুপ্ ঝাপ্ করি
ক্ষেপণী ফেলিয়া
মনানন্দে সবে
যাইছে চলিয়া।
বহিছে বাতাস
মৃদুল মৃদুল,
চলিতেছে স্রোতঃ
কুল কুল কুল।
সারি সারি বসি
সুর মিলাইয়া,
'সারি' গেয়ে সবে
যাইছে চলিয়া।
কূলে বসি তোরা
কি ভাবে বিহ্বল?
রবি অস্ত গেলে
কি করিবি বল্?
সুখধামে তোরা
কে যাবি রে আয়!

এই ধর্ম্মতরী
আছে অপেক্ষায়।
সংসার তরঙ্গে
ডোবে না এ তরী,
কাণ্ডারী ইহার
ভবের কাণ্ডারী।
মায়ার আবর্ত্ত,
পাপ-মগ্নশৈল
এ তরীতে চাপি
এড়াইয়া চল।
এস ত্বরা করি,
বেলা বয়ে যায়!
ওই সুখধাম
দেখ দেখা যায়!
সুখধামে তোরা
কে যাবি রে আয়!
ওই সুখধাম
দেখ দেখা যায়!

কিবা হাস্যময়ী
প্রকৃতি সুন্দরী!
কিবা বহিতেছে
সংগীত লহরী!
কিবা উথলিছে
কিরণ তরঙ্গ!
পুণ্যাত্মা গণের
হের কিবা রঙ্গ!

অনন্ত বসন্ত
বিভূষিত স্থান!
অনন্ত অমিশ্র
সুখের নিদান!
নাহি রোগ, শোক,
জড়া, মৃত্যু ভয়।
হরি প্রেমে দিশি
হরি প্রেমময়!
নির্ঝর বহিছে
হরি প্রেমধার!

পবন বহিছে
হরি প্রেমভার!
বিহঙ্গ বিভোর
হরি প্রেম গানে!
হরি প্রেম সুধা
বহিছে বিমানে!
সুখধামে তোরা
কে যাবি রে আয়!
কূলে বসি আর
কার অপেক্ষায়?

শ্রীদীনেশচরণ বসু।

বর্ষ-শেষ।

ঈশ্বরের কৃপায়, লেখকগণের আশীর্ব্বাদে, এবং গ্রাহক ও পাঠকবর্গের অনুগ্রহে, "আলোচনা" আপনার ক্ষুদ্র জীবনের প্রথম বৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে কাটাইয়া উঠিল।

এই বৎসর কাল এই ক্ষুদ্র পত্রিকা আপনার কর্ত্তব্য পালনে ও উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য বা অকৃতকার্য্য হইয়াছে,—তাহা সাধারণ্যে বিচার করিবেন। আমরা জানি, এই বৎসর কাল আলোচনার অনেক ত্রুটী ঘটিয়াছে; আশা করি উদার গ্রাহক ও পাঠকবর্গ তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। আমরাও আগামীতে যাহাতে এই সকল ত্রুটী না ঘটে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব।

এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা দুইটী বিষয়ে বড় অভাব বোধ করিয়াছি—প্রথম বিষয়ের সংকীর্ণতা, দ্বিতীয় স্থানের অল্পতা। ধর্ম্ম ও নীতির আলোচনা করাই আলোচনার উদ্দেশ্য; কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি এই দুটী কথাই ইচ্ছামত সঙ্কুচিত অথবা বিস্তৃত করিতে পারা যায়। যাহা কিছু মানব জীবনের বিবিধ কার্য্য ও কর্ত্তব্যের সঙ্গে কোনও প্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধিত, তাহারই সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে; সুতরাং মানবীয় সর্ব প্রকার বিষয়ের আলোচনাই এক অর্থে ধর্ম্মালোচনা। হিন্দুর নিকট, ভারতবাসী আর্য্যগণের নিকট ধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন ভাব নূতন নহে। ধর্ম্মে আবার কেবল "রিলিজিয়ন" ও (religion) বুঝাইয়া থাকে। নীতি সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। নীতি-বিজ্ঞানকে এক জন ইংরাজী দার্শনিক পণ্ডিত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগের নাম ধর্ম্মনীতি অথবা Ethics, এবং অপর ভাগের নাম রাজনীতি অথবা Politics রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম বৎসর কাল আলোচনা ধর্ম্ম ও নীতির আলোচনা করিবার সময় ধর্ম্ম শব্দকে সংকীর্ণতর "রিলিজিয়ন" অর্থে এবং নীতি শব্দকে সংকীর্ণতর Ethics অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিল। এখন হইতে এই উভয় শব্দকে "আলোচনা" তাহাদের প্রশস্ততর অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সম্পর্কিত সর্ব্ব বিষয়েরই আলোচনা করিবে। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া "আলোচনা" এখন হইতে ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস,

বিজ্ঞান প্রভৃতি মানবের হিতকর ও উন্নতিকর সর্ব্ব প্রকার বিষয়ের আলোচনা করিবে।

বিষয়ের পরিধির বিস্তৃতিতে স্থানেরও ব্যাবৃতি প্রয়োজন। তাই আগামী বর্ষ হইতে "আলোচনার" আকার আর এক ফর্ম্মা বাড়িয়া ডিমাই আট পেজী পাঁচ ফর্ম্মা অথবা ৪০ পৃষ্ঠা হইবে।

কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু এদেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, কোনও মতেই আর ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। "আলোচনার" কলেবর বর্দ্ধিত হইলেও ইহার মূল্য পূর্ব্ববৎই রহিল।

উপসংহারে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া, এবং অনুগ্রাহক গ্রাহক, পাঠক ও লেখকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া, "আলোচনা" তাহার জীবনের প্রথম বৎসর কাটাইয়া নূতন তেজে, নূতন উৎসাহে ও নূতন উদ্যমের সহিত দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। এই ক্ষুদ্র পত্রিকা খানির উপর ভগবানের কৃপা বর্ষিত হউক; তাহার প্রতি লেখক, গ্রাহক ও পাঠকগণের স্নেহ দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকুক।

শক্তি ও তাহার মূলাধার।

সংসারে যত শক্তি আছে, পরমাত্মাই তাহার প্রেরক। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শক্তিই জগতের উপাদান হইয়াছে। ভৌতিক জগতে তাহাই পদার্থ মাত্রের আদি দ্রব্য—বীজ।—"না বস্তু নোবস্তু সিদ্ধিঃ" (কঃ সূঃ ১। ৭৮) যাহা বস্তু নহে, তাহা হইতে বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। মানসিক জগতেও ঐ শক্তিই উপাদান। সাংখ্যেরা উহাকেই প্রকৃতি বলেন। উহাই এক দিকে বাহ্য বস্তু, অন্য দিকে মানব প্রকৃতি রূপে পরিণত হইয়াছে। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি সূক্ষ্মদেহ উহারই রূপান্তর এবং স্থূল দেহ উহারই বাহ্য পরিণাম। সংক্ষেপতঃ জগতে যত ভৌতিক ও জৈবিক শক্তি আছে, সমস্তই উহার অন্তর্গত। শক্তিই বাহ্য বস্তু ও মানসিক প্রকৃতি, এবং শক্তিই চেতনাচেতন সমুদায় পদার্থের তেজ, বল, বীর্য্য, ধর্ম্ম। "শক্তিঃ শক্তিমতো রভেদঃ শক্তি" আর শক্তিমানে ভেদ নাই। এই ন্যায় অনুসারে ভৌতিক-শক্তি ভূত পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র নহে, জৈবিক-শক্তি মনোবুদ্ধি

ইন্দ্রিয় ও স্থূল দেহ হইতে স্বতন্ত্র নহে। শক্তিই বাহ্য ও মানসিক পদার্থ রূপে আবির্ভূত, শক্তিই তাহাদের জীবন এবং শক্তিই তাহাদের অন্তিম পরিণাম। বেদান্তও প্রকারান্তরে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। উপাদানাধিকরণে (সাঃ সূঃ) "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুরোধাৎ।" ছান্দোগ্যের প্রতিজ্ঞা এই যে, "এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্ প্রতিপাদ্যতে।" এক মাত্র পরমাত্মার জ্ঞান হইলে সকল তত্ত্বের জ্ঞান হয়, যেমন এক মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে মৃত্তিকা নির্ম্মিত তাবৎবস্তুর তত্ত্ব জানা যায়। এই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত সিদ্ধির অনুরোধে শ্রুতিতে এক মাত্র ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ ও প্রকৃতি রূপ উপাদান-কারণ রূপে কথিত হইয়াছেন। প্রকৃতি রূপ উপাদান-শক্তি তাঁহারই প্রেরিত। তিনি সে শক্তির আধার। উপরিউক্ত ন্যায়ানুসারে তাঁহা হইতে সে শক্তির ভেদ নাই। এক মাত্র তাঁহাকেই উপাদানরূপী প্রকৃতির আধার ও প্রেরয়িতা বলিলেই বেদের প্রাগুক্ত প্রতিজ্ঞা সফল হয়; কেননা এক তাঁহাকে জানিলে যেমন সমগ্র ভৌতিক ও মানসিক জগতের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, সেই রূপ জীবাত্মারও তত্ত্ব জানা যায়। কিন্তু প্রকৃতিকে মূল কারণ বলিলে জীবাত্ম-তত্ত্বের জ্ঞান পক্ষে উক্ত শ্রুতি সফল হয় না। এ স্থলে বেদান্ত মতেও নিশ্চয় হইল যে, পরমাত্মার প্রেরিত প্রকৃতি শক্তিই জগতের স্থূল সূক্ষ্ম দ্রব্যের ও জীবের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের এবং সমুদায় ভৌতিক ও জৈবিক শক্তির মূল উপাদান; এবং মূলে তাহা দ্রব্য, বীর্য্য, তেজঃ ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বীজ-ধাতু।

পরমাত্মার প্রেরিত ঐ প্রকৃতি-শক্তি জীবগণের অনাদি বন্ধন স্বরূপ। সেই বন্ধন পরমাত্মীয় মোক্ষরূপী নহে, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক। সৃষ্টি-চক্রের আদি অন্ত নাই। অসংখ্য প্রলয়, অসংখ্য জন্ম মৃত্যু সহিত এই সৃষ্টি-চক্র বুদ্ধির অগম্য। জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাঁহাদের পর পর প্রবৃত্তিসাধক। তাহাই দেহ মন ও ভোগ্য পদার্থের বীজ। তাহাই নব নব কার্য্যের হেতু। অতএব এইরূপ স্থির কর যে, জীব আপনার ভক্তৃত্ব শক্তি ও ভোগ্য দ্রব্য দ্রব্য-বীজের সহিত চিরকাল হইতে ঐ ঐ শক্তির অধিকারে আছেন। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুসারে প্রতিবন্ধন ফলের প্রেরক ও নিয়ন্তা। ঐ শক্তি নিত্য অথচ বিকারী; অব্যয় অথচ পরিণামী; তাহার কিঞ্চিন্মাত্র কখন লুপ্ত হয় না। তাহার এক রূপের অন্তর্দ্ধান হইলেও তাহা অন্যরূপে অবস্থিতি করে। সাক্ষাৎ কর্ম্ম পরক্ষণেই অদৃষ্টরূপ ধারণ করে। অদৃষ্ট শুভাশুভ

ফলরূপে পরিণত হয়। বৃক্ষ-শক্তি ফলরূপে, ফল বীজরূপে, বীজ আবার বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। জীবের স্থূল দেহ গলিত হইয়া উদ্ভিজ্জ বা অন্য জীব দেহে পরিবর্ত্তিত হয় এবং অন্ন জলাদি ভুক্ত হইয়া স্থূল দেহে অবস্থান্তরিত হয়। উদক ঘনীভূত হইয়া তুষার হয় এবং তুষার পুনর্ব্বার জলাকৃতি ধারণ করে। এইরূপে সাগর শুষ্ক হইয়া বাষ্প হইয়া যাইতে পারে, বাষ্প পুনরায় সাগরে পরিণত হইতে পারে। পৃথিবী ও অন্যান্য লোক-মণ্ডল শক্তিরূপ মূল দ্রব্য বীজে উপসংহৃত হইতে পারে এবং আবার সেই দ্রব্য-বীজ হইতে শত শত লোক-মণ্ডল অবতীর্ণ হইতে পারে। এই প্রকার পরিবর্ত্তন অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিয়াছে এবং চিরকাল হইবে; কিন্তু তাহাতে গুণবতী প্রকৃতির এক বিন্দুও কথন বিনষ্ট হইবে না।

বিনষ্ট না হউক, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তন বিস্ময়জনক। এই সংসারে অসংখ্যাসংখ্য পদার্থ, তাহাদের বিচিত্রশক্তি; অসংখ্যাসংখ্য জীব, তাহাদের অনির্ব্বচনীয় মানসিক শক্তি, ইন্দ্রিয় শক্তি, দৈহিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু সকলই এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহে ভাসিতেছে। কথন এক একটী জড় পদার্থের এক একটী জীব দেহের শক্তি বিকৃত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন করিতেছে। কখনও বা একেবারে অনেক পদার্থ ও অনেক দেহ ব্যাপী শক্তি বিকৃত হইয়া সাধারণ উৎপাত সকল উপস্থিত করিতেছে। কোন পদার্থ ও কোন জীব একাদিক্রমে কোন অবস্থাকে ভোগ করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ এই যে, ভোগে শক্তি, রুগ্ন, দূষিত, মলিন, বিকৃত, কলুষিত ও নিস্তেজ হইয়া যায়; এই নিমিত্তে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রকৃতি সংশোধিত হইয়া থাকে।

এক একটী জড় পদার্থের বা জীবদেহের শক্তির যে পরিবর্ত্তন হয় তাহার নাম ব্যষ্টি-পরিবর্ত্তন। তাহা দ্বারা তত্তৎ পদার্থ বা জীব-ব্যাপী প্রকৃতিই সংশোধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পদার্থ বা প্রত্যেক জীবগত প্রকৃতিকে ব্যষ্টি-প্রকৃতি কহে। কোন এক স্থানস্থিত জল বায়ু দূষিত হইলে তাহা কৃত্রিমোপায়ে সংশোধিত হইতে পারে। একটী বৃক্ষের সামান্য রোগ জন্মিলে কৃত্রিম উপায়ে তাহা পুনঃপ্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু দুরারোগ্য রূপে তাহার জীবন ভঙ্গ হয়। তাহা স্থূলকায় মৃত্তিকায় পরিণত হয়। ফলে মৃত্তিকারূপ আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সংযোগে সেই উদ্ভিদ-প্রকৃতি পুনঃ সংশোধিত হয়। সেই মৃত্তিকাগত সংশোধিত প্রকৃতি পশ্চাৎ উদ্ভিজ্জান্তরে জীবনশক্তি দান

করে। কিছুতেই সেই প্রকৃতির বিনাশ হয় না। তাহা যেমন মৃত্তিকা-প্রান্তে সংশোধিত হয়, সেইরূপ বীজাশ্রয় করিয়াও প্রবহমান হইয়া থাকে। কোন এক মনুষ্যের স্থূল দেহ সামান্য রোগগ্রস্ত হইলে ঔষধিদ্বারা তাহা প্রকৃতিস্থ হয়; কিন্তু তাহার জীবনীশক্তি ক্ষয় হইলে মৃত্যু উপস্থিত হয়। স্থূল দেহই মানবের সর্ব্বস্ব নহে। স্থূল দেহের বিনাশে মনাদি সূক্ষ্ম দেহের ও তদবচ্ছিন্ন জীবাত্মার বিনাশ হয় না। "বায়ুর্গন্ধ নিবাশয়েৎ" (গীঃ ১৫।৮) কুসুম স্বস্থান হইতে গন্ধবৎ সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ু যেমন গমন করে, তাহার ন্যায় জীবাত্মা স্থূল দেহের আভ্যন্তরিক প্রকৃতিরূপ সূক্ষ্ম শরীর লইয়া লোকান্তর যান। তাহা জীবাত্মার নিমিত্তে সংশোধিত নূতন কলেবর রূপে পরিণত হয়। শাস্ত্রানুসারে জীবাত্মা মৃত্যুকালে যে সূক্ষ্মদেহ লইয়া পরলোকে উড্ডীন হন, তাহা সপ্তদশ অঙ্গ বিশিষ্ট। মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় এবং বায়বীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট পঞ্চ প্রকার প্রাণ—এই সপ্তদশ অঙ্গ। একত্রে এই গুলির নাম সূক্ষ্মদেহ। মনই এই দেহের মস্তকস্বরূপ। মনই এই দেহের আধার স্বরূপ। মনই আবার স্বীয় আশ্চর্য্য শক্তি বলে ঐ দেহকে স্থূল মূর্ত্তি প্রদান করার কর্ত্তা স্বরূপ।

অনেক পদার্থ ও অনেক জীব ব্যাপী শক্তির এক এক বারে যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, তাহার নাম সমষ্টি-পরিবর্ত্তন। এই সকল পরিবর্ত্তন প্রথমতঃ দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, বার্ষিক বা বহু বর্ষান্তস্থ। দ্বিতীয়তঃ এক দেশী, বহু দেশব্যাপী, পৃথিবী ব্যাপী, কতিপয় লোক-মণ্ডল ব্যাপী বা বহু লোক-মণ্ডল ব্যাপী। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে প্রতিদিন জীবগণের জাগরণ শক্তি ক্ষয়ে নিদ্রোপস্থিত হয়। নিদ্রান্তে নবতর বীর্য্য সহকারে পুনঃ জাগরণ দেখা দেয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অন্তে পৃথিবীস্থ বৃক্ষ লতার, নর দেহের ও সাগরের জল-ধাতু ক্রমে হ্রাসাবস্থ হয়; পুনঃ উক্ত তিথিদ্বয়ের সমাগম প্রভাবে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির পত্র পুষ্প ফল ধারণের শক্তি বর্ষে বর্ষে বর্ষা-ঋতুতে সংশোধিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি ক্ষয়, অথবা প্রকৃতির পর্জ্জন্য বর্ষণের শক্তি-ক্ষয়-নিবন্ধন কতিপয় বর্ষ যাবৎ অল্প শস্য উৎপন্ন হয়। আবার সেই সমস্ত শক্তি সংশোধিত হইয়া কতিপয় বর্ষ যাবৎ প্রচুর ফল শস্য জন্মে। প্রকৃতির স্বাস্থ্য-শক্তি ক্ষয়ে কখন পৃথিবীর এক দেশে, কখন বা বহু দেশে পীড়ার উপদ্রব দৃষ্ট হয়, কখন ও বা সেই শক্তি সংশোধিত হইয়া তথায় পুনর্ব্বার আরোগ্য বিরাজ করে। কোন কোন

সময়ে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ দোষ জন্য বিশেষ বিশেষ পীড়া পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়, আবার সে শক্তি সংস্কৃত হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। এই রূপে যখন ত্রিলোক ব্যাপী বা সমগ্র সৌর জগৎ ব্যাপী জীবগণের ভোগ শক্তি, জীবনী শক্তি, ক্রিয়া শক্তি, এবং ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য ঐশ্বর্য্যের স্থিতি-শক্তি; ভোগ দানের শক্তি ও সুখপ্রদ শক্তি সমূহের আধার স্বরূপ সমষ্টি প্রকৃতি বিকৃত হইয়া উঠে, তখন ত্রিলোক অথবা চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপী প্রলয় উপস্থিত হয়। যখন ত্রিলোক ব্যাপী হয়, তখন ত্রিলোকস্থ লোক-মণ্ডল সমূহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া জল দ্বারা আবৃত হয়। যখন চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপী হয়, তখন সমগ্র দ্রব্যময়ী ও সর্ব্ব শক্তিময়ী প্রকৃতি আপনার উদ্ভব স্থান স্বরূপিণী ব্রহ্ম-শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। তখন সমস্ত জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ প্রকৃতি, মনোবুদ্ধি আদি সূক্ষ্ম দেহ, কর্ম্মের ও কর্ম্ম ফল ভোগের বাসনা, সুখের প্রার্থনা, সুখদুঃখপ্রদ স্বভাব, দেহাধীনতা; পঠিত-বিদ্যার ও কৃতকর্ম্মের সংস্কার প্রভৃতি বৃত্তি সমূহ সেই একই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া বিরাম প্রাপ্ত হয়; কিন্তু চির বিনাশ লাভ করে না। শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ঈশ্বর-নিয়মিত-কালান্তে তাহা সংশোধিত হইয়া জীবের সহিত সৃষ্টি রূপ কার্য্যে বিচিত্র ভাবে পুনঃ পরিণত হইয়া থাকে। পুনরায় চতুর্দ্দশ ভুবনে প্রকৃতির নব রাগ বিরাজ করে।

এই রূপে জগৎ রূপিণী ও জগৎ ব্যাপিনী দ্রব্য-শক্তি ও কার্য্য-শক্তিময়ী প্রকৃতি পরমাত্মা কর্তৃক অনাদি কাল অবধি প্রেরিত ও উপসংহৃত হইতেছে। অবিমুক্ত জীবগণ তাহারই আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া ভোগার্থ যাতায়াত করিতেছে। এই প্রকৃতি কখনও চিরবিশুদ্ধ ভাবে থাকিতে পারে না। সৃষ্টিতে অনবরত ভৌতিক পদার্থ ও জীব দেহাদিতে ব্যবহৃত হওয়ায় সর্ব্বদাই অল্প বিস্তর মলিনতা লাভ করে। এই কারণে শাস্ত্রে ইহাকে সমলা শক্তি কহেন। উহা তমোগুণ মিশ্রিত, মলিন সত্বগুণ বিশিষ্ট এবং নিকৃষ্টা প্রকৃতি বলিয়া উক্ত হয়। উহার নামান্তর অবিদ্যা, স্বভাব, কারণ-দেহ, অপূর্ব্ব ইত্যাদি। জীব-রাজ্যে ইহাই মানসিক প্রকৃতি, মনের শক্তি, বুদ্ধি শক্তি, স্মৃতি শক্তি, মেধাশক্তি, চিন্তা শক্তি, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুকৃতি, দুষ্কৃতি, ব্যক্তি-স্বভাব ও অদৃষ্ট। জীবের স্থূলদেহে তাহাই গতি-শক্তি, রতি শক্তি, বীর্য্যশক্তি, গ্রহণশক্তি প্রভৃতি।

পরমাত্মার শক্তি অনন্ত। কর্ম্মসূত্রদ্বারা জগৎরূপ কার্য্যে যাহা প্রেরিত

হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনন্ত শক্তির এক বিন্দু প্রভাব মাত্র: সুতরাং তাঁহার স্বীয় বশে যে অনন্ত শক্তি আছে, তাহা অতি পবিত্র। তাহার নাম বিমলা শক্তি। তাহা নির্ম্মল সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট। তাহাকে মহামায়া বা মূল প্রকৃতিও কহা যায়। সমলা শক্তি ভৌতিক জগতে কঠোর ভৌতিক নিয়মে এবং জীব-রাজ্যে অবশ্য ভোক্তব্য অদৃষ্টে বদ্ধ। সেই পর্য্যন্তই তাহার প্রভাব। তদ্ভিন্ন তাহা এক তিলও উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাহা ঈশ্বর-নিয়মিত দেশ, কাল, পদার্থ, জীব, অদৃষ্ট প্রভৃতিতে বদ্ধ। সে নিয়ম লঙ্ঘনে তাহা অসমর্থ। অতএব তাহা দ্বারা জগতের যে সকল দুঃখের প্রতিবিধান অসম্ভব, ঈশ্বর প্রাগুপ্ত স্বীয় বশীভূতা নির্ম্মলা শক্তিদ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়া কালে কালে অদ্ভুত কীর্ত্তি সকল দেখাইয়া থাকেন। সেই সকল অদ্ভুত কীর্ত্তিকে অনেকে অস্বাভাবিক ঘটনা বলেন। কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ, ভগবৎপ্রেমিক জনেরা সেই সকল কীর্ত্তিতে জাজ্বল্যমানরূপে ঐশ্বরীয় শক্তি বা স্বভাবরূপ উপাধির দর্শন পান এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অবতীর্ণ দেখিয়া জীবন সার্থক করেন।

প্রাগুক্ত সমলা প্রকৃতিই জগতের স্থূল সূক্ষ্ম ধাতব উপাদান। তাহাই সৃষ্টিকার্য্যে পরমাত্মার "ব্রহ্মা" নামক কর্ত্তৃত্বের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। শাস্ত্রে ব্রহ্মার যে নিদ্রা ও মৃত্যু উক্ত হয়, তাহা ঐ সমলা প্রকৃতিরই অবান্তর ও অন্তিম পরিবর্ত্তনের অনুগত।

অতঃপর পরমাত্মার যে অধিষ্ঠান বিমলা শক্তি স্বরূপিণী মায়াতে উপস্থিত, তাহা চতুর্দ্দশ ভুবনের অনাদি অনন্ত পাতা। শাস্ত্রানুসারে সেই অধিষ্ঠানের নাম বিষ্ণু। যখন মহা প্রলয়দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাত্মক চতুর্দ্দশ ভুবন তত্রত্য সমলা প্রকৃতি ও তদুপরিস্থ বিমলা প্রকৃতির সহিত পরমাত্মাতে প্রবেশ করে, সেই কাল ঐ বিষ্ণু নামক কর্ত্তৃত্বের নিদ্রা বা রাত্রিরূপে কল্পিত হয়। স্বয়ং পরমাত্মা সম্বন্ধে কোন কল্পনা নাই। শক্তিরূপ উপাধিই সর্ব্বপ্রকার কল্পনার হেতু। "বিকারাবর্ত্তিব তথাহি স্থিতিমাহ" (সাঃ সূঃ)। পরমাত্মা বিকারী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়াও শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব।

তিনি এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অচিন্ত্য রচনার একমাত্র স্রষ্টাস্বরূপ। তিনি সর্ব্বভূতের ও সর্ব্বপদার্থের একমাত্র সার্ব্বভৌমিকী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু তিনি স্বয়ং কিছুই হন নাই। তিনি স্বয়ং

স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শক্তি হইতে স্বতন্ত্র, অথচ, তৎ সমস্তের অনাদি অনন্ত আধার ও যন্ত্রী। তিনি স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র, কিন্তু সর্ব্বভূত ও সর্ব্বপদার্থ তাঁহার পরতন্ত্র। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলা তাঁহার প্রকৃতি-শক্তি হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র দর্শনের নামই "ব্রহ্মজ্ঞান"।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

সমাজ সংস্কার।

সমাজ সংস্কার কথা শুনিতে বড় মিষ্ট। একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায়, সমাজ-সংস্কারক নামের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াই যেন সমগ্র জনসমাজ তাহার অনুসরণ করিতেছে। সমাজ সংস্কার এমনই জিনিস যে, ইহার নাম মাত্র শ্রবণে সকলেই সকলকে তাহা বুঝাইতে চায়, কেহ আর নিজে বুঝিতে চায় না; যেন লোককে বুঝানই সমাজ সংস্কারের প্রধানতম অঙ্গ। যে কোন ব্যক্তির নিকট সমাজ সংস্কারের কথা উপস্থিত কর, দেখিবে সে এমন ভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেন সে জননী-গর্ভ হইতে এক জন সমাজ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সামাজিক কার্য্যকলাপ নির্দ্দেশ করা ও তদ্দ্বারা সমাজকে চালিত করা যেন তাহার নিত্য-কার্য্য! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, যে কার্য্য জন-সমাজের পক্ষে অতীব গুরুতর, যাহা অপেক্ষা গুরুতর কাজ সমাজের পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তত্ত্বদর্শী মনু এবং পরাশর প্রভৃতি শাস্ত্র প্রণেতাগণ পর্য্যন্ত আপনাদের অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন-কুশল-সাধনোপযোগী বিধি প্রণয়ণ করিতে পারেন নাই, আজ কিনা পুরুষ ও রমণী, পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র, বালক ও বৃদ্ধ, ইতর ও ভদ্র, রাজাসনে রাজা, আদালতে উকীল, সংবাদ-পত্রে সম্পাদক, বিদ্যালয়ে শিক্ষক, আফিসে কেরাণী, পথে পথিক, বাজারে দোকানদার, গাড়ীতে গাড়ওয়ান সকলকেই এই গুরুতর কার্য্যে ব্রতী দেখিতে পাই,— সকলকেই সমাজ-সংস্কারক দেখি! এক দিকে ইহা শুভ চিহ্ন হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যে দেশে এত লোক অবিরাম পরিশ্রম সহকারে সংস্কার-রত, সেই দেশ এক দিনে সংস্কৃত হয় না কেন?—ইহাই বিবেচ্য বিষয়। ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে এক এক জন লোকের সুতীক্ষ্ণ

দৃষ্টিপাতে সমাজ সুশাসিত হইয়াছে,—লেখনীর আঘাতে বিধি প্রচলিত হইয়াছে,—অধর ওষ্ঠ হইতে বাক্যনিচয় নির্গত হইতে না হইতে তাহা জনসাধারণের সাধারণ-সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে, জন-সমাজ সে মহাজনের কথা শুনিতে নিয়ত উৎকর্ণ, তাহা পালন করিতে আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছে। ভাল, এক জন লোক যদি সমাজের প্রবহমান স্রোতের গতি ফিরাইতে সক্ষম হন, তবে অসংখ্য লোক সে কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, তাহা ত অবিলম্বে সম্পন্ন হওয়া উচিত। তবে কেন হয় না?—বলি, সমাজ-সংস্কারক বুঝি হইলেই হইল? কত গুলি উপকরণ সংগ্রহ করিলে এক জন লোক এ গভীর দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্য আংশিক ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, ভাই সংস্কারক, তাহার তালিকা কি তোমার নিকট আছে? যদি থাকে, তবে একবার নিজের পাঁজি পুথি খুলিয়া দেখ দেখি তাহাতে কি লেখা আছে? তাহাতে কি লেখা আছে যে, ভ্রূভঙ্গি ও ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালন সহকারে বক্তৃতা করিলে সমাজ সংস্কার হয়,—তাহাতে কি লেখা আছে যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে লেখনী চালন করিলে, দুই চারিটা "ঘনঘটা ঘোরা তিমিরা" "অমলা ধবলা" "বিধবা, সধবা অথবা কুধবা" প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক শব্দ-বিন্যাস সহকারে ভাষার খরতর স্রোতঃ বহাইতে পারিলেই সমাজ সংস্কার হয়,—তাহাতে কি লেখা আছে যে, কুযুক্তি সুযুক্তি বিযুক্তি সহকারে তর্ক করিলে সমাজ সংস্কার হয়? না, ইহার কিছুতেই সমাজ সংস্কার হয় না। বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও তর্ক ইহাদের কিছুতেই যদি সমাজ সংস্কার না হয়; তাহলে ত বড় বিপদ! আজ কালকার সমাজ সংস্কারের বাজারে যে সকল বন্ধুরা খাটিতেছেন, তাঁহাদের ত দুঃখের শেষ নাই। অনেকে সমাজকে সংস্কৃত দেখিতে ইচ্ছা করেন সত্য, কিন্তু একটি বাদে। সকল বিষয়ে সম্মতি দানে প্রস্তুত আছেন, কেবল একটি মাত্র তাঁহার নিকট তাঁহার সংস্কারক্ষেত্রের অন্তর্ভূত নহে, সেটি তিনি স্বয়ং। বন্ধু "আপনি ভিন্ন" অপর সকল বিষয়ে সংস্কারের পক্ষপাতী, যেন সংস্কার কার্য্যটা তাঁহার জীবনসীমার বাহিরের কার্য্য, তাঁহার জীবন-রঙ্গ-ভূমিতে সংস্কারের বিষয় যেন কিছুই নাই! তাঁহার জন্য এক নিয়ম অপর সকলের জন্য সম্পূর্ণ রূপে পৃথক নিয়ম দেখিতে পাই, প্রায় সকলেরই এই অবস্থা। সকলেই ভাবে, আমি বেশী বুঝি। এই রোগে পৃথিবীর যাবতীয় লোক রুগ্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এই রোগগ্রস্ত হইয়াই সকলে আপনাকে সমাজ-সংস্কারক মনে

করে। "বাল্য বিবাহ!" বিষময়,—অপবিত্র বলিয়া ধিক্কার করিতে করিতে অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার জন্য সুপাত্র অনুসন্ধান করা, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত উচিত" বলিতে বলিতে আপনার বিধবা কন্যা বা ভগ্নীর বৈধব্য গোপন করা—"এককালে বহু বিবাহ অতীব অমঙ্গলকর" বলিয়া ঘোষণা করিতে করিতে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অপরার পাণি গ্রহণ কেমন সুন্দর! সমাজ-সংস্কারক, একবার নির্জ্জনে অনন্যমনে চিন্তা কর, সমাজ সংস্কার করিতেছ কি সমাজের শ্রাদ্ধ করিতেছ। সমাজ-সংস্কারকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, কি কি উপকরণে সংস্কারকের জীবন গঠিত হয়, কি কি গুণ-সমষ্টির অস্তিত্বে আমরা সমাজ-সংস্কারক নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারি, তাহারই আলোচনায় এখন প্রবৃত্ত হইব।

সমাজ-সংস্কারকের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান গুণ ধর্ম্ম,—ধর্ম্মময় জীবন ভিন্ন সমাজ সংস্কার হইতে পারে না। ধর্ম্মে বিশ্বাস, অটল বিশ্বাস,—অবিচলিত আস্থা ভিন্ন সমাজ সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কেহ কখন পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারে না। সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারক মাহাত্মা থিয়োডোর পার্কার বলিয়াছেন " Man with all the science of the Nineteenth Century can scarcely hold a village together while every religious fanatic from Mohamed to Mormon finds followers plenty as flowers in summer." "ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র বিজ্ঞান-শাস্ত্র একত্র করিলেও এক খানি পল্লীকে রক্ষা করিতে পারিবে না, কিন্তু একেশ্বর বাদী মহম্মদ হইতে কুসংস্কারাপন্ন মর্ম্মণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধর্ম্মগুরু গ্রীষ্মে বিকসিত পুষ্প রাশির ন্যায় অসংখ্য শিষ্য লাভ করিয়া থাকেন।" কথাটী বড় সত্য। তুমি যত বড় জ্ঞানী হওনা কেন,—তোমার পাণ্ডিত্যের প্রশংসাধ্বনিতে দিগ্‌গুণ নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইলেও তোমার দ্বারা সমাজ সংস্কৃত হইবে না। অদ্য হউক কল্য হউক তোমার লোক-হিতের জন্য কল্পিত জল্পন—তোমার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার যখন মানুষে বুঝিতে পারিবে, তখন তোমার সেই আকাশ-কুসুম-সম উন্নতি ও সম্মানের শূন্যগর্ভ শিখর হইতে নিন্দা ও সমালোচনার দুর্গন্ধ ময় কূপে নিপতিত হওয়া অপেক্ষা তুমি যেমন আছ তেমনি থাক, আমরা সমাজ সংস্কার জন্য যাকে তাকে চাই না। নানা রোগগ্রস্ত এ ভারত-সমাজের সংস্কার-ক্ষেত্রে এমন লোককে সেনাপতির পদে দেখিতে চাই, যাঁহাতে রাজ কুমার শাক্য

সিংহের ত্যাগ স্বীকার, মহর্ষি ঈশার ক্ষমা, মহাত্মা চৈতন্য দেবের প্রেমাবেশ ও ভগবদ্ভক্তি, গুরু নানকের নিষ্ঠা—যাঁহাতে এ সকলের একত্র সমাবেশ রহিয়াছে, তদ্রূপ কাহাকেও চাই—কুসংস্কারের ঘন বনে সমাচ্ছন্ন এ ভারতের ভাগ্য-চক্র ঘুরাইতে অমিত-তেজঃ সম্পন্ন সদাশয় বিদ্যাসাগর চাই;—এ ক্ষেত্রে আমরা বিবেকবান্ পার্কার ও দৃঢ়ব্রত রামমোহন চাই,—অতুলনীয় অধ্যবসায়সম্পন্ন শ্রমশীল কেশবচন্দ্র ও সরল মতি শুদ্ধাচারী রাম তনু চাই। তুমি সমাজ সংস্কারক,—যিনি হও, তোমাতে ধর্ম্ম জীবনের সকল প্রকার সৌন্দর্য্য বিকসিত হইয়াছে দেখিতে চাই—তোমার সে জীবনে পঞ্চম বর্ষীয় বালকের অকৃত্রিম সরলতার ছবি দেখিতে চাই,—যাহা সত্য ও সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহা অপরের নিকট পরিহাস ও উপেক্ষার বিষয় হইলেও, তাহাতে তোমার শত প্রকার অনিষ্ট ঘটিলেও তুমি তাহার অনুসরণ করিতে পরাঙ্মুখ নও, দেখিতে চাই। দেখিতে চাই, লোক লজ্জার ভয়ে কিম্বা আপনার স্বার্থ হানির ভয়ে জড় সড় নহ; যদি তোমাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হওয়ার ভাব দেখিতে পাই, তবে বুঝিব, সমাজ সংস্কারক হওয়া তোমার কার্য্য নহে। সেই ব্যক্তি সমাজসংস্কারক হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র, যিনি এই ভয় বিপদ-সঙ্কুল সংসার পথে আত্মহারা হন না,—সত্যকে জীবনের পরম লক্ষ্য জানিয়া প্রাণপণে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন। যে পথে ভ্রমণ করা জীবনের কার্য্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, সমাজ সংস্কারক সেই পথে চলিবেন। তাহাতে তুমি আমি দশ জন তাঁহার অনুসরণ করি আর না করি, তাহা তিনি দেখিবেন না। এত গুলি কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাগ্রে আত্ম সংস্কার চাই। আত্ম-সংস্কার না হইলে তাঁহা দ্বারা সমাজ সংস্কার হইতে পারে না। আত্মসংস্কার বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসন্ত-সখা।

(ইংরাজি কবিতা অনুকরণ করিয়া লিখিত)

১

সম্ভাষি, তোমায় ওই মধু সহচর!
সুন্দর পথিক পাখী নিকুঞ্জ ভিতর,
প্রকৃতি তোমার তরে;
আবার নূতন করে,

সাজায়েছে বাস তব,—বন, উপবন
গাইছে সকলে মিলি তব আগমন।

২

নবীন প্রকৃতি গায় কুসুম নিকর
ফুটে যেই, শুনি সেই তব কল স্বর,
বরষ গড়ায়ে যায়
কেবা লক্ষ্য করি তায়
দেখায় তোমার পথ ধ্রুব-তারা মত,
বসন্ত আসিছে বার্ত্তা কহি অবিরত!

৩

প্রিয় দরশক, আমি মিলি তব সনে
সম্ভাষিব কুসুমিত বসন্ত,—দুজনে,
তোমা সনে এক হয়ে
শুনিব কাননে গিয়ে
তরল মধুর গীত, নিকুঞ্জ ভিতর
বিহগের সুললিত স্বর মনোহর।

৪

বিদ্যালয় পরিহরি বালক যখন
কুসুম চয়ন আশে ভ্রমে কুঞ্জবন,
চমকি শ্রবণ করে
সহসা তোমার স্বরে,
তব প্রিয় কণ্ঠ সনে কণ্ঠ মিশাইয়া
গায় শিশু বার বার তেমনি করিয়া।

৫

যখন মুকুল পুষ্পে হয় পরিণত
ছাড়ি সেই উপত্যকা সঙ্গীত সহিত,
বর্ষের অতিথি তুমি,
যাও সদা নব ভূমি
নূতন বসন্ত নিত্য করিতে তোষণ,
বসন্তের অনুচর সহচর তুমি অনুক্ষণ।

৬

মধুর বিহগ, তব নিকুঞ্জ নিয়ত
অনন্ত হরিৎ বর্ণে শোভায় রঞ্জিত,
তোমার অম্বর-গায়
বারিদ কণিকা প্রায়
নাহি ত কখন, দুঃখ সঙ্গীতে তোমার
নাহি, শীত ঋতু হীন এ তব সংসার।

৭

হায়রে! উড়িতে যদি পারিতাম আমি,
যাইতাম প্রীতি ভরে নব নব ভূমি,
সুখে পক্ষ বিস্তারিয়ে
তব সনে এক হয়ে
ধরার বার্ষিক গতি সহ দুই জন
ভ্রমিতাম,—বসন্তের সখার মতন।

Michael Bruce

শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী।

তিন ব্রাহ্মসমাজের মিলন সম্ভব কি না?

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম, সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম; দেশ-বিশেষে বা জাতিবিশেষে বদ্ধ থাকিবার জন্ত এধর্ম্ম অবনী মণ্ডলে প্রেরিত হয় নাই। সমস্ত জাতিকে প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া একটী ধর্ম্ম-পরিবার গঠন করা যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা যদি গৃহ বিচ্ছেদ আনয়ন করি,

সামান্য সামান্য মতভেদ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের শান্তি-ক্ষেত্রকে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার প্রয়াস পাই, তাহা হইলে আমরাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইব। রাজা রাম মোহন রায় স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার অনুগামী সাধকেরা নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে ছাড়িয়া অন্যান্য বিষয়কে প্রধান বলিয়া মনে করিবেন অথবা সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য ব্রাহ্ম সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন ও আপনাপন হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু ভাবিলে দুঃখ হয়, আজ চারিদিক্ হইতে রাম মোহন রায়ের অনুগামী সাধক দিগের উপরে উপহাসের ভ্রুকুটী নিক্ষিপ্ত হইতেছে। "সাড়ে তিনটা ব্রাহ্মদলকে অগ্রে একতার বন্ধনে বদ্ধ করিয়া তৎপরে সমগ্র নরনারীকে এক পরিবার করিতে অগ্রসর হও" বলিয়া আজ আমাদিগকে কত লোকে তীব্র ভর্ৎসনা পূর্ব্বক অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে, আর আমরা সেই কথা শুনিয়াও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে স্থির হইয়া রহিয়াছি! যাহাতে ভেদাভেদ তিরোহিত হয়,—ব্রাহ্মগণ কেবল ভগবানকে জীবনে লাভ করিবার জন্যই ব্যস্ত হন,—ব্রাহ্ম সমাজ, সকল দেশের ও সকল জাতির মধ্যে পবিত্র ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই কর্ত্তব্য হইয়াছে। এই যে তিনটী ব্রাহ্মসমাজ দেখিতেছি, এই তিনটী ব্রাহ্মসমাজের মিলন হওয়া সম্ভব কি না? মিলন যে প্রার্থনীয়, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে, ইহা সম্ভব কি না? এই প্রশ্নের বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, এই তিনটী ব্রাহ্মসমাজের ভিন্নতার স্থল কোথায়?

আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত আর দুইটী ব্রাহ্মদলের ভিন্নতার কারণ প্রধানতঃ দুইটী। (১ম) আদি ব্রাহ্ম সমাজ কেবল হিন্দুজাতির শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতে চান, অপর জাতির শাস্ত্রালোচনা এক প্রকার অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন, এবং প্রকারান্তরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে বৈদিক হিন্দু ধর্ম্মের সংস্করণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। (২য়) সমস্ত নর নারী পরব্রহ্মের চক্ষে সমান ও তাঁহারই পুত্র কন্যা স্বীকার করিয়াও উপবীতাদি জাতিভেদ-পোষক চিহ্নকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন; এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয় ব্যক্তিকে আচার্য্যের অধিকার প্রদান করেন না। রাজা রাম মোহন রায় সকল জাতির শাস্ত্র হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক দিকে যেমন বেদ ও ভগবদ্গীতা আলোচনা করি-

য়াছেন, অপর দিকে তেমনই বাইবেলাদিরও উপদেশ সংগ্রহ এবং প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজ বলেন, হিন্দুর নিকটে হিন্দু জাতির শাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম প্রচার করিলেই অধিক ফলপ্রদ হইবে। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী অপেক্ষা অপরাপর ব্রাহ্ম সমাজের অবলম্বিত প্রণালী যে সমগ্র পৃথিবীতে যেমন, ভারতবর্ষেও তেমনই সুফল প্রসব করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বহুল প্রচার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিশেষতঃ কোন শাস্ত্রের অনুরোধ বা উপদেশ অপেক্ষা, যুক্তি, বিবেক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-যোগে যে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহাই অর্জ্জন করিবার জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। সমগ্র মানব জাতির ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মকে যদি আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিতে চান, তাহা হইলে কোন জাতি-বিশেষের প্রতি অন্ধানুরাগ প্রদর্শন করা বৈধ নহে। এ বিষয়ে যদি আদি ব্রাহ্ম সমাজ অপেক্ষাকৃত উদার-পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সম্মিলনের একটা অন্তরায় তিরোহিত হইয়া যায়। আর যদিই তাঁহারা আপনাদিগের অবলম্বিত প্রণালীর একটুও পরিবর্ত্তন না করেন, অন্ততঃ উদারতা সহকারে অপর ব্রাহ্মদিগকে আদি ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে স্থান দান করুন। তাঁহারাও সপ্তাহের কোন দিন সমাজ-মন্দিরে উপাসনা কার্য্য সমাধা করিতে থাকুন; তাঁহাদিগের মধ্য হইতেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য নিযুক্ত হউন। এরূপ করিলে সমাজ বিভক্ত হইবে না, কেবল কার্য্য প্রণালী ভেদে বিভাগ হইবে। এক দিন বা কেবল হিন্দু জাতির জন্য সমবেত উপাসনা হইবে, অপর দিন বা সকল জাতির জন্য উপাসনা হইতে থাকিবে। প্রচারক দিগের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ থাকিবে, এক শ্রেণীর প্রচারকেরা কেবল হিন্দু জাতির জন্য পরিশ্রম করিবেন, অপর শ্রেণীর প্রচারকবর্গ সমগ্র জাতির জন্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা বোধ করি প্রথমোক্ত সম্মিলন-প্রতিবন্ধক অন্তর্হিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উপবীতাদি জাতি-ভেদ চিহ্নের প্রশ্রয় দান। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারিত গ্রন্থেই রহিয়াছে, এধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। বাস্তবিক আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ যে জাতিভেদ প্রথা মন্দ বলেন না, এমন নহে। কিন্তু তাঁহারা বংশ-মর্য্যাদা বোধে উপবীত রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সেই জন্য আবার সংশোধিত পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্ম সন্তানের উপবীত প্রদান করিতেছেন। ধর্ম্ম সাধন করিতে

আসিয়া, সমস্ত নর নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়া, এরূপ বংশ-মর্য্যাদা ধারণের আবশ্যকতা কি? কেহ কেহ বলেন, এই উচ্চবংশ-দ্যোতক চিহ্ন তাঁহাদিগের জীবনকে উন্নত করিবার উত্তেজনা স্বরূপ হয়; কিন্তু তাঁহারা যে ব্রহ্ম-সন্তান, ব্রহ্মোপাসক এই মনে করিয়াই আপনাপন জীবনকে মহৎ ও উন্নত করিবার জন্য কৃতোদ্যম হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং বোধ হয় ঈদৃশ ভাব, স্মৃতি অথবা অনুধ্যানই বিশেষ উত্তেজক। সেই জন্যই বলিতেছি, আদি সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণের বংশ মর্য্যাদার চিহ্নের জন্য লালায়িত হইয়া গৃহবিচ্ছেদ করা কোনও ক্রমেই উচিত নহে। আর যদিই আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মগণ এতদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন, অন্ততঃ তাঁহারা উপবীত বিরোধী ব্রাহ্মগণকে আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশাধিকার দান করুন। উপবীত-বিরোধী ব্রাহ্মগণ যদি বলেন, আমরা কিরূপে উঁহাদিগের সহিত মিলিত হইব? কেন, তাঁহারা এক দিকে উপবীতধারীদিগকে উপবীতের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে থাকুন, অপর দিকে ঘোষণা করুন যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় জাতিভেদ রক্ষার জন্য উপবীত ধারণ করিতেছেন না; সমগ্র ব্রাহ্মদলের মধ্যে কত লোকে উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা পারিবারিক চিহ্ন বোধে রাখিয়া দিয়াছেন। জাতিভেদ ভাব কাহারও মনে নাই। কিন্তু এস্থলে আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ পরিবারের পূর্ব্ব পুরুষগণের কোন ব্যক্তি তদানীন্তন কালে সদ্‌গুণান্বিত হওয়াতে যদি তাঁহার বংশধরদিগকে উক্ত চিহ্ন ধারণের অধিকার দেওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বকালীন সাধুগণের বংশধরদিগকেও সে অধিকার না দেওয়া হইবে কেন? বস্তুতঃ বংশমর্য্যাদা চিহ্ন লইয়া গৃহভঙ্গ করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কি অন্য ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সমুদায় ব্রাহ্মগণের প্রতিই নিবেদন এই, এরূপ একটা সামান্য বিষয়ে ভয়ানক বিরোধ রাখিয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। দুইটী প্রতিবায় ও তৎপ্রতিকারের যে যে উপায় নির্দ্দেশ করা হইল, তত্তৎবিষয়ে ব্রাহ্ম-সাধারণের অভিপ্রায় প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে। কেননা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবায় দুইটী তিরোহিত হইলে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আর কোন বিরোধ থাকে না।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহারই নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এক্ষণে দেখিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কি কি প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের ভালরূপ গঠন নাই; ব্রাহ্ম সাধারণের মতে উহার কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য নিবারণের জন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। যে শক্তি-শালী ব্যক্তির শক্তি-প্রভাবে অপর সাধারণের শক্তি আপনাপনি সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত, সে শক্তি দিব্যধামে মহাশক্তি সন্নিধানে নীত হইয়াছে। সে শক্তির যাহা করিবার ছিল, তাহা করিয়া গিয়াছেন। সে সকল এক্ষণে আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজেও সাধারণ-তন্ত্র প্রণালীতে সমাজ গঠনের বোধ হয় আপত্তি হইবে না। কেহ কেহ বলেন, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন অবৈধ প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দেওয়াতেই কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। সত্য হইলেও, মিলন এখন আর সুদূর-পরাহত নহে। কেশবচন্দ্র সেন আর নাই; তাঁহার অভিপ্রায়, হৃদয়ের চিন্তা অকপটিত বলিয়া কেহ আর তাঁহার বিরোধীদের সহিত বিতণ্ডা করিতে চায় না। তাঁহার আদেশপ্রাপ্তি ভ্রান্ত বল, ক্ষতি নাই; তাঁহার বিবেচনার ত্রুটী বল, অবনত মস্তকে তাহাও শুনিতে আমরা সম্মত আছি; কিন্তু তাঁহাকে কপট নাই বা বলিলে? তাঁহাকে ভণ্ড, ধনলোলুপ বলিয়া কুৎসা পূর্ব্বক তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয়ে নাই বা কষ্ট দিলে ভাই? পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজে গৃহবিচ্ছেদ নিবারণের জন্য সে সব কথা বন্ধ করিয়া দিলে ক্ষতি কি? যদি আমরা সত্য প্রচার ও সত্য অনুষ্ঠান সহকারে জীবন্ত ধর্ম্ম সাধনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি, আপনাদিগের ও সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণের জন্য তাহাই যথেষ্ট হইবে। যিনি যাহাই বলুন, আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে প্রধান ভিন্নতার বিষয় ব্রাহ্মধর্ম্মের "নববিধান" নাম। ইদানীং আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন যে সকল ক্রিয়া কলাপ করিয়াছিলেন, সে সকল ভিন্নতার কারণ হইতে পারে না, কেননা সে সমুদায় তিনি ব্রাহ্ম সমাজের স্থায়ী ক্রিয়া কলাপ করিয়া যান নাই। তাঁহার পক্ষে যাহা ভাবোদ্দীপক হইত, অপরের তাহা ভাবোদ্দীপক নাও হইতে পারে, এই

বিবেচনায় তিনি তৎসমুদয় সকলব্রাহ্মেরই অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। আমি যে সকল কথা লিখিতেছি, ইহার অনুকূলে তাঁহার উপদেশ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং ক্রিয়া কলাপ প্রধান ভিন্নতার স্থল হইতেই পারে না। একবার যাহা তিনি অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, আর কেহই তাহা করিবেন না। সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিতে আমার ইচ্ছা নাই। নববিধান নামই ভিন্নতার প্রধান কারণ। এই নাম অবলম্বন করিলে ক্ষতি হয় কি না, এই বিষয়ের আলোচনা করাই উভয় দলের ব্রাহ্মগণের প্রথম কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, কেশবচন্দ্র সেন নববিধান আখ্যা দিয়া তাঁহার ধর্ম্মকে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া গিয়াছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত যে সত্য নহে, তাহা ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য এবং উপদেষ্টাগণের উপদেশ ও প্রবন্ধ হইতে বহুল পরিমাণে প্রদর্শিত হইতে পারে। আমার প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া না পড়িলে, কয়েকটীতুল উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। যাহা হউক ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে নববিধান বলা যাইতে পারে কি না, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

আমার ক্রিয়ার নাম আমার বিধান; ঈশ্বরের ক্রিয়ার নাম ঈশ্বরের বিধান। প্রাচীন সময়ে ধর্ম্ম জগতে ঈশ্বরের যে সকল ক্রিয়া হইয়াছে, তৎসমুদায়ের নাম প্রাচীন বিধান; বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার ক্রিয়া বলিয়াই ইহা নববিধান বাচ্য হইয়াছে। এবিষয়ে আমি কথা কহিয়া দেখিয়াছি, শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান প্রধান ভাল ভাল লোকের মতদ্বৈধ নাই। অল্পদিন হইল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিধান বলিয়া একটী বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক "বিধান" শব্দকে ভয়ানক বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক লিখিয়াছেন "বিধান শব্দে ধর্ম্মকে কেন ব্যাখ্যা করিতে আপত্তি তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি, পুনরায় তাহার আভাস এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। বিধান শব্দে বর্ত্তমান সময়ে শুদ্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টি মাত্র বুঝায় না, তাহাতে বিশেষ ভাবে এই প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর কখন কখন কোন কোন স্থানের বা পৃথিবীর পাপভার মোচনের জন্য

ব্যক্তি-বিশেষকে কতকগুলি অনুচর সঙ্গে দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি যেসব ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া যান, তাহাই বিধান নামে উক্ত হয়।” (১লা বৈশাখ, ১৮০৭)। তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক বিধান শব্দে ধর্ম্মকে আখ্যাত করিতে ঐকান্ত পরাঙ্মুখ। বিধানবাদীরা বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মের নামই বিধান; ধর্ম্ম প্রচারের উপায়ও বিধান পদ বাচ্য। মানব সমাজে কোন একটী ধর্ম্মাভাব বা কোন একটী উন্নত অবস্থার অভাব বোধ হইলে অনেক কাল ধরিয়া সেই অভাব নিবন্ধন একটা ব্যাকুলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। তৎপরেই দেখা যায়, ব্যক্তি বিশেষ সেই অভাব নিরাকরণার্থ ঔষধি প্রয়োগে কৃতপ্রসত্ন হইয়া থাকেন। প্রকারান্তরে বলা যায়, তৎপরেই বিশ্ব-নিয়ন্তা আপনার অসীম দয়াতে লোক-বিশেষ বা দল-বিশেষকে আপনার ধর্ম্ম প্রচারের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া, অভাব নিরাকরণ করিয়া থাকেন। সেই ধর্ম্ম প্রচারকের সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডই যে বিধান পদ বাচ্য, তাহা নহে; কিন্তু যে সকল সত্য প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহাই বিধান। যাহা কিছু মানুষের তৎসমুদয় নশ্বর; যাহা কিছু ভগবানের, তৎসমুদয়ই অবিনশ্বর বিধান। অভাব নিবারণের ঠিক ঔষধটী বিশেষ ভাবে সেই সময়ের বিধান। সম্পাদক মহাশয় অযথা বাগ্‌জাল পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণের ন্যায় বিধান শব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোষণা করিলে এত বড় একটা গৃহবিবাদ মিটিয়া যায়। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের “নববিধান” নামকরণ করিবার আবশ্যক কি? বিধান—বাদীরা বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একটী নাম যেমন “সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম,” ইহাও তদ্রূপ। শব্দ কেবল ভাব প্রকাশক; “নববিধান” বলাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, কি লজ্জার কথা, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক এই নামকরণের হেতু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অত্যন্ত কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম থাকিলে কেশবচন্দ্র সেনের নাম একজন সামান্য ধর্ম্ম প্রচারকের মধ্যে গণ্য হইবে। আর পাঁচ জন প্রচারকও যেমন, তিনিও তেমনই একজন বলিয়া গণ্য হইবেন। তাঁহার বিশেষ কিছু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাইবে না। এই জন্যই তিনি নাম পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখিয়া ছিলেন।” (১লা বৈশাখ, ১৮০৭)। এরূপ উক্তিকে আমরা আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকি। ঘৃণা করি বলিয়া যে এইটী অবলম্বন করিয়া একটা গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে, এরূপ মনে করি না। আমার বোধ

হয়,—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি বিধান শব্দের প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান বলিতে আপত্তি না করেন, তা হলে যেমন ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মিলন হইতে পারে, তেমনই বিধানবাদীগণ একটু উদারতা সহকারে বিধান বলিতে যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহাদিগকেও প্রেম ও সদ্ভাবের সূত্রে বাঁধিয়া আপনাদের বলিয়া মনে করিলেও প্রভেদভাবে অন্তর্হিত হইতে পারে। একটা শব্দ যে কারণে হউক কতকগুলি লোক ভাল বাসেন না বলিয়া যে তাঁহাদিগের সহিত বিরোধ করিতে হইবে, ইহা কি প্রকার কথা ? বোধহয় মূলভাবে অধিক বিভিন্নতা নাই, শব্দ লইয়াই অধিক বিবাদ। কেহ কোন শব্দ বলিল কি না ইহা ধরিয়া কি ব্রাহ্মসমাজের সুন্দর তনুকে ক্ষত বিক্ষত করিব ? একদল বিধান শব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে প্রকৃতি ব্যাখ্যাত হয়, যদি তাহা প্রচার করেন ও উক্ত শব্দ ব্যবহার করেন, আর অপর দল বিধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ভাবে যদি প্রচার করিতে থাকেন, ক্ষতি নাই ; ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম ; ব্রাহ্মনিষ্ঠা, ভ্রাতৃ-প্রেম এসকল ত প্রচারিত হইবে ? স্বার্থ ভাবের মূলে কুঠারাঘাত হউক, মানুষের মানাপমান বিবেচনা ব্রাহ্ম সমাজ হইতে অন্তর্হিত হউক, দলাদলি ঘুচিয়া যাউক্। সাধের ব্রাহ্ম সমাজ আবার অক্ষত মনোহারিণী তনু লইয়া সকলের যাহাতে চিত্তরঞ্জন করিতে থাকে, এবম্বিধ উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। ব্রাহ্মগণ যদি কেবল এই দেখেন, এই লইয়া আলোচনা করেন, যে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বাড়িতেছে কি না, অহঙ্কার অভিমান, হিংসা, অসত্য চলিয়া যাইতেছে কি না, তাহা হইলেই ব্রাহ্ম সমাজে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ পুষ্প বর্ষিত হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বেদী লইয়া সম্প্রতি যে বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। উহা বিবাদের কারণ করা নিতান্ত বিসদৃশ। যাঁহার বেদীতে বসিবার ইচ্ছা হইবেনা, তিনি বসিবেননা ; যিনি বসিতে চান, তিনি বসিবেন ; এইরূপ নিয়ম করাই শ্রেয়ঃ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের গঠন-প্রণালী ভাল, অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে এ বিরোধ ঘটিতে পাইত না। ব্রাহ্ম সমাজের ভেদাভেদ অন্তর্হিত করিয়া সম্মিলন সাধনের জন্য একটী ব্রত-ধারী ব্রাহ্মদল আবশ্যক হইয়াছে। সকল বিভাগের মধ্যে যাহাতে এইরূপ ব্রত-ধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তৎবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা সহকারে প্রথমতঃ কার্য্য করিতে হইবে। উক্ত ব্রত-ধারীর সংখ্যা তিন ব্রাহ্ম সমাজেই যদি অধিক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কাজেই অপরাপর সকলকে সম্মিলনের

অনুকূল হইতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিভিন্নতা থাকিলেও আমরা মিলিত হইব। নিরাকার এক ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও সকল জাতীয় মনুষ্যের প্রতি প্রেম, এই দুইটী মূল ধরিয়া আমরা মিলিত হইব। থাকিলই বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের ভিন্নতা; হৃদয় সংকীর্ণ ও প্রেম-শূন্য না হইলে দলাদলি নিবারণ করা সহজ। বলিতে দুঃখ হয়, দলাদলির মিলনতা এত দূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, এক ব্রাহ্ম সমাজের লোক অপর ব্রাহ্ম সমাজের লোকের সহিত আদান প্রদান পর্য্যন্ত রহিত করিতেছেন। তুমি নব-সংহিতার পদ্ধতি অনুসারে আপনার কন্যার বিবাহ দিবে, তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে পারিনা, এরূপ উক্তিও শুনা গিয়াছে। আরে বাপু দেখ, নবসংহিতার পদ্ধতির সহিত তোমার অনৈক্য কোথায়? আর যদিই কোন একটী কার্য্যগত ভিন্নতা থাকে, তাহা দূষ্য কি না। কোন কার্য্যগত ভিন্নতা এক ব্যক্তির বিবেচনায় দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, অপর ব্যক্তি সেইটী ছাড়িয়া দিতে পারেন কি না, তাহাও দেখা আবশ্যক। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কি কি রূপে মিলন হইতে পারে, তৎসমুদয় উল্লিখিত হইল; এক্ষণে ব্রাহ্মগণের স্থির বিবেককে আঘাত পূর্ব্বক আবেদন করিয়া বলিতেছি, আসুন, আমরা সকল স্বার্থ ও অভিলাষ জলাঞ্জলি দিয়া সমগ্র চেষ্টা ও যত্ন সহকারে সমস্ত ব্রাহ্ম পরিবারকে পবিত্রতা ও প্রেম, শান্তি ও সদ্ভাবের ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের গৃহবিচ্ছেদ তিরোহিত করিতে প্রবৃত্ত হই।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

আহার।

জীবনের যত প্রকার অভাব আছে, আহার সকলের উপরে। আহার দ্বারাই শরীর ও প্রাণের পুষ্টি। আহারের উপরেই জীবন-অট্টালিকা স্থিতিয়া রহিয়াছে। প্রকৃতিও এই জন্যই শরীরের অঙ্কুরাবস্থা হইতে ইহারই যোগাড় আগে করিয়া থাকে। মানুষ যখন অচৈতন্য অবস্থায় ভ্রূণরূপে মায়ের গর্ভকুঠরীতে বাস করে, প্রকৃতি তখন সেই মায়েরই শিরা-পথ দিয়া রক্ত-স্রোতে প্রবাহিত অন্নসার সকল দ্বারা শিশু শরীরকে পুষ্ট করে। এবং যখন গর্ভাশয় ছাড়িয়া বাহিরে আসে, তখনও কিছুকাল

পর্য্যন্ত সেই মায়েরই আহার সামগ্রী হইতে স্তনের কলে দুগ্ধ প্রস্তত করিয়া শিশুরূপী মনুষ্যকে খাওয়ায়। যখন আরো বড় হয়, এবং শিশুর মুখে ভাত রুটী পেষিবার উপযুক্ত দন্তরূপ যাঁতাকল সকল মাড়ীর নীচে উপরে সারি সারি ফুটিয়া উঠে, তখন শিশু বাপ মার আহার খাইতে আরম্ভ করে। ঠোঁটের প্রান্তভাগ হইতে পায়ুপথের শেষভাগ পর্য্যন্ত শরীরের ভিতরে যত কিছু, তাহার প্রায়ই আহার সামগ্রী রচনা করিবার যন্ত্র তন্ত্র। অর্থাৎ মাথার খুলি এবং হাত পা ছাড়া শরীরের আর সমস্ত ভাগই পাকের ঘর। মাথা এবং হাত পা প্রথমে ইহারই খাটুনি খাটে, এবং অধিকাংশ জীবন আর আর কাযের আগে প্রায় ইহারই কাযে ব্যয়িত করে।

মানুষ যখন এই পাকের ঘরের খাটুনি খাটিয়া অবসর পায়, তখনই বাঁশী বাজাইয়া এবং গীত গাইয়া আমোদ প্রমোদ করে। আর যত ক্ষণ ইহার সরঞ্জমের যোগাড় না থাকে, ততক্ষণ আর অন্য চিন্তা মনে স্থান পায় না। ইহারই জন্য লোককে জুতা সাফ করিতে হয়, মলভাণ্ড বহিতে হয়, এবং নানা প্রকার কষ্ট দুঃখ ও গ্লানি যন্ত্রণা জীবনে সহ্য করিতে হয়। পাকের কোঠা ভাঙ্গিয়া ফেল, আর কোন উদ্বেগ নাই। কিন্তু ইহা কি সম্ভব? শুনা যায় পূর্ব্বে অনেক মুনি ঋষিরা এই রান্নাঘরের জ্বালায় ছেলে মেয়ে ফেলিয়া বনের আশ্রয় লইয়াছেন। অনেক মানুষ যোগী, সন্ন্যাসী ও ফকির হইয়া কেহ বা আবার ইহারই ফিকিরে ও কেহ কেহ বা ইহাকে সাধনায় জয় করিবার চেষ্টায় বায়ু ভক্ষণে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কিন্তু কাহার দ্বারাও রান্নাঘর বিজিত হয় নাই। ইহা কোন কালেও কোন রূপ প্রাণায়াম কি অঙ্গন্যাস ও করন্যাসের যোগে হইবার যো নাই। কারণ, পাকের ঘরেই প্রাণের যত কারখানা, এই কারখানা বন্ধ হইলে জীবনের সমস্ত কায বন্ধ হয়। এই ঘরের উপাদান দ্রব্যাদির আয়োজনেই লোক এক প্রভাত হইতে অন্য প্রভাত পর্য্যন্ত ইতর প্রাণী এবং উদ্ভিদাদির পাশা পাশি থাকিয়া জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, এবং যখন ইহার সামগ্রী যোগাইতে না পারে, তখনই প্রাণান্তায় উপস্থিত হয়।

দেখ, আহারের যোগাড়েই এক দেশের পাখী ও পশু ঋতু-পরিবর্ত্তনে এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া যায়। মানুষ দলে দলে এক রাজ্য ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে চলিয়া আসে। ব্যবসা করে, লড়াই করে, অস্ত্র ধরে

এবং চাকুরী করে। শরীর ও মনকে চালনা করিবার যত প্রকার চেষ্টা, উদ্যম ও যত্ন শরীরে আছে, আহার তাহাদের সেনাপতি ও প্রধান নেতা। ধুঁয়ার কল, কাপড়ের কল, ছাপা খানা, রেল ও টেলিগ্রাফ সকলেরই তলায় আহারের বন্দোবস্ত। মাসে যত পুথি পত্র ছাপা হয়, বছরে যত কল কৌশল আবিষ্কৃত হয়, এবং প্রতি নিয়ত আয়াস ও আরামের যত দ্রব্য সামগ্রী দেশ বিদেশ হইতে আসিয়া বাজারে উপস্থিত হয়, আহার তাহার সকলের প্রেরয়িতা। রাজা, প্রজা, ধনী ও দীন এই যে সামাজিক বিভাগ, ইহারও মূল আহার সামগ্রীর সংস্থান পরিমাণেই জানিতে হইবে। যাহার কাছে যত খাবার জিনিস আছে, সেই সমাজে তত বড় এবং শক্তিশালী। যে দশজনকে আহার দিতে পারে, সেই এক সময় দুই শত লোক ডাকিয়া তোমার ঘর বাড়ী ধন স্ত্রী কাড়িয়া নিতে সমর্থ। রাজারা সৈন্য পালে আহার বন্দোবস্তের বলে। আর তুমি আমি ভয়ে কাছে যাই না আহারের অনাটন বৈলে। রুটি পাছে মারা যায়, স্ত্রী পুত্র পাছে ভাতে মরে, এই ভয় দেখ সকল ভয়ের আগে।

সমাজের যত বাঁধুনি আহার তাহার দড়ি ও শিকল। আহার পায় বলিয়া শিশু, সকলের আগে মায়ের দিকে ধায়। আহার যোগাইতে না পারিলে প্রেম খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া যায়, পুরোহিত ধর্ম্ম কথা শুনায় না, বৈদ্য ঔষধ দেয় না, উকীল, কাছারিতে কথা কয় না; এবং জজের বিন্দুতেও বুদ্ধি যোগায় না। যে সমাজে যত আহারের বন্দোবস্ত থাকে, সে সমাজ পরিমাণ ও পরিসরে তত পুষ্ট হইয়া উঠে। এক এক বার এ দেশে যখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন তল্লাস করিয়া দেখিও এক এক গির্জাঘরে কত লোক খ্রীষ্টান হইয়া থাকে। বাদসাহী আমলে যখন খয়রাতে খিচুড়ি পাওয়া যাইত এবং কোরাণে ভক্তি দেখাইলে জায়গীর জুটিত, তখন কত সহস্রলোক আপনা হইতে যাইয়া মুসলমান হইয়াছে। আর রাজা অশোকের সময় যখন ৪০ হাজার বৌদ্ধ প্রচারকের আহারের সংস্থান করা হইয়াছিল, তখনই কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনাহারীর কাছে নরকের ভ্রূকুটীভয় ও ঈশ্বরের প্রেম প্রচার কিছুই কার্য্যকরী নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক মনুষ্য-সমাজে যত কিছু অপকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহার প্রায় তিন ভাগই ক্ষুধার জ্বালায়। সৎকর্ম্ম করিতে চাও, আহারের সংস্থান আগে। অসৎকর্ম্ম

করিতে চাও, আহারের বন্দোবস্ত আগে। আহার এই প্রাণযন্ত্রের কয়লা। যে পথে চালাও কয়লার যোগাড় সর্ব্ব প্রথমে দরকার।

প্রীত প্রণয়, অপ্যায়িত আদর, বন্ধুতা ও বান্ধবতা, যা কিছু সকলেরই জীবন আহার। যত দিন পরস্পরের মধ্যে খাওয়া দাওয়া থাকে, ততদিনই কেবল এই সকল সদ্ভাব জীবিত থাকে। আর যখন খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়, তখন ইহাদের খেলাও বন্ধ হয়। বন্ধুর সহিত মিলন, খাওয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী। সম্মানিতের নিকট হইতে সম্মান পাওনে ও মর্য্যাদাবন্তকে মর্য্যাদা করনে, খাওন এবং খাওয়ানই চূড়ান্ত লক্ষণ। ভাল খাওয়ার দ্রব্যাদি বাটীতে উপস্থিত হইলে প্রিয় ব্যক্তিকে মনে পড়া ভালবাসার অতি প্রধান চিহ্ন। মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ সন্তানের জন্য আগে খাওয়ার উপাদেয় সামগ্রী তুলিয়া রাখে। বিবাদ বিসম্বাদ, বিগ্রহ ও বিরোধের আহারই এক মাত্র সমন্বয়কারী। আমোদ আহ্লাদ, বিবাহ উৎসবের আহারই প্রাণ। বিয়োগ বিরহ, শোক সন্তাপে আহার পরিত্যাগই কষ্ট কল্পনার পরাকাষ্ঠা। আহারই স্বাস্থ্য এবং সুখের প্রধান লক্ষণ। অনাহারই পীড়া ও দুঃখ সঞ্চারের সম্যক নিদর্শন। দেখ আজি তুমি বারিষ্টর হইতে বিলাতে যাও, আহারের বিলক্ষণ আয়োজন না করিলে এবং তিনবৎসর পর্য্যন্ত চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রূপে সাহেবদিগকে ভোজ না দিলে কোন মতেও বারিষ্টরি সনন্দ পাইতে পারনা। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ঢুকিতে চাও ভোজের দরকার, সিবিলসর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে যাও খড়ের কুটীর ছাড়িয়া অট্টালিকায় বসিয়া প্রতি বেলাদের ডাল চর্চ্চরি হইতে কাঁটা চামচায় ভাল খাইবে, ইহা তোমার মনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষা। ধর্ম্ম সম্প্রদায় কর খাইতে না দিলে লোক যোটেনা, এবং মাঝে মাঝে বৃহৎ ভোজ না যোগাইলে ভ্রাতৃভাব থাকেনা; সাম্প্রদায়িক উৎসাহ ক্রমে শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যায়। এই আহারের জন্য লাখে লাখে লোক অন্নদাতার ইঙ্গিত মাত্রে সমর-ক্ষেত্রে দাঁড়ায় এবং মাসিক সপ্ত মুদ্রা বেতনের লোভে শীতল শোণিতে সজীব তুলিয়া অনায়াসে পাড়া পড়সীর কুক্ষি বিদারণ করে। বেশি কি, আজি আফিস দপ্তরে এই আহার সামগ্রীর সুন্দর সংস্থান হইতেছে বলিয়াই অক্লেশে জুতা এবং চাবুক মস্তকে বহন করিতেছ।

টোল, মক্তব ও স্কুলে প্রত্যহ যত উপদেশ উপার্জ্জন করিয়েছ, আহারার্জ্জন তোমার চরমাকাঙ্ক্ষার ধ্রুবতারা। এই লক্ষ্যেরই অভিমুখে থাকিয়া

তোমার তাবৎ জ্ঞান, ধর্ম্ম শিক্ষা ও সাধনার মেরু, আজি দৈনিক আবর্ত্তনে সমানান্তরাল ভাবে ঘুরিয়া আসিতেছে। দশ শত লোককে অন্ন কষ্টে ফেলিয়া মুষ্টি-পরিমিত এক শত লোক কেমনে নির্ব্বিঘ্নে পায়স ও পলান্ন দ্বারা বেলওয়ারি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের তলায় বসিয়া আহার সমাপন করিতে পারিবে, তাহারই জন্য এত আইন কানুন, নিয়ম ও নীতি এবং পুলিস ও পল্টন। আর, তুমি ধনী এবং তুমি রাজ-সেবাভিমানী, প্রাগুক্ত শতজন রূপ মহা ষড়-যন্ত্রেরই একজন। অপর সহচর সহস্রকে গর্ত্তে ফেলিয়া নিষ্কণ্টকে উচ্চাসনা-রোহণে আহার করাই তোমার এক মাত্র উদ্দেশ্য। কোন ক্ষুধার্ত্ত তোমার পায়স-পাত্রে বিঘ্ন জন্মাইলে, তুমি অমনি পুলিসের শরণাপন্ন হও। পুলিস, উকীল ও ব্যবস্থাপক তোমারই রাষ্ট্র ষড়যন্ত্র রূপ যন্ত্রের চাকা, চোঙ্গ ও কুড়া। ইহারা যাহার কাছ হইতে ভাল আহার পায়, তাহারই কথা কয়। অনাহারী ও তণ্ডুল শূন্য শত প্রকারে উৎপীড়ি হইলেও ইহাদের সাহায্য পাইতে পারে না। যাহার গৃহে আহারের সংস্থান নাই, সেই দরিদ্ররূপী কুষ্ঠরোগীকে কেহ ঘৃণায় স্পর্শও করিতে চাহে না। কেবল দূরে দূরে থাকে। কখন কখন বা আপনাদের খেয়াল ধরিলে, অনাহারীদের আহার কষ্ট গাইয়া আবার আপনাদেরই জঠরের যশ সমন্বিত আহারের যোগাড় দেখে।

উন্নত জাতি, উন্নত লোক, বড় লোক, ও মস্তলোক এই যত শব্দ তুমি আজি কালি কাগজ পত্রে ও কথায় বার্ত্তায় ব্যবহার করিয়া থাক, ইহার সমস্তই একমাত্র আহারবস্ত দিগকে নির্দ্দেশ করে। যে জাতি কি যে লোকের ঘরে আজ যত পরিমাণে আহার সঙ্গতি আছে, সে ই তত পরিমাণে উন্নত এবং বড। ইংরেজেরা আজি উন্নত লোক কেন? না, তাহাদের অনেক খাবার সংস্থান আছে। যেখানে, যে দেশে এবং যে বাজারে যাইয়া দাঁড়ায়, সেখানেই ইহারা বলে হউক আর বুদ্ধিতে হউক, আপনার খাবার সংস্থান করিয়া লইতে পারে। ইহারা এত অন্ন-করী বিদ্যা জানে যে, যেদেশে এবং যে মনুষ্য সমাজেই কেন যাউকনা, সেখানেই একটা না একটা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আপনারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের শরীরে বল, হৃদয়ে সাহস, মস্তকে বুদ্ধি এবং মস্তিকে শিল্প ও বিজ্ঞান-কৌশল পরিপূর্ণ; সুতরাং যেখানে যায়, সেখানেই অতি সহজে সকলের আগে আপনার খাবার বন্দোবস্ত করিয়া লয়। খায়ও যেমন, গায়ে রক্ত এবং মাংসপেশীও তেমন। জীবনীশক্তি

যেন পদ্মানদীর বেগে ইহাদের ধমনী সকলে ধাবিত হয়। আমাদের জাত ইহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবনত। কেন ? না, আমাদের খাবার কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। যাহাও আছে তাহাও ক্রমেই দিন দিন কষ্টায়ত্ত হইয়া উঠিতেছে। কিছু দিন আগে যখন আপনাদের রামরাজ্য ছিল, তখন মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আপনারাই আপনাদের মধ্যে এক প্রকার কাড়া কাড়ি করিয়া খাইয়াছি। সংহিতা পড়িয়াছি, সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এবং ইহা ছাড়া আর যাহা যাহা করিয়াছি, সকলই আপনাদের আরামের জন্য ছিল। তখন আর্য্য ছিলাম, ঋষি ছিলাম, গায়েও বল ছিল, বুদ্ধি এবং শিল্প কৌশলাদিও সেকালের উপযুক্তই ছিল। আপনাদের আর্য্যবংশ যতই বাড়িয়াছে, গোষ্ঠী গোত্রে পল্লবিত হইয়াছে, অনার্য্যদের ভূ-সম্পত্তি ততই আত্মসাৎ করিয়াছি। জীবনোপায়ের জন্য পাঠ ও পরীক্ষাদির এত চাপাচাপিতে পড়িতে হয় নাই। দশ জন একত্র হইলেই নূতন রাজ্য স্থাপন, করিয়া নূতন ব্যবস্থা মতে সুবিধা ও স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিয়াছি। কিন্তু কতক দিন পরে যখন রহিমজান ও রমজান আসিয়া বুকে চড়াও করিল, তখন তোমার ও আমার অন্যরূপ অবস্থা। তখন তোমার কি ক্ষেত্রে দুই সরিক, একটি গম দুইভাগ করিয়া খাইতে হইয়াছে। তোমার মুনি ঋষি যেমন এক দিকে গোষ্ঠিগোত্রে বাড়িতে লাগিল, সেইরূপ রহিমের মোল্লা মৌলবীরাও অপর দিকে তোমার পাশে পাশে ছাইয়া পড়িল। সকল কাজেই তখন দুই ভাগ। যে কাজ করিয়াছ, যে ব্যবসা করিয়াছ, এবং যে পদে আরূঢ় হইয়াছ, রহিম তোমার সঙ্গে সঙ্গে। কখন বা উপরে এবং কখন বা সমতলে। তখন একটি গাভী দুজনা দোহন করিয়াছ। তখন বল বুদ্ধি এবং শিল্পাদিতে তুমি অনেক সময় রহিমের প্রায় প্রতিযোগী। তোমার বিশ্বকর্ম্মা ঠাকুর এবং রহিমের লোকমান হকিম কারিকরী এবং বুদ্ধিতে বড় একটা বেশ কম ছিল না। যারপর। জমি মাপিবার এবং টাকা কড়ি শোধিবার যতরূপ কল ও যন্ত্র তখন লোকমান আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে গুলির অনেকটাই মোটা মোটি ধরণের ছিল। মাপিতে ও শোধিতে অনেকটাই এপাশে ওপাশে পড়িয়া থাকিত। কেহ বড় একটা হিসাব পত্রে আনিত না। মকুতবের ছবকেরও এত চাপাচাপি ছিলনা। বড় বয়সে ইচ্ছা মুনসী মৌলবী অনায়াসে হইতে পারিতে। কায কর্ম্ম চালাইয়া উঠিতে পারিলেই কায পাওয়া যাইত। জায়গীর, চেয়াগী ও ব্রহ্মোত্তর

অনেক ছিল। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে তখনও এক রকমে সুখে দুঃখে আহার চলিয়া গিয়াছে। আজ তোমার সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন অবস্থা। এখন রাম, রহিম,রবার্ট তিনজন এক ভিটিতে বাসকরে। সকল কর্ম্মেই তিন ভাগ। বিষয় পসার এবং ব্যবসা মাত্রেই তিন খানা হাতে টানা টানি হয়। রবার্ট আপন আহার সংস্থাপন বিষয়ে বিলক্ষণ পটু। তার আজি অভ্যুদয়ের কাল। না বল, না জমা জমি যাহা কিছু এত দিন হিসাব পত্রের বাহিরে লুকান ছিল, তাহা রবার্টের বৈজ্ঞানিক জরিপে রেখায় রেখায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিলটি খোবারও যায়গা নিষ্কর পাবার যো নাই। তোদরমলের বন্দোবস্ত রবার্টের কাছে আজ কিসে লাগে? বন জঙ্গল তৃণ দুর্ব্বা পর্য্যন্ত একটি করিয়া রবার্টের জমিদার-লতায় মুদ্রিত। কড়িটি না দিলে তৃণটি উঠাইবার ক্ষমতা নাই। পাহাড়ে জঙ্গলে লাঠিয়াল পাইক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রহিম রমজানের অভ্যুদয় কালে লাঠি গাছটা তবু হাতে রাখিতে পাইতে। স্ত্রীবর্গকে যদিও অন্দর মহলে পুরিয়াছিলে, তবু আপন সম্মান আপনি এক প্রকারে বাঁচাইয়া পথে ঘাটে চলা ফিরা করিবার ভরসা ছিল। সময় এবং স্থান বিশেষে জোর জবর-দস্তিতে নিষ্কর খাবারও অনেক যো ছিল। কিন্তু রবার্টের কাছে সে সব খবার যো নাই। তাহার কাছে সম্মান রক্ষার জন্য স্বামীদিগকেও আজি অন্দর মহলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে! রবার্ট রহিম হইতে অনেক সেয়ানা। সুতরাং পথে ঘাটে গোঁচা খোঁচির ভয়ে তোমর হাতে সূচি গাছটিও রাখেনাই। রবার্ট স্ত্রীবর্গকে বড়ই খাতির করে। তারি জন্য হয়তো তোমাকে আজি তাহাদেরই আকারে পরিণত করিয়াছে! তোমার বাজার বন্দর সমস্তই রবার্টের দোকান ঘর। ব্যবসা বাণিজ্য সকলি তাহার হাতে। তোমার দালালিতে আর এখন পেটের অন্ন পুষিয়া উঠেনা। ওকা-লতি, ডাক্তারি ও আফিসের চাকরি যদিও বয়সের বেড়া এবং পরীক্ষার বিষম গভীর খানা সকল ডিঙ্গিয়া ডাঙ্গাইয়া কলে কৌশলে হাত করিতে পার বটে, কিন্তু তাহাতে আজি এত লোকের ভিড় যে, সে প্রাঙ্গনে একটি গমও সহজে কুড়াইয়া মুখে দিবার যো নাই। সর্ব্বত্রই অন্নোপার্জ্জন কষ্ট। সিবিল সর্ব্বিসের জন্য লাফালাফি করিলে কি হইবে? তাহার বাঁধুনি ছাঁদুনির মধ্যে কটা লোক ঢুকিবার আশা আছে? যেখানে বাইশ কোটি লোকের জীবন লইয়া নিত্য হুড়াহুড়ি, সেখানে বহু ব্যয় এবং বহু কষ্টসাধ্য

গোটা পাঁচ ছয় লোকের সিবিলি এবং ব্যারিষ্টারি দিয়া দেশের কি লাভ? ইহাদের অধিকাংশই যখন স্বোদর-পূরক এবং আয়েস-বাজ, তখন ইহাদের দ্বারা আমাদের অথবা পরবর্ত্তী সন্তানে সন্ততিদের কোন বিশেষ উপকার নাই। অনাটন যে দেশশুদ্ধ লোকের পানেই ভ্রূকুটি করিতেছে! এত যে মহামারী, এত যে জলধৌত এবং এত যে দুর্ভিক্ষের মরক, তাতেও তো তোমার মুনি ঋষির গোত্র, রহিমের মোল্লা মৌলবীর বংশ এবং রবার্টের অভিনব জাত ম্যাও, ডিক্রুসের গোষ্ঠী ডাল পল্লবে বৃদ্ধি হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে কসুর করিতেছেনা! কিরূপে যে আপনারা পেটে অন্ন দিবে তাহার কি কেহ কোন চিন্তা কর? এখন আর একার ভাবনা ভাবিলে চলিতেছেনা। যখনই ভাবিবে, তখনই তিনের ভাবনায় ভাবিতবান হইতে হইবে। দুই জনকে ফেলিয়া একা নিশ্চিন্তমনে বিষয় পসার ভোগের আর সুবিধা নাই। আজি তোমার স্কন্ধের বোঝার উপরে খড়ের গাদা এবং তাহার উপরে আবার শাকের আঁটি। এঘরে যখন একলাটি ছিলে তখনই ঐরূপ ভাবনায় আরাম ও শান্তি ছিল। যখন আরো দুই সরিক তাহাতে যোটাইয়াছ, তখন তিনের বন্দোবস্ত না হইলে তোমার কল্যাণ নাই। বাইশ কোটির ঘরে ঘরে যে কালে অন্ন লইয়া টানি টানি, তখন কেবল উকীল ডাক্তার হইয়া কার ফীসে কে এবং কার ভিজিট দ্বারাই বা কার পেট প্রতিপালিত হইবে?

দেখ, আজ বিলাতে শ্রমীদলের সভাপতি জর্জ পটার সাহেব অন্নের টানাটানিতে পড়িয়া টাইম্‌স নামক সংবাদপত্রে কিরূপ পরামর্শ করিতেছে। বিলাতের সমস্ত কারবারে আজ এক প্রকার মান্দ্যতা ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সুবিধা মত শ্রমীবর্গের প্রচুর অন্ন যুটিয়া উঠিতেছে না। হতভাগ্য ভারতবর্ষের বাজার হাট ছাড়া স্বাধীন বাণিজ্যের ডাইল আর কোথাও এত গলিতে পারে না। সকলেই আপন আপন দেশে আপনাদের প্রয়োজনীয় ও বিলাসোপযোগী ফালতু জিনিষপত্র গড়িয়া লইতে পারে। এবং ইংরেজদের কাছ হইতেও সময়ে সময়ে চাল কড়ি বিলক্ষণ রকমে খসাইয়া আনে। কাযেই ইংলণ্ডীয় শৈল্পিক শ্রমীদলের গড়ান জিনিষপত্র পরকীয় স্বাধীন হাট বাজারে আশানুরূপ বিক্রয় হয় না। ব্যবসায়ের স্রোতেও আজকাল মন্দগতি ছাড়েনা। রবার্ট সাহেবের চক্ষু খুলিয়াছে। এবং তিনি এখন দেখিতেছেন যে, স্বাধীন বাণিজ্যের তলে তলে ইম্পিরিয়েল ফীডেরেসন (Imperial federation) অর্থাৎ সাম্রাজ্ঞীয় একযুক্তি না গড়াইলে আর কৌন

মতেও স্বদেশীয় লোকের আহার ঘটিয়া উঠিতেছে না। এবং এই আশঙ্কায় অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া বলিতেছেন,—

"I advocate Imperial federation as a relief from our industrial depression: Why should England not amalgamate with her colonies and dependencies in one vast free-trade and protect ourselves from other countries? * * * * By so doing we could keep our wealth in our own Empire."

আমাদের শিল্প বাণিজ্যাদির নিস্তেজ ও পতিতাবস্থা প্রশমন করিবার জন্য আমি একটী সাম্রাজ্যীয় একযুক্তি গড়িবার পরামর্শ দিতেছি, এবং বলিতেছি যে, ইংলণ্ড কেন তাহার উপনিবাস ও অধীনস্থ স্থান সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আপনাদের মধ্যে একটি বৃহৎ স্বাধীন বাণিজ্য স্থাপন করিতেছেনা। এবং কেনই বা তদ্দ্বারা আপনাদিগকে অপর রাজ্য সকল হইতে "অর্থাৎ ভিন্নদেশীয় বাণিজ্যরূপ লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেনা? এরূপ করিলে যে আমরা আমাদের ধন সম্পত্তি আপন সাম্রাজ্য মধ্যেই রাখিতে পারি। ইত্যাদি।" ইহাকেই বলে স্বাধীন বাণিজ্যের নামে মণ্ডা গড়ান। দেখ এখন, যে গতিকে ভারতবর্ষ আজি কোপীন পরিতেছে এবং যে গতিকে তাহার স্বাঙ্কস্থ শৈল্পিক শ্রমীজীবিরা হা অন্ন হা অন্ন করিয়া ঘাটে পথে রুটীর জন্য লালায়িত, আজি আপনাদের দেশে সেই ঘটনাটির কিঞ্চিন্মাত্র সূত্রপাত হওয়াতেই পটার সাহেব স্বদেশীয় লোকদিগকে কিরূপ প্রস্তাবে যোগদিতে বলিতেছেন! আপনা মর্ম্মে খোচা না লাগিলে উদার নীতি সকলের প্রকৃত গভীরতা টের পাওয়া যায়না। হাঁ, এখন যদি ইংলণ্ড তাহার অধীনস্থ ভারতবর্ষ, সিংহল এবং উপনিবাস অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের সহিত ইংলণ্ডের শ্রমীদলকে আহার যোগাইবার জন্য উল্লিখিত সাম্রাজ্যীয় ধর্ম্মঘটে যোগদান করায় এবং অন্য রাজ্যের প্রস্তুতীয় পণ্যদ্রব্যাদি সস্তায় পাইলেও তাহারা না কেনে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিলক্ষণ মৎসামুলার যোগাড় হয়। এক পয়সার জিনিস শেষে ভারতে আসিয়া দশ পয়সায় বিক্রয় হইতে পারে। আর ভারতবর্ষের টাকাটাকেও এক চেটিয়া প্রণালীতে আরো বেশী বেশী করিয়া কেবল লণ্ডনের তেরজুরিতেই নির্বিঘ্নে ঢোকান যায়! কয়েক ছালা গম কিনিয়া খাইতে হয় বলিয়া পটার সাহেব তাঁহার দেশের মহতার আবার কি কহিতেছেন শোন,

"Do we get a sufficient amount of foreign trade to bring this money back again into this conntry—to say nothing about the enormous sale of foreign manufactured goods in this country which also have to be paid for in cash?"

"আমরা কি পররাষ্ট্র সকলে (অবশ্য ভারতবর্ষ ও সিংহল ছাড়া) প্রচুর পরিমাণে ব্যবসা বাণিজ্য পাইয়া থাকি, যাহাতে করিয়া আমাদের এই টাকা গুলি (অর্থাৎ ভিন্ন দেশ হইতে গম ছোলা ও অন্যান্য খাদ্যোপকরণ সকল কিনিয়া খাবার টাকা গুলি) আমরা পুনরায় আপন দেশে ফিরিয়া আনিতে পারি? যে সকল বিদেশোৎপন্ন শিল্প দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে এ দেশে বিক্রয় হয় এবং যাহার জন্য আমাদিগের নগদ পয়সা দিতে হয়, তাহার তো এখানে কোন কথাই নাই। ইত্যাদি।" আহা, যে দেশের এত কল যন্ত্র, এত শিল্পজাত দ্রব্য ও এত বাণিজ্য দেশ বিদেশ হইতে দিবা রাত্রি জাহাজে জাহাজে টাকা বোঝাই করিয়া আনিতেছে, তাহার গোটা কত টাকা এপাশ ওপাশ হইতে চুয়াইয়া অন্য দেশে যায় বলিয়া "দেশের লোক ক্ষুধায় শুকাইয়া উঠিল, দেশ নির্দ্ধন হইতে চলিল"ইত্যাদি রূপ কত চীৎকার হইতেছে! কিন্তু যে দেশে কল নাই, বল নাই, স্বদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ঠাঁই নাই, অথচ প্রতিবৎসর ৪০ ক্রোরেরও অধিক টাকা কাচ মাটি কাপড় ও কলম প্রভৃতি কিনিতে এবং আরো আরো নানা পথে ভিন্ন দেশের উদরে আহুতি প্রদত্ত হয়, এবং যাহার বদলে একটা কাণাকড়িও দেশের শূন্য কোষে আসিয়া জমা হয় না, সে দেশের লোকদিগের যে আজি কিরূপ বিড়ম্বনা এবং কতদূর আকাশভেদী হাহাকারে আর্ত্তনাদ করা উপযুক্ত এবং আপনাদের মধ্যে একযুক্তি-যোটে যোট বাঁধা ও ধর্ম্মঘট করা কর্ত্তব্য, তাহা একবার একটু প্রশান্তমনে ভাবিয়া দেখ।

অনেকেই আজি ত্রৈবার্ষিক ব্যারিষ্টারি-ভোজে টাকা বেচিয়া ডিপ্লোমা কিনিতে ব্যতিব্যস্ত। পার্লিয়ামেণ্টের নির্ব্বাচকদের নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়া এম, পি, হওয়ার জন্য দেশের টাকায় বিলাতি বিলাস উপভোগে বিলাতের অট্টালিকায় বসিয়া ক্ষয় করিতে উদ্যুক্ত, কল্পিত মহাপুরুষ দিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য হাজার হাজার টাকার তৈলবাজি পোড়াইতে কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু কেমনে দেশের ছেলেপিলে দিগকে ধনদ্বারা সাহায্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে শিল্প কৌশলাদি ও যন্ত্র কল ইত্যাদি শিখাইয়া অর্থো-

পার্জ্জনের বিবিধ কারবার খোলাইয়া দেওয়া হয় এবং তদ্দারা পুনরায় আপনাদের মৃত্তিকা প্রোথিত মূল ধনকে কেমনে বৃদ্ধি করান যায়, সে বিষয়ে একটি লোকেরও প্রকৃত যত্ন কি উদ্যম নাই! দেশের কালতু জিনিষ বেচিয়া বিদেশের টাকা ঘরে আনা দূরে থাকুক, দেশের যে টাকাগুলি নদী-প্রবাহের ন্যায় বিলাতি আয়াস ভোগের পথে বহিয়া বিলাতের দীঘী পুকুর সমস্ত ভরিয়া ফেলিয়েছে এবং দেশ ক্রমেই অর্থমরুতে পরিণত হইতেছে, তাহার কোন রূপ প্রতিবিধানে, এবং আপনাদের সন্তান সন্ততিকে ভাবী দুঃখ দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে পরিত্রাণে কাহারও ত কোনরূপ ভাবনা দেখি না অথবা ভাবনা-জনিত কার্য্য দেখিতে পাই না! যত জমিদার রূপ মহা যক্ষ এবং নৃপনামধারী দেশীয় প্রকাণ্ড ধননক্র ধান চাল গোলায় আঁটিয়া আয়েস মজায় মোসাহেবগণের সঙ্গে কালাতিপাত করিতেছে, তাহারা যদি দেবর্ষি রাজর্ষি অথবা রাজাবাহাদুর দিগের পিণ্ডমূর্ত্তি গড়ানের থামখেয়ালে এবং কেবল মাত্র কামনায় হিতবান্ রাজপুরুষ দিগের প্রতি হৃদয়-কচলান কৃতজ্ঞতা দানের হুজুকে নৃত্য না করিয়া, দেশীয় বিপন্ন দিগের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের পথ খোলান-ব্যাপারে কায়মনে উদ্যোগী ও উৎসাহশালী হন, তাহা হইলে কি দেশে এত দরিদ্রতা থাকিবার সম্ভাবনা থাকে? রুষিয়ার পীটর দি গ্রেট "গ্রেট" বলিয়া পূজনায় কিসে? সে কি সংবাদপত্রে প্রবন্ধবাজী করিয়া অথবা টাউনহলে কি পার্লিয়ামেণ্টে কালওয়াতি ঝাড়িয়া? না, তা কখন নয়। এতাদৃশ অসার বায়ুবাজী কর্ম্মের কোনটাতেই প্রকৃত রূপে গ্রেট হওয়া যায় না। মন্ত্রি-হস্তে রাজত্ব রাখিয়া অথবা নায়েবের হাতে কিছু কালের জন্য জমিদারী সঁপিয়া কেবল প্রজার হিতের জন্য আপন হাতে যখন হাতুড় বাটালী ধরা যায়, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে শুকিয়া ভিজিয়া জাহাজ গড়ান শিখা যায় এবং শিখিয়া প্রজাবর্গের ও বন্ধু বান্ধবের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করান যায়, তখনই এবং কেবল একমাত্র তখনি "গ্রেট" বলিয়া প্রকৃতপক্ষে পূজনীয় হওয়া যায়। রায়তকে মর্দ্দন করিয়া অথবা পাকে চক্রে পাড়াপড়সীকে নির্দ্ধনতায় ফেলিয়া লাঠিয়ালের জোরে অথবা সঙ্গীনের পৃষ্ঠপোষকতায় অট্টালিকায় বারুণীরস সেবনে কাল কাটাইয়া মাঝে মাঝে মহাদুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে কেবল দুই এক মুঠা চাল বেচিয়া কোনমতেও গ্রেট হওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে "গ্রেট" হইবার কোথাও কোন দুগ্ধফেণ-নিভ সোপান নাই। তবে আজি কালি কাশীর শিবলিঙ্গ তুল্য ঘাটে পথে যত মহাত্মা ও গ্রেটম্যান স্থাপিত

দেখিতে পাও, তাহারা সকলেই একপ্রকার জোর জবরদস্তিতে লোকের মুখে চড়াও করিয়া এবং সম্পাদকবর্গের খামখেয়ালপূর্ণ মুদ্রাযন্ত্রের আবর্ত্তন চক্রে আরোহণ করিয়া "গ্রেট"। এ রকমের "গ্রেটের" পূজায় একটী তুষের নৈবিদ্য দিতেও মন আপনা হইতে অগ্রসর হয় না।

অনাহার নানা অনর্থের হেতু। আজি কালি আহারের বড়ই অনাটন উপস্থিত। যদি এ সময় সকলে ঐক্যবাক্য হইয়া বোম্বাই,পাঞ্জাব,বাংলা ও মান্দ্রাজ একত্রে মিলিয়া মিশিয়া অন্নোপার্জ্জনের বিবিধ পরিসর পথ খুলিবার চেষ্টা না কর এবং কেবল সরকারি কাছারি ঘরের কুর্সিতে বসিবার উপযুক্ত হইবার নিমিত্তই ইস্কুলকালেজের কুঁদকাঠে চাঁচা ছোলা হইতে থাক, তাহা হইলে তুমি হাকিম, তুমি ধনী, তুমি রাজা ও তুমি জমিদার কোন মতেও নিরাপদে অন্ন খাইতে পারিবে না। নিহিলিষ্ট ও ফিনিয়ানেরা রুষিয়া ও ইংলণ্ডে ডিনামাইটের যেরূপ বিপ্লব করিয়া তুলিয়াছে, ভারতবর্ষেও কালে নৃশংস ক্ষুধামাইটে যে কি কি উৎপাত ও পাপাচরণ উপস্থিত করিবে, এবিষয় আজি কে চিত্র করিতে সক্ষম ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়—আগ্রা।

কর্ম্মফল।

(প্রতিবাদ)

মাঘ মাসের আলোচনায় "কর্ম্মফল" প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমাদের নিতান্তই কর্ম্ম ভোগ যে আলোচনায় কর্ম্ম-ফল পাঠ করিতে হইল। দেশে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য আলোচনার উৎপত্তি; কিন্তু এরূপ প্রবন্ধ দ্বারা আলোচনা ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন, বুঝিতে পারি না। প্রবন্ধটী পড়িয়া লেখকের উদ্দেশ্য প্রথম ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। এ কোন্ কর্ম্ম ফল ? সচরাচর লোকে যে বলে 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' এ সেই কর্ম্মফল কি ? তাহা হইলে একথা বুঝাইবার জন্য লেখক এত বহ্বাড়ম্বর করিয়াছেন কেন ? সকলেই জানে (এবং তদনুসারে কার্য্যও করিয়া থাকে) যে, যে যেরূপ কার্য্য করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। পুণ্য কর পরকালে সুখ আছে, পাপ কর নরক ভোগ রহিয়াছে। ইহকালেও

খুন কর ফাঁশি কাঠে ঝুলিবে; উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে ভোজ দাও গেজেটে নাম উঠিবে। যে যেমন কর্ম্ম করে ইহলোকে হউক পরলোকে হউক তদনুরূপ ফল পাইবেই পাইবে। "গোড়া হইতে বুঝিয়া সুঝিয়া কায কর, দেখ যেন শেষ ঠকিতে না হয়" এই মন্ত্রই ধর্ম্ম শাস্ত্রের—অন্ততঃ পূর্ব্বতন ধর্ম্মগুলির মূল মন্ত্র। লেখক কি প্রবন্ধে সেই পুরাতন মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন? না, তাহা নয়; প্রবন্ধটী শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে লেখকের অভিপ্রায় বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। কর্ম্মের অর্থ সাধারণে যাহা বুঝে, লেখক সে অর্থে কর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করেন নাই। সাধারণের মতে "কর্ম্ম স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত কার্য্য, আমরা নিজেই নিজকে কর্ম্মে নিয়োগ করি; কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সুতরাং সৎকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম নিজেরই গুণে বা দোষে ঘটিয়া থাকে।" লেখকের মতে, কর্ম্মের ফল আমরা ভোগ করি বটে, কিন্তু কর্ম্মে নিজকে নিযুক্ত করা না করা আমাদের নিজের উপর অণুমাত্র নির্ভর করে না। কর্ম্মে নিয়োগ কর্ত্তা আমরা নহি, নিয়োগ কর্ত্তা হৃষীকেশ। নিজমত সমর্থনার্থ লেখক সেই পুরাতন উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' মোট কথা, লেখকের কর্ম্ম ফল অর্থে অদৃষ্টবাদ (Doctrine of necessity)। লেখকের মতে মনুষ্যের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে পৃথিবী শাসিত হইতেছে। সেই নৈসর্গিক নিয়মানুসারে চিরকাল কায হইয়া আসিয়াছে এবং চিরকাল হইবে। আজ যে আমি এই কর্ম্ম-ফল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এও সেই নৈসর্গিক কারণের একটী কার্য্য মাত্র এবং আপনি যে ধর্ম্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উহাও তাহাই। এতদ্দেশীয় ইতর ইংরাজেরা যে নীচ জাতীয় পুরুষদিগের প্রাণ নাশ ও রমণীদিগের ধর্ম্মনাশ দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেও কর্ম্মফল; আর আইরিশ ডিনামিটওয়ালারা যে ইংলণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, সেও কর্ম্ম-ফল! ফলতঃ লেখকের মতে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমুদায়ই কথার কথা; কারণ, যাহা হইবে তাহা হইবেই হইবে। এই মতানুসারে মনুষ্যের নৈতিক দায়িত্ব (Moral responsibility) মাত্রই নাই। আমি যদি চুরি করি বা নরহত্যা করি, তাহাতে আমার কিছুমাত্রই দোষ নাই। কারণ, সমুদায়ই নিয়তি, আর তুমি যদি পর-হিত-ব্রতে জীবন অতিবাহিত কর তাহাতেও তোমার কোন গুণ নাই,

কারণ উহাও নিয়তি। বস্তুতঃ অদৃষ্টবাদ ও নৈতিক দায়িত্ব পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান দার্শনিক জনষ্টুয়ার্ট মিল (John stuart Mill) দুটী মতকেই বজায় রাখিতে গিয়া কিরূপ গোলযোগ করিয়াছেন, বোধ হয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত আছেন। অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীনতাবাদ (Necessity and Liberty) লইয়া আজও দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বিলক্ষণ মত ভেদ দৃষ্ট হয়। ঘোর অদৃষ্টবাদী হইতে গেলে নৈতিক দায়িত্ব বজায় রাখা যায় না বলিয়া অনেকেই ততদূর অগ্রসর হইতে সাহসী নহেন। এমত অবস্থায় নৈতিক দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে পত্রিকার সৃষ্টি, তাহাতে অদৃষ্টবাদ প্রচার কতদূর যুক্তি সঙ্গত বুঝিতে পারি না। হিতবাদী এবং অজ্ঞাতবাদীরাও যাহাতে সাহস করে না, ব্রহ্মবাদীরা তাহাতে যত্নবান্ কেন? ধর্ম্ম বিষয়ে অদৃষ্টবাদীদের অদৃষ্ট যে নিতান্তই দুরদৃষ্ট, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এখন কর্ম্ম বিষয়ে অদৃষ্ট বাদের ফল কি দেখা যাউক।

একজন ইংরাজ লেখক স্বজাতির চরিত্র সম্বন্ধে সাহঙ্কারে লিখিয়াছেন যে, অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে একজন ফরাশী বলিয়া উঠিবে "হায়! কি হইল"; কিন্তু একজন ইংরাজ বলিয়া উঠিবে "ছি! এমন কাযও করে"। এই সামান্য ঘটনা দ্বারাই ফরাশীর অপেক্ষা ইংরাজের মানসিক বল কত অধিক তাহা বুঝা যায়। আমাদের কর্ম্মফল লেখকের মতে দেখিতে গেলে ফরাশীই অধিক বিজ্ঞ, ইংরাজ নিতান্ত নির্ব্বোধ; কারণ, মানুষ, তুমি গোলামের গোলাম, ছি বলিতে তুমি কে?

প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্টবাদ মানিতে গেলে স্বীয় উন্নতির চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। যাহা হইবে তাহা হইবেই হইবে, তোমার শত চেষ্টায়ও তাহা বিপর্য্যয় হইবার নয়। পৃথিবীতে আদি হইতে যদি সমাজে অদৃষ্টবাদ প্রচারিত থাকিত, তবে কর্ম্মফল প্রবন্ধ লেখককে মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তে দানব-প্রবৃত্তি লিখিতে হইত। মনুষ্য কখনই সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত না। অদৃষ্টবাদীরা বলিতে পারেন যে, তোমার সাধ্য কি যে তুমি চেষ্টা না করিয়া থাকিবে, তোমাকে চেষ্টা করিতে হইবেই হইবে। এরূপ বলিলে অবশ্য তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। এরূপ অদৃষ্টবাদ প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না। এ আমাদের পুরাতন আয়ুর্ব্বিদের ন্যায়—যদি মরিল আয়ু ছিল না, আর যদি

বাচিল আয়ু ছিল। সাধ্য কি যে তুমি তর্ক দ্বারা এরূপ মত খণ্ডন করিবে; এরূপ মত সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ বা অপ্রমাণ উভয়ই অসম্ভব। অদৃষ্টবাদ তর্কের দ্বারা একেবারে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে পারিবে না। লেখক তাঁহার মতের পোষক কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু স্থির চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে কে অস্বীকার করিবে যে, মনুষ্য অনেক পরিমাণে ঘটনার অধীন, কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে মনুষ্যের কতকটা স্বাধীনতাও আছে। এমত অবস্থায় অদৃষ্টবাদ অথবা ঘোর স্বাধীনতাবাদ অপেক্ষা, অদৃষ্ট এবং স্বেচ্ছা উভয় দ্বারাই মনুষ্য চরিত্র সংগঠিত হয় এরূপ অভিমত সমাজের পক্ষে কল্যাণকর।

ঘোর অদৃষ্টবাদের অপকারিতা আমরা উপরে দেখাইলাম। এখন মনুষ্য-চরিত্রের উপর ইহার আংশিক প্রভুত্ব স্বীকার করিলে কি কি উপকার সম্ভাবনা তাহা দেখাইতেছি।

একদা কথা প্রসঙ্গে আদি পাপের (Doctrine of Original Sin) কথা উল্লেখ হওয়ায় একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মহাত্মা রাম মোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--Raja, do you believe in the doctrine of original sin? (রাজা, আপনি কি আদ্য পাপ মানেন?) রাম মোহন রায় উত্তর করিলেন Yes, madam, I know it is a doctrine that teaches us humility. (আজ্ঞে হাঁ, আমি জানি ইহাতে মনুষ্যকে বিনয়ী হইতে শিক্ষা দেয়)। যেমন প্রশ্ন তেমনি ঘোল আনা উত্তর। অদৃষ্টবাদেরও এইরূপ কোন কোন বিষয়ে উপকারিতা আছে। এবং সেই জন্যই আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ইহার অবতারণা। সংসারে এত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, মনুষ্যের সাধ্য নাই যে তাহার সকল গুলিকে অতিক্রম করিতে পারে। বিপদে পড়িয়া যখন মনুষ্য অনন্যোপায় হইয়া পড়ে, তখন তাহার কেবল মাত্র সান্ত্বনা "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" অদৃষ্টবাদ মনুষ্যের কষ্ট অনেক পরিমাণে লঘু করিয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ অদৃষ্টবাদ সহানুভূতি শিক্ষা দান বিষয়ে উৎকৃষ্ট গুরু। যখন দেখিবে একজন ঘোর পাপী নিয়তই দুষ্ক্রিয়ায় রত রহিয়াছে, কত কদাচার করিতেছে তখন তাহাকে ঘৃণা করিও না, মনে রাখিও ঘটনা-ভ্রমে পতিত হইলে তুমিও ঐ রূপ পাপাচারী হইতে। সে ব্যক্তির নিজের দোষ কি? অমুদরই ঘটনার দোষ।

হে হিন্দুধর্ম্ম-পুনরুদ্ধারকারিন্, কর্ম্মফলের অপব্যবহার করিও না। হে বৈজ্ঞানিক, অদৃষ্টবাদের সুব্যবহার শিক্ষা কর। যখন সংসারে স্থল কূল হারাইবে তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিওনা, অথচ নিজের আত্মাকে নিজে দংশন না করিয়া স্মরণ করিও "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। আবার যখন কাহার উপর ত্যক্ত বিরক্ত হইবে, কাহাকেও ঘৃণা, বিদ্বেষ বা হিংসা করিতে ইচ্ছা হইবে তখনও স্মরণ করিও "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তঃ স তথা করোতি"।

শ্রীরসিকলাল সেন।

কুরুচি ও সুরুচি।

অনেকে বলেন রুচি আবার কি, রুচির আদর্শ কোথায়? তোমরা যাহাকে কুরুচি বল, অর্থাৎ যাহাতে তোমাদের লজ্জার উদয় হয়, কিম্বা মনে অপবিত্র ছবি উপস্থিত হয়, তাহা অনেকের নিকট কুরুচি নহে অর্থাৎ তদ্দ্বারা তাহাদের মনে কোন প্রকার নিকৃষ্ট ভাবের উদয় হয় না। যে কথা উচ্চারণ করিলে তোমাকে আমাকে লজ্জাতে অধোবদন হইতে হয় এবং যাহা তুমি আমি কখনই গুরুজনের সমক্ষে উচ্চারণ করিতে পারি না, কৃষক, ধীবর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নিরন্তর অম্লান মুখে সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিতেছে। যদি তন্মধ্যে তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও বিরুদ্ধভাব

আমরা "আলোচনাতে" ক্ষীরোদ বাবুর কর্ম্মফলের প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়া এই প্রবন্ধ লেখক আমাদিগের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির জন্য যখন "আলোচনার" জন্ম, তখন তাহাতে এরূপ ধর্ম্ম বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল কেন? ক্ষীরোদ বাবুর কর্ম্মফলের প্রবন্ধ যে ধর্ম্ম বিরোধী, তাহা আমরা তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও পারিলাম না। পরন্তু নীতির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যে কোন সুযুক্তিপূর্ণ ও চিন্তাপ্রসূ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আমরা প্রতিশ্রুত। তলাইয়া দেখিলে প্রতিবাদকে ও প্রবন্ধলেখকে মতগত বড় অধিক পার্থক্য নাই। লেখক ধর্ম্মফলের একদিক্ দেখাইয়াছেন, প্রতিবাদকগণ অন্য দিক দেখাইতেছেন; আলোচনার উদ্দেশ্যও তাই। একটা বিষয়ের যতদিক্ আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনার জন্যই "আলোচনার" জন্ম। আমরা ইচ্ছা করি হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলে ইহাতে স্ব স্ব ধর্ম্ম মত লইয়া আলোচনা করেন।

থাকিত, তাহা হইলে কথনই পিতা পুত্রের সমক্ষে, পুত্র পিতা মাতার সমক্ষে, ভ্রাতা ভগিনীর সমক্ষে ব্যবহার করিত না। আবার তুমি আমি প্রতিনিয়ত যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেছি তাহার মধ্যে এমন অনেক কথা থাকে, ইংরাজ সমাজের এক জন লোক যাহা উচ্চারণ করিতে লজ্জিত হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "গর্ভ" এবং "স্তন পান" দুইটী শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুইটী শব্দ আমরা সচরাচর ব্যবহার করিতেছি, কেহ কুরুচি বলিয়া অনুভব করেন না। এমন কি ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে স্তন পান শব্দ নিরন্তর ব্যবহার করিতেছি। যথা—

"মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর দুগ্ধ দিলেন জননীর স্তনে"

অথবা "সঞ্চার না হতে আমি, সৃজন করিলে তুমি, মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল।"

অথবা,—অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে, "আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান, আমি তখনি তাহারি মূলে নিরখি তোমায় হে, অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায়!"

দেখুন, কেমন অসংকোচে অতি পবিত্র বিষয়ের মধ্যে স্তন ও স্তনপান শব্দ আমরা ব্যবহার করিতেছি! কিন্তু এক জন ইংরাজ কোন ইংরাজ মহিলার সমক্ষে কথনই এরূপ শব্দ ব্যবহার করিবে না। যদি এই সকল বিষয়ের নিতান্তই উল্লেখ করিতে হয়, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ভাষা জালে প্রচ্ছন্ন করিয়া এই ভাব প্রকাশ করিবেন। সকল জাতির লৌকিক আচার ব্যবহার সমান নয়; সুতরাং মনের ভাব সমান নয়, অতএব রুচির আদর্শও সমান নয়। তবে রুচির আদর্শ কোথায়? লৌকিক আচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও কত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে পুরুষগণ বাড়ীতে শরীরের উপরার্দ্ধ অনাবৃত রাখিতে কিছুই লজ্জাবোধ করেন না। আমরা ঐ প্রকার অবস্থাতে পিতা মাতা, ভগিনী খুড়ী, জেঠী, সকলের নিকট অসংকোচে যাইতেছি, কিন্তু এক জন ইংরাজ ঐ অবস্থাতে আমাদিগকে দেখিলে চমকিয়া উঠিবে এবং মনে করিবে আমরা যে এখনও অসভ্যতাতে বাস করিতেছি তাহার ঐ একটী প্রধান চিহ্ন। আমাদের কুলাঙ্গনাগণ সর্ব্বদাই অনাবৃত পদে রহিয়াছেন, এবং তদবস্থাতেই শ্বশুর ভাশুর প্রভৃতি গুরুজনের সমক্ষে গতায়াত করিতেছেন, এক জন ইংরাজ মহিলা তাহা দেখিয়া চমকিয়া উঠিবেন এবং হয়ত মনে মনে ভাবিবেন "ইহারা অসভ্য, সুতরাং

এরূপ হইবেইত ?” কিন্তু একজন যুবতির বক্ষস্থলের অর্দ্ধেক অনাবৃত থাকিলে সেই সকল ইংরাজ মহিলা হয়ত তত লজ্জার বিষয় মনে করিবেন না।

আবার মান্দ্রাজ প্রদেশে যদি গমন করা যায় সেখানে ভদ্রলোকেরা প্রতি দিন যে কার্য্য করেন, তাহা দেখিয়া এক জন বাঙ্গালি হয়ত তাঁহাদিগকে মনে মনে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিবেন। তাঁহাদের দেশে স্নান করিবার সময় পরিধেয় বস্ত্র সহিত স্নান করিবার রীতি নাই। সকলেরই পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নে এক খণ্ড কৌপীন থাকে, স্নানের সময় তাঁহারা বস্ত্র খুলিয়া সেই কৌপীন টুকু পরিয়া স্নান করেন। এইরূপ ভাবে তাঁহাদিগকে মাতা পত্নী, ভগিনী, খুড়ী জেঠী সকলের সমক্ষে নগ্ন হইতে দেখা যায়। এই নগ্নাবস্থাতে তাঁহারা অনেকক্ষণ যাপন করিয়া থাকেন। মান্দ্রাজি বন্ধুদিগের পরিবার মধ্যে গিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগকে এই অবস্থাতে দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চই চমকিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব থাকিলে তাঁহারা মাতা ভগিনী প্রভৃতির সমক্ষে তাহা করিতে পারিবেন কেন ? আবার উক্ত প্রেসিডেন্সির পশ্চিম উপকূলে গেলে আরও আশ্চর্য্য রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। মালাবার উপকূলের সন্নিকটস্থ প্রদেশ সকলে নারীগণ কোমরের উপরিস্থ দেহার্দ্ধ অনাবৃত রাখেন। শূদ্র যুবতিগণ যদি কখনও প্রকাশ্য পথে গতায়াত করিবার সময় এক খণ্ড চীবরের দ্বারা বক্ষস্থল আবৃত করেন, পথিমধ্যে কোন ব্রাহ্মণকে দেখিলে সে আবরণ সরাইতে হয়। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয় না। ইহা শুনিলে অনেকের মনে সে জাতির প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোন বিরুদ্ধভাব নাই। কারণ ব্রাহ্মণের ন্যায় পিতা বা জ্যেষ্ঠ সহোদর, বা অন্য কোন গুরুজনের নিকটেও তাঁহারা ঐ ভাবে গিয়া থাকেন। এইরূপে রুচি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাব। তবে রুচির আদর্শ কোথায় ?

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে তদনুরূপ আর একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। রুচির আদর্শ নির্ণয় করা যেমন কঠিন, সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্থির করাও তদ্রূপ দুষ্কর। দুইটী জাতির সৌন্দর্য্যের ভাব সমান নয়। ইংরাজগণ যাহাকে সৌন্দর্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন, এ দেশীয়দিগের নিকট তাহা সৌন্দর্য্য বলিয়া গণ্য নহে। যদি কোন রমণীর রূপ শোভা বর্ণন উপলক্ষে বলা যায়—

যবলাঙ্গী স্বর্ণকেশী সুনীল-নয়না।

তাহা হইলে এক জন ইংরাজ হয়ত মুগ্ধ হইবেন, কিন্তু এদেশীয়গণ ইহার মধ্যে কিছুই সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন না। এইরূপে চীনবাসিগণ যাহাকে সৌন্দর্য্য বলে তাহা আমাদিগের চক্ষে উপহাসের বস্তু। তবে কি সৌন্দর্য্য বলিয়া একটা কিছু নাই? এই বিচিত্রতার মধ্যে সার্ব্বভৌমিক ভাব কি কিছু নাই? এমন কি কোন দিক নাই যে দিকে চীন, মার্কিন, ইংরাজ বাঙ্গালি সকলেই মুগ্ধ হইতে পারে? চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় সৌন্দর্য্যের দুইটি ভাব আছে—একটী শারীরিক অপরটী আধ্যাত্মিক। আমরা এখানে সৌন্দর্য্য শব্দে নারী-দেহের রূপলাবণ্যকেই মনে করিতেছি। সৌন্দর্য্যের শারীরিক ভাবই জগতে পাপস্রোতকে প্রবাহিত করিতেছে। নারী দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষ গঠনের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখের এক প্রকার সংস্রব আছে, যাহারা ইন্দ্রিয়-সুখপ্রিয় তাহাদের কলুষিতচিত্তে সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ও গঠন মাধুরীর সহিত ইন্দ্রিয়-সুখের এমন যোগ থাকে যে, যখনই তাহারা সেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা গঠন মাধুরী দর্শন করে তখন সেই সুখের ভাব মনে হয়; এবং চিত্ত বলবৎরূপে সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহাদের সৌন্দর্য্য বোধকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, কোমলাঙ্গের নাতি-শীতোষ্ণ সংস্পর্শজনিত ইন্দ্রিয়-সুখকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সৌন্দর্য্যের শারীরিক ভাব, ইহার ফল ইন্দ্রিয়-বিকার। ইহা চিত্তের উন্মাদকারী, ও বুদ্ধিভ্রংশকর। সৌন্দর্য্যের অপর ভাবের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহাতে হৃদয়কে উন্নত করা দূরে থাক, বরং নিম্ন দিকেই লইয়া যায়; সুখ ভোগের বাসনাকে প্রবল করে, চিত্তকে প্রবৃত্তিদিগের বশবর্ত্তী করে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের আধ্যাত্মিক ভাব অন্য প্রকার, যে মুখে স্বাস্থ্য, প্রসন্নতা, প্রেম, ও পবিত্রতার আভা পড়ে তাহাকে আমরা সুন্দর দেখি, তাহা আমাদের মন প্রাণকে হরণ করে। এখানে মুখশ্রী আন্তরিক সাধুতার পরিচায়ক মাত্র। সৌন্দর্য্যের এই আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়কে উন্নত করে, মনকে স্বার্থ ও সুখাসক্তি হইতে উদ্ধার করিয়া এক পবিত্র রাজ্যে লইয়া যায়। এইরূপ মুখের প্রতি তাকাইতে তাকাইতে আমরা এক অপূর্ব্ব পবিত্র ভাব অনুভব করিতে থাকি, যাহা আমাদের সমুদায় দুষ্প্রবৃত্তিকে লজ্জা দিয়া দমন করিয়া রাখে। আমরা অনুভব করিতে থাকি, যেন আমরা এক আলোকের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি, যেন পবিত্রতার সুবাতাস সেবন করি-

তেছি। সৌন্দর্য্যের এই ভাব চিত্তের উন্মাদকারী নহে, কিন্তু শান্তি ও আরামপ্রদ।

সৌন্দর্য্যের ন্যায় রুচির মধ্যেও দুই প্রকার ভাব আছে। যে বর্ণনাতে মানবের দৃষ্টিকে শারীরিক ভাবের দিকে অধিক আকৃষ্ট করে তাহা কুরুচি, আর যাহা আধ্যাত্মিক ভাবকে উজ্জ্বল করে তাহা সুরুচি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রেমের উল্লেখ করা যাউক। এই প্রেম যে কি বস্তু, ইহার প্রকৃতি যে কি, তাহা বর্ণন করিতে গিয়া মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন:—

> অদ্বৈতং সুখ দুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য
> দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ॥
> কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎস্নেহসারে স্থিতং
> ভদ্রংপ্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হিতৎপ্রাপ্যতে॥

অর্থ—"সুখ এবং দুখ উভয়ের মধ্যে যাহার এক ভাব, সকল অবস্থাতে যাহা অনুকূল, যাহাকে পাইয়া হৃদয় আরাম ও বিশ্রাম লাভ করে; বার্দ্ধক্য যাহার গাঢ়তাকে নষ্ট করিতে পারে না, কালক্রমে পরিপক্ক হইলে লজ্জারূপ আবরণ ভেদ হইয়া যাহা ঘনীভূত স্নেহের আকার ধারণ করে, তাহার নাম প্রেম;—এই উৎকৃষ্ট বস্তু দুই একটী সুমানুষের হৃদয়ে পাওয়া যায়।"

বলিতে কি আমি এমন প্রেমের লক্ষণ অতি অল্পই দেখিয়াছি। পাঠক একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক লক্ষণটী আর একবার পাঠ করিয়া দেখুন, শারীরিক ভাব ইহার কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না। "যাহা পাইয়া হৃদয় বিশ্রাম লাভ করে এবং বার্দ্ধক্য যাহার গাঢ়তা হরণ করিতে পারে না," এই দুইটী বাক্যের মূল্য লক্ষ টাকা। ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, এই মহাকবি প্রেমের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। হৃদয় কোথায় বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে? যেখানে বিদ্বেষ নাই, বিরাগ নাই, সন্দেহ নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই, সেই স্থানেই হৃদয়ের বিশ্রান্তি। যাহার প্রতি প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, যাহার সঙ্গে থাকিলে মনে সংকোচ থাকে, যাহার সহবাসে আত্মার অবজ্ঞা ও বিরাগ প্রবল হয়, সেখানে আত্মা আরাম ও বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না। অতএব প্রেমে হৃদয়ের বিশ্রাম বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, প্রেমের মূলে পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। এই দুইটী আধ্যাত্মিক ভাব যেখানে সম্মিলিত নহে, সেখানে প্রেম

নাই। প্রেমের মূলে যে শ্রদ্ধা, বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এমারসন তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"The rude village boy teases the girls about the school-house-door, but to-day he comes running into the entry and meets one fair child disposing her satchel; he holds her books to help her, and instantly it seems to him as if she removed herself from him infinitely; and was a sacred precinct."

অর্থ—"একটা অসভ্য পাড়াগেঁয়ে ছেলে প্রত্যহ স্কুল গৃহের দ্বারে আসিয়া বালিকাদিগকে বিরক্ত করিত, আজ দেখি সে দৌড়িয়া সেই দ্বারে আসিয়া দেখিল একটী বালিকা তাহার দপ্তর গোছাইতেছে, সে তাহার পুস্তকগুলি ধরিয়া তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার বোধ হইল যেন সেই বালিকাটী তাহার নিকট হইতে কত যোজন দূরে গিয়াছে। তাহার দেহ যেন পবিত্র ভূমি।" এইরূপে প্রেমের জন্ম হয়। যেখানে প্রেম সেইখানেই শ্রদ্ধা, সেইখানেই পবিত্রতা। সুবিখ্যাত জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পত্নীর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত ছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সেই প্রেমের মূল কোথায় তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এক বার নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করুন।

"While she was the light, life and grace of every society in which she took part, the foundation of her character was a deep seriousness, resulting from the combination of the strongst and most sensitive feelings with the highest principles."

অর্থ—"তিনি যে কোন সমাজে মিশিতেন, তাহার আলোক, জীবন ও শোভা স্বরূপ হইতেন। তাঁহার চরিত্রের মূলে একপ্রকার গাম্ভীর্য্য ছিল। হৃদয়ের প্রবল ভাব রাশির সহিত সুনীতির নিয়ম সকলের যোগ হওয়াতে ঐ গাম্ভীর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছিল।"

প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইতেই প্রগাঢ় প্রেমের জন্ম। পাছে কোন্ হতবুদ্ধি লোক প্রেমকে রূপ লাবণ্যের সহিত সংসৃষ্ট করে, এই ভয়েই বোধ হয় ভবভূতি বলিলেন "বার্দ্ধক্যেও যে প্রেমের গাঢ়তা হরণ করে না!" যে প্রেম ইন্দ্রিয় সুখের উপর প্রতিষ্ঠিত, রূপ-লাবণ্য তাহার প্রধান অবলম্বন; সুতরাং যৌবন বিগত হইলে সে প্রেমের গাঢ়তা আর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রকৃত প্রেম সেরূপ নহে; ইহার সহিত রূপ লাবণ্যের অতি অল্পই সম্বন্ধ। ভবভূতি আর একটী

কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সুমানুষেরই এই প্রেম ঘটে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্ত বিকৃতচেতা ব্যক্তিরা ইহা জানে না। এক্ষণে প্রেম কি তাহা স্থির হইল। ইহা শারীরিক ভাব-সম্ভূত না হউক, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিও ইহাতে আছে। ভবভূতি নিজেই বলিয়াছেন—

ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়-মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥

অর্থ—"ইন্দীবর-নয়নার কথা গুলি কি মিষ্ট! শুনিলে ম্লান প্রায় জীবন-পুষ্প ফুটিয়া উঠে, মন-তৃপ্তি লাভ করে, সকল ইন্দ্রিয় মোহিত হয়, কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করে এবং মনকে প্রেমে প্লাবিত করে।"

ইহা অপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয় সুখের বর্ণনা কোন্ কবি করিতে পারেন? কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-সুখের উপরে প্রেমের আভা পড়িয়া ইহাকে পবিত্র করিয়াছে। অতএব ইহা সুরুচি-সঙ্গত। কবি যদি তাঁহার বর্ণনাতে আধ্যাত্মিক ভাবের দিকে না গিয়া কেবল জড় দেহের রক্তমাংসময় সুখের দিকে যাইতেন, তাহা হইলে সে বর্ণনা কুরুচিপূর্ণ বলিয়া গণ্য হইত। কালিদাস দুষ্মন্তের মুখে নিম্ন লিখিত কথা গুলি দিয়াছেন ;—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নব মনাস্বাদিতরসং।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি ভুবি॥

অর্থ—"সেই নিষ্কলঙ্ক রূপরাশি অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়, নখের দ্বারা অচ্ছিন্ন কিসলয়ের ন্যায়, অনাবিদ্ধ মণির ন্যায়, অনাস্বাদিত মধুর ন্যায়, এবং অখণ্ড পুণ্যের ফল স্বরূপ; জানি না কোন্ ব্যক্তির কপালে তাহার ভোগ ঘটিবে।"

এখানে যতগুলি পদার্থের সহিত শকুন্তলার রূপের তুলনা করা হইয়াছে, সকল গুলিই ভোগ্য বস্তু ; সুতরাং রূপকে এখানে শারীরিক ভোগ্য বস্তু বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। কবি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহার নায়কের মুখে এমন কথা দিলেন। যাহাতে সেই নায়ককে ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। "না জানি কাহার ভাগ্যে এই রূপ-রাশির ভোগ

ঘটিবে!" এখানে নীচ ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি যেন সর্ব্বোপরি জাগিয়া উঠিতেছে। একটা মৌমাছি বার বার শকুন্তলার মুখে বসিতেছে এবং তিনি হস্ত দ্বারা নিবারণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া রাজা বলিতেছেন ;—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী ॥

অর্থ—"ভাই ভ্রমর, তুই এই সুন্দরীর কম্পনশীল ও চঞ্চল কটাক্ষকে বার বার স্পর্শ করিতেছিস্, কর্ণের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কি গোপনীয় কথা বলিতেছিস্. বার বার হস্ত নাড়িয়া বারণ করিলেও ইহার অধরে চুম্বন করিতেছিস্, অতএব ভৃঙ্গ, তুই বাহাদুর! আমি কেবল তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে করিতেই গেলাম।" ভ্রমরের উপদ্রবে শকুন্তলার যে ব্যস্ততা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক প্রকার সৌন্দর্য্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবি আরও দশ প্রকারে সেই সৌন্দর্য্যের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন; তাহা না হইয়া কবির নায়কের মনে এই ভাবেরই উদয় হইল, ভ্রমরটা উহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, আমি হতভাগা তাহা পারিলাম না! ইহাতে মনকে আধ্যাত্মিক ভাব হইতে একেবারে টানিয়া শারীরিক ভাবের মধ্যে ফেলিয়া দিল। এরূপ বর্ণনা কুরুচি-সঙ্গত।

কিন্তু রত্নাবলীকার এই কুরুচির দৃষ্টান্তের চূড়ান্ত করিয়াছেন। কবিতাটী তুলিতে লজ্জাবোধ হইতেছে; কিন্তু আশা করি পাঠকগণ সত্য নির্ণয়ের জন্যই উদ্ধৃত হইতেছে ভাবিয়া, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। রত্নাবলী বিরহ-যাতনা ভোগ করিতেছেন; তাঁহার সখীগণ তাঁহার হৃদয়-তাপ দূর করিবার জন্য পদ্মপত্রের শয্যা করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়াছিলেন। রাজাও রত্নাবলীর বিরহে কাতর, কিন্তু সে বিরহ কিরূপ বিরহ তাহা পাঠকগণ নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করিয়া বিচার করুন। রাজা পদ্মপত্রের শয্যাটী দেখিয়া বলিতেছেন:—

"স্থিতমুরসি বিশালং পদ্মিনীপত্রমেতৎ,
কথয়তি ন তথান্তর্ম্মন্মথোত্থামবস্থাং।
অতিশয় পরিতাপ ম্লাপিতাভ্যাং যথান্তাঃ,
স্তনযুগপরিণাহং মণ্ডলাভ্যাং ব্রবীতি॥

অর্থ—"এই বিশাল পদ্মপত্র প্রিয়ার বক্ষস্থলে স্থাপিত হইয়াছিল ; হৃদয়ের অত্যন্ত তাপ বশতঃ এই পত্রে দুইটী গোলাকার দাগ পড়িয়াছে, উক্ত দাগ দ্বয়ের দ্বারা প্রিয়ার বিরহ-যাতনার যত পরিচয় পাওয়া যাউক আর না যাউক, স্তনদ্বয় যে সুবিস্তৃত তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।" ছি! ছি! ছি! পদ্মপত্র ম্লান হইয়া গিয়াছে, এইমাত্র বলিয়া কবি যদি থামিতেন, লোকে একটু আধ্যাত্মিক ভাবের দিকে যাইতে পারিত। লোকের মনে সহজেই হইত যে, অত্যন্ত তাপ না হইলে পদ্মপত্র ম্লান হইবে কেন? বিরহের আতিশয্য ভিন্ন এত পরিতাপ হইবে কেন? প্রেম ভিন্ন এত বিরহের যাতনা হইবে কেন, আমরা এইরূপে মাজিয়া ঘসিয়া একটু আধ্যাত্মিক ভাব পাইতাম ; কিন্তু কবি ভাবিলেন, কি জানি যদি কেহ আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করে! অতএব তাহার পথ বন্ধ করিয়া, নায়িকার স্তন যুগলের বিস্তৃতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া দিলেন! বাঃ! কেমন রুচি। এই কবির এমনি বিদ্যা যে, তাঁহার নায়িকা যখন ঘরে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন এবং নায়করাজ আসিয়া তাঁহাকে সেই অগ্নি-শিখার মুখ হইতে ত্রস্তে ব্যস্তে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তখন সেই ভয়ানক মুহূর্তে নায়িকার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই সুখে নায়কের নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, এবং সেই সংকটের সময় তিনি প্রেমালাপ করিয়া বলিতেছেন ;—

"ব্যক্তংলগ্নোপি ভবতীং ন ধক্ষ্যতি হুতাশনঃ।
যতঃ সন্তাপমেবায়ং স্পর্শস্তে হরতি প্রিয়ে॥"

অর্থ—"প্রিয়ে, তোমার দেহে যদিও অগ্নি লাগিয়াছে, তথাপি তোমাকে পুড়াইতে পারিবে না ; কারণ, তোমায় স্পর্শমাত্র আমার বিরহাগ্নি নিবিয়া গেল।"

সাবাস! ইহাকেই ত বলে রুচি। প্রেমালাপের এমন সময় কি আর হয়?

তবে কুরুচি ও সুরুচিতে প্রভেদ কি, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। যে বর্ণনা চিত্তকে আধ্যাত্মিক ভাব হইতে বিচ্যুত করিয়া ইন্দ্রিয় সুখের দিকে নত করে, তাহা কুরুচি সম্পন্ন এবং যদ্দারা চিত্তকে আধ্যাত্মিক ভাবের দিকে উন্নত করে, তাহা সুরুচি সম্পন্ন।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

অসীম ও সসীম।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

গত প্রস্তাবে যে বিষয়গুলির বিচার ও মীমাংসাদি করা গিয়াছিল, পাঠক-বর্গের স্মরণার্থ নিম্নে অতি সংক্ষেপে, আবশ্যক বিবেচনায়, সে গুলির পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) মীমাংসা করা গিয়াছিল যে, ক্ষেত্র সসীমকে ও বিন্দু অসীমকে নির্দ্দেশ করে। বিন্দুই ক্ষেত্রের মূল তত্ত্ব; সুতরাং প্রমাণ করা হইয়াছিল যে, এক পক্ষে যুক্তি বিরুদ্ধ হইলেও অসীম হইতে সসীমের সৃষ্টি অন্য পক্ষে যুক্তি সঙ্গত বটে। (এবম্বিধ বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন যুক্তিদ্বয়ের মীমাংসা শাস্ত্র ও সুবিচারমতে কি রূপে সম্ভব, তাহা পরে আলোচিত হইবে)।

(২) বিন্দু অধ্যাস প্রাপ্ত হইলে রেখা আদি সসীম পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্যথা বিন্দু হইতে রেখার সৃষ্টি সম্ভবপর নহে; অতএব অসীম অধ্যাসে যে এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

(৩) উক্ত অধ্যাসের মূল অনুসন্ধানে কিয়দ্দূর গিয়া দেখা গিয়াছিল যে, আমাদের চিত্তেন্দ্রিয়াদিই স্বভাবতঃ অধ্যাস আনয়ন করে, অর্থাৎ সেই ছেদভাব বর্জ্জিত পদার্থে ছেদভাব জন্মাইয়া অসীমকে সসীম করে।

(৪) চিত্তের ইদংবৃত্তি-গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ যে অহংবৃত্তি-গ্রাহ্য অনুভব সমষ্টি হইতে উদ্ভূত, অর্থাৎ অস্তিত্ব যে অস্মিতার কোন অজ্ঞেয় অস্তি নাস্তি ভাববিহীন পদার্থের উপর প্রতিফলন ক্রিয়া মাত্র, তাহা দেখান গিয়াছে। (বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই বিষয়টির পুনরুল্লেখ অনিবার্য্য বিধায় বিশেষভাবে এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে)।

(৫) আমাদের চিত্তেন্দ্রিয় সমস্ত সসীম বিধায় যে সেই অজ্ঞেয় অসীম পদার্থকে সসীম ভাবে জ্ঞেয় করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কথা নাই। সসীম তত্ত্বের মূল রহস্য ভেদ করিতে হইলে আমাদের চিত্তেন্দ্রিয়াদির স্বধর্ম্ম যে সসীমত্ব, তাহার মূল অন্বেষণ করা উচিত।

এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, সসীম তত্ত্বের মূল রহস্য-ভেদ যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহা আধ্যাত্মিক জগৎসম্বন্ধীয় অতি সূক্ষ্মরূপ বিচারের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আধুনিক ইউরোপীয়

বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থদর্শন বা রসায়নশাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষান্তে যেরূপ দ্রব্য গুণ স্থির করিয়া থাকেন, চিকিৎসকেরা যেরূপ শব-দেহ ছেদন পূর্ব্বক নানাবিধ আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে শারীরতত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে অবগত হয়েন, আধ্যাত্মিক জগতে তদপেক্ষা সহস্র গুণ সাবধানতার সহিত আমাদের চলা উচিত; নতুবা সকলই পণ্ডশ্রম। তাই বলি, এই সমস্ত ধ্যানস্তিমিতলোচন যোগীর কার্য্য; যাঁহারা গম্ভীর প্রশান্তভাবে যোগবলে ইন্দ্রিয়ের পর চিত্ত, চিত্তের পর অহঙ্কার, অহঙ্কারের পর মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে মুষ্টিবদ্ধ বস্তুর ন্যায় আয়ত্ত করিয়া কঠোর অধ্যবসায় সহকারে বারবার পরীক্ষা ও বিচার করিতে পারেন, এ সকল তাঁহাদেরই কার্য্য। বাস্তবিক আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে কোন নূতন কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই; সুতরাং এবম্বিধ অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইলেই অজ্ঞান, বিপর্য্যয় ভিন্ন অন্য ফল উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মধুময় সংক্ষিপ্তসার উক্তিগুলি বিশদভাবে বুঝিবার ও বুঝাইবার প্রয়াস পাইবে মাত্র, অথবা যেখানে তাঁহাদের উক্তিগুলির অর্থ আপাত-বিরুদ্ধভাব যুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেই গুলির সদর্থ ও সামঞ্জস্য বিধানে যত্নবান্ থাকিবে। অসাধ্য বিবেচনা হইলে আমাদিগের ক্ষীণ-বুদ্ধির অগম্য বলিয়াই সে গুলিকে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে ইহার অধিক আমাদের ন্যায় ব্যক্তি হইতে যে সম্ভবপর নহে, তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন।

অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে বিচারান্তে সর্ব্ব প্রথমেই ইন্দ্রিয় গুলির উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ ও ইন্দ্রিয়ের মূল কারণ, এই তিনটি বিষয় স্থির করিয়া পরে মূল বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যাইবে।

পঞ্চভৌতিক জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্পাদন ও তৎপরে উক্ত জগতে তদনুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদন—ইন্দ্রিয়ের এই দ্বিবিধ কার্য্য এবং তদনুযায়ী ইন্দ্রিয়গুলিকে যে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, ইহা সকলেই জানেন। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আহঙ্কারিক বিকৃতি সম্পাদন হইলে অন্তঃকরণ হইতে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (reflex action) উৎপন্ন হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাহা বাহ্যজগতে সম্পাদিত হয়, এই কথা সকলেই অবগত আছেন। সে সব লিখিয়া কাগজ বৃথা পরিপূর্ণ করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। আমাদের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে,

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখিয়া আসিয়াছি যে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ+ অস্মিতা=ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম; অতএব এরূপ সূক্ষ্ম হিসাবে ধরিতে গেলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, পঞ্চভৌতিক জগত সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্পাদন স্বরূপতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নহে। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, পঞ্চভৌতিক জগৎ সৃষ্টিই ইন্দ্রিয়ের মূল ক্রিয়া। এই জন্য সাংখ্যকার অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চভূতের একীকরণ দেখাইয়াছেন। মোট কথা এই, সাংখ্য মতে অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় হইতে পঞ্চভূতময় জগৎ। বেদান্ত শাস্ত্র যদিও পঞ্চভূত হইতে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বলিয়াছেন, তথাপি শাস্ত্র ও সুবিচারানুযায়ী এবম্বিধ বিরুদ্ধ যুক্তি-দ্বয়ের সামঞ্জস্য সম্ভবপর; কেবল সম্ভবপর নহে, তাহাই সদর্থ-সঙ্গত ও সত্য।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ভূত অর্থে যে ভাব প্রকাশ করে, হিন্দুরা সে ভাবে ভূত অর্থ কস্মিনকালেও গ্রহণ করেন নাই। আধুনিক বিজ্ঞানানুসারে ৬৪ বা ততোধিক মূল পদার্থ স্বীকৃত হউক বা নাই হউক, হিন্দুদের পঞ্চভূতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। আধুনিক ভূত সমষ্টি বাহ্য-জগতের জড়ভাবময় অস্তিত্বাবলম্বনে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুদের ভূত সমষ্টি বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছাড়িয়া জ্ঞানমাত্রাবলম্বনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তন্ত্র ও যোগ-শাস্ত্রাদি হইতেও এবিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আজ কাল অনেকেই সুপরিচিত; সুতরাং এ কথা ধরিয়া বেশী কিছু না বলিলেও চলিতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তাই যদি হয় অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ও অস্মিতার যোগফল যদি পঞ্চভূত হয়, তাহা হইলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ অনুভবগুলিই ইন্দ্রিয় পদবাচ্য হইতে পারে কি না। শব্দ স্পর্শাদি অনুভব সমষ্টি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা প্রকাশ বলিয়াই গণ্য করা উচিত, অথচ যদি উক্ত অনুভব সমষ্টি ইন্দ্রিয় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র করা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় যে কি পদার্থ, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। সেই জন্য সাংখ্যকার বলিয়াগিয়াছেন যে, প্রকৃত ইন্দ্রিয় শক্তি ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ, অর্থাৎ বাস্তবিক ইন্দ্রিয় যাহা তাহা ইন্দ্রিয়াতীত। ইন্দ্রিয়ের অতীত স্থানে যাইলে পর, তবে আমরা ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ কি বুঝিতে পারিব; নতুবা ইন্দ্রিয়ের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয় পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না এবং করাও

অসম্ভব। আমরা কোন পদার্থ অনুভব কালীন অন্যান্য পদার্থের সহিত তাহার তুলনায় তৎ-বিশেষত্ব বোধে তৎ স্বরূপ বুঝিয়া থাকি মাত্র। যেরূপ আলোক বুঝিতে হইলে অন্ধকারের অপেক্ষা করে, অহং বুঝিতে ইদং বৃত্তির অপেক্ষা করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় কি তাহা বুঝিতে হইলে ইন্দ্রিয় যাহা নয় তাহা অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি অনুভবের অপেক্ষা করে। অতএব এ ভাবে শব্দস্পর্শাদি হইতে আমরা যে ইন্দ্রিয় অনুভব করিয়া থাকি,তাহাতে উক্ত অনুভব গুলির ভাব জড়িত থাকিয়া যায়। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় পদার্থকে উক্ত অনুভব সমষ্টি হইতে নির্লিপ্ত ভাবে ধরিলে তাহা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া দাঁড়ায়। স্থূল মর্ম্ম এই যে, শক্তি কার্য্যের অপেক্ষা করে, কার্য্য ছাড়িয়া দিলে শক্তির ভাবও তাহার সহিত লোপ পায়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য বিধায় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ব্যতীত যে প্রকৃত ইন্দ্রিয় লোপ পাইবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা সিদ্ধ। ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণের শক্তি বা বিকার বিশেষ বিধায় কার্য্যাভাবে সেই শক্তির ভাব অন্তঃকরণেই লীন হইয়া থাকে। কার্য্যকালীন তৎশক্তি বা ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র। অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত শব্দ স্পর্শাদি. অনুভব-সমষ্টিভূত ভাবের সহিত অকাট্য সম্বন্ধ স্থাপিত আছে। সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে ইন্দ্রিয় রক্ষা পায় না ও পাইতে পারে না। এখন দেখা যাউক যে, শব্দস্পর্শাদি অনুভব সমষ্টি আন্তঃকরণিক ইন্দ্রিয়শক্তির উপর নির্ভর করে কি ইন্দ্রিয়শক্তি উক্ত অনুভব-সমষ্টির উপর নির্ভর করে। ফলে শেষে এই দাঁড়াইতেছে যে, শক্তি কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে কি কার্য্য শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে? ইহাতে প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, ইহার মধ্যে যাহা বল তাহাই স্বীকার্য্য; কারণ, কার্য্য যেমন শক্তি ভিন্ন প্রকাশিত হয় না, শক্তিও সেইরূপ কার্য্য ব্যতীত প্রকাশ পায় না। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, পঞ্চ ভূতকে ইন্দ্রিয়জই বল বা ইন্দ্রিয়কে পঞ্চভৌতিকই বল, ভাবান্তরে এই দুইটিই সত্য বলিয়া গণ্য। প্রভেদ এই যে, এক শাস্ত্রে বলিতেছেন তৈলাধার পাত্র, অন্য শাস্ত্রে তা না বলিয়া বলিতেছেন পাত্রাধার তৈল; সুতরাং ব্যাখ্যাকার দিগের মাথা ঘুরিবারই কথা।

এতক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই মীমাংসা স্থির করিলাম যে, যখন পঞ্চভূতের বা নামান্তরে অন্নময়কোষের সহিত

তাহার অকাট্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয় অর্থাৎ যখন সেই আন্তঃকরণিক শক্তি অন্নময়কোষ পরিণামী হয়, তখনই কেবল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব সম্ভবপর, অন্যথা কার্য্যবিহীন শক্তির অস্তিত্বের ন্যায় তদস্তিত্ব খ-পুষ্পবৎ। পরিণাম অভাবে ইন্দ্রিয় শূন্য অন্তঃকরণ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। এবম্বিধ অন্তঃকরণের তুলনা একমাত্র গভীর নিদ্রার সহিত সম্ভবপর। "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা" বাহ্য ভাবের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভাবের অভাবের নামই নিদ্রা। তৎকালীন যে অবিকৃত অন্তঃকরণসত্তা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই ইন্দ্রিয়ের যে বীজত্ব প্রতিষ্ঠিত তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, স্বীয় কারণ ভিন্ন অন্য কোন স্থলে কোন পদার্থের বিলীন হওয়া সম্ভব পর নহে।

শাস্ত্রে এবম্বিধ অন্তঃকরণসত্তাই অস্মিতা শব্দে অভিহিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে ইন্দ্রিয় শক্তির মূল কারণ অস্মিতা, এবং এই অস্মিতাবস্থিত বিষয়বর্ত্তী প্রবৃত্তিই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ, এবং উক্ত প্রবৃত্তির বিকাশ বা ভূতপরিণামাবস্থাই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। স্মতরাং অস্মিতাই সকলের মূল; "নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ" অর্থাৎ অস্মিতাই বহুবিধ চিত্ত বা প্রবৃত্তি নির্ম্মাণের হেতু। অতএব অস্মিতাই যদি বহুবিধ প্রবৃত্তি নির্ম্মাণে কারণ-রূপী হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রবৃত্তি-পরিণামী বিচিত্র জগদাদির স্বষ্টিকর্ত্তা যে অস্মিতাই হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বোধকরি অধিকাংশ আস্তিক দলের সহিত এই খানে আমাদের ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত, তাঁহাদের মতে ঈশ্বরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগদস্তিত্বের কারণ। "He said let there be light and there was light" এই রকম ধরণের ভাব আধুনিক উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ভাণ অবলম্বনে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত হইয়া অনেক আস্তিকের চিত্তে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মতে ঈশ্বর জগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বষ্টিকর্ত্তা নহেন, হইতে পারেন না এবং হওয়াও অসম্ভব। চিত্তে ইহার বিপরীত সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ থাকিলে, অস্মিতাই যে জগদস্তিত্বের পক্ষে মূল কারণ, এ বিষয় সহসা বোধগম্য হইতে পারে না। বিবেচনায় ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগদস্তিত্বের কারণ কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার করিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিক এবম্বিধ বিরুদ্ধ মীমাংসাদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইলে সকলকেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুকাল যাপন করিতে হয়।

* যাঁহারা ঈশ্বরকে জগদস্তিত্বের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ মূল কারণ বলিয়া বিবেচনা ও বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে ইউরোপীয় আস্তিক পণ্ডিত

বার্কেলের নামই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। আমারা তাঁহার মত ও যুক্তির সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক বর্গকে দেখাইতে চাই, সে গুলি কতদূর যুক্তি ও সুবিচার সঙ্গত। তাঁহার প্রণীত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক গুলির মধ্যে তিনি অতি সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, আমরা জড় বোধে যে সকল পদার্থ ভাবনা করি, তাঁহাদিগের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের প্রত্যক্ষ করিবার কোন উপায় নাই। কারণ বৃত্তি (idea) ভিন্ন আমাদিগের অন্তঃকরণে আর কিছুই উপলব্ধি হয় না ও হইতে পারে না।

তিনি বলিয়াছেন—

It is indeed an opinion strangely prevailing amongst men that horses, mountains, rivers and in a word all sensible objects, have an existence natural or real, distinct from their being percieved by the understanding. But with how great an assurance and acquiescense so ever this principle may be entertained in the world; yet whoever shall find in his heart to call it in question, may, if we mistake not, perceive it to involve a manifest contradiction. For what are the forementioned objects but the things we perceive by sense and what do we perceive besides our own ideas or impressions, and is it not plainly repugnant that any one of them or any combination of them should exist unperceived......Hence as it is impossible for me to see or feel any thing without an actual sensation of that thing, so is it impossible for me to conceive in my thoughts any sensible thing or object distinct from the sensation or perception of it. অন্যত্র—

It is very obvious, upon the least inquiry into our thougts, to know whether it be possible for us to understand what is meant by the Absolute Existence of sensible object in themselves or without the mind. To me it is evident that those words mark out either a direct contradiction or else nothing at all &c.—

চিত্ত ব্যতীত অন্যত্র যে জড় জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব, উল্লিখিত বচন সমূহে মোট এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। জড় জগতের জড়ত্ব অপনয়ন করা বার্কেলের প্রথম উদ্দেশ্য এবং তাহাতে যে তিনি সফলকাম হইয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গুণীতে যে গুণ কল্পনা করিয়া থাকি তাহা সেই গুণীর নহে, আমাদেরই ইন্দ্রিয় শক্তি হইতে উদ্ভূত ও চিত্তে কল্পিত মাত্র, উদ্ধৃত বচনাবলীর সার মর্ম্মই এই। জড়ের জড়ত্ব ঘুচাইয়া বার্কেলে কি ভাবে ঈশ্বর সপ্রমাণ করিতে চাহেন, আমরা এক্ষণে তাহাই দেখাইব—

All our ideas, sensations or the things which we perceive, by

whatever name they may be distinguished, are visible inactive. So that one idea or object of thought can not produce or make any alteration in the other......We perceive a continual succession of ideas some are a new excited, others are changed or totally disappear. There is therefore some cause of those ideas whereon they depend and which produces or changes them. That this cause can not be any quality or idea or combination of ideas is clear. It must therefore be a substance; but it has been shown that there is no corporeal or material substance; it remains therefore that the cause of ideas is an incorporeal active substance or spirit.

বেশ কথা। গুণ স্বয়ং অন্য গুণ উৎপাদনে অক্ষম, গুণ উৎপাদনে গুণীর অপেক্ষা করে, এ সব কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। সাংখ্যশাস্ত্রও বলিয়া গিয়াছেন, ইন্দ্রিয় মন পঞ্চভূতাদি রূপ ষোড়শ তত্ত্ব বিকারী হইয়াও বিকার উৎপাদনে অক্ষম, বার্কেলেও ভাবান্তরে এই সত্যই প্রকাশ করিতেছেন। তার পর, গুণ ক্রমাত্রবিশিষ্টতারূপে সপ্রমাণিত হওয়াতে গুণী কদাপি জড় হইতে পারেন না, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যথা গুণই গুণ আনয়ন করিয়া থাকে বলা হয়, যাহা প্রকৃত পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং গুণী যে অজড় বা চিন্মাত্রবিশিষ্ট তাহাতে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। এতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার মতের সহিত আমাদের মতের কোন বিরোধ নাই। পরে তিনি বলিতেছেন—

But whatever power I may have over my own thoughts, I find the ideas actually perceived by sense have not a like dependence on my will. When in broad daylight I open my eyes, it is not in my power to choose whether I shall see or not and so likewise as to the hearing and other senses, the ideas imprinted on them are not creatures of my will. There is therefore some other will or spirit that produces them.

এইস্থলে তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে, সেই গুণী আমরা হইতে পারি না। তাহার কারণ এই যে, যখন প্রশস্ত দিবালোকে আমরা চক্ষু খুলি, তখন দেখা বা না দেখা আমাদের সাধ্যায়ত্ত থাকে না। যদি সেই গুণী আমরাই হইতাম তাহা হইলে আমরা ইচ্ছাক্রমে দৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া রুদ্ধ বা মুক্ত করিতে সক্ষম হইতাম। তা যখন পারা যায় না, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, চিত্তের এবম্বিধ বৃত্তি অন্য চিন্মাত্রবিশিষ্ট গুণীর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সেই গুণী জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই নহেন; ইহাই তাঁহার যুক্তির সারাংশ।

ফলতঃ এই স্থানেই বিরোধ উপস্থিত। সর্ব্ব প্রথমে তিনি বাহ্য বস্তুর

গুণ সমূহকে এই বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন যে, সেই সমুদয় চিত্তারোপিত পদার্থের গুণ নহে ও হইতে পারে না ; কারণ, সে সকলই আমাদের নিজ নিজ চিত্তবৃত্তি হইতে উৎপন্ন।

"As for our senses, by them we have the knowledge only of our sensations, ideas &c. but they do not inform us that things exist without the mind or unperceived, like to those which are perceived"

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা আমাদের নিজ নিজ অনুভব সমূহেরই উপলব্ধি করিয়া থাকি ; পরন্তু উক্ত অনুভব সমষ্টি ব্যতীতও যে বাহ্য পদার্থগুলি তদাকার ভাবে অবস্থিত থাকে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। তারপর আর এক স্থলে স্বীয় মত দৃঢ় রূপে সংস্থাপনার্থ বার্কেলে আর একটী প্রমাণ দিতেছেন এই যে, বাহ্য পদার্থের অবিদ্যমানতা সত্বেও সময়ে সময়ে (যথা স্বপ্নাবস্থায় বা বায়ু বিকারে) আমরা সেই সমুদয় গুণ অনুভব করিয়া থাকি। যদি সেই সমুদয় গুণ চিত্তবৃত্তিজনিত না হইয়া বাহ্য-পদার্থের প্রকৃত স্বরূপই হইত, তবে তদবিদ্যমানতাতেও চিত্তে তদাকার গুণসমষ্টির উদয় সম্ভবপর হইত না। অতএব বাহ্য পদার্থ—চিত্তবৃত্তি=গুণের নিরস্তিত্ব ∴ চিত্ত-বৃত্তি=গুণের অস্তিত্ব ; ইহাই যদি তাঁহার বিচারের সারাংশ হয়, তবে এবম্বিধ প্রমাণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিচারেও যে অবশ্য তাঁহার মতে প্রযুজ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাদী প্রতিবাদী উভয়েই যখন এবম্বিধ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছেন, তখন এইরূপ প্রমাণ প্রয়োগে যে মীমাংসা স্থিরীকৃত হইবে, তাহাতে কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে না এবং থাকিলেও শ্রবণ যোগ্য নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার মতে চিত্ত বৃত্তি + ঈশ্বর = গুণ সম্বলিত বাহ্য-পদার্থ। মিথ্যা কল্পিত জড়জগতের আধার (Substance) তিনি ঈশ্বরকেই করিতেছেন, ও তদ্দ্বারা "In him we live and move and have our being" বাইবেলের এই বাক্যের সারবত্তা দেখাইতেছেন। যাহা হউক ফলিতার্থে ঈশ্বরই তাঁহার মতে প্রকৃত বাহ্য পদার্থ হইতেছেন ও আমাদের মতে অস্মিতাই ঈশ্বরের স্থান পূর্ণ করিতেছে। বাহ্য পদার্থের জড়ত্ব অপ-নয়ন মানসে তিনি সেরূপ অন্তরঙ্গ অনুভব ব্যতীত সেই সকল গুণের নিরস্তিত্ব দর্শনে, চিত্তবৃত্তিকেই তাহার কারণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সেই রূপ প্রমাণাবলম্বনে আমাদের এখন দেখা উচিত যে অস্মিতা—(চিত্ত-বৃত্তি বা বাহ্য পদার্থের গুণসমষ্টি, যাই বল) = ঈশ্বর বা বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব

(Substance of external things) হওয়া সম্ভবপর কি না। প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, যেমন চিত্তবৃত্তি ছাড়িয়া দিলে বাহ্য-পদার্থের গুণ সমষ্টির অস্তিত্ব নাই ও থাকিতে পারে না, সেইরূপ অস্মিতা ছাড়িয়া দিলে বাহ্য-পদার্থের যে Substance অর্থাৎ আধার বা যাই বল তাহারও অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না এবং হওয়াও অসম্ভব। সুতরাং প্রথমতঃ যখন এই বলিয়া বাহ্য পদার্থের গুণকে আমাদের চিত্তবৃত্তিমাত্রাবিশিষ্ট বলিয়াছেন ও দ্বিতীয়তঃ গুণ হইতে গুণের উৎপত্তি অসম্ভব বিধায় একমাত্র চিন্মাত্রাবিশিষ্ট গুণই গুণ উৎপাদনে সক্ষম মীমাংসা করিয়াছেন, তখন এই উভয় যুক্তির যোগফলে তাঁহার কথিত গুণী যে আমাদিগেরই অস্মিতামাত্রতেই পরিণত হয়েন, তাহা সকলকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অস্মিতাই যে জগদস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষাৎ কারণ, সে বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিতেছেন না। বিশেষতঃ এই সিদ্ধান্ত আর দৃঢ়তররূপে স্থাপনা হয়, যখন আমরা তাঁহারই প্রদত্ত প্রমাণের ব্যবহার করিয়া বলি যে বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব না রহিলেও সময়ে সময়ে (যথা স্বপ্নাবস্থায় বা বায়ু বিকারে) আমাদের চিত্তে বাহ্য গুণ সমষ্টির উদয় হইবামাত্র তাহাতে তৎপদার্থ সম্বন্ধীয় অস্তিত্বের ভাব অখণ্ডিত থাকিয়া যায়। এক্ষণে যদি বার্কেলের শিষ্যবৃন্দ স্বীকার করেন যে, তোমাদের কথিত অস্মিতাই আমাদের ঈশ্বর, তবে আর তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; কারণ, নামান্তর ব্যবহারে পদার্থান্তর সম্ভবপর নহে। তবে কি না তাঁহাদের হাতে পড়িয়া ঈশ্বরই শেষ অস্মিতাতে পরিণত হইলেন, এই একটা কথা!!

এখনো যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, অস্মিতাই যদি জগদস্তিত্বের কারণ হয়, তবে জগদস্তিত্ব আমাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার না হইবে কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে, কারণ ইচ্ছাধীন হইলে তবে তৎকার্য্যও ইচ্ছাধীন হইতে পারে। প্রথমে প্রমাণ কর যে, অস্মিতা আমাদের ইচ্ছাধীন, তাহার পর জগদস্তিত্ব ইচ্ছাধীন না হইবে কেন বলিও। কোটি কোটি বার ইচ্ছা করিলেও অস্মিতার ভাব অবগত হইবার নহে; হইবেই বা কিরূপে? ইচ্ছাতেই অস্মিতা অনাদিজড়িত, অস্মিতা ব্যতীত ইচ্ছাক্রিয়া সম্ভবপর নহে. তবে আর অস্মিতা অস্মিতাকে খণ্ডন করিবে কিরূপে? সুতরাং অস্মিতাই যদি ইচ্ছাধীন ব্যাপার না হয়, তাহা হইলে তৎপ্রসূত জগদস্তিত্ব যে ইচ্ছাধীন হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণিত হইল,

ঈশ্বর জগদস্তিত্বের সাক্ষাৎ কারণ নহেন ও হইতে পারেন না। উপরুক্ত বিচার প্রণালী অবলম্বনে যাঁহারা ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমিকত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অবলম্বিত প্রমাণই শেষে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। বস্তুতঃ ঈশ্বর সপ্রমাণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিচার-প্রণালীর উপর নির্ভর করিতেছে, প্রসঙ্গ ক্রমে সে সকল কথা পরে বলা যাইবে।

শ্রীবিপিন বিহারী সেন।

জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

আপনার প্রতি, সমাজের প্রতি, দেবতার প্রতি,—মানুষের কর্ত্তব্য সাধারণতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। আত্মোৎকর্ষ বিধান প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, সামাজিক নিয়ম প্রতি-পালন দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত এবং ধ্যান ধারণাদি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই বিভাগ যথেচ্ছাকৃত, আমার কার্য্য দ্বারা যেমন আমার উপকার হয়, আমার কার্য্যদ্বারা যেমন সমাজের উপকার হয়, এই বিভাগের সত্যতা বিশ্বাস করিতে হইলে আমার কার্য্য দ্বারা তেমনি দেবতা দিগেরও উপকার হয় স্বীকার করিতে হইবে। আবার আমার কার্য্য দ্বারা যেমন আমার এবং সমাজের অপকার হয়, তেমনি দেবতাদিগেরও অপকার হয়। সুতরাং দেবতাগণ মনুষ্যের ন্যায় ইষ্টানিষ্ট প্রভাবিত এবং আমার প্রসাদ আকাঙ্ক্ষী ও বিরাগ আশঙ্কী। এইরূপ দুর্ভাগা দেবতা পুরাকালের কল্পনা, ইহারা নর-বানর-সমুৎপন্ন।

স্বার্থ, বিবেক ও প্রেম আমাদের সকল প্রকার কার্য্যের উৎস বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়। স্বার্থপরতা আত্মোৎকর্ষ সাধনের প্রবণ, বিবেক সামাজিক জীবনের উৎস এবং দেবকার্য্য প্রেম-সমুৎপন্ন। যখন সকল কার্য্যের নিমিত্ত আমি, তখন আমিই স্বার্থপর রূপে আত্ম মঙ্গল অনুষ্ঠান করি, কর্ত্তব্য পরায়ণ রূপে তোমাদের উপকার সাধন করি এবং প্রেম প্রভাবিত হইয়া আপন পর ভুলিয়া "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" যথেপ্সীত কার্য্য বিভাগে সুতরাং আরো কিছু গোলযোগ বাধে। প্রথম আত্মোৎকর্ষণ এবং যজন যাজন "কর্ত্তব্য" মধ্যে পরিগণিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ দেবকার্য্যকে সামাজিক ও আত্মীয় কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র করা হয়, তৃতীয়তঃ

দেবকার্য্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া সামাজিক কার্য্যকে অবনত করা হয় এবং আত্মোৎকর্ষণ অসার, ঘৃণিত ও হীনতম কার্য্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। এই অসদাচরণের ফলে জীবন দুঃখময়, সংসার কণ্টকপূর্ণ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিগণিত হইয়াছে—সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠতর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা ও সমাজগত ব্যভিচার প্রভৃতি এই অসদাচরণের লোম-হর্ষণ প্রতিশোধ লইতেছে। আমার দ্বারা দেবতার কোন ইষ্টানিষ্ট হইতে পারে না, তাঁহারা আমার প্রসাদ বা বিরাগ আকাঙ্ক্ষা বা আশঙ্কা করিতে পারেন না। তাঁহারা আমাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরস্কার দিয়া কর্ত্তব্যে প্রণোদিত বা দণ্ড দিয়া অকর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ করেন না। আমরা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্পর্কিত। আমাদের যাহা কিছু করিবার আপনার বা সমাজ সম্বন্ধে, দণ্ডপুরস্কার, ভয় ভাবনা, অনুরাগ বিরাগ, এই দুই জনের নিকট আমাদের কর্ত্তব্য পালিত না হইলে এই দুইজনের অন্যতর দণ্ড দেয়, পালিত হইলে অন্যতরের নিকট পুরস্কার পাই। ইহারা দেবতা প্রণোদিত কি না, ইহাদিগের শক্তি সেই শক্তিসঞ্জাত কি না, চিন্তা করিতে দার্শনিকের আনন্দ জন্মিতে পারে; কিন্তু জীবনের প্রাত্যহিক কার্য্যে তাহাদিগের ফলোপধায়কতা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং দেবতার কোন কার্য্য করিবার জন্য আমাদের জীবন নহে। যদি দেবতার কোন কার্য্য থাকে, দেবতা আপনার কার্য্য আপনি করিবেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার। দেবানুগত প্রবৃত্তির অনুশীলন করা কর্ত্তব্য কি না, সে কথা এখানে আলোচনা করা হইল না।

অগত্যা আমাদিগের কর্ত্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—সামাজিক ও স্বকীয়—ইহাদিগের কেহ কাহারও শ্রেষ্ঠ নহে। পরন্তু, যাহা আমাদিগের সামাজিক কর্ত্তব্য, তাহা স্বকীয় কর্ত্তব্যের রূপান্তর মাত্র; বস্তুতঃ স্বকীয় কর্ত্তব্যই একমাত্র কর্ত্তব্য, সামাজিক বা দৈবিক সকল কর্ত্তব্যই স্বকীয় কর্ত্তব্য, কেবল নামভেদ মাত্র। এবং যদি শ্রেষ্ঠতা কাহাকেও দিতে হয়, স্বকীয় বা স্বার্থ-প্রসূত কর্ত্তব্যকেই সে শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে। জীব মাত্র স্বার্থপর, কর্ম্ম মাত্র স্বার্থপরতা-প্রসূত। স্বকীয় না হইলে পরকীয় হইতে পারে না। আগে স্বতন্ত্রতা, তাহার পর সমাজ।

"জীবনের উদ্দেশ্য স্বার্থ সাধন। আমার যাহাতে উন্নতি হয়, আমি তাহাই করি।" উন্নতি অনুশীলনে, কর্ম্ম অনুশীলনের নামান্তর। স্বকীয়

কার্য্য বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন হেতু, পরকীয় বা সামাজিক কার্য্য ভাব-বৃত্তির অনুশীলন হেতু এবং বুদ্ধি ও ভাব উভয় বৃত্তির অনুশীলন হেতু দেব-কার্য্য। দেব-কার্য্যে ভাব ও বুদ্ধির সমতা, কেহ কাহারও উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। ভাব ও বুদ্ধির সমতার নাম প্রেম। প্রেমে ভাবের মত্ততা নাই, বুদ্ধির প্রভবতা নাই; প্রেমে হাসি কান্না নাই, বিচার তর্ক নাই, জড়তা নাই, সূক্ষ্মতা নাই, কার্য্য নাই, প্রবণতা নাই। সামাজিক কার্য্য প্রবণতা-মূলক ও আত্ম কার্য্য কার্য্যপরতা মূলক। সামাজিক কার্য্য, কার্য্যতৎপরতা দেখাইবার ক্ষেত্র বা আত্মস্বার্থ প্রবণতা দেখাইবার ক্ষেত্র নহে। অথচ যদি সামাজিক ও দৈব কার্য্য উঠাইয়া সকলই আত্মকার্য্যে পরিণত কর, তখন আত্মকার্য্যের উদ্দেশ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাব বৃত্তি উভয়ের যুগপৎ ও সমন্বয়যুক্ত উন্নতি। যখন উভয়ের সমন্বয় হইয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব লোপ হয়, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে কে কোথায় বা কে কি পৃথক করিবার সামর্থ্য থাকে না, লোকে তাহাকে প্রেম বলে। আত্মোৎকর্ষণের সেই চূড়ান্ত। সুতরাং মানুষের কর্ত্তব্য তিন প্রকার নহে, এক প্রকার মাত্র; এবং সে কর্ত্তব্যের মধ্যে কেহ কাহারও শ্রেষ্ঠ নহে। ভাবের কর্ষণ বুদ্ধির কর্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা উন্নত নহে, জ্ঞান-যোগও কর্ম্মযোগের উচ্চদেশীয় রূপে গণ্য হইতে পারে না। সন্ন্যাসী গৃহস্থের অপেক্ষা পুণ্যবান্ নহেন, গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে ঘৃণা করিতে পারেন না। গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানযোগী, ভক্ত রামানন্দ—মনুষ্য জীবনের আদর্শ। শাক্য চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ নহেন, চৈতন্য সিদ্ধার্থকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

আমরা সামাজিক আদেশ প্রতিপালন করি, সমাজের উপকারের জন্য নহে, আমাদের উপকারের জন্য; সমাজের আদেশ উল্লঙ্ঘন জন্য যে দণ্ড পাই, সে দণ্ডও আমাদের আপন উপকারার্থ। আমাদিগকে ছাড়িয়া সমাজ নাই, একথাটী সকল সময় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা যাহা কিছু করি, তাহা যেমন আমার আপন উন্নতি হেতু, তেমনি দণ্ড পুরস্কারও আমার আপন উন্নতি হেতু, শাস্তি বা প্রতিশোধ দিবার জন্য নহে। এবং দণ্ড পুরস্কারের বিধান কর্ত্তা একমাত্র সমাজ হইলেও পুরস্কার ততক্ষণ স্ব-স্বরূপ গ্রহণ করে না, যতক্ষণ আমার অনুমোদন প্রাপ্ত না হয়। দণ্ড পুরস্কারের সার্থকতা আমার অনুমোদন সাপেক্ষ। যতক্ষণ আমার অনুমতি না পায়, ততক্ষণ তাহা অনুচিত তাড়না মাত্র। আমার ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রভাবিত

করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং নিষ্ফল। অতএব আমা কর্ত্তৃক বা অন্য কর্ত্তৃক আমা সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটে, তাহাতে আমিই প্রধান। আমার মধ্যদিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জগতে যাহা কিছু সব আমার জন্য, আমি প্রধান আর সব অপ্রধান। আমার জন্য সমাজ, সমাজের জন্য আমি নহি; আমার জন্য দেবতা, দেবতার জন্য আমি নহি। আমি দেহ চালন করি, বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন করি, আমার উন্নতির জন্য; আমি তোমাকে সম্মান করি, পুত্রকন্যাকে স্নেহ করি, প্রতিভার গৌরব করি, দরিদ্রকে দান করি, পাপীকে দণ্ড দেই, আমার উন্নতির জন্য; আমি যোগ সাধন করি, আরাধনা উপাসনা করি, প্রেমের মধ্য দিয়া আমাতে সকলি পর্য্যবসিত এবং আমি ও আমার তন্ময়ে পরিণত দেখি, মধুরে মধুরে ভুবন মধুময় দেখি, সেও আমার আপন উন্নতির জন্য। জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা আমার উন্নতির জন্য; বন্ধু দ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা, বিবাহ, ব্যথা বেদনা, বজ্রাঘাত, আমার উন্নতির জন্য। বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস, সংসার বা আসক্তি, ভয় বা ভাবনা, জরা বা মৃত্যু সকলই আমার উপকারের জন্য; পদে পদে স্খলিত হইতেছি, চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে ধর ধর, কেহ ধরে না বাঁচায় না, নিজের সামর্থ্য নাই—অন্যে সাহায্য করে না, ডুবিতেছি অনন্ত নরকে, দণ্ড দিতে সকলে প্রস্তুত, আহা বলিয়া আমার ব্যাধির কারণ আমি কি অপরে দেখিতে কেহ প্রস্তুত নহে, অথচ কপোত-পক্ষী শ্যেনের ন্যায় বজ্রাঘাত আমাকে ঐ অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া কখন আপনাকে অভিসন্তপ্ত বলিয়া পাষণ্ডদিগকে গালি দেই বটে, কিন্তু পরক্ষণই বুঝিতে পারি সেও আমার আপন উন্নতির জন্য। আপাত-বিপদে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিলে জগদ্দল পাষাণ অলক্ষিত কোমল করে যখন বুক হইতে তুলিয়া লয়, তখনই আবার ডাকিয়া বলি এ পাষণ্ডকে কেন স্নেহ দেখাইলে, পাষাণে পেষিত কর, জীবন ঘুচিয়া যাউক। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কতবার দেখিয়াছি, জীবকের দৃশ্য কঠোর হস্ত খানি কোমল নবনীতময়।

জীবনের উদ্দেশ্য উন্নতি, পরকাল থাকুক বা না থাকুক কর্ম্মফল যখন অবশ্যম্ভাবী, আমার কর্ম্মে যখন অনন্ত কাল আমার সন্তান সন্ততি প্রভাবিত হইবে, তখন কে অপকর্ম্ম করিবে? সমাজের কঠোর শাসন, সন্তান সন্ততির অমিত বাসনা, ও অতীত কর্ম্মফল জনিত পরাধীনতা আমাদিগকে নিয়-মিত করে। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে আমরা জ্ঞান ভাব প্রেম, বেদ, যজ্ঞ, দান

দ্বিকর্ম্মের অনুশীলন করিতে বাধা। কেহ বা সন্ন্যাস, কেহ বা ব্রহ্মচর্য্য আদর্শ আশ্রম বলিয়া ঘোষণা করেন। যে বিদ্যালয়ে আমাদিগের অধিকাংশ বৃত্তি অধিক তর রূপে অনুশীলিত হয়, সে আশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সন্ন্যাস গ্রহণে বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সকলবিধ বৃত্তি স্ফূরিত হয় না। সংসার আশ্রম সকল আশ্রমের সার, সকল বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ। পরন্তু সংসারী না হইলে কেহ সামাজিকও হইতে পারে না, কেহ প্রেমিকও হইতে পারে না। দেবভক্ত ও সমাজ ভক্ত হইতে হইলে যে বৃত্তির স্ফূর্ত্তি চাই, সংসারে তাহার সম্ভাবনা। সমাজের শাসন প্রতিপালন করিতে যে আত্মসুখ বলিদান দিতে হয়, স্বাধীনতার সঙ্কোচ করিতে হয়, সংসারে তাহার সাধন না হইলে কখনই তাহাদের লক্ষ্য করিবার সম্ভাবনা নাই। সুখের নাম বহুদর্শন। দুঃখ হইতে যে পলায়ন করে সে কেবল কাপুরুষ নহে, সে অনভিজ্ঞ ও অপূর্ণ। সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী কেবল অসম্পূর্ণ নহে, তাহাদের যাহা আছে তাহাও দুর্ব্বল। তাহারা মনুষ্যত্বের অনধিকারী। সুখের কোমল শয্যায় মনুষ্যত্ব ঘটে না। সমাজ বৃহতীকৃত সংসার মাত্র। সংসারে যাহা ভোগ করি, সহ্য করি তাহাই অধিক পরিমাণে সমাজে ঘটে। সুতরাং অল্পে অল্পে সংসারে তাহার শিক্ষা না হইলে সমাজে তিষ্ঠান যায় না।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতার নিকট প্রতিদিন যে উপদেশ পাই, সমাজেও সেই উপদেশ পাইয়া থাকি; পরিমাণ ভেদ থাকিতে পারে, প্রকার ভেদ নাই। এজন্য যে সংসারী নহে, সে সামাজিক মনুষ্য হইতে পারে না, এবং যাহার সাংসারিক শিক্ষা যত অসম্পূর্ণ, সে সমাজের তত অনুযুক্ত; যাহার সংসারে যত লোক, তাহার শিক্ষা তত অধিক। যাহার পুত্র কন্যা হয় নাই, সে যেমন সমাজে অপ্রবীণ; যে পিতা মাতার নিকট সংসারে শিক্ষা পায় নাই, সেও সেইরূপ অসামাজিক বলিয়া গণ্য হয়।

এই জন্যই কুমার কুমারী ও বাল বিধবা সমাজ দরবারে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। যাহারা ইহাদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিধান করিতে চাহেন, তাঁহারা মনুষ্যত্বের গৌরব বুঝেন না। তাঁহাদের আদর্শ অপকৃষ্ট। যদি পূর্ণ মনুষ্য চাও, সংসারে খুঁজিতে হইবে। যদি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে চাও, সংসারী হইতে হইবে। যদি দেবতার ভক্তি থাকে, সমাজে প্রীতি থাকে, সংসারী হইতে কাহাকেও নিরস্ত করিওনা। যে নিবৃত্ত হয়, সেও পাপী; যে নিবৃত্ত করে, সেও পাপী।

তুমি সংসারী, "সর্ব্বোপকারকমং আশ্রমংতে" যাহাতে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, যাহাতে সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন হয়, মনুষ্যত্বের এক মাত্র সোপান স্বরূপ, তুমি নিজে সেই আশ্রম অবলম্বন করিয়া অন্যের জন্য নির্জীব ব্রহ্মচর্য্য বিধান কর, এই কি তোমার সহৃদয়তা? "যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ। বর্ত্তন্তে গৃহিণস্তদ্বৎ আশ্রিত্যেতর আশ্রমাঃ" তোমারি আচার্য্য মনুর এই উপদেশ। এ উপদেশ কি বলিয়া অবহেলা করিবে? সংসার-আশ্রম বীরভূমি, ধর্ম্মারণ্য, দেবক্ষেত্র। কবিত্ব যদি মনোহারী, ধর্ম্ম যদি সুখপ্রদ, প্রেম যদি লোভনীয়, দেবত্ব যদি বাঞ্ছিত, ব্যাবৃত্তি যদি বিজ্ঞানসিদ্ধ, কর্ষণ যদি উন্নতি-প্রসূ, কাপুরুষতা যদি ঘৃণিত, অপূর্ণতা যদি পরিত্যাজ্য হয়, তবে সংসার আশ্রম অপরিহার্য্য। স্নেহের উৎস, দয়ার প্রস্রবণ, ভক্তির নিদান, কোমলতা, কবিত্ব, প্রেমের প্রতিমা, বীরত্ব, সাহস, অধ্যবসায়ের আদর্শ এমন আর কোথায় মিলিবে?

"সত্যার্জবঞ্চাতিথি পূজনঞ্চ,
ধর্ম্মস্তথার্থশ্চরতিঃ স্বদারৈঃ।
নিষেবিতব্যানি সুখানি লোকে,
হ্যস্মিন্‌পরেচৈবমতং মমৈতৎ॥
ভরণং পুত্রদারাণাং বেদানাং ধারণং তথা।
যসতামাশ্রমং শ্রেষ্ঠং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥
এবং হি যো ব্রাহ্মণোযজ্ঞশীলো গার্হস্থ্যমধ্যাবসতে যথাবৎ।
গৃহস্থবৃত্তিঃ প্রবিশোধ্য সম্যক্ স্বর্গে বিশুদ্ধং ফলমাপ্নুতে সঃ॥
পুণ্যাং গৃহস্থেন বিচক্ষণেন গৃহেষু সক্তেতুমনং প্রযাসাৎ।"শান্তিপর্ব্ব।
"বিনাপি তৎকর্ত্তৃ নিষেবনেন তীর্থাদিসেবা বহুদুঃখসাধ্যা।
গৃহী ধনী ধন্যতরো মতো মে তস্মোপজীবন্তি ধনং হি সর্ব্বে।
চৌর্য্যেণ কশ্চিৎ প্রণয়েন কশ্চিদ্দানেন কশ্চিদ্বল তোহপি কশ্চিৎ॥
সন্তোষয়েদ্বেদবিদং দ্বিজং যঃ সন্তোষয়ত্যেষ স সর্ব্বদেবান্।
তদ্বেদবিপ্রে নিবসন্তি দেবা ইতি স্ম সাক্ষাচ্ছ্রুতিরেব বক্তি॥
স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বিদিতাখিলার্থা জিতেন্দ্রিয়াঃ সেবিত সর্ব্বতীর্থাঃ।
পরোপকারোন্নতিনো মহান্ত আয়ান্তি সর্ব্বে গৃহিণো গৃহায়॥
গৃহীগৃহস্থোহপি তদশ্নুতে ফলং যত্তীর্থসেবায়বাপ্যতে জনৈঃ।
তত্তত্তীর্থং গৃহমেব কীর্ত্তিতং ধনী বদান্যঃ প্রবসেন্ন কশ্চন॥

অন্তঃস্থিতা মূষকমুখ্যজীবা বহিঃস্থিতা গোমৃগপক্ষিমুখ্যাঃ।
জীবন্তি জীবাঃ সকলোপজীব্যস্তস্মাদ্‌গৃহী সর্ব্ববরো মতোমে॥
শরীরমূলং পুরুষার্থসাধনং তচ্চান্নমূলং শ্রুতিতোঽবগম্যতে।
তচ্চান্নমস্মাকমমীষু সংস্থিতং সর্ব্বং ফলং গেহপতিক্রমাশ্রয়ম্॥"

শঙ্করবিজয়ম্।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

অমৃতে গরল।

অমৃত-সিন্ধু মন্থনেই গরলের উৎপত্তি—কেবল কাল দোষে, কেবল অত্যধিক মন্থন নিবন্ধন। আজি যাহা অমৃত, জীবনসঞ্চারক; কাল তাহাই বিষ, জীবনহারক। অমৃতে গরলের উৎপত্তি স্বাভাবিক। অমৃতের পরিণতি গরলে,—কাল দৌরাত্ম্যে।

মাতৃস্তন্য পীযূস, শিশুর পক্ষে; শিশু জীবন তাহা না হইলে বাঁচেনা, বাড়ে না, বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হয় না। যৌবনে কিন্তু তাহাতে চলে না। আবার যৌবনে যাহা জীবনদায়ক ও জীবনরক্ষক;—যৌবনের প্রদীপ্ত জঠরানল যাহাকে ভস্মীভূত করিয়া স্বকার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিতে পারে, বার্দ্ধক্যে তাহাতে চলে না। যৌবনের অমৃত বার্দ্ধক্যের গরল।

যেমন মানুষ তেমনি সমাজ। কাল যাহা সমাজের পক্ষে অমৃত ছিল, আজ তাহাই সমাজের পক্ষে গরল;—তারতম্য এই, মানুষ কাল পরিবর্ত্তনে আপনার আহারীয়াদি পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, কিন্তু সমাজ কখন কখন তাহা না করিয়া আপনার হাতে আপনি মারা পড়ে।

যৌবনে মাতৃস্তন্য অনুপাদেয় খাদ্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি বয়ঃপ্রাপ্তিতে মাতৃ স্তন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কমিয়া যায়? বার্দ্ধক্যে যৌবনের খাদ্য অখাদ্য বলিয়া কি তাহার প্রতি বৃদ্ধদিগের ঘৃণা জন্মে?—জন্মেনা একটী কারণে;—যথাসময়ে তাহা পরিত্যক্ত হয় বলিয়া। যৌবনে যদি শৈশবের মাতৃস্তন্য বলপূর্ব্বক গলাধঃ করাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহাতে কি উদ্গার আসিবে না? দন্তহীন বৃদ্ধকে যৌবনোপযুক্ত কঠিন খাদ্য চর্ব্বন করিতে বাধ্য করিলে, তাহাতে কি তাঁহার বিরক্তি ও ক্রোধের সঞ্চার হইবে না? যাহারা সমাজের প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, তাঁহারা তাহাদের প্রতি

তোমরা বলপূর্ব্বক কালিকার পচা, পূতিগন্ধময় অমৃতকে আজও অমৃত বলিয়া গিলাইতে চাহিও না, আমরাও প্রাচীন অমৃতের যথোপযুক্ত সম্মান করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

এই সম্মানই তো প্রকৃত রক্ষণ-শীলতা, প্রকৃত জাতীয়তা, প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষণার লক্ষণ। সমাজের প্রাচীন রীতিনীতির আদর করিব, যেমন মাতৃ দুগ্ধের আদর করি,—এক দিন তাহা জীবন রক্ষার উপায় হইয়াছিল বলিয়া; যেমন প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতের আদর করি;—এক দিন তাহারা জন সমাজে জ্ঞানানুশীলনের পথ দেখাইয়াছে বলিয়া,—তাহাদের মৃত দেহের উপর বর্ত্তমানের উন্নত বিজ্ঞানের মনোহর অট্টালিকা রচিত হইয়াছে, বলিয়া। শৈশবের মাতৃস্তন্য যৌবনে পান করি না;—কিন্তু তাহাতে কি মাতৃস্তন্যের প্রতি অপমান প্রদর্শিত হইল? বা, প্লেটো ও আরিষ্টটোলের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মত সমূহ আজ সত্য বলিয়া স্বীকার করি না বলিয়া, ঐ মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত দ্বয়ের প্রতি অনাদর প্রদর্শিত হয়? তবে দুই সহস্র বা দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমাজে যে রীতি নীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাকে আজ অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যাগ করাতে জাতীয়তা, বা স্বদেশহিতৈষণার ব্যাঘাত জন্মিবে কেন?

আজ আমরা জন সমাজে যত প্রাচীন রীতি নীতি দেখিতে পাই, তাহারা বর্ত্তমানের সম্পূর্ণ উপযোগী হউক আর নাই হউক, বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত অবস্থাধীন তাহাদের দ্বারা সুফলই ফলুক আর কুফলই ফলুক, এক দিন তাহারাই জনসমাজের উন্নতির সহায় হইয়াছিল, এক দিন তাহাদের হাত ধরিয়াই জনসমাজ জগতে দাঁড়াইয়াছিল। এক দিন তাহারাই সমাজের পক্ষে অমৃত ছিল, আজ তাহারা হয়ত, কাল দোষে, গরলে পরিণত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারবিদ্ স্যার হেনরী সমার মেইন একস্থলে (Ancient Law) বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজের রীতি নীতি যে দিন বিধিবদ্ধ হইল,—মুখে মুখে যাহা প্রচলিত ছিল, কাগজে কলমে আইনরূপে যে দিন তাহা লিখিত হইল, সে দিনই হিন্দুসমাজের অধঃপতনের সূত্রপাত ও তাহার ভবিষ্য উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইল। স্যার হেনরী মেইনের এই-মত সম্পূর্ণরূপে সত্য না হইলেও যে অংশতঃ সত্য, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কেবল ভারতে কেন, অপর দেশেও Codification-এর দ্বারা

সমাজের উন্নতির বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। সামাজিক রীতি নীতি হইতেই আইন কানুনের সৃষ্টি। Codification অর্থই লিখিত আইনের চতুঃসীমার মধ্যে দেশের প্রচলিত রীতি নীতিকে আবদ্ধ করা। যত দিন রীতি নীতি সামাজিকগণের মুখে মুখে কিম্বদন্তিরূপে প্রচলিত থাকে, তত দিন তাহার পরিবর্ত্তন করা সহজ; কিন্তু যেই তাহারা পুস্তকবদ্ধ হইল, অমনি তাহাদের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা সংশোধন ক্রিয়া নিরতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। আজি কালি জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই আইন কানুন পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিবার লোক আছেন,—কোথাও বা রাজা, কোথাও বা ব্যবস্থাপক সভা; কিন্তু প্রাচীন জগতে এইরূপ সভা সমিতি বড় ছিল না। রাজার ক্ষমতাও অধিকাংশ স্থলে পুরোহিতের ক্ষমতার দ্বারা সংকুচিত হইত। সুতরাং পুরোহিতে যাহা দেশের রীতি নীতি ও আইনকানুন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া দেবতার নামে প্রচার করিয়া গেলেন, রাজার তাহা সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার রহিল না। কিন্তু সমাজের রীতি নীতিই তো কেবল লিখিত আইনের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করা হইল; সমাজ গতি তো আর ঐরূপে সীমাবদ্ধ করা যায়না! সমাজ-শরীর স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পাইতে চাহিল। এই বিধিবদ্ধ আইন কানুন তাহাকে চাপিয়া ধরিল, তাহার স্বাভাবিক বিকাশের ব্যাঘাত জন্মাইল;—তাহার পীড়নে সমাজ ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। Codification-এর দ্বারা সমাজের এই দুর্গতি হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও কোনও অবস্থাধীন Codification না হইলেও সমাজস্থিতি রক্ষা পায় না। ভারতে সেই সকল অবস্থাধীন Codification হইয়াছিল কি না, তাহার আলোচনা এস্থলে করিব না; তবে সাধারণতঃ কোনও বিশেষ সমাজের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া একথা বলা যাইতে পারে যে, যে Codification সমাজের উন্নতি ও স্ফূর্ত্তির সময় তাহার পক্ষে গরল হয়, তাহাই সমাজবন্ধনের সময়—তাহার অতি শৈশব অবস্থায় তাহার পক্ষে অমৃত ছিল।

Codificationএর প্রধান দোষ, তদ্দ্বারা সামাজিকগণের স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন কার্য্যের পথ অবরুদ্ধ হয়। তাহাতেই Codification সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু সমাজ-জীবনের এক সময় স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কার্য্যের পথ অবরুদ্ধ না করিলে সমাজ গঠিত হইতে পারে না; তাহার স্থিতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সমাজগঠনের প্রথম ও প্রধান সূত্রই

স্বাধীনতার সংকোচ, অধীনতা শৃঙ্খল পরিধান। সমাজগঠনের পূর্ব্বে মানুষ স্বাধীন থাকে, বনের পশুর মত স্বাধীনতা ভোগ করে। সে স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। এই উচ্ছৃঙ্খলতার উচ্ছেদেই কেবল সমাজ গঠন সম্ভব হয়। একজন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক সমাজগঠন সম্বন্ধে বলেন :—

"The first thing to acquire is, if I may so express it, *the legal fibre*; a polity first—what sort of polity is immaterial, a law first—what kind of law is secondary, a person or a set of persons to pay deference to—though who he is or they are, by comparison scarcely signifies." (Walter Bagehot's *Physics and Politics.* p. 50.)

সমাজগঠনের প্রথমেই আইন চাই—সে আইন যেরূপই হউক না কেন, শাসন চাই—সে শাসন যে প্রণালীরই হউক না কেন, এক বা ততোধিক ব্যক্তি চাই, যাহার বা যাহাদের বশ্যতা অপর সকলে স্বীকার করিবে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কাহারা তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুতর বিষয়। এই প্রয়োজনীয় পরাধীনতা, এই অত্যাবশ্যকীয় স্বাধীনতা-সঙ্কোচের নিমিত্তই Codification-এর উৎপত্তি। সমাজ বন্ধন কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত Codification-এর উপকারিতা, তৎপর্য্যন্ত Codification সমাজের পক্ষে অমৃত। কিন্তু তৎপরেই তাহা বিষ। স্যার হেনরী মেইন Codification সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ওয়ালটার বেগহট তাহাই বিশদতর ভাষায় বুঝাইয়াছেন :—

"Progress is only possible in those happy cases where the force of legality has gone far enough to bind the nation together, but not far enough to kill out all varieties and distroy nature's perpetual tendency to change." (*Physics and Politics* p. 64.)

সমাজ-জীবনের শৈশবেই যুদ্ধযুগ। এই যুগে সমাজের জীবন রক্ষার জন্য একব্যক্তির কর্তৃত্ব ও অপর সকলের তাহার বশ্যতা স্বীকার ও সর্ব্ববিষয়ে তাহার ইচ্ছার ও আদেশের সমক্ষে আপনাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বলিদান করা অত্যাবশ্যক, এবং তাহাতেই জনসমাজে সর্ব্ব প্রথমে রাজার সৃষ্টি। প্রাচীন সমাজে যে রাজা, সেই সেনাপতি; সেই তাহার জাতির অপর সকলকে বিপক্ষদলের সমক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালিত করিত। সেই সময়ে একজন রাজা না হইলে সমাজ চলিত না। সেই সময়ে একজন প্রভু ও অপর সকলে দাস না হইলে সমাজস্থিতি রক্ষিত ও সমাজের উন্নতি হইত না। তখন স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র শাসন স[illegible]

তাহা গরল। সেই কালে অধীনতা সমাজের উন্নতির সহায় হইয়াছিল. আজ তাহাতে সমাজের অধোগতি হয়।

দাসত্ব-প্রথা প্রাচীন সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন জগতের সর্ব্বত্রই ;—ভারত, মিশর, পারস্ত, গ্রীশ, রোম, কার্থেজ—সর্ব্বস্থানে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টোটল একটী ক্ষুদ্র বাক্যে এই প্রথা সম্বন্ধে সমগ্র প্রাচীন সমাজের মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন;— "Slavery exists by the law of nature" প্রকৃতির নিয়মানুসারে জনসমাজে দাসত্ব-প্রথা বিদ্যমান থাকে। এক অর্থে ধরিতে গেলে এই কথা অতি সত্য; কেন না প্রাচীন সমাজের উন্নতির জন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই দাসত্বের সৃষ্টি ও স্থিতি হইয়াছিল। সেইকালে দাসত্ব প্রথা সমাজের পক্ষে অমৃত ছিল; আজ তাহা বিষ। সেই সময়ে দাসত্ব প্রথা না থাকিলে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব হইত; আজ দাসত্বপ্রথাতে সমাজের অধোগতি ঘটাইতেছে—উরুপীয় তুর্কি তাহার সাক্ষী। প্রাচীন সমাজের দাসত্ব প্রথার উপকারীতা সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন "Refinement is only possible when leisure is possible; and slavery first makes it possible. It creates a set of persons born to work that others may not work, and not to think in order that others may think." (Ibid p. 73.)

সভ্যতার উন্নতি অবসর-সাপেক্ষ; এবং সর্ব্ব প্রথমে জনসমাজে দাসত্ব-প্রথা দ্বারাই লোকে আত্মোৎকর্ষ সাধনের অবসর প্রাপ্ত হয়। দাসত্ব-প্রথা সমুদয় কায়িক শ্রমভার বহন করিবার জন্য একদল লোক সৃষ্টি করিয়া সমাজের অপর সকলকে চিন্তা করিবার অবসর প্রদান করিয়া থাকে। গ্রীশ ও রোমে প্রাচীনকালে এই কুপ্রথা না থাকিলে, রোমক ও গ্রীসীয়গণকে অহর্নিশি উদরান্নের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু দাসগণ তাহাদের ভূমি কর্ষণ, গো মেষাদি প্রতিপালন ও অপরাপর কায়িক শ্রমের কার্য্য করিত এবং তাহারা কায়িক শ্রম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মানসিক শ্রমে প্রবৃত্ত হইবার অবসর প্রাপ্ত হন। তাহা হইতেই রোমক এবং গ্রীক সভ্যতা ও জ্ঞানের উৎপত্তি। ভারতেও শূদ্র দাসগণের কৃপায় ঐ রূপে শ্রেষ্ঠতর জাতি সমূহের জ্ঞানোন্নতির এবং ভারতের সামাজিক উন্নতির বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল। সেই সময়ে দাসত্ব প্রথা সমাজের পক্ষে অমৃত ছিল। কিন্তু যখন অর্থের সৃষ্টিতে সমাজে মূলধনের উৎপত্তি হইল; যখন

অর্থের বিনিময়ে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক খাটিবার লোক—ভৃত্য, মজুর, প্রভৃতি পাওয়া সহজ হইল, তখন দাসত্ব প্রথা বিষে পরিণত হইল। তখন দাসত্ব প্রথাতে সমাজের একাঙ্গকে বিকল ও নির্জীব করিয়া রাখিয়া মহা অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। যতদিন যাহা প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যক ততদিনই তাহার উপকারিতা; যেই তাহার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়, অমনি তাহা অপকার করিতে আরম্ভ করে। প্রকৃতির এই নিয়ম। দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধেও তাহাই হইল।

এক সময়ে মানুষ প্রাণীপূজা করিত, আজ প্রাণী পূজার ধর্ম্মে লোকের বিশ্বাস অল্প; যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু এই প্রাণী পূজা হইতে সমাজের কি সামান্য উপকার হইয়াছে? এই প্রাণী পূজা এককালে সমাজের পক্ষে অমৃত ছিল। প্রাচীন সমাজে যেমন দাস দাসীর প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুকুলও নিরতিশয় আবশ্যকীয় ছিল। তখন চাষ বাস সকলই পশুদিগের দ্বারা হইত। প্রাণী পূজা প্রথমতঃ এই গৃহপালিত পশুদিগের রক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মানুষের মতি জন্মাইয়াছে। সমাজের শৈশবকালে মানুষের সংহারকভাব নিরতিশয় প্রবল থাকে; সে অবস্থায় এই প্রাণী পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যবহারোপযোগী জন্তুকুল সুরক্ষিত হয় এবং দূরতঃ মানব হৃদয়কে কোমল করিবার বিশেষ সাহায্য করে। প্রাণী পূজা (Fetishism) সমাজের এক অবস্থায় অমৃত ছিল, আজ তাহা গরল।

শ্রম বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শ্রেণী বিভাগ হইয়া জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক সময়ে জাতিভেদ প্রথা সমাজের হিতার্থে ও উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রাচীন ভারতে যে অতি দ্রুত গতিতে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, ও যুদ্ধ বিদ্যা প্রভৃতির অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বহুল পরিমাণে তাহার জাতিভেদে ব্যবসায় ভেদের ফল। কেহ কেহ বৈজিক-তত্ত্বের উপর জাতিভেদের উৎকর্ষতা স্থাপন করিতে চাহেন। আমরা বৈজিক তত্ত্বের সত্যে বিশ্বাসী হইলেও তাহাকে এতদূর ক্ষমতা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু বৈজিক-তত্ত্ব নিবন্ধন না হইলেও জাতিভেদ, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোককে পুরুষানুক্রমে এক ব্যবসায়াবলম্বী করিয়া তাহাদের দ্বারা যে সেই ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধন করে, ইহা অস্বীকার করি না। সাধারণতঃ বৈজিকতত্ত্বে যে সকল গুণ আরোপ করা হয়, তাহার অধিকাংশই সমানুভূতি বা association এর ফল। এই association

গুণেই পুত্র পিতার গুণ-ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। বালক কাল হইতে যে ভাবের ও যে দৃষ্টের মধ্যে কোনও ব্যক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার মনের উপর সে ভাব ও সে দৃষ্ট প্রভূত আধিপত্য উপভোগ করে। এই জন্য ব্যবসায়াদি বংশানুগত হইলে, বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব প্রভৃতি সেই বংশীয়গণের হৃদয় মনের উপর কার্য্য করিয়া, তাহাদের সেই সেই ব্যবসায়াদি পরিচালনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। তাহাতেই জাতিভেদে ব্যবসায়ভেদ হইলে তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের আশ্চর্য্য উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কেবল সমাজের প্রথম অবস্থাতেই হইতে পারে। কাল ক্রমে জাতিগত ব্যবসায় থাকাতে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে প্রতিযোগীতা বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহাতে ব্যবসায়ের উন্নতিপথও অবরুদ্ধ হয়। জাতিভেদ সমাজের এক অবস্থায়, সমাজের পক্ষে অমৃত ছিল ;— কিন্তু সমাজের অবস্থান্তর সংঘটনে তাহা গরলে পরিণত হইয়াছে।

সমাজ জীবনের বিকাশে, তাহার উন্নতি ও জটিলতা বৃদ্ধি সহকারে জনসমাজে পৌরোহিত্যের সৃষ্টি। প্রাচীনতম ধর্ম্ম সমূহের প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে পৌরোহিত্য প্রথা বিদ্যমান ছিল। এই প্রথা সর্ব্ব প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাহার প্রয়োজন ছিল ; স্বাধীনতা-বলিদান করিল ; আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লুপ্ত হইল। যে সময়ে সর্ব্ব প্রথমে তাহা হইয়াছিল, তখন সমাজের সকলের চিন্তা ও মতামত দান করিবার স্বাধীনতা থাকিলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইত। পৌরোহিত্য তখন সমাজের পক্ষে অমৃত ছিল। সেই অন্ধকার সময়ে পৌরোহিত্য নিবন্ধনই জনসমাজে জ্ঞানের বিমল আলোক রক্ষিত ও উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের অলৌকিক জ্ঞান ভাণ্ডার পৌরোহিত্য প্রথারই অক্ষয় কীর্ত্তি। কিন্তু কাল ক্রমে যখন সমাজে জ্ঞানের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় হইল, যখন স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাব সমাজের উন্নতির জন্য নিরতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল, তখন পৌরোহিত্য প্রথা আপনার দিন যে ফুরাইয়াছে, ইহা দেখিল না। না দেখাতেই যাঁহারা এক দিন জ্ঞানালোকের এক মাত্র আশ্রয় ও আধার ছিলেন, তাঁহাদের হস্তেই বর্দ্ধনশীল, উন্নতিশীল জ্ঞানের অপমৃত্যু হইল! কালিকার অমৃত আজ গরল হইল!

এই অমৃত হইতে গরলের উৎপত্তির মর্ম্ম যিনি বুঝিয়াছেন, জাতীয়তার সঙ্গে সংস্কার এবং রক্ষণশীলতার সঙ্গে উন্নতিশীলতার সম্বন্ধ ও সমাধান

করিতে তিনিই সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচীন সময়ের পিতৃপুরুষগণের প্রতি সরল, গভীর শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করাই তো প্রকৃত জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ; সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করাই তো প্রকৃত দেশহিতৈষীর কার্য্য। যিনি অদ্যকার কুরীতি কুনীতির মধ্যে এক দিনকার সুরীতি ও সুনীতি লক্ষ্য করিবেন, তিনি প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি খড়্গহস্ত হইলেও তাহাদের প্রবর্ত্তকগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন না। আমরা আজ জাতিভেদকে বহু অমঙ্গলের নিদান বলিয়া প্রাণপণে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিব, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন কালে এই জাতিভেদের দ্বারা সমাজের কি মহান্ উপকার সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া যাঁহারা ইহা সমাজে প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও কৃতজ্ঞ থাকিব। পৌরোহিত্যকে আজ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ও মানবের উন্নতির পরম শত্রু বলিয়া তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহার বিনাশ সাধনে বদ্ধ পরিকর হইব, কিন্তু এই পৌরোহিত্যেই একদিন জগতে বিবিধ জ্ঞান প্রচারিত, নীতি রক্ষিত ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে জানিয়া, প্রাচীন কালে যাঁহারা পৌরোহিত্যের প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক ছিলেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করিব। ইহাই প্রকৃত জাতীয়তা। ইহাই প্রকৃত রক্ষণশীলতা। নতুবা শৈশবে মাতৃস্তন্যে জীবন রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া যৌবনেও তাহাই পান করা, কিম্বা এক দিন একটী প্রথা সমাজের উপকারী ছিল বলিয়া এখনও সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তাহাকে রক্ষা করা,—জাতীয়তা না মূর্খতা?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।